(ভারতীয়-ঐতিহাসিক)

৪র্থ খণ্ড

শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার

দিব্যসিংহ দেব হইতে

পৃথ্বীরাজ পর্য্যন্ত।

১৩৪৬ বঙ্গাব্দ

মূল্য পাঁচ টাকা

প্রকাশক
শ্রীদেবব্রত চক্রবর্ত্তী এম্ এ
২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

কলিকাতা
২০৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
জীবনী-কোষ মুদ্রাযন্ত্রে
শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার
কর্ত্তৃক মুদ্রিত

চতুর্থ খণ্ডের মুখবন্ধ।

এই চতুর্থ খণ্ডে দিব্যসিংহ দেব হইতে পৃথ্বীরাজের কতক অংশ পর্য্যন্ত গেল। ৮৯৭ হইতে ১৩৪৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ইহাতে আছে। সত্বর গ্রন্থ শেষ করিতে আমরা চেষ্টা করিতেছি। যুদ্ধের জন্য কাগজের মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি পাইলেও আমরা গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করিলাম না। ইহাতে আমাদের অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

দিব্যসিংহ দেব—(প্রথম) তিনি উড়িষ্যার অন্তর্গত খুর্দ্দার রাজা ও জগন্নাথ মন্দিরের রক্ষক। তাঁহার পিতা প্রথম মুকুন্দ দেব। দিব্যসিংহ দেব ১৯৯২—১৭২০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আদেশে তিনি উড়িষ্যার জগন্নাথ মন্দিরের প্রবেশ পথের রাক্ষস মূর্ত্তি ভগ্ন করিতে ও মন্দিরের কাষ্ঠ নির্ম্মিত বিগ্রহ আওরঙ্গজীবের নিকট পাঠাইতে বাধ্য হন। কেবল তাহাই নহে, আওরঙ্গজীবের আদেশে তাঁহার কর্ম্মচারীরা অনেক অত্যাচার করিয়াছিল। জুনাইদ খাঁ। শেখ দেখ।

দিব্যসিংহ মহাপাত্র—তিনি 'শ্রাদ্ধদীপ' নামে একখানা স্মৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

দিব্যোক, দিব্য—উত্তর বঙ্গের একজন মাহিষ্য জাতীয় রাজা। বাঙ্গালার পালবংশীয় রাজা মহীপাল (দ্বিতীয়) অতিশয় প্রজাপীড়ক ছিলেন; তাঁহার অত্যাচার ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিলে সামন্ত নায়কগণ (অনন্ত-সামন্ত-চক্র) মহীপালেরই কৈবর্ত্ত জাতীয় অন্যতম সচিব (মতান্তরে সেনাপতি) দিব্যের নায়কত্বে বিদ্রোহী হন। ঐ সময়ে প্রজাশক্তিও বিশেষ প্রবল ছিল। সুতরাং মহীপালের অত্যাচারে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহা প্রজা ও সামন্তগণের মিলিত বিদ্রোহ বলা যাইতে পারে। ঐ বিদ্রোহের ফলে মহীপাল রাজ্যচ্যুত হন এবং বিদ্রোহিগণ দিব্যের প্রখর বুদ্ধি, কার্য্যদক্ষতা, আত্মসংযম প্রভৃতি নায়কোচিত গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন; এই ভাবে সামন্ত নায়কগণ রাজশক্তি অধিকার করিয়া রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করেন।

মহারাজ দিব্য খুব সম্ভব অধিক কাল রাজত্ব করেন নাই। তাঁহার রাজ্য কালের পরিমাণ এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। দিব্যের পর রুদক বা রুদ্র এবং তৎপরে ভীম সিংহাসনে আরোহণ করেন। দিবর গ্রামে শিলাস্তম্ভ শোভিত দিবর দীঘি তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক গ্রাম সরোবর প্রভৃতি তাঁহার নাম সংযুক্ত হইয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

দিমিত্রিয়—এই গ্রীক নরপতি ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম অংশে ও আফগানিস্থানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পিতার নাম প্রথম ইউথিদিম। খ্রীঃ পূঃ ১৯০ অব্দে এবুক্রদিত, দিমিত্রিয়কে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। দিমিত্রিয়ের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। বৈদেশিক নরপতিগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার মুদ্রায় ভারতীয় ভাষায় নিজ নাম অঙ্কিত করাইয়াছিলেন।

দিলওয়ার খাঁ—(১) তিনি মালব দেশের মুসলমান রাজবংশের স্থাপ-

য়িতা। তিনি মাতৃকুলে সুলতান সাহেব উদ্দিন ঘোরীর বংশধর। স্মরণাতীত-কাল হইতে মালব দেশ হিন্দুদেরই অধিকারে ছিল। ১৩১০ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৭১০) দিল্লীর সম্রাট গিয়াসউদ্দিন বলবনের রাজত্ব কালে এই প্রদেশ প্রথম মুসলমান কর্ত্তৃক বিজিত হয়। সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদ শাহ তোগলকের রাজত্ব কালে (১৩৯৪—১৪১৪ খ্রীঃ) দিলওয়ার খাঁ এই প্রদেশের শাসন কর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু অনতি বিলম্বে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৩৯৮ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহ, তৈমুরলঙ্গ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া গুজরাটে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তিন বৎসর মালব দেশে অবস্থান করেন। পরে সম্রাট দিল্লীতে গমন করিলে, দিলওয়ার খাঁ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া ধারনগরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। ১৪০৫ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৮০৮) তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র আলপ খাঁ মালবের অধিপতি হন। তিনি সুলতান হুসাংশাহ উপাধি গ্রহণ করেন। এই বংশের নিম্ন লিখিত সুলতানেরা ধারনগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১। সুলতান দিলওয়ার খাঁ ঘোরী।
২। সুলতান হুসাংশাহ।
৩। " মোহাম্মদ শাহ, ১ম।
৪। " মামুদ খিলিজী প্রথম।
৫। " গিয়াসউদ্দিন খিলিজী।
৬। " নাসিরউদ্দিন।
৭। " মোহাম্মদ শাহ, ২য়।
৮। " বাহাদুর শাহ।
৯। " কাদের শাহ।
১০। " সুজা খাঁ।
১১। " বাজ বাহাদুর।

দিলওয়ার খাঁ—(২) তিনি একজন দাউদসাই আফগান। তাঁহার প্রকৃত নাম—জালাল খাঁ। তিনি বাহাদুর খাঁ রোহিলার অনুজ সহোদর ভ্রাতা এবং সম্রাট আওরঙ্গজীবের একজন বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। সম্রাট তাঁহাকে পাঁচ হাজারী মসনবদারী পদ ও দিলওয়ার খাঁ উপাধি প্রদান করিয়া, দাক্ষিণাত্যে বিজয়ে প্রেরণ করেন। ১৬৮৩ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৯৪) তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

দিলওয়ার খাঁ—(৩) তাঁহার পিতার নাম আবদুল করিম। তাঁহার প্রকৃত নাম—আবদুল রউফ। তিনি পূর্ব্বে বিজাপুর অধিপতির সেনাপতি ও মন্ত্রী ছিলেন। ১৬৮৬ খ্রীঃ অব্দে উক্ত প্রদেশ মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজীব কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে, তিনি সম্রাটের অধীনে সেনাপতি হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে সাত হাজারী মসনবদারী ও দিলওয়ার খাঁ উপাধি প্রদান করিলেন। বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যেই তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

দিলওয়ার খাঁ—(৪) তিনি বাহাদুর খাঁ রোহিলার পুত্র। তিনি মুঘল সম্রাট শাহজাহানের একজন বিখ্যাত সেনা-পতি ছিলেন। ১৬৫৮ খ্রীঃ অব্দে কাবুলে তিনি পরলোক গমন করেন।

দিলরস বানু বেগম—তিনি শাহ নওয়াজ খাঁ সফিবীর কন্যা ও সম্রাট আওরঙ্গজীবের মহিষী ছিলেন। তাঁহার অপরা ভগিনীর সহিত রাজকুমার মুরাদের বিবাহ হয়।

দীক্ষিত—সাম্বৎসরিক। তিনি রামচন্দ্র বাজপেয়ীকৃত 'সমর সার' নামক গ্রন্থের এক টীকা রচনা করেন।

দীনকান্ত ন্যায়পঞ্চানন— ত্রিপুরা জিলার একজন শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ। বাঘাউ-রার চক্রবর্ত্তীবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সুবৃহৎ টোলে এক সময়ে ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১২৫ হইয়া-ছিল। ১২৯৮ সনে একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হইয়া, তিনি দেহত্যাগ করেন।

দীনদয়াল গিরি—তিনি একজন হিন্দী ভাষার বড় কবি ছিলেন। কাশী নরেশ তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করি-তেন। তিনি অন্যান্য আরও অনেক বড় লোকের সাহায্য পাইতেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক সাধু কবি ছিলেন।

দীনদয়াল গুপ্ত—তিনি একজন সুকবি ছিলেন। রঙ্গপুরের অন্তর্গত তুলসীঘাট তাঁহার জন্মস্থান। তিনি 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী' নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

দীনদয়াল পাঠক--একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত। তিনি 'মুহূর্ত্তভৈরব নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

দীননাথ—একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত। তিনি 'সর্ব্বসংগ্রহ' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়—তাঁহার জন্ম স্থান চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত হালিসহর গ্রাম। এই নীরব কর্ম্মীর কর্ম্মবহুল জীবনের কথা অনেকের নিকটেই অজ্ঞাত। তিনি পাঠ্যাবস্থায়ই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় কবিতা এবং খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মযাজকগণ পরি-চালিত 'অরুণোদয়' পত্রে গদ্য প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া তিনি কাশীবাসী হন। তখনও কাশী পর্য্যন্ত রেল হয় নাই মাত্র রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেল লাইন গিয়াছিল। তৎপরে একা গাড়ীর সাহায্যে তিনি কাশীতে উপস্থিত হন। কাশীতে আসিয়া কাশীর ভ্রমণ কাহিনী ও অন্যান্য বিবরণ দিয়া প্রভাকর পত্রিকায় কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেন। তৎপরে হালিসহরবাসী উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্ম্মচারী হইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। ইহার পরে তিনি প্রয়াগে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া দারা-গঞ্জে অবস্থান করেন। এই স্থানেই

তাঁহার 'বিবিধ দর্শন' কাব্য রচিত হয়। ১৮৭৫ সালে তিনি এটোয়া জিলায় বদলী হন। এই স্থানে কয়েকজন পদস্থ লোকের সাহায্যে সাহিত্য সভা স্থাপন করেন। এই স্থানে তিনি ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে অনেকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সমুদয় আলীগড় ইনষ্টিটিউট গেজেট, কলিকাতার প্রভাকর ও প্রয়াগ-দূত পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। পরে তিনি মোগল সরাই নামক স্থানে বদলী হন। এখানেও একটী সাহিত্য সভা স্থাপন, সভার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য চর্চ্চারও বিরাম ছিল না। তৎপরে কিছুদিন তিনি গিরিডির কয়লার খনিতে চাকরী করিয়া ১৮৭৪ সালে পার্ব্বতীপুরে বদলী হন। এইস্থানে তিনি নেটিব ইম্প্রুভমেণ্ট সোসাইটী নামে একটী সভা স্থাপন করেন। রেল কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার সৎকর্ম্মানুরাগ দেখিয়া অর্থ, গৃহ, পুস্তকাদি প্রদানে তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। এখানেও তিনি বক্তৃতা, কথকতা, নাট্টাভিনয়, প্রীতি-ভোজন প্রভৃতি অনুষ্ঠান দ্বারা লোকের মধ্যে নানা সদ্ভাব সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিতেন। একটী 'স্পোর্টিং ক্লাব' স্থাপন করিয়া, লোকের বাড়ী যাইয়া কথকতা সংগীত ও আলোচনাদ্বারা উদাসীন লোকদের মধ্যেও সদ্‌গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্তি জন্মাইতেন। তিনি ১৮৮২ সালে দক্ষিণ ভারতের পুনা নগরে বদলী হন। এখানেও তিনি নীরব ছিলেন না, প্রার্থনা সমাজে ও অন্যান্য নানাস্থানে বক্তৃতা দিয়া তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এই স্থানেই তাঁহার 'একতা-ব্রত' কাব্য প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তাঁহার অনেক প্রবন্ধ নব্যভারত, নবজীবন, হিন্দুহেরাল্ড, পুনা সার্ব্বজনিক সভা পত্রিকা প্রভৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুনায় তিনি পাঁচ বৎসর ছিলেন। পুনা হইতে তিনি ধারবার গমন করেন। তিনি এখানেও নীরব ছিলেন না। এখানে হিন্দু সম্মিলনী সভা স্থাপন করিয়া, সাহিত্য চর্চ্চা ও দরিদ্রের সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। শ্মশান ক্ষেত্রে তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় একটী মুমূর্ষু নিবাস নির্ম্মিত হয়। ধারবার রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট তাঁহার আর একটী কীর্ত্তি। সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী লোকেই উৎসাহের সহিত ইহাতে যোগদান করিতেন। বিংশতি সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে ইহার গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

১৮৯১ সালে তিনি দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া দক্ষিণ ভারতের মান্দ্রাজ, মাদুরা, রামেশ্বর, কলম্বো প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও অন্যান্য প্রবন্ধ মাদুরা মেইল (Madura Mail) নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সময়ে লণ্ডন

হইতে প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান মেগাজিন এণ্ড রিভিউ (Indian Magazine and Review) নামক পত্রিকায় কৌলিন্যপ্রথা সংশোধন বিষয়ে এক প্রবন্ধ ও কবীরের জীবন চরিত প্রকাশিত হয়। তাঁহার 'জ্ঞানপ্রভা' উপন্যাস, 'আর্য্যপ্রতিভা' পত্রিকায় ও দৈনিক সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তাঁহার 'হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন ও সংস্কার' নামক নব্যভারতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৮৯৪ সালে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আবার দেশভ্রমণে বহির্গত হন এবং ত্রিবাঙ্কুর, বেলারী, ত্রিচিনপল্লী, চিদম্বরম, মাদুরা, টিনাভেলী ত্রিভেন্দ্রাম, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন।

দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি সাধক রামপ্রসাদ সেনের স্মৃতি চিহ্ন স্থাপনে প্রয়াসী হন। তদর্থে অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি কলিকাতায় অবস্থান করিতে থাকেন। এই সময়ে কিছুদিন তিনি বিশ্বকোষ অফিসে ও কিছুদিন বুদ্ধিষ্ট টেক্সট বুক সোসাইটিতে (The Buddhist Text Book Society) কাজ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি কলিকাতা জাতীয় সমাজ সংস্কার সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সম্পাদকের এবং কয়েক বৎসর কলিকাতার ভারতীয় শিল্প সমিতির সহযোগী সম্পাদকের কাজ করেন। তৎপরে তিনি কলিকাতা, মৈমনসিংহ, দেওঘর, ভাগলপুর, মুঙ্গের, জামালপুর, কাশী, প্রয়াগ, কানপুর, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি স্থানে গমনপূর্ব্বক বক্তৃতা করেন এবং সেই সমুদয় বক্তৃতার বিষয় বহু ইংরেজী বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'বিচিত্র দর্পণ' তাঁহার রচিত একখানি কাব্য। 'জ্ঞানপ্রভা' উপন্যাস তাঁহার শেষ প্রকাশিত উপন্যাস।

এই অসাধারণ কর্ম্মবীরের জীবনের অবসান ১৯০২ সালে হয়।

দীননাথ ধর—একজন বাঙ্গালী কবি। ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে চুঁচড়া নগরে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা কুমারহট্ট হালিসহরবাসী ছিলেন। চুঁচড়ায় বিবাহ করিয়া তিনি তথায় বসবাস আরম্ভ করেন।

দীননাথ বাল্যকালে পাঠশালায়, পরে চুঁচুড়ায় ফ্রিচার্চ্চ স্কুলে এবং তৎপরে হুগলি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বি, এল পরীক্ষা দিয়া প্রথম হুগলীতে পাঁচ বৎসর, পরে আর দুইটি স্থানে পাঁচ বৎসর ওকালতি করেন। ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে তিনি ঢাকায় সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। শারীরিক অসুস্থতা হেতু ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া, হুগলী আসিয়া পুনরায় স্বাধীন ভাবে আইন ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। মধ্যে মধ্যে কলিকাতা হাই-

কোর্টে ওকালতি করিতেন।

কবিতা রচনা বিষয়ে দীননাথ মাইকেল মধুসূদন দত্তের একরূপ শিষ্য ছিলেন। "মেঘনাদ বধের" অনুকরণে তিনি ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে "কংস বিনাশ" কাব্য রচনা করেন। ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে মাতৃ বিয়োগ জনিত শোক অবলম্বনে "প্রসূতি বিয়োগে তন্য সুত" নামে একটি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন। ১৮৭৬ হইতে ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে তাঁহার তিনটি পুত্রকন্যার মৃত্যু হইলে, ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে "ত্রিশূল" নামে একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক রচনা করেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে "ঊষা চরিত" নামে তাঁহার মৃত জ্যেষ্ঠ পুত্র ঊষানাথ ধরের জীবনী রচনা করেন। ১৯০২ খ্রীঃ অব্দে আনন্দ ভট্টকৃত সংস্কৃত বল্লাল চরিতের বাঙ্গালা অনুবাদ ও ১৯০৩ খ্রীঃ অব্দে "সুবর্ণ বণিক কুলোদ্ধারক ঠাকুর উদ্ধারণদত্ত" নামে পুস্তক রচনা করেন। ইহা ছাড়া দীননাথ আরও কতকগুলি কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করেন। সঙ্গীত রচনা বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। ভক্তিরসাত্মক সাধন সঙ্গীত রচনায় তাঁহার যেরূপ পটুতা, হাস্যরসাত্মক সঙ্গীত রচনায়ও তদ্রূপ ছিল।

দীননাথ ন্যায়পঞ্চানন—বিক্রমপুর পুরাপাড়া নিবাসী একজন প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত। অনুমান ১২৭২ সনে তিনি স্বর্গী হন।

দীননাথ সান্যাল—দীননাথের পিতৃভূমি কৃষ্ণনগর। ১২৬৪ বঙ্গাব্দে (১৮৫৭ খ্রীঃ) মাতুলালয় শ্রীরামপুরে তাঁহার জন্ম হয়। শ্রীরামপুর হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণনগরে গমন করেন। প্রসিদ্ধ রামতনু লাহিড়ীর অনুজ ডাক্তার কালীচরণ লাহিড়ীর সাহায্যে তিনি প্রবেশিকা ও এফ্‌, এ, পাশ করিয়া কলিকাতায় আসেন এবং এখান হইতে বি, এ, ও এম, বি, পাশ করেন। দীননাথ, এই উপকারী কালীচরণের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

ডাক্তারী পাশ করিয়া তিনি সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি উন্নতি লাভ করিয়া সিবিল সার্জ্জেন হইয়াছিলেন।

দীননাথ রসজ্ঞ ও উচ্চস্তরের সাহিত্যিক ছিলেন। সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথের রচনা, দীননাথকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি ইন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী সম্পাদনেও বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গবাসী পত্রিকায় নাম দিয়া এবং নাম না দিয়া বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান দান মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্য সমালোচনা ও ব্যাখ্যা। মেঘনাদ বধ কাব্যের পরিমার্জ্জিত সংস্করণ তাঁহার অতুল কীর্ত্তি। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যের এই ব্যাখ্যা অতি মনোহর হইয়াছে।

তিনি আজীবন সাহিত্যসেবা করিয়া-ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি বাল্মীকি রামায়ণের একটী সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বাঙ্গালা গদ্যে করিয়াছিলেন। তদুপ-লক্ষে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"গীতশেষ, অপরাহ্ন; সন্ধ্যা আসিতেছে ধীরে,
বসি ধ্যানমগ্ন—এই জীবন প্রভাস তীরে।
সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু—ভাসে কৃষ্ণ পদতরি,
এই তীরে সন্ধ্যা—ঊষা অন্যকূলে মুগ্ধকরী।"

তিনি বাঙ্গালীকে মধুসূদনের অমর কাব্যগুলির রস আস্বাদন করাইয়া ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ৪ঠা পৌষ ৭৮ বৎসর বয়সে অমর ধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

দীননাথ সেন, রায় সাহেব—তিনি পূর্ব্ব বঙ্গের স্কুল ইনস্পেক্টার ছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতৃভূমি ঢাকা জিলার মাণিক গঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত দাসরা গ্রাম। তাঁহার পিতার নাম গোকুলচন্দ্র সেন ও মাতার নাম দয়াময়ী দেবী। তিনি কুমিল্লা জিলা স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া জুনিয়ার বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তৎপরে ঢাকা কলেজে প্রবেশ করেন। তিনি বি, এ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। কলেজ পরিত্যাগ করিয়া, তিনি কলেজ সংলগ্ন স্কুলে শিক্ষক হন। তৎপরে ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ বহুকাল করেন। তৎপরে তিনি ক্রমে এসিষ্ট্যাণ্ট ইনস্পেক্টার, জয়েণ্ট ইনস্পেক্টার ও ইনস্পেক্টার হন। ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ক্রমে ত্রিপুরার মহারাজের মন্ত্রীত্বও অল্পকাল করিয়াছিলেন, পরে পূর্ব্ব পদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন। তাঁহার ও অভয়কুমার দাসের বিশেষ চেষ্টায় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। পরে তাঁহার ধর্ম্ম মত পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি কয়েকখানি বিদ্যালয় পাঠ্য গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার শিল্প কাজের দিকে অতিশয় অনুরাগ ছিল। এক সময়ে তিনি কাপড়ের কল স্থাপন করিয়াছিলেন। ভাল কাপড় প্রস্তুত না হওয়ায় তাহা পরিত্যাগ করেন। নূতন প্রকারের প্রদীপদানও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি খুব প্রতিভাবান উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি পর-লোক গমন করেন।

দীনবন্ধু গুপ্ত—তিনি ১২৬৪ বাংলা সালে 'অজেন্দু চরিত' নামে একখানি বাংলা পুস্তক লিখিয়া বন্ধু বান্ধবের নিকট হইতে রৌপ্য নির্ম্মিত তৈজস পত্রাদি উপহার পাইয়াছিলেন।

দীনবন্ধু দত্ত—বাঙ্গালী দেশসেবী ও ব্যবহারজীবি। তিনি ২১ বৎসর বয়সে

ছাত্রবৃত্তি পাশের পর বাঙ্গালা কমিটি ওকালতি পাশ করিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহরে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং অল্প-দিনেই প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ব্রাহ্মণ-বাড়িয়ার সর্ব্ববিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে তাঁহার যোগ ছিল। কংগ্রেস বা স্বদেশী আন্দোলনেও তিনি অল্প-বিস্তর সংশ্লিষ্ট ছিলেন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে, চাঁদপুর ষ্টেসনে চা বাগানের কুলি হাঙ্গামা, অসহ-যোগ আন্দোলন প্রভৃতিতে তিনি যথা-সম্ভব যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘ সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া মিউনিসিপ্যা-লিটির চেয়ারম্যান, লোকাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, সমবায় ব্যাঙ্কের ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট প্রভৃতির কার্য্য দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়া-ছিলেন। তাঁহার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাড়ী সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল, তিনি বহু দরিদ্র ছাত্রের লেখাপড়ায় সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

দীনবন্ধু বাবুর ওকালতি ব্যবসার ষাট বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর ব্রাহ্মণ-বাড়িয়ায় তাঁহার হীরক জয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠান হয়।

সঙ্গীত বিদ্যায়ও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। সুবিধা পাইলেই তাঁহার গৃহে রাত্রির পর রাত্রি জলসার আসর বসাইতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম ছিলেন। তিনি ১৩৪৫বঙ্গাব্দের ১৯শে আশ্বিন, ৮৬ বৎসর বয়সে পর-লোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার চারি পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান ছিল।

দীনবন্ধু দাস—তিনি একজন বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহকারক। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'সংকীর্ত্তনামৃত'। তিনি শ্রীখণ্ডের শিষ্য বা শিষ্যানুশিষ্য ছিলেন।

দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন--হুগলীজিলার কোন্নগর নিবাসী বঙ্গের তৎকালিন একজন প্রধান নৈয়ায়িক। বাঙ্গালী পণ্ডিতদের মধ্যে তিনি প্রথম "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি লাভ করেন (১৮৮৭ খ্রীঃ)।

দীনবন্ধু মিত্র, রায় বাহাদুর—খ্যাতনামা বাঙ্গালী নাট্যকার। নদীয়া জিলার চৌবেড়িয়া গ্রামে ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। গ্রামের পাঠশালায় তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। পরে হেয়ার সাহেবের স্কুলে, তৎপরে হিন্দু স্কুলে পড়েন। পাঠান্তে ইং১৮৫৫ সালে তিনি ডাক বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক দেড়শত টাকা বেতনে পাটনার পোষ্ট মাষ্টার হইয়া তথায় গমন করেন। ছয় মাস পরেই তিনি উড়িষ্যা বিভাগে পরিদর্শক পোষ্ট মাষ্টার হইয়া গমন করেন। এই কার্য্যে অনেক সময়ে তাহাকে মফস্বলে থাকিতে হইত। এই ভ্রমণের ফলে লোক চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান লাভ হয়। উড়িষ্যা হইতে নদীয়ার, তৎপরে ঢাকা: নগরে তিনি

বদলি হন। এই সময়ে নীলের হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। রাজকার্যোপলক্ষে মফস্বলে ভ্রমণের ফলে, নীলকরদের অত্যাচার তিনি স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই অত্যাচারের বিবরণই তাঁহার নীল দর্পণ নাটকের বিষয় বস্তু ছিল।

১৮৭০ সালে তিনি কলিকাতার সুপার নিউমরারি ইনস্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টারের পদ প্রাপ্ত হন। পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলকে সাহায্য করাই এই পদের কার্য্য। এই সময়ে লুসাই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ায়, তিনি ১৮৭১ সালে ডাকের বন্দোবস্ত করিবার জন্য কাছাড় গমন করেন। তিনি অতি দক্ষতার সহিত যুদ্ধের সময় কাজ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। ইতিমধ্যে পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল ও ডিরেক্টার জেনারেলের মধ্যে বিবাদ ঘটে। তিনি পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলকে সমর্থন করেন। ইহার ফলে তিনি ডাক বিভাগ ছাড়িতে বাধ্য হইয়া অন্য বিভাগে চলিয়া যান। ইহারই কিছুকাল পরে ১৮৭৩ সালের আশ্বিন মাসে তিনি কয়েকটী কৃতবিদ্য পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

দীনবন্ধু প্রধানতঃ সামাজিক বিষয় লইয়া নাটক রচনা করেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ সামাজিক নানা বিষয় লইয়া বিস্তৃত ভাবে নাটক রচনা করেন নাই। তাঁহার প্রধান নাটক নীলদর্পণ ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশ কালে উহাতে গ্রন্থকারের নাম ছিল না। তৎপরে নিম্ন লিখিত নাটকগুলি যথাক্রমে প্রকাশিত হয়:—নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩); বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৫); সধবার একাদশী (১৮৬৬); লীলাবতী (১৮৬৯); সুরধনী (কাব্য; ১৮৭১); জামাইবারিক ও দ্বাদশ কবিতা (১৮৭২)। এই সকল ভিন্ন কমলে কামিনী; যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ; পোড়ামহেশ্বর; কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ এবং পদ্য সংগ্রহ নামক কয়েক খানি গ্রন্থও তিনি রচনা করেন।

সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে দীনবন্ধুর অনেক নাটক প্রকৃত ঘটনা লইয়া রচিত এবং নাটকান্তর্গত অনেক চরিত্র জীবিত ব্যক্তিদিগকে লক্ষ্য করিয়া অঙ্কিত। কোন কোন চরিত্র ইংরেজি নাটকের অনুকৃতি।

নীলদর্পণ নাটক প্রকাশিত হইবার পর এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। উহার ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশ হয় এবং তাহা লইয়া কলিকাতা সুপ্রীমকোর্টে মকর্দ্দমাও হয় (জেমস্ লঙ্ নাম দ্রষ্টব্য)। দীনবন্ধুর নাটকগুলি তৎকালে খুব লোকপ্রিয় হইয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর পরেও দীর্ঘকাল

তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে অভিনীত হইত।

দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর—তিনি যোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র। ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি সঙ্গীত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের বহু সংগীতের সুর যোজনা করিয়াছেন। তিনি বোলপুর বিশ্বভারতীতে দীর্ঘ ২৫ বৎসরকাল সঙ্গীতের শিক্ষক ছিলেন। সাধারণতঃ বড় বড় গায়কেরা সঙ্গীত শাস্ত্রের এক এক বিশেষদিকে দক্ষতা অর্জ্জন করেন। কেহ প্রাচীন সংগীতের একভাগ, আর কেহ অন্যভাগে দক্ষতা লাভ করেন, কেহ কীর্ত্তনে, কেহ বাউল কেহ বা ভাটিয়াল, এইরূপ এক একজন এক এক দিকে পারদর্শিতা লাভ করেন। এই সব বৈচিত্র অনুসারে গুণীদের শ্রেণী বিভাগ হইয়া থাকে। কিন্তু দীনেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট ছিল এই যে, তিনি সব রকমের গানই অনায়াসে অতি দক্ষতার সহিত গাহিতে পারিতেন। প্রাচীন হিন্দী সঙ্গীতেও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল। তাঁহার কীর্ত্তন শুনিয়া অনেক সময় অশ্রু সংবরণ করা অসাধ্য হইত। দ্বিজেন্দ্রনাথের হাসির গান তাঁহার মুখে শুনিলে মনে হইত, তাঁহার জুড়ি নাই। শুধু ভারতীয় নহে, ইউরোপীয় সঙ্গীতেও তাঁহার দক্ষতা ছিল। বিলাতে অবস্থানকালে এই সঙ্গীতের মোহই তাঁহাকে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় অগ্রবর্ত্তী করিতে পারে নাই।

তিনি সংগীত রচনাতেও নিপুণ ছিলেন। যদিও বেশী সংগীত তিনি রচনা করেন নাই, কিন্তু যে অল্প কয়টী রচনা করিয়াছেন, তাহা অতি মনোহর।

অনেকে হয়ত জানেন না যে, তিনি নানা ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। ফরাসী ইংরেজী, সংস্কৃত, মৈথিলী ও ব্রজবুলি তিনি বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার খুব অধ্যয়ন স্পৃহা ছিল। তিনি নিজেকে জাহির করিতে একেবারেই ইচ্ছুক ছিলেন না। ১৩৪২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে তিনি অপুত্রক পরলোক গমন করিয়াছেন।

দীনেশচন্দ্র বসু— বাঙ্গালী সাহিত্যিক। ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে (১২৫৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন) তাঁহার জন্ম হয়। ঢাকা জিলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমায় শ্রীবেড়িয়া গ্রামে তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল। তাঁহার পিতা অভয়াচরণ বসু সরকারী কাজ উপলক্ষে ভাগলপুরে বাস করিতেন। দীনেশচরণ সেই স্থান হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু শারিরীক অসুস্থতার জন্য তাঁহাকে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিতে

হয়। তদবধি তিনি বাটীতে অবস্থান করিয়া বিদ্যালোচনা ও সাহিত্য সেবা. করিতে থাকেন।

তাঁহার কবিকাহিনী ও মানস বিকাশ নামক কবিতা পুস্তকদ্বয় তৎকালীন সুধীজনকর্ত্তৃক বিশেষ সমাদৃত হয়। কুল-কলঙ্কিনী ও মহাপ্রস্থান নামক দুই খানি উপন্যাসও তিনি রচনা করেন। বামা বোধিনী, বান্ধব, ভারতমিহির প্রভৃতি বাঙ্গালা পত্রিকা ও ইংরেজি ষ্টেটসম্যান কাগজে তাঁহার অনেক রচনা প্রকাশিত হইত। ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত চারু বার্ত্তা এবং ঢাকাপ্রকাশ পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক পদেও তিনি কিছুকাল নিযুক্ত থাকিয়া পত্রিকাদ্বয়ের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। ঢাকা নিবাসী খ্যাত-নামা সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাঁহার বিশেষ উৎসাহ দাতা ছিলেন।

১৩০৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে (১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর) মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে ওলাউঠা রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, অতীশ—অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান দেখ।

দীপনারায়ণ সিংহ—১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে পাটনায় তাঁহার জন্ম হয়। তিনি প্রথমে কলিকাতায় শিক্ষা লাভ করিয়া বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসেন। তাঁহার পিতা রায়বাহাদুর তেজনারায়ণ সিংহ, ভাগলপুরে কলেজ স্থাপন করিয়া শিক্ষা বিস্তারের সহায় হইয়াছিলেন। ইং১৯০৭ সালে বহরম-পুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মি-লনের তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যও ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া, তিনি ইং১৯২০ সালে অহিংস, অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষিত হন। তিনি আইন ভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দিয়া কারাবাসও করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দেশের শিল্প ও অন্যবিধ উন্নতি কল্পে ন্যাসসম্পত্তিরূপে দান করিয়া গিয়াছেন। ১৯৩৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি পর-লোক গমন করেন।

দীপাবাই—(১) ছত্রপতি শিবাজীর পিতামহী। তিনি বনঙ্গপাল নিম্বলকার নামক একজন মহারাষ্ট্রপতির কন্যা ছিলেন। মালোজী তাঁহাকে বিবাহ করেন।

দীপা বাই—(২) তিনি শিবাজীর পত্নী পুতলী বাই এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারই সহোদর ভ্রাতা রাজারাম। বিশাজী রাও তাঁহাকে বিবাহ করেন।

দীপা বাই—(৩) তিনি শিবাজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বঙ্কোজীর সহধর্ম্মিণী। এই বুদ্ধিমতি রমণীর উপদেশে শিবাজীর সহিত বঙ্কোজীর মিলন হইয়াছিল। বঙ্কোজী অতি গর্ব্বিত ছিলেন। প্রধান

মন্ত্রী হনুমন্ত রাও অতিশয় বুদ্ধিমান ও বঙ্কোজীর পরম হিতৈষী ছিলেন। এই উপকারী মন্ত্রীকে অপমান করিয়া,তিনি রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। হনুমন্ত রাও শিবাজীর সহিত মিলিত হইলেন। এদিকে বঙ্কোজী শিবাজীকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় শিবাজী হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। বঙ্কোজীর সৈন্য ভীষণভাবে পরাজিত হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া বঙ্কোজী স্বীয় পত্নী দীপা বাঈ এর শরণাপন্ন হইলেন। তিনি স্বামীকে বিশ্বস্ত মন্ত্রী হনুমন্ত রাওকে প্রত্যানয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। বঙ্কোজী গত্যন্তর না দেখিয়া হনুমন্ত রাওকে অতি বিনীতভাবে আসিতে অনুরোধ করিলেন। প্রথম বারে কৃতকার্য্য না হইয়া আবার তিনি আরও কাতরতা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে আসিতে লিখিলেন। হনুমন্ত রাও এবার না আসিয়া পারিলেন না। বঙ্কোজী অতি সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। হনুমন্ত রাও মনের ক্রোধ বিদূরীত করিয়া শিবাজীর সহিত তাঁহার মিলন করাইয়া দিলেন। শিবাজী স্বীয় ভ্রাতাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত ত করিলেনই, অধিকন্তু বুদ্ধিমতী ভ্রাতৃবধূকে সাত লক্ষ টাকা আয়ের এক বিস্তৃত ভূমি খণ্ড উপহার প্রদান করিলেন।

দীর্ঘরভস—তিনি উড়িষ্যার সোমবংশীয় নরপতি মহাভব গুপ্ত জন্মেজয়ের অন্যতম পুত্র। তাঁহার পুত্র আপভার অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে, জন্মেজয়ের অপর পুত্র বিচিত্রবীর্য্য রাজা হন। বিচিত্রবীর্য্য দেখ।

দুঃখভঞ্জন— একজন জ্যোতিষের পণ্ডিত। জাতক সুধাকর গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

দুঃখীরাম পাল – নদীয়া জিলার অন্তর্গত দুগাছিয়া নিবাসী দুঃখীরাম পাল ও বাগাড়ে নিবাসী রঘুনাথ দাস প্রভৃতি কয়েকজন হিন্দু ও একজন মুসলমান, সাহেবধনী নামক একজন সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া স্বীয় গুরুর নামে সাহেবধনী নামে এক ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাকে কর্ত্তাভজারই এক শাখা বলা যাইতে পারে। ইহাদের উপাসনা স্থানে একখানা আসন থাকে। প্রতি বৃহস্পতিবারে এই আসন সমীপে উপাসকেরা মিলিত হইয়া সাধনা করিয়া থাকে। এই সম্প্রদায় বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। অচিরে অস্তিত্ব লোপের সম্ভাবনা আছে।

দুঃখী শ্যামাদাস—ভক্ত বৈষ্ণব কবি। অনুমান ১০৭০ বঙ্গাব্দে মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত প্রায় পনের মাইল পূর্ব্ববর্ত্তী হরিহরপুর গ্রামে দুঃখী শ্যামাদাস জন্মগ্রহণ করেন। ইনি

দেববংশীয় কায়স্থ। পিতার নাম শ্রীমুখ অধিকারী ও মাতার নাম ভবানীদাসী।

ইনি 'গোবিন্দমঙ্গল' নামে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অদ্যাপি তাঁহার বাটীতে নিজ বংশধরগণ কর্ত্তৃক ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত ইহা পূজিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীধর স্বামীর টীকা অবলম্বন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের একখামি সরল বঙ্গানুবাদও রচনা করেন।

দুজন জী—একজন দাদুপন্থী সাধু। দামোদর দাসজী দেখ।

দুদা—দিল্লীর সম্রাট আকবর চিতোর আক্রমণ করিলে পর রাণা উদয়সিংহ ভয়ে পলায়ন করিলেন। কিন্তু মিবারারে সমস্ত সামন্ত নরপতিগণ চিতোর রক্ষার্থ সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। তন্মধ্যে মাদোরিয়াপতি রাবৎ দুদা সঙ্গাবৎদিগকে লইয়া মুঘলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অগণিত পাঠান ও তাতার সৈন্য নিপাত করিয়া দুদা সমরাঙ্গণে শয়ন করেন। উদয়সিংহ দেখ।

দুন্দিয়া বেগ—একজন দস্যুপতি। প্রথমে সে টিপু সুলতানের সৈনিক দলে ছিল। পরে কিছু লোক সংগ্রহ করিয়া টিপু সুলতানের রাজ্যেই উৎপাত করিতে আরম্ভ করে। সুলতান তাহাকে পরাস্ত করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। ইংরেজেরা মহীশূর অধিকার করিলে সে মুক্তি পায়। এই কৃতঘ্ন পাঁচ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইংরেজ রাজ্যেই অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে সে পরাজিত ও বন্দী হয় এবং অত্যল্প কাল পরেই বন্দী দশাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

দুর্গদেব—তিনি ১৫০৮ শকে (১৫৮৬ খ্রীঃ) সম্বৎসর ফল নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

দুর্গভঞ্জন—একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত তিনি 'রেখা জাতক সুধাকর' নামক সামুদ্রিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

দুর্গসিংহ—— একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। পরাশর আচার্য্য 'চারুসিদ্ধান্ত' প্রণয়ন করেন, কালবশতঃ তাহাতে ভুল দেখিয়া, আর্য্যভট্ট, তাহাকে পরিশোধিত করেন। তাহাও ভ্রম হওয়াতে দুর্গসিংহ, বরাহমিহিরাদি তাহাতে স্ফুট নিবদ্ধ করেন।

দুর্গাকুমার বসু, রায় সাহেব—স্বর্গীয় দুর্গাকুমার বসু প্রাচীন ঢাকা নগরীর বুড়ীগঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরস্থ তেঘরিয়া গ্রামে প্রসিদ্ধ বসুবংশীয় বড়বাড়ীর স্বর্গীয় সদানন্দ বসু ঠাকুরের সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান। ১৮৪৮ ইং ১৭ই আগষ্ট উক্ত গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। শৈশবেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। একান্নভুক্ত বৃহৎ পরিবারস্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র বসুর তত্ত্বাবধানে বাল্যকালের শিক্ষা সম্পন্ন হয়। বঙ্গদেশে

প্রাচীনতম তেঘরিয়া উচ্চইংরেজী বিদ্যালয় ১৮৫৩ ইং ১৫ই মার্চ্চ স্থাপিত হয়। সম্ভবতঃ বঙ্গদেশে সেই সময় পল্লী অঞ্চলে আর কোনও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন উক্ত বিদ্যালয় অনুমোদন লাভ করে। উক্ত বিদ্যালয় হইতে প্রথম যে পরীক্ষার্থীদল ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে প্রবেশিকা (Entrance) পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়, তাহাদের মধ্যে দুর্গাকুমার বসু একজন ছিলেন। পাশ হওয়ার পরে, ঢাকাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভগ্নিপতি প্রসিদ্ধ উকিল স্বর্গীয় লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের ঢাকা বাঙ্গালা বাজারের বাসায় থাকিয়া ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করেন। এফ্-এ (First Arts)পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে ঢাকা কলেজ হইতে তিনি বি, এ পাশ করেন। সমপাঠীদের মধ্যে স্বর্গীয় নবাব সিরাজ্-উল ইসলাম খাঁ সাহেব একজন ছিলেন। ঐ বৎসরেই তিনি শ্রীহট্ট মিশন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট জিলা স্কুল স্থাপিত হইলে, তিনি উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্যভার গ্রহণ করেন এবং তথায় বিশেষ সুখ্যাতি ও সম্মানের সহিত চৌত্রিশ বৎসর নির্ব্বাহ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

কেবল শ্রীহট্ট জিলায় নহে, আসামের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই, যাঁহারা এক তৃতীয়াংশ শতাব্দীর মধ্যে শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহার ছাত্র। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং পূতচরিত্র দ্বারা তিনি আদর্শ শিক্ষকরূপে সর্ব্বত্র সকলের নিকট সম্মানিত হইতেন। আসামে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁহার নিকট ঐ প্রদেশ বিশেষভাবে ঋণী। ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল।

তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল, স্বর্গীয় সন্তদাস বাবাজী, (তারাকিশোর চৌধুরী এম, এ বি, এল্) সিভিলিয়ান গুরু-সদয় দত্ত, প্রথম জাপান যাত্রী রমাকান্ত রায়, প্রসিদ্ধ দার্শনিক শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস ইত্যাদি মেধাবী ছাত্রগণ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তিনি যৌবনকালেই স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন দৈনিক 'ইণ্ডিয়ান মিরার' সংবাদ পত্র নিয়মিতভাবে পাঠ করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী ও তদনুযায়ী উপাসনাশীল হন। তিনি তাঁহার ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার গুহ এবং শ্রীহট্টের তদানীন্তন সরকারী উকীল কৈলাসচন্দ্র ঘোষ দস্তীদার মহাশয়ের সহযোগীতায় শ্রীহট্ট ব্রাহ্ম সমাজ গৃহ

নির্ম্মাণ করেন। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করার পর শ্রীহট্ট সহরে তাঁহার স্থাপিত পাঠশালা তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ দ্বারা 'দুর্গাকুমার পাঠশালা' নামে অভিহিত হয়। তাহাতে বর্ত্তমান সময়ে ছাত্র সংখ্যা প্রায় আটশতের উপর।

১৯০২ খ্রীঃ অব্দে তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে' রায় সাহেব' উপাধি পান। পরবর্ত্তী বৎসর তাঁহার বিশেষ চেষ্টাতে নিজ জন্মভূমি তেঘরিয়া গ্রামে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের অধীন একটী এলোপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান দ্বারা এই অঞ্চলের এবং পার্শ্বস্থ বহু গ্রামের অধিবাসীগণ আজ পর্য্যন্তও অতিশয় উপকৃত হইতেছেন।

আসামের চিফ কমিশনার মন্তব্য করিয়াছিলেন—'বাবু দুর্গাকুমার বসুর মত অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রধান শিক্ষক পাওয়ার সৌভাগ্যের গর্ব্ব করিতে পারে এমন স্কুলের সংখ্যা ভারতবর্ষে বিরল'। এই মন্তব্য অনুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে।

দুর্গাকুমার বসু মহাশয়ের কর্ত্তব্য পরায়ণতা, অপক্ষপাতিতা, সময়নিষ্ঠা শিক্ষা নৈপুণ্য, নিরলসতা ও অমায়িকতা সর্ব্ববাদী সম্মত ছিল। এসব বিষয়ে তাঁহার কৃতী ছাত্রগণের মধ্যে স্বনামধন্য বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল ও অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র নাগ এম এ, বি, এল প্রভৃতি স্বরচিত পুস্তকাদিতে অনেকে কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ১৯২৪ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে (১৩৩০ বঙ্গাব্দের মাঘ) তিনি পরলোক গমন করেন।

দুর্গাচন্দ্র সান্যাল—বাঙ্গালী ঐতিহাসিক। ১২৫৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৮৪৭ খ্রীঃ জুন) তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামচন্দ্র সান্যাল। তাঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ। ইহাদেরই পূর্ব্ব পুরুষ, ভৃগুবংশীয় ধরাধর নামক এক ব্যক্তি মহারাজ আদিশূরের সময়ে কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন। দুর্গাচন্দ্রের অগ্রজের নাম জয়চন্দ্র। অতি শৈশবেই তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হয়। বিধবা পিতৃষসা কর্ত্তৃক তিনি প্রধানতঃ লালিত পালিত হন।

১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার তিন বৎসর পরে বঙ্গপুর জিলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া দশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। অতঃপর তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং (পূর্ত্তবিদ্যা) শিক্ষার জন্য কলিকাতায় উপস্থিত হন এবং হিন্দু ছাত্রাবাসে অবস্থান পূর্ব্বক পূর্ত্তবিদ্যালয়ে পাঠ করিতে থাকেন। ঐ সময়ে ইংরেজি শিক্ষিত নব্য যুবকগণের মধ্যে নানা প্রকার অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত সকল প্রকার আচার ব্যবহারেরই বিরোধিতা করিতেন। দুর্গাচন্দ্র

সেই শ্রেণীর ছিলেন না। তজ্জন্য ছাত্রাবাসস্থিত অন্যান্য ছাত্রগণ তাঁহার প্রতি নানারূপ উৎপীড়ন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে গো-মাংস ভক্ষণ করাইবার জন্য চেষ্টা করেন। এই সকল নানারূপ উৎপীড়নের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য তিনি পূর্ব্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তৎপরে ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে জেনারেল অ্যাসেম্ব্লী ইনষ্টিটিউশন (General Assembly Institution, বর্ত্তমান স্কটিশচার্চ্চ কলেজ) হইতে এফ্-এ (First Arts) পরীক্ষা দেন। কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই।

ইহার পর কিছুকাল তিনি স্বাস্থ্য লাভের আশায় পাটনা ও কাশীতে বাস করেন। কাশীতে তিনি সংস্কৃত অধ্যয়নও করেন। পূর্ব্বে কিছু ফরাসীও শিখিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি তৎকালীন প্রচলিত আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জলপাইগুড়িতে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু জলপাইগুড়ির জলবায়ু তাঁহার স্বাস্থ্যের অনুকূল না হওয়াতে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের অধীন আর এক আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কানপুরে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি কানপুরে ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি "মহামোগল" নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। অতঃপর তিনি সামান্য কিছুকাল কলিকাতা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে ওকালতি করিয়া পুনরায় জলপাইগুড়ি গমন করেন এবং ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। পুনরায় স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি কিছুকাল টাঙ্গাইল, নওগাঁ প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়া ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে দিনাজপুরে যাইয়া আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

বৎসর খানেক পরে, কোনও বৈষয়িক কাজের জন্য রঙ্গপুর যাইবার সময়ে রেল গাড়ীর কামরায় দুইজন ইংরেজ অতর্কিতে তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি আত্মরক্ষার জন্য ঐ ইংরেজদ্বয়কে বিশেষ প্রহার করেন। তৎফলে আদালতের বিচারে তাঁহার চার বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এই ব্যাপার লইয়া চারিদিকে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাঁহার প্রতি যে অত্যন্ত অবিচার করা হইয়াছে তাহা তাহা অনুভব করিয়া অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার পক্ষ হইতে মুক্তির জন্য আবেদন করিলেন। অনেক সদাশয় ইংরেজও সেই আবেদনে স্বাক্ষর করেন। এই আন্দোলনের ফলে সাত মাস পরে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিলেন।

মুক্তি লাভ করিয়া তিনি পুনরায় দিনাজপুরে আইন ব্যবসায় আরম্ভ

করিতে মনস্থ করেন, কিন্তু অনুমতি পাইলেন না। তদবধি তিনি প্রধানতঃ সাহিত্য সেবায় মনোনিবেশ করেন।

দুর্গাকুমার ঘড়িয়াল— বাঙ্গালী পালাগান রচয়িতা। তিনি ঠাকুরদাস দত্তের যাত্রার দলে অনেক দিন প্রধান গায়ক ছিলেন। পরে নিজেও একটি যাত্রার দল গঠন করেন।

কলিকাতায় তাঁহার নিবাস ছিল। তিনি প্রথম জীবনে ঘড়ির কাজ করিতেন বলিয়া 'ঘড়িয়াল' বলিয়া পরিচিত হন। তাঁহার অন্য পরিচয় দুষ্প্রাপ্য।

দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী—বাঙ্গালী কবি। তাঁহার নামান্তর বুলা চক্রবর্ত্তী। ফরমাইস মত যে কোনও ছন্দের বা যে কোন নির্দ্দিষ্ট ভাবের গীত অতিসত্বর রচনা করিবার তাঁহার অতি আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। তিনি তরণীসেন বধ ও রাসলীলা নামক পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থদ্বয় এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে।

দুর্গাচরণ নাগ—তিনি 'সাধুনাগ মহাশয়' নামেই সাধারণে পরিচিত। ঢাকা জিলার অন্তর্গত দেওভোগ গ্রামে ১২৫৩ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা দীনদয়াল কলিকাতা হাটখোলাতে এক মহাজনের গদীতে কাজ করিতেন। তিনি নর্ম্মাল স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া কলিকাতা আসিয়া হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করেন। এই সময়ে তাঁহার প্রথমা পত্নী পরলোক গমন করেন। ডাক্তারি পাশ করিয়া তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং অল্পকাল মধ্যেই বিশেষ উন্নতিলাভ করেন। স্বগ্রামেই তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। তিনি সংসারে থাকিয়াও উদাসীন ছিলেন। একদিন পরমহংস রামকৃষ্ণদেবকে দেখিতে যাইয়া মুগ্ধ হন। তৎপরে তাঁহার দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। সংসারে থাকিয়াই সাধন ভজনে বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। ১৩০৬ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

দুর্গাচরণ ন্যায়রত্ন—বরিশাল জিলার গাকড়িয়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বাকলা সমাজের একজন প্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। অনুমান ১৩০৭ সনে, তিনি স্বর্গী হন। তাঁহার পুত্র মহামহোপাধ্যায় বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন নবদ্বীপে এবং বর্দ্ধমানে ন্যায়ের একজন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন। মৃত্যু ১৩২০ সন।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১) তাঁহার পিতা বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় খড়দহবাসী ছিলেন। দুর্গাচরণ উত্তরপাড়ার সাবর্ণচৌধুরী বংশে বিবাহ করিয়া তথায় বাসস্থান স্থাপন করেন। ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে নবাব আসফউদ্দৌল্লা লক্ষ্ণৌএর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময়ে দুর্গাচরণ তোষাখানার দেওয়ান ছিলেন। এই কার্য্যে তিনি

যেমন প্রভূত যশ ও সম্মান লাভ করেন তেমনি যথেষ্ট অর্থও উপার্জ্জন করেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে পঞ্চানন ও রামশঙ্কর নামে দুই পুত্র এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে রামলোচন নামে এক পুত্র জন্মে।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১) বিখ্যাত চিকিৎসক। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বারাকপুরের নিকটবর্ত্তী মণিরামপুরে ১৮১৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। দশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলিকাতার হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। পাঠ্যাবস্থায় তিনি ইতিহাস ও গণিতে বিশেষ কৃতীত্বের পরিচয় দেন। এই সময়েই তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পরেই তাঁহার পিতা, তাঁহাকে নিমক মহলের একটী সামান্য কাজে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু তাঁহার অধ্যয়নানুরাগ অতিশয় প্রবল ছিল। সেজন্য তিনি কিছুকাল চাকুরীর পরেই সেই মহলের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার অধ্যয়নের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। ঠাকুর মহাশয় তাঁহার অধ্যয়নানুরাগে অতিশয় প্রীত হইলেন। তিনি তাঁহার পিতাকে ডাকাইয়া, দুর্গাচরণকে পুনর্ব্বার পাঠে নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার পিতা, পুত্র দুর্গাচরণকে পুনর্ব্বার হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে অবিলম্বে তাঁহাকে পাঠ বন্ধ করিতে হইল। এই সময়ের মধ্যে তিনি সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিশেষরূপ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বিখ্যাত হেয়ার সাহেব তাঁহাকে তাঁহার স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে এই সময়ে নিযুক্ত করিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২১ বৎসর। একদিন বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করিতেছেন, এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার স্ত্রী সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষু প্রায় হইয়াছেন। তিনি গৃহে আসিয়া স্ত্রীর অবস্থা দর্শনে অতিমাত্র ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক আনয়ন করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। কিন্তু চিকিৎসক লইয়া গৃহে আসিয়া তিনি দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী চিকিৎসার অতীত স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। বিয়োগ বিধুর স্বামীর মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিল, উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, তাঁহার স্ত্রীর অকালে কখনও মৃত্যু হইত না। এই ঘটনা তাঁহাকে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রণোদিত করে এবং পিতার অনিচ্ছা সত্বেও তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। হেয়ার স্কুলে অধ্যাপনা কালে, তিনি হেয়ার সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, প্রত্যহ মেডিকেল কলেজে গিয়া দুই ঘণ্টা কাল পাশ্চাত্য ভৈষজ্য বিদ্যা ও শরীরবিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া

আসিতেন। এই অবস্থা বেশী দিন চলিল না। নূতন অধ্যক্ষ জেমস সাহেব দুর্গাচরণের ছুটি বন্ধ করিয়া দিলেন। তেজস্বী, আত্মকর্ম্মে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দুর্গাচরণও তৎক্ষণাৎ হেয়ার স্কুলের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ডাক্তারি শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করিলেন এবং পাঁচ বৎসর কাল মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইলেন।

কলিকাতার বহুবাজার নিবাসী নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি পীড়িত হইয়া মৃত প্রায় হন। তদানীন্তন কলিকাতার খ্যাতনামা অনেক চিকিৎসকের চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। কাহারও চিকিৎসায় তাঁহার রোগ আরোগ্য না হইয়া দিন দিন তাঁহার অবস্থা আরও শঙ্কটাপন্ন হইল। রোগীর আত্মীয়েরা একরূপ হতাশ হইলেন। অবশেষে হিতাকাঙ্খীদের পরামর্শে তাঁহারা দুর্গাচরণ বাবুকে ডাকাইলেন। তিনি রোগীর অবস্থা সম্যক পর্য্যালোচনা করিয়া ঔধধের ব্যবস্থা করিলেন। সে সময়ে জ্যাক্‌সন্ নামে একজন বিখ্যাত ইংরেজ চিকিৎসক বিলাত হইতে অনতিপূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। রোগীর আত্মীয়েরা দুর্গাচরণের সহায়তার জন্য তাঁহাকেও আনয়ন করিলেন। জ্যাক্‌সন্ দুর্গাচরণের ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইলেন। পরে নীলকমল বাবু আরোগ্য লাভ করিলে, এই জ্যাক্‌সন্ সাহেব দুর্গাচরণের ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—'বাবু আপনি নেটিভ্ জ্যাক্‌সন্।' এই চিকিৎসা নৈপুণ্যে তাঁহার খ্যাতি অল্পদিনেই খুব বিস্তৃত হয়।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুরোধে, কিছুদিন তিনি কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের খাজাঞ্চীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে প্রাতে ও বিকালে এবং বন্ধের দিনে চিকিৎসা করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার যখন প্রসার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থাগমও হইতে লাগিল; তখন চাকুরী ছাড়িয়া দেওয়াই সমীচিন বলিয়া মনে করিলেন। তিনি ইহা স্থির করিয়া ৩৪ বৎসর বয়সে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসা ব্যবসায়ে আত্ম নিয়োগ করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই দুর্গাচরণের যশ এমন বিস্তৃত হইল যে, লোকে তাঁহাকে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরির ন্যায় জ্ঞান করিতেন। বাস্তবিক তৎকালে তিনি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন। কি ধনী, কি দরিদ্র, কোন ব্যক্তি বিপন্ন হইয়া যখনই তাঁহার শরণাপন্ন হইতেন, তিনি তখনই তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া, যথাশক্তি তাঁহার রোগ মুক্তির ব্যবস্থা করিতেন। সকলেই তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্যে, প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বে এবং ততোধিক তাঁহার অমায়িক হাস্য পরি-

হাস ব্যবহারে অতিশয় মুগ্ধ হইতেন। কথিত আছে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোনও ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভদ্রলোক পীড়া গ্রস্ত হইয়া অনেক কবিরাজ ও ডাক্তারের চিকিৎসায় ব্যর্থকাম হন। রোগের প্রধান লক্ষণ অনবরত হাঁচি ও কাসি কেহই নিবারণ করিতে পারেন নাই। অবশেষে দুর্গাচরণকে ডাকা হইল। তিনি কিছুক্ষণ রোগীকে পরীক্ষা করিয়াই রোগের নিদান নির্ণয়ে সমর্থ হন। রোগীকে কোনও ঔষধ দ্বারা অল্পকালের জন্য অজ্ঞান করিয়া তাঁহার নাসিকা বিবর হইতে, একটী ছোট সন্না দ্বারা একটী ঊর্দ্ধগামী রোম উৎপাটন করিলেন। ক্ষণকাল পরে রোগীর জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার হাঁচি ও কাসিও বিদুরিত হইল। রোগী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সেই রোমটী দেখাইয়া বলিলেন—'এইটী আপনার রোগ', আর সন্নটী দেখাইয়া বলিলেন—'এইটী আপনার ঔষধ।' বলা বাহুল্য, রোগী সেই ভদ্র মহোদয় তাঁহার প্রত্যুৎপন্ন মতিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন। এইরূপে খ্যাতি লাভের সহিত তাঁহার যথেষ্ট অর্থাগমও হইয়াছিল। শেষ বয়সে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দের ২২ ফেব্রুয়ারী (১২ই ফাল্গুন ১২৭৬ মঙ্গলবার) তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহারই সুযোগ্য পুত্র দেশ নায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—(৩) খ্যাতনামা আইন ব্যবসায়ী ও জনহিত ব্রতী। তিনি ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় কাশী মিত্র ঘাট ষ্ট্রীটস্থ স্বভবনে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার উক্ত জন্ম স্থানের সংলগ্ন ভূমিতে (১নং ধনদা ঘোষ ষ্ট্রীট) স্বনির্ম্মিত প্রাসাদোপম ভবনে সপরিবারে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার পিতামহ কালীকুমার হুগলী জিলার অন্তর্গত হরিপাল হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনারায়ণ সুশিক্ষিত ও কর্ম্মদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাজকীয় সৈনিক পূর্ত্ত বিভাগে (P. W. D. Military Accounts Deqartment) কাজ করিতেন। শেষে অরডিগনাম কোম্পানীর (Messrs Orr Dignam Company) কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে (Managing Assistant) সম্মানের সহিত কাজ করিয়াছিলেন। দুর্গাচরণ তাঁহারই সুযোগ্য পুত্র। তিনি প্রথমে ওরিয়েণ্টেল সেমিনারী হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাফ কলেজ হইতে ক্রমে ক্রমে এম, এ প উত্তীর্ণ হন। বি, এ ও এম, এ পরীক্ষায় ইতিহাস ও অর্থশাস্ত্রে প্রথম স্থান

অধিকার করিয়াছিলেন। ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি আইন (B. L.)পরীক্ষায়, এবং ১৯০৭ সালে এটর্ণি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অল্পকাল মধ্যেই একজন মেধাবী আইনব্যবসায়ী বলিয়া পরিগণিত হন। তাঁহার আইন সম্বন্ধীয় রচিত ইণ্ডিয়ান কনভেয়েনসিং ও ইণ্ডিয়ান রেজিষ্ট্রেসন এক্ট শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রশংসিত। অর-ডিগনাম এণ্ড কোম্পানীতে তিনি প্রথমে সামান্য আর্টিকেল ক্লার্ক হইয়া প্রবেশ করেন। পরে স্বীয় প্রতিভাবলে সেই কোম্পানীর একজন প্রধান অংশীদার হইয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রথম হইতেই তিনি পৌরতন্ত্র ব্যাপারে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন এবং তাহার ভবিষ্যত গঠন ও উন্নতির সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়া যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

রাজনীতি ক্ষেত্রে যদিও তাঁহাকে কখনও পুরোভাগে দেখা যায় নাই কিন্তু বাঙ্গালার সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনেই তাঁহার কিছু না কিছু অংশ ছিল। তিনি এক সময়ে উত্তর কলিকাতার একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্ম্মী ছিলেন এবং সর্ব্বদা উহার কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। দেশের কাজের জন্য অর্থ দান করিতে তিনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রতিষ্ঠিত পল্লী সংঘটন তহবিলে, মহাত্মা গান্ধীকে ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে তাঁহার দান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি দেশবন্ধু স্মৃতিসংস্থাপক সমিতির একজন সদস্য ছিলেন।

তাঁহার বিশ্বাস ছিল, শিল্পের উন্নতি ব্যতীত, কখনও দেশের আর্থিক অসচ্ছলতা দুর হইতে পারে না। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি দেশের বহুবিধ আর্থিক উন্নতি বিধায়ক কার্য্যে অর্থ নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি বহু চা কোম্পানী ও কয়লা কোম্পানীর সহিত যুক্ত ছিলেন। বেঙ্গল পটারী কোম্পানী লিমিটেডের বোর্ড অব ডাইরেক্টারদের তিনি সভাপতি ছিলেন। তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় উক্ত কোম্পানী ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়। তাঁহার এই কাজে অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়া আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার জীবন স্মৃতিতে, দুর্গাচরণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। গত ত্রিশ বৎসর মধ্যে দেশে শিল্পের উন্নতি কল্পে যে সমুদয় প্রচেষ্টা হইয়াছে তাহার প্রায় সকলগুলির সহিতই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁহার যোগ ছিল।

তিনি দেশের উন্নতিকর সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠানে আনন্দের সহিত যোগ দিতেন। সামাজিক জীবন সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি লাভ করে, ইহাই তাঁহার আন্তরিক আকাঙ্খা ছিল। পল্লীমঙ্গল

এবং দেশের উন্নতি বিধায়ক এবম্প্রকার বহুবিধ সভাসমিতেও কত অনুষ্ঠানে যে তিনি কত অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাদিগকে প্রকৃত দেশের হিতকরী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এখানে তাহা বলা সম্ভব নয়।

উত্তর কলিকাতার যুবকদের সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানে তিনি একজন প্রধান সহায় ছিলেন। যুবকেরা কোনও কাজের সূচনা করিয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলেই হইল, তিনি তাঁহাদের সাহায্য ও উপদেশ দিয়া অগ্রসর করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি সন্তরণ প্রতিযোগীতায় একজন বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। বহু খেলার ক্লাবে তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন। তিনি বহুবিধ লাইব্রেরী, সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির বিশেষ পৃষ্টপোষক ছিলেন।

রাজনীতিতে তাঁহার প্রখর প্রতিভার পরিচয় পাইয়া স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাস তাঁহাকে মুকুটহীন রাজা বলিয়া অভিহিত করিতেন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বিবাদের সময় উভয় পক্ষ তাঁহার নিকট সুপরামর্শের জন্য আসিতেন এবং তাঁহার উপদেশ বিশেষভাবে গ্রহণ করিতেন।

উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার রাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের কন্যা সুবোধবালা দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। জগদ্ধাত্রীকুমার, শচীন্দ্রকুমার, ও পবিত্রকুমার নামে তিন পুত্র ও তিন কন্যা বর্ত্তমান রাখিয়া গিয়াছেন। সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র জগদ্ধাত্রীকুমার বি, এল, পিতার ফারমেই আর্টিকেল ক্লার্ক হইয়া কাজ করিতেছেন।

এই অমায়িক মিষ্টভাষী, দাতা, পরোপকারী দেশমাতৃকার সুসন্তান ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ১০ই আষাঢ় (২৬শে জুন ১৯৩৫) পরলোক গমন করেন।

দুর্গাচরণ রক্ষিত—ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁহার পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত। তিনি কলিকাতায় থাকিয়া ফরাসী জাহাজে মাল সরবরাহ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তদ্ভিন্ন ক্যামা এণ্ড ল্যামারু নামক একটি ফরাসী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানেরও তিনি বেনিয়ান ছিলেন। এই উভয় কার্য্যে তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ১২৪৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে, (১৮৪১ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর) চন্দননগরে দুর্গাচরণের জন্ম হয়। তথাকার পাঠশালায় তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। কিন্তু বাল্যকালেই, মাত্র দশ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃ হীন হওয়ায় উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। অধিকন্তু গোবিন্দচন্দ্র হঠাৎ দারুণ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহার ত্যক্ত অর্থাদির কোনও সন্ধান

পাইলেন না। ফলে দুর্গাচরণের মাতা অপোগণ্ড পুত্র ও কন্যা লইয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। এই বিপদকালে পূর্ব্বোক্ত ক্যামা-ল্যামাক্ কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার ক্যামা সাহেব নানা ভাবে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে থাকেন এবং তাঁহারই যত্নে ও সাহায্যে দুর্গাচরণ আরও কয়েক বৎসর লেখা-পড়া শিখিবার সুযোগ লাভ করেন।

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে দুর্গাচরণ ছাত্র জীবন শেষ করিয়া পূর্ব্বোক্ত আপিসেই সহকারী কোষাধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে ঘটনা-চক্রে, তাঁহাকে চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া আত্ম গোপন করিয়া থাকিতে হয়। তাঁহার অন্যতম হিতার্থী ক্যামা সাহেব তখন ভারতে ছিলেন না। তিনি সংবাদ পাইয়া তাঁহার সহকারী ল্যামাক্ সাহেবকে প্রকৃত তথ্য অনু-সন্ধান করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠান। কারণ তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে দুর্গাচরণ বাস্তবিক দুষ্ট লোকের চক্রান্তে বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, ক্যামা সাহেবের চেষ্টায় দুর্গা-চরণ চাকুরী ফিরিয়া পাইলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহার সহকারী কোষাধ্যক্ষ থাকার সময়ে প্রতিষ্ঠানের যে অর্থ ক্ষতি হয়, তাহার অর্দ্ধেক পূরণ করিয়া দিতে আদিষ্ট হইলেন। দুর্গাচরণ ঋণ করিয়া দেয় অর্থ পরিশোধ করেন, কিন্তু চাকুরী জীবনের উপর বীতস্পৃহ হইয়া স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় করিতে মনস্থ করেন। তাঁহার পরম হিতৈষী ক্যামা সাহেব ইতিমধ্যে ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ব্যবসায় করি-বার জন্য দুর্গাচরণকে পাঁচশত টাকা মূলধন স্বরূপ প্রদান করিলেন।

ঐ অর্থের সহিত আর কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দুর্গাচরণ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণে অল্পকালের মধ্যেই বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার ব্যবসা দ্রুত বিস্তৃত হইতে লাগিল এবং তিনি অচিরকাল মধ্যে একজন প্রধান ব্যবসায়ী রূপে গণ্য হইলেন। আমদানী রপ্তানী কার্য্যে তৎকালীন প্রধান প্রধান বৈদেশিক কারবারগুলির সহিত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। ব্যবসায় ক্ষেত্রে তিনি কখনও অসাধুতা বা প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই।

ব্যবসায় উপলক্ষে প্রধানতঃ কলি-কাতায় থাকিতে হইলেও তিনি প্রায়ই চন্দননগরে আসিতেন এবং তথাকার সকল প্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষ যোগ রক্ষা করিতেন। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই তিনি চন্দন-নগরের শাসনকর্ত্তার পরামর্শ সভার (Conseil Local) সদস্য মনোনীত হন। দীর্ঘকাল তিনি ঐ পদে অধি-ষ্ঠিত ছিলেন। তিনি চন্দননগরে একটি

শক্তিশালী রাজনৈতিক দল গঠন করেন। উপযুক্ত ব্যক্তিকে বিভিন্ন সভায় নির্ব্বাচিত করিয়া দেওয়াই উক্ত সভার প্রধান কাজ ছিল। তিনি কিছুকাল স্থানীয় ছোট আদালতের অবৈতনিক বিচারপতির পদ লাভ করেন। প্রথম জীবনে দারিদ্র্য বশতঃ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ ঘটে নাই বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে তিনি উৎকৃষ্ট রূপে ইংরেজি ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ফরাসী রাজপুরুষগণ তাঁহার বিবিধ সদ্‌গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ উচ্চ উপাধি প্রদান দ্বারা সম্মানীত করেন। তিনি প্যারী নগরীর বিদ্বজ্জন পরিষৎ কর্ত্তৃকও উপাধি (Officer d' Academie) ভূষিত হন। কাম্বোডিয়া নামক ফরাসী উপনিবেশ হইতে তিনি Chavalier de-l' ordre royal du Cambodge উপাধি প্রাপ্ত হন এবং চন্দননগরবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম বহুসম্মানাস্পদ (Chevalier de-la-legion d' houneur) উপাধি প্রাপ্ত হন। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে এতদূর সম্মানভাজন মনে করিতেন যে তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে চন্দননগরের ফরাসী সেনা উপস্থিত থাকিয়া সামরিক প্রথায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

লোক সেবাও তাঁহার জীবনের বিশেষ কাজ ছিল। দরিদ্রের দুঃখমোচনে তিনি কখনও কাতর ছিলেন না। সাধারণ দীন দরিদ্র ভিন্ন, দুস্থ প্রতিবেশীগণকেও ব্যাপক ভাবে মুক্ত হস্তে সাহায্য করিয়া তিনি সকলের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। তীর্থ ভ্রমণে যাইবার সময়ে তিনি অনেক লোককে সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। এ বিষয়ে তিনি যশোলিপ্সার বশীভূত না হইয়া নীরবে কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যাইতেন। একবার চন্দননগরে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায়, বহু মধ্যবিত্ত পরিবার প্রায় অনশনে কাটাইতে থাকেন। দুর্গাচরণ সেই সংবাদ পাইয়া, প্রভূত পরিমাণে চাউল ক্রয় করিয়া বিতরণ করিতে লাগিলেন। দুস্থ ভদ্র পরিবারের ব্যক্তিগণ ভিক্ষা গ্রহণ করিতে আসিতে সঙ্কোচ বোধ করিবেন বুঝিতে পারিয়া তিনি নিজ ব্যয়ে তাহাদের গৃহে গৃহে চাউল প্রেরণ করিতেন। চন্দননগরে তিনিই প্রথম দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় স্থাপন করেন এবং উহার স্থায়ীত্ব বিধানের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করেন। তিনি বাল্যকালে যে গুরু মহাশয়ের পাঠশালাতে বিদ্যারম্ভ করেন, পরবর্ত্তী কালে সম্পূর্ণ নিজব্যয়ে উহার বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়া তাঁহারই পূর্ব্ব গুরু মহাশয়কে উহার প্রধান শিক্ষক করিয়া গুরু ভক্তির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ প্রদান করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বিদ্যালয় পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার স্থানীয় শাসন

কর্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। আরও নানা ভাবে, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হৃদয়ে তিনি বহু জনহিতকর কার্য্য করিয়া নিজ নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার চরম পত্রেও (Will) তিনি বহু অর্থ জনহিতকর কার্য্যে দান করিবার ব্যবস্থা করিয়া যান।

দুর্গাচরণ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন এবং আন্তরিক নিষ্ঠার সহিত নিজ বাটীতে পূজা পার্ব্বণাদির অনুষ্ঠান করিতেন।

মাত্র আটান্ন বৎসর বয়সে দুষ্টব্রণ রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার জীবন সংশয় হইলে তাঁহারই একান্ত ইচ্ছায় তাঁহাকে কাশীধামে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেই স্থানেই ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে (১৮৯৮, আগষ্ট) তাঁহার মৃত্যু হয়। ফরাসী দেশের অনেক সংবাদ পত্রেও তাঁহার মৃত্যু সংবাদ সহ প্রশংসাবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্বারাই ফরাসী সরকারের নিকট তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তির বিষয় অনুমতি হইতে পারে।

দুর্গাচরণ রায়—তিনি বাঙ্গালা ভাষায় একজন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দীর্ঘপাড়া গ্রামে বৈদ্য বংশে ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাঁহারই রচিত। এই গ্রন্থ লিখিয়াই তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ইহাতে তিনি পাণ্ডিত্য ও গবেষণার সঙ্গে নানাবিধ রসের সঞ্চার করিয়া বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'পাশ করা ছেলে', 'দুঃখনিশি অবসান' ও 'চিনির বলদ' নামক পুস্তকগুলিও তাঁহারই রচিত। ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দুর্গাচরণ লাহা, মহারাজ C. I. E.—কলিকাতার লাহা বংশীয় প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ও ব্যবসায়ী। পুরুষানুক্রমে ব্যবসা ও বাণিজ্যদ্বারা তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। ১২২৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে চুচুঁড়া নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম প্রাণকৃষ্ণ লাহা। বাল্যকালে চুঁচুড়ায় তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। পরে কলিকাতা আসিয়া প্রথমে কিছুকাল গৌরমোহন আঢ্যের ও গোবিন্দচরণ বসাকের স্কুলে পড়িয়া, পরে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন। বিশেষ কৃতী ও মেধাবী ছাত্র বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল।

সতর বৎসর বয়সে তিনি পিতার সহকারী হইয়া ব্যবসাক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ইং১৮৫৩ সালে পিতার মৃত্যুর পরে স্বয়ং ব্যবসায়ের কর্ত্তা হইলেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি ইংলণ্ডে দুইটী শাখা কার্য্যালয় খুলিয়া স্বয়ং তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। বাণিজ্য বিষয়ে অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন

বলিয়া, অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাদের কারবার (প্রাণকৃষ্ণ লাহা এণ্ড কোম্পানী) খুব প্রতিপত্তি লাভ করিল। ১৮৬৩ সালে কতিপয় বণিকবন্ধুর সহযোগীতায় 'ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্কিং করপোরেসন (Calcutta City Banking Corporation) নামে একটী ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। উহাই পরে ন্যাশানেল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (National Bank of India) নামে পরিচিত হয়। দেশীয় বণিকদিগকে সাহায্য প্রদান করাই ঐ ব্যাঙ্কের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অল্পকাল পরেই বোম্বাই ও লণ্ডনে উহার শাখা স্থাপিত হয়। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে এক জনরব উঠে যে কলিকাতার সম্মুখবর্ত্তী ভাগীরথীর জল ক্রমশই কমিয়া আসাতে, অদূর ভবিষ্যতে কলিকাতায় আর সমুদ্রগামী বাণিজ্য-পোত আসিতে পারিবে না। তজ্জন্য কলিকাতার দক্ষিণভাগে সুন্দরবনস্থ মাতলা নামক স্থানে নূতন বন্দর স্থাপিত হইবে। এই জনরবের সঙ্গে সঙ্গে পোর্ট ক্যানিং কোম্পানী (Port Canning Company) নামে একটি যৌথ সমবায় সমিতি গঠিত হয়। উহার প্রতি অংশের মূল্য এক হাজার টাকা নির্দিষ্ট হয়। প্রস্তাবিত বন্দরের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে দুর্গাচরণের কিছু জমি ছিল। তিনি উহা ঐ সমিতিকে বিক্রয় করিয়া মূল্যের অর্দ্ধাংশের বিনিময়ে কিছু অংশ গ্রহণ করেন। পরে ঐ কারবারে এক হাজার টাকার অংশের মূল্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে যখন এগার হাজার টাকা হইল, তখন তিনি নিজের অংশগুলি বিক্রয় করিয়া দিয়া প্রভূত অর্থ লাভ করিলেন এবং ঐ অর্থ-দ্বারা নানাস্থানে জমিদারী ক্রয় করিলেন।

দেশীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম কলিকাতা বন্দরের পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য (Port Commissioner) মনোনীত হন। ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতার শেরিফ (Sheriff) নিযুক্ত হন। উহার কয়েক বৎসর পরে (১৮৮৮ খ্রীঃ) তিনি কলিকাতা মেয়ো (Mayo) হাসপাতালের অন্যতম পরিচালক (Governor) নিযুক্ত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য (Fellow) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং তিন বৎসর কলিকাতা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশন (British Indian Association) নামক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হইয়াছিলেন। অন্যান্য কারবারের সহিত তিনি মহাজনী ব্যবসায়ও করিতেন। কিন্তু তিনি অত্যধিক সুদ গ্রহণ করিয়া অধমর্ণদিগকে পীড়ন করিতেন না। নারায়ণগড়ের (মেদিনীপুর) রাজা পৃথ্বীবল্লভ পাল তাঁহার নিকট হইতে তিন

লক্ষ বিশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ না হওয়ায়, তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি দুর্গাচরণের হইয়া যায়। ইহাতে দুর্গাচরণের হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি পৃথীবল্লভকে তাঁহার বসত বাটী ও তৎসংলগ্ন বাগান ছাড়িয়া দিলেন এবং মাসিক ১২৫ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। এই বৃত্তি তাঁহার পোষ্য পুত্রও ভোগ করিয়াছিলেন।

দাতা বলিয়া তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মেয়ো হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে, চুঁচুড়াতে জলের কল স্থাপনের জন্য এবং বিভিন্ন শিক্ষায়তনে প্রভুত অর্থ দান করেন। ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দের দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি বহু অর্থ দান করেন। এই সকল বিবিধ সদ্‌গুণের পুরস্কার স্বরূপ তিনি প্রথমে সি-আই-ঈ (C. I. E. ১৮৮৪ খ্রীঃ) উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে 'রাজা' এবং আরও কয়েক বৎসর পরে (১৮৯১ খ্রীঃ) মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৩১০ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে (১৯০৪ খ্রীঃ মার্চ্চ) মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার দুই পুত্র, কৃষ্ণদাস ও হৃষিকেশ বর্ত্তমান ছিলেন। কলিকাতা টাউন হলে তাঁহার আবক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

দুর্গাচার্য্য—তিনি বেদের নিরুক্তের একজন টীকাকার। নিরুক্ত ১২।২।

দুর্গাদত্ত ঝা—দ্বারবঙ্গ জিলার মধুবাণী উপবিভাগের অন্তর্গত 'ভরাম' গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি। খ্রীঃ অষ্টাদশ শতকে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি একাধারে ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। ব্যাকরণ, ন্যায় কাব্য, স্মৃতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ সংস্কৃতে রচনা করিয়াছেন। তিনি মৈথিলী ভাষায় 'দুর্গাসপ্তসতীর' অনুবাদও করেন।

দুর্গাদত্ত সিংহ—মিথিলার রাজবংশে তাঁহার জন্ম। তিনি পরম ধার্ম্মিক, দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। শিব, দুর্গা প্রভৃতি দেব দেবী সম্বন্ধে তাঁহার রচিত বহু মনোহর স্তোত্র ও কবিতা মৈথিলী ভাষার অলঙ্কার স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। নৃত্য ব্যবসায়ী ও সাধারণ গায়কেরা তাঁহার বহু গান এখনও গান করিয়া থাকে।

দুর্গাদত্ত মিশ্র—একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত। তিনি খুব সম্ভব খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তৎরচিত গ্রন্থের নাম ন্যায় বোধিনী। উক্ত পুস্তকে ন্যায় ও বৈশেষিক মত সমূহ আলোচিত হইয়াছে।

দুর্গাদাস—ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজপুত সেনাপতি। প্রভুভক্তি, বীরত্ব, অকুতোভয়তা প্রভৃতি মহৎ গুণের জন্য ইতি-

হাসে তাঁহার নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তিনি রাজপুতনার অন্তর্গত মাড়বারের রাঠোর বংশ সম্ভূত ছিলেন। তাঁহার পিতা আস্কারান মাড়বারপতি যশোবন্ত সিংহের একজন অমাত্য ছিলেন। ভারতের সে সকল স্থানে তখনও মুঘল প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সে সকল স্থানের মধ্যে রাজপুতনার অন্তর্গত মাড়বার, উদয়পুর ও মেবার প্রধান ছিল। এই কয়টি ক্ষুদ্র রাজ্য অনেক দিন পর্য্যন্ত কখনও পৃথক পৃথক ভাবে, কখনও বা মিলিত ভাবে মুঘল আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন। মাড়বার পতি যশোবন্ত সিংহ, অনেক দিন সম্রাট আওরঙ্গজীবের অধীনে একজন সেনানায়কও ছিলেন। মেবারের রাণা জয়সিংহও কখনও কখনও মুঘল সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব করেন। কিন্তু তাঁহারা আওরঙ্গজীবের প্রতি তাদৃশ প্রীত ছিলেন না। সম্রাটও তাঁহাদের মনোভাব অবগত ছিলেন। সে জন্য তিনি তাঁহাদিগকে দমন করিতে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দে জয়সিংহের মৃতুর পর (জয়সিংহ মিরজা ৬৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য) সম্রাট যশোবন্ত সিংহকে দমন করিতে চেষ্টা পান। কয়েক বৎসর পরে যশোবন্ত সিংহ মুঘল বাহিনীর অধিনায়ক হইয়া কাবুল গমন করেন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হয় (১৬৭৯ খ্রীঃ)। যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নীদ্বয় দুইটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। তাহাদের মধ্যে একটি অল্পকালের মধ্যেই গতায়ু হয়। যেটি জীবিত থাকে সেইটিকে নিজ আয়ত্বে আনিবার জন্য সম্রাট আওরঙ্গজীব বিশেষ উদ্গ্রীব ছিলেন। কারণ ঐ শিশুই মাড়বার রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী ছিলেন। সম্রাটের উদ্দেশ্যে সন্দিহান হইয়া রাঠোর সেনাপতিগণ পণ করেন যে, ঐ শিশুকে তাঁহারা কিছুতেই সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করিবেন না। তাঁহাদের কৌশল পূর্ণ আয়োজন এবং দুর্গাদাস প্রমুখ কতিপয়ের অসাধারণ স্বার্থ ত্যাগ ও বীরত্বে, শিশু অজিতসিংহ নিরাপদে দিল্লী হইতে মাড়বার রাজধানীতে নীত হন।

ইহার কিছুকাল পরে দুর্গাদাস সম্রাট আওরঙ্গজীবের বিদ্রোহী পুত্র আকবরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। মাড়বার রাজ্য অধিকার করিবার জন্য আওরঙ্গজীবের বারংবার চেষ্টার জন্যই রাঠোরেরা তাঁহার অত্যন্ত বিরোধী হইয়াছিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজীবের চতুর রাজনীতি কৌশলে দুর্গাদাস আকবরের পক্ষ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, পুনরায় আকবরের সহিত যোগ দেন এবং তাঁহার নিরাপত্তার জন্য, তাঁহাকে লইয়া মুঘল অধিকারের

বাহিরে মারাঠা রাজ্যে যাইয়া উপস্থিত হন। পরে আকবর পারস্য দেশে চলিয়া গেলে দুর্গাদাস পুনরায় মাড়বারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এযাবৎ মাড়বারের রাঠোরেরা যথাসাধ্য মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারে আপ্রাণ চেষ্টার কোন ফল হয় নাই। ১৬৮৭ খ্রীঃ অব্দে দুর্গাদাস দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রাঠোরেরা পুনরায় উৎসাহিত হন এবং দুর্গাদাসের নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতা পুনস্থাপনের জন্য বদ্ধ পরিকর হন। তখন পুনরায় মুঘল রাজপুতে সংঘর্ষ আরম্ভ হইল।

আওরঙ্গজীবের পুত্র আকবর যখন ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যান, তখন তিনি তাঁহার পুত্র বুলন্দ আখতার ও কন্যা সফিয়ত-উন্‌-নিসাকে দুর্গাদাসের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যান। আওরঙ্গজীব তাহা জানিতে পারিয়া পৌত্র ও পৌত্রীকে নিজ সকাশে আনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু দুর্গাদাস বিনা সর্ত্তে রাজকুমার ও রাজকুমারীকে প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন অনেক আলোচনার পর ১৬৯৮ খ্রীঃ অব্দে দুর্গাদাসের সহিত সম্রাটের এক আপোষ হইল। তৎফলে আওরঙ্গজীব যশোবন্ত সিংহের পুত্রকে ক্ষমা করিয়া উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন ও জায়গীর প্রদান করিলেন, দুর্গাদাসও বুলন্দ আখতার ও সফিয়ত-উন্‌-নিসাকে সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এই শান্তি ও আপোষ বেশী দিন থাকে নাই। দুর্গাদাস জীবিত থাকিলে মাড়বারে পুনরায় বিদ্রোহ বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায়, সম্রাট কৌশলে তাঁহার জীবন নাশের চেষ্টা করিতে থাকেন। দুর্গাদাস তাহা বুঝিতে পারিয়া পুনরায় অজিত সিংহের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহী হইলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে অজিত সিংহের সহিত তাঁহার মতান্তর উপস্থিত হওয়ায়, তিনি অজিতের পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। কিছুকাল পরে আবার সম্রাটের সহিত তাঁহার মৈত্রী স্থাপন হইল এবং তিনি নিজের পূর্ব্ব সম্মান লাভ করিলেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই দাক্ষিণাত্যে মুঘল শক্তি ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া, দুর্গাদাস পুনরায় মাড়বারের সিংহাসনে অজিত সিংহকে স্থাপন করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন এবং ১৭০৭ খ্রীঃ অব্দে, সম্রাটের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই, তাঁহার দীর্ঘকালের ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সুযোগ হইল। পুনরায় দুর্গাদাস ও অজিত সিংহের মিলিত চেষ্টায় মাড়বার স্বাধীনতা লাভ করিল।

দুর্গাদাস কর চৌধুরী— যে সকল ব্যক্তি সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় প্রতিভা

বলে উন্নতি লাভ করিয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। ১৭৫৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত কোদালে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার অবস্থা ভাল না থাকায়, তিনি বাঙ্গালা ও সামান্য ফারসী শিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা জনার্দ্দন অল্প বয়সেই, জগন্নাথ-পুরের ঘোষেদের বাড়ীতে তাঁহার পুত্র দুর্গাদাসের বিবাহ দেন। আর্থিক অভাববশত তিনি বিবাহের পরেই মেদিনীপুরের অন্তর্গত মাজনা মুটার জমিদার যুগরাম রায়ের নিকট চাকুরী গ্রহণ করেন। কর্ম্মে নিষ্ঠা ও অনু-রাগের বলে, দুর্গাদাস অল্পকাল মধ্যেই জমিদারী কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিলেন। ইহার পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিমক মহলে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন। রাজপুরে ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া বাস-স্থান নির্ম্মাণ করেন। অচিরকাল মধ্যেই কয়েকটী জমিদারী ক্রয় করিয়া বিশেষ সম্ভ্রান্ত শ্রেণীতে পরিগণিত হই-লেন। দুর্গাদাস স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি বহু তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। কোনও কোনও স্থানে তিনি দেব মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। স্বদেশে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা ও জলাশয় খনন করিয়া লোকপ্রিয় হইয়া-ছিলেন। তিনি গরীবের ও নিরাশ্রয়ের আশ্রয় স্থল ছিলেন। পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান রাখিয়া বৃদ্ধ বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

দুর্গাদাস দে—তিনি একজন বাঙ্গালা ভাষার লেখক। ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্কুল পরিত্যাগ করিয়া, একটী 'মডেল স্কুল' স্থাপনপূর্ব্বক কর্ম্ম জীবনে প্রবেশ করেন। পরে একটী পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া গ্রন্থ প্রকাশে ব্রতী হন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ—আদর্শ ব্যাকরণ। তৎপরে তিনি ক্রমান্বয়ে পর পর 'মজলিস', 'গল্প গুজব' দুর্গাদাসের দপ্তর, প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদন করেন। এই সময়ে তিনি নাট্যচার্য্য গিরীশচন্দ্র ও অমৃতলাল বসুর সহিত সুপরিচিত হন। তাঁহার কোন কোন পত্রিকায় তাঁহাদের প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত হইত। সিটি, মিনার্ভা, ক্লাসিক, গ্রাণ্ড, প্রভৃতি নাট্যশালার কার্য্যাধ্যক্ষের কাজও তিনি কিছুদিন করিয়াছিলেন। তিনি অনেক গুলি নাটকও লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রী, জুবিলী যজ্ঞ, ল'বাবু, ছবি, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, মহিলা মজলিস প্রভৃতি প্রধান। ১৯১১ খ্রীঃ অব্দে তিনি পর-লোক গমন করেন।

দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ— মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার। তিনি নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বাসু-দেব সার্ব্বভৌমের পুত্র। তিনি কবি

কল্পদ্রুমেরও একখানা উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

দুর্গাদাস লাহিড়ী—খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও বৈদিক পণ্ডিত। নদীয়া জিলার নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী চকব্রাহ্মণগড়িয়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। পল্লীগ্রামের পাঠশালায়ই তাঁহার প্রথম বিদ্যারম্ভ হয়। তৎপরে পিতার সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া পড়াশুনা করিতে থাকেন। ষোড়শ বর্ষ বয়সে হাওড়া জিলার সাঁত্রাগাছি গ্রামে, প্রসিদ্ধ চৌধুরী বংশে তাঁহার বিবাহ হয়। কিছুদিন সাঁত্রাগাছি গ্রামের স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হন। পরলোক গত ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ বরদা চরণ মিত্র ও সিবিলিয়ান কিরণচন্দ্র দে কলেজে তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। কলেজে অধ্যয়ন কালেই তিনি সাহিত্য চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন। ঐ সময়ে প্রচলিত সাধারণী, সোমপ্রকাশ, নববিভাকর, সুলভ-সমাচার, জন্মভূমি প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার লিখিত কবিতা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইলে, কোনও সমালোচক তাঁহার কয়েকটী বানানের ভ্রম প্রদর্শন করেন। লাহিড়ী মহাশয় এই সকল যে ভুল নয়, তাহা অতি নিপুণতার সহিত প্রদর্শন করেন। এই সূত্রে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহার শিষ্য শ্রেণীতে গণ্য হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপদেশে ও উৎসাহে তিনি সাহিত্য সেবায় আরও মনোযোগী হন।

১২৯৪ বঙ্গাব্দে তাঁহার অনুসন্ধান পত্রিকা প্রথম বাহির হয়। উহা খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। উক্ত পত্রিকায় কতকগুলি প্রতারকের, বিজ্ঞাপনদ্বারা প্রতারণার কাহিনী প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। অনুসন্ধান মাসিক, পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক ও দৈনিক, আকার প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে ইংরেজি বাঙ্গালা উভয় ভাষায়ই ইহা মুদ্রিত হইত। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহাকে উহার প্রচার বন্ধ করিতে হয়। (১৩১২ সালের বৈশাখ)। অনুসন্ধান পরিচালন কালেই তাঁহার রচিত দ্বাদশ নারী, নির্ব্বাণ জীবন, ভারতে দুর্গোৎসব, চুরি জুয়াচুরি, জাল ও খুন প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

অনুসন্ধানের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া তিনি বঙ্গবাসীর সম্পাদক হন। ঐ পদে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে তিনি স্বাধীনতার ইতিহাস, রাণী ভবানী, বাঙ্গালীর গান, বৈষ্ণব পদলহরী, শিখ যুদ্ধের ইতিহাস, রামায়ণ ও মহাভারত কৃত্তিবের সহিত সম্পাদন করেন। বঙ্গবাসীর প্রাণ স্বরূপ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু পরলোক গমন করিলে, ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে

তিনি বঙ্গবাসীর কার্য্যও পরিত্যাগ করেন। বঙ্গবাসী সম্পাদন কালে, লণ্ডনের 'রয়েল সোসাইটী অব আর্টস' (The Royal Society of Arts) কর্ত্তৃক দেশীয় সংবাদপত্র সমূহের এক-মাত্র প্রতিনিধি রূপে লণ্ডনে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সনাতনপন্থী ছিলেন বলিয়া, ইংলণ্ডে গমন করেন নাই।

বঙ্গবাসী পত্রিকা সম্পাদন কালেই তিনি 'অন্নরক্ষিণী সভা' নামক এক সভা স্থাপন করেন। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে আমাদের দেশের ধান বা চাউল বিদেশে রপ্তানি না হয়, তাহার প্রতী-কার করা। দ্বারভঙ্গের অধীশ্বর রামেশ্বর সিং বাহাদুর উহার সভাপতি ছিলেন। দেশের আরও অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট লোক ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। অনেক আন্দোলনের ফলে বড়লাট রপ্তানী সংযত করিতে সম্মত হন।

তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি পৃথিবীর ইতিহাস রচনার প্রয়াস। বঙ্গবাসীর কর্ম্ম পরিত্যাগের পর তিনি এই কার্য্যে ব্রতী হন। ভারতবর্ষের ইতিহাস সাত খণ্ডে সমাপন করিয়াই, তিনি পরলোক গমন করেন।

তিনি চতুর্ব্বেদ বঙ্গাক্ষরে অনুবাদ সহ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা দেশের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নানা বিষয়ে রাজা রামকৃষ্ণ, লক্ষ্মণ সেন, সুবর্ণ বলয়, সুখ ও শান্তি, চিত্রাবলী, মণি, নবরত্ন, অদৃষ্ট চক্র, পঞ্চানন্দের পঞ্চরং, সাধনা, সৎপ্রসঙ্গ, মর্ত্তে ভগবান্, জ্ঞানবেদ প্রভৃতিও রচনা করিয়াছেন। ইংরেজ কবি টেনিসনের এনক আর্ডেন (Enoch Arden) কাব্য অতি সুন্দর বাঙ্গালা পদ্যে অনু-বাদ করিয়াছিলেন।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২১শে শ্রাবণ (সেপ্টেম্বর ১৯৩২ খ্রীঃ) পরলোক গমন করিয়াছেন।

দুর্গানাথ রায়—বাঙ্গালী সাধক। তিনি বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মভাবাপন্ন ও শুদ্ধ-চরিত্র ছিলেন। প্রথম যৌবনে তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন; ক্রমে স্বর্গীয় বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে তাঁহার সহ-যোগী ও সহকর্ম্মীরূপে ঢাকা নগরী কেন্দ্র করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে নীতি ও ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ব্রতী হন এবং চির দারিদ্র্য বরণ করেন। তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রিয় অনুচর ছিলেন এবং কয়েকবার তাঁহার দলের সঙ্গে দেশ বিদেশে ধর্ম্ম প্রচারে গিয়াছিলেন।

তিনি সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন এবং উপাসনাকালীন ভাব অবলম্বনে তৎ-ক্ষণাৎ সঙ্গীত রচনা করিয়া গান করিতেন। তাঁহার স্বাভাবিক বাগ্মিতা শ্রোতাদের মনে ভক্তিভাব উদ্দীপিত করিত। তিনি অনেক বৎসর ঢাকা হইতে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্র "বঙ্গ-

বন্ধু''র সম্পাদকতা করেন এবং কিছু কালের জন্য "মিলন" নামে একখানা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কাগজ বাহির করেন।

তিনি সকল সম্প্রদায়ের বিশ্বাসী সাধু ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন এবং সকলের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন। তাঁহাকে যাঁহারা জানিতেন সকলেই—সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে শ্রদ্ধা করিতেন। ঈশ্বরভক্তি তাঁহাকে সেবাপরায়ণ করিয়াছিল। ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষের সময় সেবাকার্য্যে তিনি সহায়তা করিতেন ও অনেক কাল নবাব আবদুল গণি রিলিফ ফণ্ডের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৩৪৪ সালে এই ভক্ত পরলোক গমন করেন।

দুর্গাপ্রসাদ তর্কালঙ্কার—বিক্রমপুর কাঠিয়াপাড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। নবদ্বীপ-গৌরব গোলোকনাথ ন্যায়রত্নের তিনি অন্যতম ছাত্র ছিলেন। গোলোকনাথের পুত্র হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্তের মৃত্যুর পর, তিনি পাকা টোলের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১২৯৯ সনে স্বর্গী হন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন।

দুর্গাপ্রসাদ দ্বিবেদী—তিনি একজন জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিত। ক্ষেত্রমিতি (ক্ষেত্র ব্যবহার) নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত। অপর এক দুর্গাপ্রসাদ বৃহৎ সংহিতা নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়— তিনি নদীয়া জিলার অন্তর্গত উলা বা বীরনগর গ্রামের খড়দহ পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম মুখোপাধ্যায় ও মাতার নাম অরুন্ধতী দেবী। তাঁহার স্ত্রী হরপ্রিয়া দেবীকে, গঙ্গাদেবী স্বপ্নে আদেশ করেন যে, তাঁহার স্বামী যেন গঙ্গা মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কাব্য রচনা করেন। এই আদেশ পাইয়া দুর্গাপ্রসাদ "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী" নামক এক কাব্য রচনা করেন। ইহাতে ভগীরথ কর্ত্তৃক মর্ত্ত্যে গঙ্গার আনয়ন, সগর সন্তানগণের উদ্ধার, প্রভৃতি বিষয় আছে। ইহা পাঠ করিলে তৎকালের অনেক সামাজিক রীতিনীতি অবগত হওয়া যায়। খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উহা রচিত হইয়াছিল।

দুর্গাপ্রসাদ শর্ম্মা—ইনি একজন কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ "মুক্তালতাবলী"। কল্কি পুরাণ হইতে এই গ্রন্থের উপাখ্যান ভাগ গৃহীত। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা, রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন প্রভৃতি বিষয় সন্নিবিষ্ট। এই কাব্যগ্রন্থে অনেক দার্শনিক তত্ত্বের বিচারও দেখিতে পাওয়া যায়।

দুর্গাবতী—মধ্য ভারতের অন্তর্গত গড়-মণ্ডল নামক রাজ্যের অধিপতি দলপৎ রাওয়ের মহিষী। তিনি মহবারাজ্যের এক ক্ষত্রিয় ভূপতির কন্যা ছিলেন। তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্যের খ্যাতি

বস্তুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এ জন্য অনেক ক্ষত্রিয় বীর তাঁহাকে বিবাহ করিতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু দুর্গা-বতী, গড়মণ্ডলের অধিপতি দলপৎ রাও এর তেজস্বীতা ও বলবীর্য্যের খ্যাতি শুনিয়া তাঁহারই প্রতি আকৃষ্ট হন। দলপৎ দুর্গাবতীর মনোভিলাষের কথা অবগত হইয়া মাহোবা রাজধানী সিংহল-গড় আক্রমণ করেন। সিংহলগড়াধি-পতি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কন্যাকে দল-পতের করে প্রদান করিতে বাধ্য হন।

বিবাহের চারি বৎসর পরে দলপৎ রায়, বীরনারায়ণ নামক একটি শিশু পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। দুর্গাবতী তদবধি শিশু পুত্রের নামে স্বয়ং রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। তাঁহার দৃঢ় অথচ সুশাসনে গড় রাজ্য বিশেষ উন্নতি লাভ করিল।

মুঘল সম্রাট আকবর সেই সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আসফ খাঁ নামক একজন সেনাপতি তখন গড়মণ্ডলের নিকটবর্ত্তী মুঘল শাসনাধীন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি গড়মণ্ডলের সমৃদ্ধি মুঘল রাজ্যের পক্ষে আশঙ্কার হেতু স্বরূপ এই কারণ দর্শাইয়া সম্রাটের নিকট অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক গড়মণ্ডল আক্রমণ করিলেন। দুর্গাবতীর বিচক্ষণ মন্ত্রী অধর রাও এই অন্যায় আক্রমণ নিবারণ করিবার জন্য দিল্লীতে যাইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। ১৫৬৪ খ্রীঃ অব্দে মুঘল আসফ খাঁ গড়মণ্ডল আক্রমণ করিলেন। দল-পতের পুত্র বীর নারায়ণ তখন অষ্টাদশ বর্ষের যুবক মাত্র। দুর্গাবতী পুত্রকে লইয়া সমরায়োজন করিলেন এবং স-পুত্র নিজেও সৈন্য দলের সহিত যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। প্রথম দুই-বারের আক্রমণে আসফ খাঁর পরাজয় হয়। শেষ বারে আসফ খাঁ বৃহত্তর বাহিনী ও নূতন অস্ত্রশস্ত্রাদি সহ দুর্গা-বতীকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধ কালে দুর্গাবতী সমর ক্ষেত্রে গুরুতর আহত হইয়া, শত্রু হস্তে বন্দী হইবার আশঙ্কায়, নিজ হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। বীরনারায়ণ প্রথমেই আহত হইয়া অন্যত্র নীত হন। আসফ খাঁ পরে সেই দুর্গও আক্রমণ করেন এবং বীরনারায়ণ যুদ্ধে নিহত হন। দুর্গস্থ মহিলারা শত্রু হস্তে বন্দিনী হওয়া অপেক্ষা অনলে প্রবেশ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দেওয়াই শ্রেয় বোধ করেন।

দুর্গাবতী—(২) তিনি চিতোরের রাণা সঙ্গের কন্যা এবং বেসিনের অধিপতি শিলোড়ীর মহিষী। গুজরাটের অধি-পতি বাহাদুর শাহ ১৫৩১ খ্রীঃ অব্দে বেসিন আক্রমণ করিয়া শিলোড়ীকে বন্দী করেন এবং বলপূর্ব্বক তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। শিলোড়ীর ভ্রাতা লক্ষ্মণ কিছুকাল দুর্গ

রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে দুর্গ শত্রু হস্তে সমর্পণ করিতে অভিলাষী হন। কিন্তু রাণী দুর্গাবতী মুসলমান হস্তে পতিত হওয়ার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয় মনে করিয়া, জহরব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিলেন।

দুর্গাবর কায়স্থ—তিনি আসামের একজন বৈষ্ণব কবি।

দুর্গাভঞ্জ—তিনি উড়িষ্যার অধিপতি মুকুন্দ হরিশ্চন্দ্রের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। সুলেমান কররাণীর সহিত যুদ্ধে তিনি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক মুসলমান পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। মুকুন্দ হরিশ্চন্দ্র দেখ।

দুর্গামাণিক্য—লক্ষ্মণমাণিক্যের পুত্র দুর্গামণি, মহারাজা রাজধর মাণিক্যের সময়ে ত্রিপুরার যুবরাজ ছিলেন। রাজধর মাণিক্যের মৃত্যু হইলে রাজ্যের অধিকারী কে হইবেন তাহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। এক পক্ষ যুবরাজ দুর্গামণির পক্ষ অবলম্বন করেন, অপর একদল রাজধর মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার রামগঙ্গার পক্ষ অবলম্বন করেন। ইংরেজ সরকার রামগঙ্গার অনুকূলে মত প্রদান করাতে তিনিই প্রথম সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন দুর্গামণি প্রথমে কিছু কুকী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহী হইলেন। কিছুকাল পরে ইংরেজ সরকার তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন যে দুর্গামণি যেন চাকলা রোশনাবাদে স্বীয় স্বত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দেওয়ানী আদালতের সাহায্য গ্রহণ করেন। উক্ত আদালত কর্ত্তৃক জমীদারীতে তাঁহার স্বত্ব স্থিরীকৃত হইলেই, ইংরেজ সরকার রাজসিংহাসনে তাঁহার অধিকার স্বীকার করিবেন। তদনুসারে দুর্গামণি দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং ১৮০৮ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে আদালত তাঁহার সপক্ষে রায় প্রদান করিলেন। মহারাজ রামগঙ্গা এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করেন। সেইখানেও তাঁহার বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হয়। তখন যুবরাজ দুর্গামণি সিংহাসন লাভ করিয়া দুর্গামাণিক্য নাম গ্রহণ করিলেন। তিনি মাত্র তিন বৎসর রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় বিজয় মাণিক্যের পৌত্র শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরকে তিনি যুবরাজের মর্য্যাদা প্রদান করেন। ১৮১৩ খ্রীঃ অব্দে, শম্ভুচন্দ্রের হস্তে রাজ্যের শাসন ভার প্রদান পূর্ব্বক তিনি কাশী যাত্রা করেন। পথিমধ্যে পাটনা নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। অতঃপর রামগঙ্গা পুনরায় রাজ্যাধিকারী হন। রামগঙ্গা দেখ।

দুর্গামোহন দাস—১২৪৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৪১ খ্রীঃ নবেম্বর) বিক্রমপুরের অন্তর্গত তেলিরবাগ গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস যশোহর জিলার অন্তর্গত কালিয়া গ্রামে

ছিল। তাঁহার পিতা কাশীশ্বর দাস বরিশালের সরকারী উকীল ছিলেন। অতি শৈশবেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হইলে তিনি পিতামহের তত্ত্বাবধানেই বাস করেন। নয় বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার পত্নী ব্রহ্মময়ীর বয়স তখন চারি বৎসর। গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় কিছুদিন লেখাপড়া করিয়া তিনি প্রায় নয় বৎসর বয়সে ফারসী পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে কলিকাতায় পিতৃব্যের নিকট আসিয়া ভবানীপুরে এক ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে বরিশালে সরকারী ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে, পিতার নিকট যাইয়া সেই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে প্রদর্শনী বৃত্তি (Exhibition Scholarship) পাইয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁহার সতীর্থদের মধ্যে যাঁহারা পরবর্ত্তী জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে সার রমেশচন্দ্র মিত্র, রায়বাহাদুর কালিকাদাস দত্ত, রায়বাহাদুর সূর্য্যনারায়ণ মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। গণিতে দুর্গামোহন আদৌ কৃতী ছিলেন না বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই কিন্তু সাহিত্য ও ইতিহাসে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। এই পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি স্বয়ং খ্রীষ্টধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান হইয়াই সন্তুষ্ট হন নাই। পত্নী এবং বিধবা বিমাতাকেও ঐ ধর্ম্মের তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করাইবার জন্য তিনি তাঁহাদিগকে ব্যাপ্টিষ্ট মিশন সোসাইটির (Baptist Mission Society) একজন ধর্ম্মযাজক সূর্য্যকুমার ঘোষের গৃহে রাখিয়া আসেন। এই অসমসাহসিক কার্য্যে পরিবারে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হয়। কিন্তু দুর্গামোহনও সহজে সংকল্পচ্যুত হইবার পাত্র ছিলেন না। পরিশেষে অনেক পরামর্শের পর স্থির হয় যে তাঁহার অগ্রজ কালিমোহন বরিশালের সরকারী উকীলের কাজ ছাড়িয়া কলিকাতা হাইকোর্টে আসিয়া আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিবেন এবং দুর্গামোহন তাঁহার স্থলে বরিশালে যাইবেন। খ্রীষ্টানের গৃহে বাস করার অপরাধে দুর্গামোহন তখন আর পিতৃব্য বিশ্বেশ্বরের গৃহে স্থান পাইলেন না। কলিকাতা হইতে সস্ত্রীক নৌকাযোগে বরিশাল চলিয়া গেলেন। বরিশালে যাইয়াও কিছুকাল তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। পরিশেষে অগ্রজ কালিমোহনের পরামর্শে আমেরিকান মনীষি থিয়োডোর পার্কারের গ্রন্থাবলী পড়িয়া তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হয়

১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে তিনি আইনের

প্রথম পরীক্ষায় (Licentiate of Law) উত্তীর্ণ হন। কিন্তু এফ্-এ (First Arts) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছিলেন না বলিয়া পরবর্ত্তী উচ্চতর পরীক্ষা দিবার আর সুযোগ পান নাই। প্রথমোক্ত আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে কিছুকাল, আইন ব্যবসায় অন্যায় মনে করিয়া চাকুরী গ্রহণপূর্ব্বক যশোহর গমন করেন। কিন্তু মাত্র এক মাসের মধ্যে সে চাকুরী ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং সদর আদালতে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। পরে বরিশালে যাইয়া তথা-কার সরকারী উকীল হন (১৮৬৩ খ্রীঃ)।

দুর্গামোহন যৌবনকাল হইতেই সংস্কার পন্থী ছিলেন। বরিশালে অব-স্থান কালে, ১২৭১ বঙ্গাব্দে তাঁহারই প্রধান চেষ্টায় তথায় দুইটি কায়স্থ বাল-বিধবার পুনর্বিবাহ হয়। তৎপূর্ব্বে পূর্ব্ব-বঙ্গের আর কোথাও বিধবা বিবাহ হয় নাই। ইহার ফলে চারিদিকে ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হইল। নানা ভাবে তাঁহার উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। বিরোধী দলের প্ররোচনায় তাঁহার ভৃত্যবর্গ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। ধর্ম্মঘট করিয়া লোকে প্রতিজ্ঞা করিল যে, তাঁহাকে কেহ আর মকর্দ্দমায় উকীল নিযুক্ত করিবে না। এই ভাবে আয়ের পথ রুদ্ধ এবং আরও বিবিধ রূপ উৎপীড়ন আরম্ভ হওয়া সত্বেও তিনি বিন্দুমাত্র ভীত হইলেন না। কিছুকাল পরে আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পাইল। তাঁহারও পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাগম হইতে লাগিল। তদনন্তর তাঁহার যত্নে বরি-শালে আরও কয়েকটি বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইল। ঐ সকল বিবাহে তাঁহার অনেক অর্থও ব্যয় হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভিন্ন বাঙ্গালা দেশের আর কেহ বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য এত অর্থ ব্যয় করেন নাই। বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য তাঁহার এত উৎসাহ ছিল যে নিজের বিমাতারও (তিনি দুর্গামোহনের অপেক্ষা মাত্র তিন বৎসরের বড় ছিলেন) বিবাহ দিয়া-ছিলেন। বলাবাহুল্য এই কাজ সম্পন্ন করিতে যাইয়া তিনি পরিবারের লোক-দিগের নিকট প্রভূত বাধা প্রাপ্ত হন এবং অনেক হাঙ্গামার পর তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে সমর্থ হন। এই সময়ে দুর্গামোহনের বয়স পঁচিশ বৎসর মাত্র ছিল।

বরিশালে থাকিতেই ১৮৬৩ অথবা ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে, তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন। বরিশালে ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় ও অর্থ সাহায্যে স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেন। কয়েকজন প্রচারককে, নিজ গৃহে আশ্রয় দিয়া সপরিবারে প্রতিপালন করিতেন। কিছুকাল তিনি বরিশাল

ব্রাহ্মসমাজের সভাপতিও হইয়াছিলেন;

বরিশালে প্রধানতঃ তাঁহার উৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ প্রচার হয় এবং অনেক উৎসাহশীল যুবক প্রকাশ্যে প্রাচীন সমাজের রীতিনীতি পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে লাখুটিয়ার রাখালচন্দ্র রায় ও বিহারীলাল রায়, নামক জমীদার ভ্রাতৃ-দ্বয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। তাঁহাদের ঐ অসমসাহসিক কার্য্যে বরিশালে আন্দোলনের দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু দুর্গামোহন প্রমুখ নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তিগণ স্থিরচিত্তে নিজেদের কর্ত্তব্য করিতে থাকেন। আন্দোলন কিছু প্রশমিত হইলে রাখাল বাবু ও বিহারী বাবু দুর্গামোহনের পরামর্শে তাঁহাদের বাস ভবনে এক বিরাট ভোজের আয়োজন করেন এবং বরি-শালের তদানীন্তন সমুদয় ইংরেজ রাজ কর্ম্মচারী তাহাতে নিমন্ত্রিত হন। ভ্রাতৃ-দ্বয়ের ঐ অসমসাহসিক অথচ সংস্কার-মূলক কাজে বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট সার সিসিল বীডন (Sir Cecil Beadon) বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করেন। উহার অল্পকাল পরেই পূর্ব্বোক্ত লাখুটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র রায়ের ভগ্নীর সহিত ভাগলপুর নিবাসী নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির বিবাহ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়।

১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে দুর্গামোহন বরি-শালের সরকারী উকীলের পদ পরি-ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তদবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতাতেই ছিলেন।

কলিকাতায় আসিবার পর তিনি নব্য ব্রাহ্মদের একটি ক্ষুদ্র দলের নেতৃস্থানীয় হইলেন। ব্রাহ্ম-বিবাহ বিধি কিরূপে প্রণীত হওয়া উচিত, তাহা বিবেচনা করিবার জন্য একটি মন্ত্রণা সমিতি গঠিত হয়। তিনি সেই সমিতির অন্যতম সদস্য হইয়াছিলেন এবং অসবর্ণ বিবাহ সিদ্ধ করিবার জন্য ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে তিন আইন (Civil Marriage Act) বিধিবদ্ধ হইলে, ঐরূপ বিবাহ সম্পাদন করিবার অন্যতম ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী (Registrar) নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি আনন্দ-মোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ উৎসাহী ব্রাহ্মদের সহিত মিলিত হন। তাঁহারা সেই সময়ে, ব্রাহ্মদের মধ্যেও বিশেষ অগ্রগামী ছিলেন। বিশেষতঃ নারী-দিগকে উচ্চ শিক্ষা দান, স্ত্রী স্বাধীনতার প্রবর্ত্তন, বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন প্রভৃতি সমাজসংস্কার-মূলক কাজে তাঁহাদের অদম্য উৎসাহ ছিল।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তখন ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান নেতা ছিলেন। ঐ সকল বিষয়ে দুর্গামোহন প্রমুখ উৎসাহী অগ্রপন্থী ব্রাহ্মদের সহিত কেশবচন্দ্রের অনেক সময়ে ঘোরতর মতভেদ হইত। ব্রহ্মমন্দিরে নারীগণ যাহাতে যবনিকার অন্তরালে না বসিয়া তাঁহাদের ইচ্ছা মত সর্ব্বসাধারণের মধ্যে আসন গ্রহণ করেন, তজ্জন্য নব্য-ব্রাহ্ম দল বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করেন এবং কেশবচন্দ্র তাহাতে বাধা প্রদান করিলে, তাঁহারা কিছুকাল স্বতন্ত্র ভাবে উপাসনার আয়োজন করেন।

কলিকাতায় যে ক্ষুদ্র অগ্রগামী ব্রাহ্ম দলের তিনি নেতৃ স্থানীয় ছিলেন, তাঁহারা বালবিধবা ও অসহায়া কুলীন কন্যাদিগকে নানারূপ বিপদ শঙ্কুল অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। কিন্তু ঐরূপ উদ্ধারপ্রাপ্ত কন্যাগণকে আশ্রয় দিবার কোনও ব্যবস্থা না থাকাতে, দুর্গামোহন অনেক বালিকাকে নিজ গৃহে আশ্রয় প্রদান করেন এবং অনেককে নিজ ব্যয়ে শিক্ষা প্রদান করেন। স্ত্রীশিক্ষা ও নারী জাতীর উন্নতির জন্য তাঁহার অসাধারণ উৎসাহ ও যত্ন ছিল। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে কুমারী এক্রয়েড (যিনি পরে জজ বিভারিজ সাহেবের সহিত বিবাহিতা হন), দেশীয় নারীদের শিক্ষার জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ বিদ্যালয় স্থাপনের মূলে একটু ইতিহাস ছিল। দুর্গামোহন গৃহে যে সকল অসহায়া কন্যাকে আশ্রয় দিতেন তাঁহাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছিল। দুর্গামোহন, তাঁহার পত্নী ও কন্যারা এই সকল অসহায়া বালিকাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হন। সেই জন্যই দুর্গামোহন পূর্ব্বোক্ত মিস্ এক্রয়েডের সহায়তায় ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রায় আড়াই বৎসর পরে ঐ বিদ্যালয় উঠিয়া গেলে, দুর্গামোহন ও তাঁহার অন্যান্য সুহৃদ, মনোমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসুর অর্থানুকুল্যে ও উৎসাহে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দের জুন মাসে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় নামে আর একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ঐ বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এবং অন্যান্য আশ্রিত বালিকাদের শিক্ষার জন্য তিনি মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য করেন। তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর স্মৃত্যার্থে ছাত্রীগণের জন্য বৃত্তিদানের বন্দোবস্ত করেন।

কুচবিহারের নাবালক রাজার সহিত কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহ লইয়া ব্রাহ্মসমাজে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং তৎফলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে যে পৃথক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়, তাহার সহিতও দুর্গামোহনের অতি ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বস্তুতঃ কেশবচন্দ্রের সহিত

বিরোধ উপস্থিত হইলে দুর্গামোহনই প্রথম পৃথক ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি একজন প্রধান ছিলেন। উহার উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণের জন্য তিনি মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য করেন এবং তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সহকর্ম্মীদের সহায়তায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নিয়মাবলী প্রণয়নাদির দ্বারা উহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেও বিশেষ সাহায্য করেন। তখন হইতে জীবনের অবশিষ্ট কাল অর্থ ও শক্তি দ্বারা সর্ব্ব প্রকারে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কলিকাতা পুরতন্ত্রের (Municipality) একজন সদস্য মনোনীত হন। ভারত সভার (Indian Association তিনি একজন পোষক (Patron) ছিলেন। দেশের সর্ব্ব প্রকার সৎকার্য্যে তাঁহার অসীম উৎসাহ ছিল। তখন লোকমুখে এইরূপ প্রচলিত হইত "দুর্গামোহন ও আনন্দমোহনের ন্যায় সাহায্যকারী থাকিলে কোনও সৎকার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত চিন্তা করিতে হয় না"

দেশের পরম হিতকারী, অশেষ গুণালঙ্কৃত এই পুরুষ ১৩০৪ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে (১৮৯৭ খ্রীঃ ডিসেম্বর দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যবহারজীবি সতীশরঞ্জন দাস (S. R. Das) ও রেঙ্গুন হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি জ্যোতিষরঞ্জন দাসের (J. R. Das) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু এবং প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত আচার্য্য প্রসন্নকুমার রায় (Dr. P. K. Roy) তাঁহার জামাতা ছিলেন।

দুর্গারাও—গুর্জ্জরপতি সুলতান বাহাদুর চিতোর আক্রমণ করিলে, যে সকল বীর পুরুষ চিতোর রক্ষার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। চিতোর প্রাকার ধ্বংস হইলে বীরবর দুর্গারাও তাঁহার সৈন্য সহ তৎস্থান রক্ষার্থ অগ্রসর হইয়া শত্রুর কামানের সম্মুখে জীবন বিসর্জ্জন দেন।

দুর্গারায়—দুর্গা রায় আকবর শাহের অধীন একজন দেড় হাজারী সেনাপতি ছিলেন। চিতোরের নিকটবর্ত্তী পরগণা রামপুর তাঁহার জন্ম স্থান। তিনি সুবিখ্যাত শিশোদিয়া রাজপুত বংশোদ্ভব ছিলেন। আকবর শাহ তাঁহাকে গুজরাট যুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং এই যুদ্ধে যশোভাজন হয়েন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দুর্গাশঙ্কর--তিনি একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। "আগার বিনোদ" নামক বাস্তু বিদ্যা বিষয়ে তাঁহার একখানা গ্রন্থ আছে। তিনি মল্লারি কৃত জাতক পদ্ধতির উপর এক টীকা রচনা করিয়াছেন

দুর্গাসহায়—তিনি একজন জ্যোতিষী। 'শব্দরত্ন' নামক গ্রন্থ তাঁহার।

দুর্জ্জন শাল—(১) তিনি কোটার রাজা ভীম সিংহের তৃতীয় পুত্র। ভীম সিংহ ইং১৭২০ সালে পরলোক গমন করিলে, জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্জ্জুন সিংহ রাজা হন। তিনি চারি বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া অপুত্রক গতায়ু হইলে, তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্যাম সিংহ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্জ্জন শালের মধ্যে সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে শ্যাম সিংহ নিহত হন এবং দুর্জ্জন শাল রাজ-পদ লাভ করেন (১৭২৪ খ্রীঃ)। তিনি দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহের নিকট হইতে পাঁচ হাজারী মসনবদারী ও খিলাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে এই অনুমতিও পাইলেন যে—যমুনার তট ভাগে হিন্দু অধ্যুষিত স্থানে গো-বধ হইতে পারিবে না।

জয়পুর পতি জয়সিংহ ও তৎপুত্র ঈশ্বর সিংহ বুন্দিরাজ বুধসিংহের রাজ্য অধিকার করিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু দুর্জ্জন শালের জন্য তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। ১৭৪৯ খ্রীঃ অব্দে দুর্জ্জন শাল মারাঠাদের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

তিনি একজন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। ১৭৫৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি অপুত্রক পরলোক গমন করেন। তাঁহার মহিষী অম্বার অধিপতি অজিত সিংহকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দুর্জ্জন শাল—(২) ভরতপুরের রাজা কাদের সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র। কাদের সিংহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র বলবন্ত সিংহ রাজা হন। কিন্তু দুর্জ্জন শাল বলবন্ত সিংহকে তাড়াইয়া দিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। ইংরেজ সরকার বলবন্তের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে দুর্জ্জন শালকে পরাস্ত করিয়া বলবন্তকেই সিংহাসন প্রদান করেন।

দুর্জ্জয় দাশ—তিনি শ্রীখণ্ডের অধিবাসী বিশ্বম্ভর দাশের পুত্র। তাঁহার রচিত 'বৈদ্যকুল পঞ্জিকা' অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তিনি শক্তি গোত্রীয় চক্রপাণি সেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

দুর্জ্জয়দেব ঠাকুর—ত্রিপুরার অধিপতি মহারাজ রাম মাণিক্যের (১৬৭০—১৬৮২ খ্রীঃ) দ্বিতীয় পুত্র। ধর্ম্ম মাণিক্য দ্বিতীয় দেখ।

দুর্দ্দানা বেগম—তিনি বাঙ্গালার সুবেদার নবাব সুজা উদ্দিনের কন্যা। মুরশিদ কুলি খাঁর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। নবাব সুজাউদ্দিন মুর্শিদকুলি খাঁকে উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার পদে নিযুক্ত করেন। এই নবাব কন্যা অতিশয় বীর্য্যবতী ছিলেন। আলীবর্দ্দি খাঁ তাঁহার ভ্রাতা সরফরাজ খাঁকে বধ করিয়া বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করেন। পরে উড়িষ্যা আক্রমণ করিলে মুরশিদ কুলি খাঁ প্রথমে যুদ্ধ করিতে

অসম্মত হন। কিন্তু তাঁহার বীর পত্নী দুর্দ্দানা বেগমের উৎসাহে তিনি যুদ্ধে যাইতে সম্মত হন এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সপরিবারে উড়িষ্যার দক্ষিণে পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

দুর্লভ—চৌহানরাজ দুর্লভ চিতোর পতি বীরসিংহ কর্ত্তৃক নিহত হন। দুর্লভের পুত্র বিশাল দেব। বীরসিংহ ও বিশাল দেব দেখ।

দুর্লভক—দুর্লভবর্দ্ধন দেখ।

দুর্লভ নারায়ণ—তিনি কামতাপুরের (বর্ত্তমান কোচবিহার) রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজ্য বড় নদী হইতে করতোয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কথিত আছে আহম রাজা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে, তিনি স্বীয় রজনী নাম্নী কন্যাকে তাঁহার করে সমর্পণ করিয়া, সন্ধিস্থাপন করেন। খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। দুর্লভ নারায়ণের সহিত গৌড়েশ্বর ধর্ম্ম নারায়ণের যুদ্ধ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তিনি ১৩৩০—১৩৫০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র ইন্দ্র নারায়ণ ১৩৫০—১৩৬৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বোধ হয় রাজত্ব করেন। সন্ধ্যা দেখ।

দুর্লভবর্দ্ধন— কাশ্মীরের কর্কোটক রাজবংশের আদি পুরুষ। কাশ্মীরপতি বালাদিত্যের মৃত্যুর পর ৬০২ খ্রীঃ অব্দে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। তিনি বালাদিত্যের একমাত্র কন্যা অনঙ্গলেখাকে বিবাহ করেন। তিনি প্রথমে বালাদিত্যের অশ্বশালার অশ্বের খাদ্য রক্ষক ছিলেন। দুর্লভবর্দ্ধন ছয়ত্রিংশ বৎসরকাল যোগ্যতার সহিত রাজ্যশাসন করিয়া পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র দুর্লভক, প্রতাপাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়া ৬৩৭ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

দুর্লভবর্দ্ধন সমীপবর্ত্তী অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করিয়া নিজ রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেন। তিনি খুব সম্ভব শৈব মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি মহারাজ হর্ষের সমসাময়িক ছিলেন। কবি বাণের মতে দুর্লভবর্দ্ধন মহারাজ হর্ষকে কর প্রদান করিয়া, তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন।

দুর্লভ মল্লিক—তাঁহার রচিত 'গোবিন্দ গীত নামক' একখানা গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম লোপের পর, ইহা বাঙ্গালা ভাষায় বিরচিত হিন্দুত্ব প্রাপ্ত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। যোগ সাধন দ্বারা লোকে যে অলৌকিক ক্ষমতা ও অমরত্ব লাভ করিতে পারে, ইহা প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। সম্ভবত তিনি খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

দুর্লভরাজ—তিনি সামুদ্রিক তিলক বা নরলক্ষণ নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

দুর্লভরাম সোম—বিহারের নায়েব

সুবাদার মহারাজ বাহাদুর জানকীনাথ সোমের পুত্র। তিনি ১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দে মীরজাফরের অন্যতম মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তিনি লর্ড ক্লাইবের সহিত, বাঙ্গালার দেওয়ানী বন্দোবস্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দিল্লী গমন করেন। বাদশাহ তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় প্রীত হইয়া, তাঁহাকে 'মহারাজ মহীন্দ্র' উপাধি ও বিহার প্রদেশে এক বিস্তৃত জায়গীর প্রদান করেন। রঙ্গপুর জিলায় তাঁহার এক বিস্তৃত জমিদারীও ছিল।

দুর্লভাদেবী—তিনি আসামের নরপতি পুরন্দর পালের মহিষী ও ইন্দ্র পালের মাতা ছিলেন। ইন্দ্র পাল ও পুরন্দর পাল দেখ।

দুর্লভেন্দ্র চন্তাই—তিনি ত্রিপুরার রাজবংশের কুল দেবতা 'চতুর্দ্দশ দেবতার' পূজক ছিলেন। ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস রাজমালা, মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের আদেশে, প্রথমে তাঁহাদ্বারাই বর্ণিত হয়। পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর তাহা লিপিবদ্ধ করেন।

দুলাজী ঠাকুর—বুন্দেলা সর্দ্দার ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের একজন সেনাপতি। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সেনাপতি স্যার হিউরোজ (Sir Hugh Rose) ঝান্সী দুর্গ অবরোধ করেন। কিন্তু রাণী লক্ষ্মীবাই অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক ইংরেজ সেনাপতির সকল আক্রমণ ব্যর্থ করেন। স্যার হিউরোজ যখন হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সময়ে দুলাজী ঠাকুর দুর্গের দক্ষিণ দ্বার খুলিয়া দিয়া ইংরেজসৈন্যকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দেওয়াতে ইংরেজ সেনাপতি দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হন।

দুলা মিয়া—বৈষ্ণব পদাবলী অনেক মুসলমান কবিও রচনা করিয়াছিলেন। এই দুলা মিয়ার রচিত অনেক বৈষ্ণব পদাবলী পাওয়া গিয়াছে।

দুলারাও—মুসলমানেরা ৬৮৫ খ্রীঃ অব্দে প্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। সেই যুদ্ধে তিনি সমর শয্যায় শয়ন করেন।

দুলাল সিংহ—তিনি আসামের অন্তর্গত বিজনীর রাজা ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে সামান্য রাখাল ছিলেন। সেই সময়ে বর্ম্মারা আসাম দেশ আক্রমণ করিয়া ভীষণ অত্যাচার করিত। তাহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কতকগুলি লোক বিজনী অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। তাঁহারাই দুলাল সিংহকে তাঁহাদের রাজা বলিয়া বরণ করেন। কোচবিহারে সেনাপতি শুক্লধ্বজ (বা চিলা রায়) একবার বিজনী আক্রমণ করেন। দুলাল সিংহ তাঁহার আক্রমণ ব্যর্থ করেন। উভয়পক্ষে বহু লোক ক্ষয় হয়। চিলা রায় খাত্যাভাবে দেশ ত্যাগের উপক্রম করিতেছিলেন, এমন

সময়ে তুলাল সিংহ লোক ক্ষয়ে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া শুক্লধ্বজকে রাজ্য প্রদান-পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। বর্ত্তমান বিজনীর রাজবংশ এই শুক্ল-ধ্বজের বংশধর।

তুলিতক—তিনি কাশ্মীরের অধিপতি চন্দ্রাপীড়ের সময়ে (৬৮৭-৯৬ খ্রীঃ) নগর রক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সুব্যবস্থার গুণে নগরের বিচারালয়গুলি বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। কারণ কেহই বিচারপ্রার্থী হইয়া বিচারালয়ে যাওয়া প্রয়োজন মনে করিত না। তিনি 'তুলিত স্বামী' নামে একটী বিষ্ণু মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

তুল্ল সিংহ—তিনি যোধপুরের রাণা যশোবন্ত সিংহের একজন সামন্ত নর-পতি। যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পরে তাঁহার বিশ্বস্ত সেনাপতি দুর্গাদাস তাঁহার মহিষী ও শিশু পুত্রকে অতি কৌশলে সম্রাট আওরঙ্গজীবের কবল হইতে উদ্ধার করেন। সেই সময়ে মুসলমানদের সহিত যে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেই যুদ্ধে দারাবৎ সর্দ্দার বীর তুল্লসিংহ জীবন বিসর্জ্জন করেন।

তুশজ—তিনি যশলমীরপতি বাছেরার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি পিতার মৃত্যুর পরে ১০৪৪ খ্রীঃ অব্দে রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ক্ষীররাজ প্রতাপ সিংহের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজা হইবার পূর্ব্বেই তিনি বীরত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। একদা এক বণিক বহু উৎকৃষ্ট অশ্ব লইয়া লোদ্রুর্বা নগরে উপস্থিত হইয়া-ছিল। তুশজ বণিককে আক্রমণ করিয়া সমস্ত অশ্ব আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তুশজের যশল ও বিজয়রাজ নামে দুই পুত্র ছিল। পরে বার্দ্ধক্যে তাঁহার লঞ্জ-বিজয়রাজ নামে এক পুত্র জন্মে। তিনি মিবারের রণাবত সর্দ্দারের একটী দুহিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তুশজের মৃত্যুর পরে সর্দ্দারেরা কনিষ্ঠ বিজয়কেই সিংহাসন প্রদান করেন।

দূজন জী—তিনি দাদুপন্থী একজন ভক্ত সাধু। তাঁহার রচিত অনেক ভক্ত বাণী পাওয়া গিয়াছে।

দৃকপতি—ত্রিপুরপতি ত্রিলোচনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কাছাড় রাজ্যাধিপতি তাঁহার অপুত্রক মাতামহ তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যাধিকারী মনোনীত করেন এবং মাতামহের মৃত্যুর পর দৃকপতি কাছাড়ের অধিপতি হন। ত্রিলোচনের মৃত্যুর পর তাঁহার মধ্যম পুত্র দক্ষিণ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু দৃকপতি ত্রিপুর রাজ্যও লাভ করিবার জন্য দক্ষিণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ত্রিপুর রাজধানী অধিকার করেন।

দৃঢ়নাথ—একজন নাথ পন্থী যোগা-চার্য্য। অপালনাথ দেখ।

দৃঢ়বল—পঞ্চনদ দেশবাসী একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। কালক্রমে চরক সংহিতার কোন কোন অংশ বিলুপ্ত হইলে তিনি নানা তন্ত্র হইতে সমুদ্ধৃত করিয়া, চরকের অপ্রাপ্ত অংশ সমূহের পরিপূর্ণতা বিধান করিয়াছিলেন।

দেওয়ান চাঁদ—তিনি পাঞ্জাব কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। এই ব্রাহ্মণ সেনাপতি মুলতান দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং বিশেষ দক্ষতার সহিত তাহা রক্ষাও করিয়াছিলেন। কাশ্মীর অভিযানকালে তিনি অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদলের অধিনায়ক পদে অবস্থিত ছিলেন। কাশ্মীরপতি জব্বর খাঁ বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হন। দেওয়ান চাঁদের অসীম বীরত্বে কাশ্মীর অধিকৃত হয়।

দেওয়ার বক্স সুলতান—তিনি দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের পৌত্র ও রাজকুমার খসরুর পুত্র। পিতামহের মৃত্যুর পরে তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাত্র দুই মাস রাজ্য শাসনের পর, তাঁহার পিতৃব্য শাহজাহান তাঁহাকে পদচ্যুত ও নিহত করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করেন।

দেওয়া রাও—মধ্যভারতের সমগ্র উন্নতভূমি পথর নামে খ্যাত। অতি পুরাকালে পথর প্রমার বংশীয় মীন নামক নরপতির অধীন ছিল। তাঁহার রাজধানী মৈনাল নগরে ছিল। চৌহান বংশীয় রাও বাঙ্গ উক্ত মৈনাল নগর অধিকার করেন। তিনি পথরের একটী উন্নত স্থানে বুমৈদা দুর্গ স্থাপন করেন। এই রাও বাঙ্গের দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে দেওয়া জ্যেষ্ঠ ছিলেন। দেওয়ার হররাজ, হাতীজি ও সমরসিংহ নামে তিন পুত্র ছিল। এই সময়ে মোহাম্মদ তোগলক দিল্লীর সুলতান ছিলেন। (১৩২৫-১৩৫১ খ্রীঃ)। রাও দেওয়া ১৩৪২ খ্রীঃ অব্দে মীন নামক অসভ্য জাতিদের হস্ত হইতে বান্দু উপত্যকা কাড়িয়া লইয়া বুন্দী নগর স্থাপনপূর্ব্বক সমগ্র দেশকে হারাবতী নামে অভিহিত করেন। কথিত আছে মীন রাজা হাররাজের কন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলেন। রাও দেওয়া এই প্রগল্‌ভতার শাস্তি স্বরূপ বহু মীন প্রজার প্রাণ সংহার করেন। অভিজাত্যের কি ভীষণ স্পর্দ্ধা! এই ভীষণ নরহত্যার পরে তিনি কনিষ্ঠ পুত্র সমর সিংহের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। বোধ হয় নিরপরাধ প্রজার বিনাশের জন্য অনুতাপের নরকানলে বিদগ্ধ হইয়া তিনি এই প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলে তিনি মৃত বলিয়া পরিগণিত হন। তিনি আর স্বীয় নগর বুন্দি কি বুমৈদায় কখনও গমন করেন নাই। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বুন্দির পাঁচ

মাইল দূরবর্ত্তী অমরচুনা নামক পল্লীতে পরমার্থ চিন্তায় যাপন করিয়াছিলেন।

দেকষ্টা (Mr. Fortune Decosta)—তিনি চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজের ডিরেক্টার ছিলেন। ১৯০০ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজি, ফরাসী ও বাঙ্গালা ভাষায় তিনি একখানি শব্দকোষের প্রথম ভাগ মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার নাম ছিল—Vocabulary of French, English and Bengali Words.

দেৎবা—তিনি কাছাড় পতির ভ্রাতা। ১৫৩১ খ্রীঃ অব্দে আহম রাজাদের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

দেৎসুং—১৫৩১ খ্রীঃ অব্দে আহমেরা কাছাড় প্রদেশ আক্রমণ করিলে। কাছাড়পতি খুনখারা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন এবং তাঁহার আত্মীয় দেৎসুং রাজপদ অধিকার করেন। ১৫৩৬ খ্রীঃ অব্দে আহমদের সঙ্গে তাঁহার আবার বিবাদ উপস্থিত হইলে তিনি দিমাপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক, মেইবং নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু পরে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

দেদ্দদেবী—পালবংশীয় প্রথম নরপতি গোপাল দেবের (৭৯০—৯৫ খ্রীঃ) মহিষী। নরপতি গোপাল দেব পরলোক গমন করিলে দেদ্দদেবীর গর্ভজাত পুত্র ধর্ম্মপাল রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল দেব দেখ।

দেব—রাণা বাপ্পা রাওএর বালীয় ও দেব নামে দুইজন বিশ্বস্ত অনুচর ছিল বালীয় স্বীয় শোণিত দ্বারা বাপ্পা রাও এর ললাটে রাজতিলক পরাইয়া দিয়াছিল। বালীয় দেখ।

দেবকীনন্দন—(১) জীবানন্দের পুত্র দেবকীনন্দন একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বিট্‌ঠল কৃত কল্পবল্লীপদ্ধতির আনন্দকন্দ নামক টীকা ও হোরাহকর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

দেবকীনন্দন—(২) কৃপাপদ্ধতি একখানি গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

দেবকীনন্দন—(৩) বৃহৎ মুহূর্ত্তসিন্ধু নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

দেবকীনন্দন দাস—ব্রাহ্মণ বংশে হালিসহরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম সদাশিব কবিরাজ তিনি পুরুষোত্তম দাসের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বৈষ্ণববন্দনা ও বৈষ্ণব অভিধান তাঁহারই রচিত।

দেবকীর্ত্তি—তিনি একজন জ্যোতিষ শস্ত্রের গ্রন্থকার। মুহূর্ত্ত চিন্তামণির গোবিন্দ কৃত পীযূষধারা টীকাতে বহু গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের উল্লেখ আছে। উক্ত টীকাতে দেবকীর্ত্তির নামেরও উল্লেখ আছে।

দেবকুমার রায় চৌধুরী—বাঙ্গালী সাহিত্যিক। বরিশাল জিলার অন্তর্গত লাখুটিয়ার ভূম্যধিকারী রাখালচন্দ্র রায়

চৌধুরী তাঁহার পিতা। দেবকুমার যৌবনকাল হইতেই সাহিত্যরসিক ছিলেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। দ্বিজেন্দ্র-লাল রায় অনুষ্ঠিত পূর্ণিমা সম্মিলনে দেবকুমারের মধুর আবৃত্তি সকলেরই পরিতৃপ্তি সাধন করিত। প্রধানতঃ সাহিত্যামোদী হইলেও দেশের সকল প্রকার সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কাজের সহিতও তাঁহার যোগ ছিল। দেবকুমারের জননীও সাহিত্য রচনায় ব্রতী ছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েক-খানি উপন্যাস আছে। দেবকুমারের প্রণীত কবি দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে (১৯২৯ খ্রীঃ ডিসেম্বর) তাহার মৃত্যু হয়।

দেবখড়গ—বঙ্গের পালবংশীয় নর-পতিদের অবনতিকালে, বঙ্গে একটী স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। অনু-মান দেবপাল দেবের রাজ্যের শেষ-ভাগে খড়্গোদ্যম এই রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। খড়্গোদ্যমের পরে তাঁহার পুত্র জাতখড়্গ ও পৌত্র দেব খড়্গ বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার তাম্রশাসন অনুসারে তিনি খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

দেব গুপ্ত—জৈন গ্রন্থকার। তিনি খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি জিনচন্দ্রগণি নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রাকৃত ভাষায় নবপদ প্রকরণ এবং জীবতত্ত্ব প্রকরণ নামে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উভয় গ্রন্থই জৈন দার্শনিক মতবাদ সমম্বিত। খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অভয়-দেব সুরী এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যশোদেব তাঁহার এক এক খানি টীকা রচনা করেন।

দেবগুপ্ত, মগধরাজ—তিনি মগধের গুপ্তবংশীয় নরপতি আদিত্যসেনের মহিষী কোণদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। দেবগুপ্তের ভগিনীকে মৌখরী বংশীয় ভোগবর্ম্মা বিবাহ করেন। দেবগুপ্তের পত্নীর নাম কমলা দেবী ও পুত্রের নাম বিষ্ণুগুপ্ত। আদিত্য সেন ৬৭২ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

দেবগুপ্ত, মালবরাজ—স্থাণ্বীশ্বরপতি (বর্ত্তমান থানেশ্বর) হর্ষবর্দ্ধন উত্তরাপথ অধিকার করিয়াছিলেন, মৌখরীরাজ গ্রহবর্ম্মা হর্ষবর্দ্ধনের ভগিনী রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মালবের গুপ্ত-বংশীয় অধিপতি দেবগুপ্ত, গ্রহবর্ম্মাকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন দেব-গুপ্তকে ৬০৬ খ্রীঃ অব্দে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। দেবগুপ্তের সঙ্গে সঙ্গেই মালবের গুপ্ত বংশের অবসান হয়।

দেবজী—আরবদের সিন্ধুদেশ বিজয়ের পূর্ব্বে উক্ত দেশে ব্রাহ্মণ জাতীয় এক রাজবংশ রাজ্যশাসন করিতেন। এই বংশের স্থাপয়িতার নাম দেবজী এবং এই বংশের শেষ রাজার নাম সাহসী রায়। সাহসী রায়ের মৃত্যুর পরে, তাঁহার ব্রাহ্মণ জাতীয় মন্ত্রী চচ রাজ্য অধিকার করিয়া সাহসী রায়ের বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

দেবদত্ত—(১) একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। 'গর্গলঘুপ্রকাশ' নামক গ্রন্থ তাঁহারই বিরচিত।

দেবদত্ত—(২) শুকসপ্ততি নামক গ্রন্থকে পূর্ব্ব রাজস্থানীভাষায় রূপান্তরিত করেন।

দেবদত্ত—(৩) তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত। 'ধাতুরত্ন মালা' ও 'নপুংসক সংজীবনী' নামক গ্রন্থদ্বয় তাঁহারই বিরচিত।

দেবদত্ত—(৪) কামরূপপতি বলবর্ম্মার সময়ে (সম্ভবতঃ খ্রীঃ তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে) কামরূপে পরাশর গোত্রজ কাণ্বশাখার বাজসনেয়িগণের অগ্রণী দেবদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বেদবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই ব্রাহ্মণকে প্রাপ্ত হইয়া ত্রয়ী (বেদবিদ্যা) কৃতার্থম্মন্য হইয়াছিলেন।

দেবদত্ত—(৫) বুদ্ধদেবের মাতুলের পুত্র দেবদত্ত, বুদ্ধদেবের ন্যায় একটী নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। বুদ্ধদেব দেখ।

দেবদামোদর—তিনি আসামের একজন বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারক। ১৪৮৮ খ্রীঃ অব্দে (১৪১০ শকে) আসামের নয়াগাঁ জিলার অন্তর্গত নলবা গ্রামে গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম সদানন্দ ও মাতার নাম সুশীলা দেবী। তিনি বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। এবং চির কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি শঙ্করদেবের প্রায় ৪০ বৎসর বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। শঙ্করদেবই তাঁহার নামাকরণ করেন। উভয়ের ধর্ম্মানুরাগের ফলে আসামে বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আউনি আটি, গড়ে-মুড়ি, কুরুয়াবাহি ও দক্ষিণা পাঠ সত্র (ধর্ম্ম প্রচার স্থান বা মঠ) প্রধান। এতদ্ব্যতীত কামরূপের বেহকুচি সত্রও বিখ্যাত। ১৫৮০ খ্রীঃ (১৫০২ শকে) অব্দে ৯২ বৎসর বয়সে তিনি কোচ-বিহারের অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুরে পরলোকবাসী হন। ভট্টদেব তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহাকেই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন।

দেবদাস—একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—চিকিৎসামৃতসার।

দেবদাসী—একজন মহিলা বৈষ্ণব কবি। তাঁহার রচিত ঝুমুর সঙ্গীতগুলি সম্পূর্ণ অশ্লীলতা বর্জ্জিত ও উচ্চ ভাবপূর্ণ।

দেবধর— কামরূপপতি বলবর্ম্মার সময়ে (খুব সম্ভব খ্রীঃ তৃতীয় শতাব্দীতে) কাণ্বশাখাবলম্বী বেদজ্ঞ অধ্বর্য্যু দেবধর ভট্ট বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারা বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পাদন করিতেন।

দেবনন্দী—বিশিষ্ট জৈন গ্রন্থকার। তিনি প্রধানতঃ পূজ্যপাদ দেবনন্দী নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা পণ্ডিত-গণের বিচার্য্য রহিয়াছে। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, তিনি খ্রীঃ ৫ম ও ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন ধরিতে হয়। দেবনন্দী একাধারে বৈয়া-করণ ও কবি ছিলেন। ইষ্টোপদেশ ও সমাধিশতক নামে তাঁহার রচিত গ্রন্থদ্বয় সমধিক প্রসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন তিনি উমাস্বাতি রচিত "সর্ব্বার্থসিদ্ধি"র এক-খানা টীকাও রচনা করেন। প্রভাচন্দ্র কর্তৃক সমাধি শতকের একখানা টীকা রচিত হয়। কিন্তু তাঁহার পরিচয় অজ্ঞাত।

দেবনাগ—পদ্মাবতী বা নলপুর (বর্ত্ত-মান নারওয়ার) এককালে নাগ-বংশীয়দের রাজধানী ছিল। পুরাণ সমূহে নয়জন নাগবংশীয় রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে গণপতি (গণেন্দ্র) নাগ, দেবনাগ প্রভৃতি ছয়জন নরপতির মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। দেব-নাগের মুদ্রার একদিকে ব্রাহ্মী অক্ষরে 'মহারাজ শ্রীদেবনাগস্ত' লিখিত আছে এবং অপর দিকে একটী চক্র আছে।

দেবনাথ—(১) তিনি যোধপুরের রাজা মানসিংহের রাজত্বকালে (১৮০৩ খ্রীঃ-১৮৪৩ খ্রীঃ) বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি রাজার গুরু ছিলেন। রাজা তাঁহাকে অতিশয় বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করিতেন না। দেবনাথ পরম পণ্ডিত, চতুর ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন। কিন্তু সদ্‌বুদ্ধি ছিল না। রাজার উপকার করিতে যাইয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভীমসিংহকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। রাজা তাঁহাকে প্রচুর ধনরত্ন দিয়াছিলেন। তিনি ধনে ও ক্ষমতায় রাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোক হইয়াছিলেন। এই সমস্ত অর্থের সাহায্যে তিনি রাজ্য মধ্যে ৮৪টী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া, সেই সঙ্গে এক একটী মঠও স্থাপন করেন। তথায় বিদ্যার্থীরা বিনা ব্যয়ে গ্রাসাচ্ছাদন লাভ করিয়া মনোমত বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে পারিত। নিজ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি সকলেরই নিকট পূজ্য ছিলেন। কিন্তু এই সম্মান অচিরেই বিনষ্ট হইল। তিনি দিন দিন অতিশয় ক্ষমতাপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। ইহার ফলে রাজ্যের সকলেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইতে লাগিল। তিনি অনতিকাল মধ্যেই আমীর খাঁর পাঠান

সৈন্যকর্ত্তৃক নির্দ্দয়ভাবে নিহত হইলেন।

দেবনাথ—(২) তিনি একজন বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবি। তাঁহার রচিত গ্রন্থ—গৌরগণাখ্যান ও ভ্রমর গীতা।

দেবনারায়ণ বাচস্পতি—কাশীতে সংস্কৃত অধ্যাপনা করিবার জন্য টোল স্থাপন করিয়া, যে সকল বাঙ্গালী পণ্ডিত বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। সিপাহী বিদ্রোহের বহু পূর্ব্বে এই পণ্ডিত শিরোমণি টোল স্থাপন করেন। বহু বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত। তিনি প্রায় শত বর্ষ জীবিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন পাণ্ডিত্যে প্রায় পিতারই সমকক্ষ ছিলেন। তিনি পিতাকর্ত্তৃক স্থাপিত টোলে অধ্যাপনা করিতেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র উমেশচন্দ্র সান্যাল এম, এ কাশী কুইন্‌স্ কলেজের (Queen's College) অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। এই পণ্ডিত বংশ কাশীতে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

দেবপাল—বঙ্গের পালবংশীয় নরপতি ধর্ম্মপালের দ্বিতীয় পুত্র ও প্রথম গোপাল দেবের পৌত্র। তাঁহার মাতা রন্না দেবী রাষ্ট্রকূটবংশীয় পরবলের কন্যা ছিলেন। দেবপাল দক্ষিণাপথের প্রথম অমোঘবর্ষকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। তিনি গুর্জ্জরপতি রামভদ্রকেও যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিলেন। দেবপালের খুল্লতাত পুত্র জয়পাল উৎকলপতিকে স্বীয় রাজধানী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন এবং কামরূপপতি জয়মাল বীরবাহুকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দেবপাল,যবদ্বীপ বা সুবর্ণ দ্বীপের অধিপতি বালপুত্রদেবের অনুরোধে নালন্দার বৌদ্ধবিহারের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ পাঁচখানি গ্রাম, তাঁহার রাজত্বের অষ্টত্রিংশ বর্ষে দান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালের অমাত্য ছিলেন গর্গদেব ও তৎপুত্র দর্ভপাণি। এই দর্ভপাণি দেবপালেরও মন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁহারই পরামর্শে দক্ষিণে বিন্ধ্য, উত্তরে হিমালয় পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ তাঁহার করতলগত ছিল। দর্ভপাণির পুত্র সোমেশ্বর দেবপালের সেনাপতি এবং সোমেশ্বরের পুত্র কেদার মিশ্র তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। কেদার মিশ্র পরবর্ত্তী রাজা শূরপালেরও (বা প্রথম বিগ্রহ পাল) মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহারই পুত্র গুরব মিশ্র। দেবপালের পুত্র রাজ্যপাল পিতার জীবিতকালেই গতায়ু হন। সুতরাং জয়পালের পুত্র প্রথম বিগ্রহপাল (শূর), দেবপালের মৃত্যুর পরে রাজা হইয়াছিলেন। দেবপাল অনুমান ৮২০-৮৬০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

দেব পূর্ণমতি— একজন নেপালী বৌদ্ধাচার্য্য। তিনি 'ক্রোধরাজোজ্জ্বল

বজ্রাশনি-নামমণ্ডলবিধি' নামক গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—বাঙ্গালী রাজনীতিক ও দেশকর্ম্মী। হুগলী জিলার থানাকুল কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ সর্ব্বাধিকারী বংশে ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে (১২৬৮ বঙ্গাব্দে) তাঁহার জন্ম হয়। সর্ব্বাধিকারী বংশে অনেক কৃতী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাঁহার পিতৃব্য ছিলেন। তাঁহার পিতা সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন।

রামেশ্বরপুর গ্রামের এক মাইনার স্কুলে তাঁহার শিক্ষারম্ভ হয়। পরে কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজ, হাওড়া জিলা স্কুল, হেয়ার স্কুল প্রভৃতি বিবিধ শিক্ষায়তনে অধ্যয়ন করিবার পর ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কৃতী ও মেধাবী ছাত্র বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। ছাত্রাবস্থায় একাধিক বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে, প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে কৃতীত্বের সহিত এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাঁহার ছাত্রজীবন শেষ হয়। দেবপ্রসাদের পিতা সূর্য্যকুমার পুত্রদের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না কিন্তু তাহাদিগের কোনওরূপ বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতেন না। অপেক্ষাকৃত ধনীর সন্তান হইলেও তাঁহাদিগকে অতি সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের সন্তানগণের ন্যায় নানা বিষয়ে কষ্টসহিষ্ণু করিতে চেষ্টা করিতেন। ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে আইন বিষয়ক এক পরীক্ষায় (Attorneyship) উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন।

দেবপ্রসাদ পিতার মধ্যম পুত্র। তাঁহার অগ্রজের নাম রায়বাহাদুর ডাঃ সত্যপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। দেশবিখ্যাত অস্ত্র চিকিৎসক ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী তাঁহারই অন্যতম অনুজ ছিলেন।

যৌবনের প্রারম্ভেই, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের নিকট তিনি দেশাত্মবোধের শিক্ষা লাভ করেন এবং সুদীর্ঘকাল নানাভাবে যথাসাধ্য রাজনীতির চর্চ্চাদ্বারা দেশের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ভারত সভার (Indian Association) কার্য্যে তিনি সুরেন্দ্রনাথের একজন প্রধান সহকর্ম্মী ছিলেন এবং ১৯২১ খ্রীঃ পূর্ব্বে তিনি উৎসাহের সহিত কংগ্রেসের সকলপ্রকার কার্য্যে যোগ দিতেন।

কর্ম্ম জীবনের প্রথম হইতেই জনহিতকর কাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি সর্ব্বদাই যথাসাধ্য নিজেকে পশ্চাতে রাখিয়া কাজ করিতে ভালবাসিতেন। কোনও সৎ কাজ

করিয়া লোকের প্রশংসা লাভের জন্য লালায়িত হইতেন না। যে সকল জন-হিতকর কাজের সহিত তাঁহার যোগ ছিল, তাহাদের মধ্যে ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী (Imperial Library), কলিকাতা মাদক নিবারণী সভা (Calcutta Temperance Federation), সাহিত্য সভা (শোভাবাজার রাজবাটীর) প্রভৃতি প্রধান। কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের (Calcutta University Institute) পরিচালনার দোষে যখন উহা প্রায় সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবার উপক্রম হয়, তখন প্রধানতঃ দেবপ্রসাদের বিশেষ চেষ্টাতেই উহা বিপন্মুক্ত হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে তিনি দুইবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। দুই বার তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি স্বরূপ লণ্ডন নগরে অনুষ্ঠিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলনে (Universities of the Empire Congress) গমন করেন। তদুপলক্ষে ইংলণ্ডে অবস্থানকালে ১৯১৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি এবার্ডিন (Aberdeen) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানসূচক উপাধি (L.L. D.) লাভ করেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা (Bengal Legislative Council) এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা (Imperial Legislative Council), এই দুই প্রতিষ্ঠানেই তিনি দীর্ঘকাল সদস্য ছিলেন। নিষ্ঠার সহিত তিনি উহাদের অধিবেশনগুলিতে যোগ দিতেন এবং অতি যোগ্যতার সহিত উহাদের কার্য্যাবলী সম্পাদনে সাহায্য করিতেন। নির্ভিকভাবে কর্ত্তৃপক্ষের অনাচার অবিচারের প্রতিবাদ করিতেও তিনি পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না।

১৯১২ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সাম্রাজ্ঞীর কলিকাতায় আগমনকালে ছাত্রগণের পক্ষ হইতে রাজদম্পতির যে সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার ভার দেবপ্রসাদের উপর অর্পিত হয়। তাঁহার সুব্যবস্থায় প্রীত হইয়া সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী নিজ নিজ স্বাক্ষর যুক্ত দুইখানি প্রতিকৃতি তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন।

তিনি সুবক্তা ছিলেন। ব্যবস্থাপক সভাগৃহ, সাধারণ জনসভার মঞ্চ সর্ব্বত্রই তাঁহার গম্ভীর ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গের প্রীতি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিত। ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সর্ব্বাধ্যক্ষ' (Vice Chancellor) মনোনীত হন। তিনি তিনি সর্ব্বমোট চারি বৎসর ঐ গৌরবপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কর্ম্মকুশলতার পরিচয় প্রদান করেন। তিনিই প্রথম বেসরকারী সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন

কার্য্যকরী সভা (Boards of Studies) এবং সিনেট (Senate) ও সিণ্ডিকেটের (Syndicate) সদস্য ছিলেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার পরম অনুরাগ ছিল। একাধিক পত্রিকাতে তাঁহার মূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী প্রভৃতি প্রকাশিত হইত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য্যের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কিছুকাল উহার অন্যতম সহঃ সভাপতিও হইয়াছিলেন। দেশের নানারূপ জনহিতকর কার্য্যের সহিত তাঁহার বিশেষ যোগ ছিল। সে সকল কার্য্য তিনি ঐকান্তিক আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারে সম্পন্ন করিতেন। লোক দেখান আগ্রহ প্রদর্শন তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধ ছিল। যুবকদিগের মধ্যে তিনি ব্যায়াম চর্চ্চার বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। সামাজিক আচার ব্যবহারে তিনি দেশচলিত প্রাচীন প্রথাই অনুসরণ করিতেন। কিন্তু অন্ধ স্বধর্ম্মানুরাগদ্বারা চালিত হইয়া, অযথা ধর্ম্মের বাহ্যিক উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন না। বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ এবং দেশের প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলিতেও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ১৯২৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের অবস্থা পর্য্যালোচনা ও ভারত সরকারের পক্ষ হইতে তথ্য অনুসন্ধানে প্রেরিত হন।

তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ, রিপণ কলেজ ও একাধিক স্কুল লাইব্রেরী প্রভৃতির পরিচালনার সমিতির সদস্য ছিলেন। সর্ব্বত্রই তিনি আন্তরিক নিষ্ঠার সহিত নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদনে নিরত থাকিতেন।

স্বনামধন্য সার তারকনাথ পালিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে যে বহু লক্ষ টাকা দান করেন, তাহার পশ্চাতেও দেব প্রসাদের চেষ্টা ছিল। তারকনাথের পুত্র সমুদয় অর্থ ও দলিলাদি মধুপুরে যাইয়া দেবপ্রসাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করিতে বলেন। তাঁহারই প্রধান চেষ্টায় মধুপুরে একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

সংস্কৃত ভাষা ও ভারতের প্রাচীন সাহিত্য আলোচনার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে, তিনি তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটিরই সহিত যোগ রক্ষা করিতেন। সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা যাহাতে দেশে প্রসারিত হয় তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ও যত্ন ছিল। নবদ্বীপ, ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিত মণ্ডলী কর্তৃক তিনি এজন্য উপাধি ভূষিত হন।

বিবিধ জনহিতকর কার্য্যের পুর-

স্বরূপ তিনি প্রথমে সি-আই-ই (C. I. E.) ও পরে সার (Knight) উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৯২১ খ্রীঃ অব্দে, ইয়োরোপে শিক্ষার্থী ভারতীয় ছাত্রগণের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার জন্য যে অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হয়, তিনি উহার একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং ঐ সমিতির কার্য্যোপলক্ষে, ইয়োরোপের নানাস্থানে গমন করেন। ১৯৩০ খ্রীঃ অব্দে তিনি জাতি সঙ্ঘে (League of Nations) ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

১৩৪২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে (১৯৩৫ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর) কলিকাতা নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দেববতী— রাণী দেববতী প্রাগ্জ্যোতিষপুরের পুষ্যবংশীয় নরপতি নারায়ণ বর্ম্মার মহিষী ছিলেন। পুষ্যবর্ম্মা ও নারায়ণবর্ম্মা দেখ।

দেবভঞ্জ—তিনি উড়িষ্যার ভঞ্জবংশীয় নরপতি। তাঁহার পিতার নাম অজ্ঞাত, সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী ভঞ্জ নরপতিদের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ তাহা নির্ণিত হয় নাই। দেবভঞ্জের পুত্র (প্রথম) রায়ভঞ্জ পৌত্র বীরভঞ্জ ও প্রপৌত্র দ্বিতীয় রায় ভঞ্জ। দ্বিতীয় রায় ভঞ্জের পুত্র জয়ভঞ্জ ও যশোভঞ্জ। ইহাদের পর এই বংশের বিবরণ অজ্ঞাত।

দেবন্ন ভট্ট—তিনি খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে 'স্মৃতিচন্দ্রিকা' নামে স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন।

দেবভদ্র সূরী—একজন জৈন সাহিত্যিক। তিনি ১১০৯ খ্রীঃ অব্দে (১১৬৫ সং) প্রাকৃত ভাষায় 'পার্শ্বনাথ চরিত্র' গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

দেবভূতি—মগধের শুঙ্গ বংশীয় শেষ নরপতি। তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বসুদেব তাঁহাকে হত্যা করিয়া, মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। (আনুমানিক ৭৩ খ্রীঃ পূঃ অব্দে)।

দেব মাণিক্য—তিনি ত্রিপুরাধিপতি ধন্য মাণিক্যের দ্বিতীয় পুত্র। ধন্য মাণিক্য ১৫১৫ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধ্বজ মাণিক্য রাজা হন। তিনি মাত্র সাত বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে,তাঁহার শিশু পুত্র ইন্দ্রমাণিক্যকে অপসারিত করিয়া দেব মাণিক্য রাজা হন (১৫২২ খ্রীঃ)। এই সময়ে বাঙ্গালার নবাব হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করিয়া,তিনবার বিফল মনোরথ হন, কিন্তু চতুর্থ বারে কৃতকার্য্য হইয়া চট্টগ্রাম অধিকার করেন। মিথিলাবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ নামক এক তান্ত্রিক সাধক রাজাকে তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার উপর এতদূর প্রভাব বিস্তার করেন যে, রাজা তাঁহার প্ররোচনায় আটজন

সেনাপতিকে বলি প্রদান করেন। ইহার কিছু পরেই তিনি রাজাকেও বধ করেন। এই দুষ্কর্ম্মের ফলে তিনি স্বয়ং সেনাপতিগণকর্ত্তৃক নিহত হন। দেব মাণিক্যের পরে তাঁহার পুত্র বিজয় মাণিক্য ১৫৩৫ খ্রীঃ অব্দে রাজা হইয়াছিলেন।

দেব মামলেদার—একজন মহারাষ্ট্রীয় সাধু পুরুষ। তাঁহার আসল নাম যশোবন্ত মহাদেব ভোসেকর। তিনি ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণবংশ সম্ভূত ছিলেন। দেবতার ন্যায় পবিত্র জীবন যাপন করিতেন বলিয়া, ইনি দেব মামলেদার নামে পরিচিত ছিলেন। মামলেদার বাঙ্গালা দেশের সব ডেপুটী কালেক্টারের পদ। বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত শোলাপুর জিলার ভোসে গ্রামে ১৮১৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধীর ও নম্র প্রকৃতি, পরদুঃখকাতর, উদার ও সদাচার সম্পন্ন ছিলেন। অল্পবয়সেই শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি মাত্র দশ টাকা বেতনে এক কেরাণীর কাজে নিযুক্ত হন। ক্রমে কর্ম্মনিপুণতা ও সততার বলে উন্নতি করিতে করিতে মামলেদারের পদ প্রাপ্ত হন। সাধু চরিত্র ও পরোপকারীতার জন্য তিনি আজীবন সকল সকল প্রকার লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করেন। তাঁহার গুণাবলী এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে একবার গোয়ালিয়রের মহারাজা তাঁহাকে বোম্বাই নগরে নিজ প্রাসাদে আমন্ত্রণ করিয়া প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করেন। আর একবার বোম্বাই প্রদেশের শাসনকর্ত্তাও তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া লাট ভবনে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করেন। বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় বিবিধ গুণালঙ্কৃত পুরুষ আমাদের দেশে অধিক জন্মগ্রহণ করে নাই। কুচক্রী লোকের চক্রান্তে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কখনও কাহারও প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন না। ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে নাসিক নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দেব রক্ষিত—তিনি পীঠীর (বর্ত্তমান গয়া) অধিপতি ছিলেন। বঙ্গের পাল বংশীয় নরপতি রামপালের মাতুল মহন দেব তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। দেব রক্ষিতকে স্বীয় ভাগিনের রামপালের পক্ষে রাখিবার জন্য স্বীয় কন্যা শঙ্করদেবীর সহিত, তাঁহার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করেন।

দেবরাজ—(১) মধ্যভারতের নারনৌল জিলার ধারসু গ্রামে তিনি ১৭৭১ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পূরণ ব্রাহ্মণ। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি আগ্রা গমন করেন। সেই সময়ে মাধবরাওসিন্ধিয়া আগ্রার রাজা ছিলেন। একটী চাকুরী তিনি গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি হিন্দু মুসলমান সর্ব্ব-

শ্রেণীর সাধুদের সহিত মিশিতেন। ৩৩ বৎসর বয়সে তিনি স্বীয় উদার মত প্রচারের সূচনা করেন। তিনি জাতি-ভেদ মানিতেন না। স্বয়ং ব্রাহ্মণ হইয়াও বৈশ্য কন্যাকে বিবাহ করেন। পর্দা প্রথার তিনি অতিশয় বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মতে ঈশ্বর এক ও অপরূপ, অপ্রতিম, সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য। তাঁহারা প্রতিমা,মূর্ত্তি,প্রতীক বা জাতি-ভেদ মানেন না। ধর্ম্মসাধনায় স্ত্রীলোক বা পুরুষ সকলেরই সমান অধিকার উপাসনায় সময়ে মেয়েরা সংগীত করেন। এই উদার মত দেশের লোকেরা তেমন উদারভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না। মারনৌলের অন্তর্গত ঝাঝরের নবাব নজাবত আলী তাঁহার এই অভিনব মত প্রচারের জন্য তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। দীর্ঘকাল তিনি কারাক্লেশ ভোগ করেন। অবশেষে ঝাঝর রাজ্যে গোল-মাল উপস্থিত হওয়ায়, সমস্ত কয়েদীরা মুক্তি লাভ করে। তৎপরে তিনি খেতরী জিলায় ছুরিণা গ্রামে যাইয়া বাস করেন। তথায় ৮১ বৎসর বয়সে ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন গঙ্গারাম। মেয়েরা পর্দা মানে না বলিয়া এই সম্প্রদায়কে নাংগীপন্থ বলে। ইহাদের মতবাদ বহু পরিমাণে বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপ।

দেবরাজ—(২) বরদাচার্য্য পুত্র দেব-রাজ। জ্যোতিষী তুলসরাজকৃত বাক্যামৃত গ্রন্থের তিনি এক টীকা রচনা করিয়াছেন।

দেবরাজ—(৩) একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত। তিনি মুহুর্ত্তপরীক্ষা নামক জ্যোতিষী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

দেবরাম—একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত তিনি মুহূর্ত্তমুক্তাবলী নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করেন।

দেবল— তিনি একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নমে দেবলসংহিতা। বরাহের বৃহৎ সংহিতার টীকাকার উৎপল ভট্ট স্বীয় রচিত গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

দেবলাদেবী—তিনি গুজরাটের অধি-পতি করণ রায়ের কন্যা। দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন খিলিজির ভ্রাতা আলফ খাঁ, গুজরাট জয় করিয়া, করণ রায়ের স্ত্রী কমলাদেবী ও কন্যা দেবলাদেবীকে বন্দী করিয়া, দিল্লীতে আনয়ন করেন। কমলাদেবীকে আলাউদ্দিন বিবাহ করেন। দেবলাদেবীকে তাঁহার পুত্র খিজির খাঁ বিবাহ করেন। খিজির খাঁ ও দেবলাদেবীর প্রণয় কাহিনী অতি বিচিত্র ঘটনা পূর্ণ। দেবলাদেবী তাঁহার মাতারই ন্যায় অতিশয় রূপবতী ছিলেন. খিজির খাঁর আকৃতি দেবলাদেবীর ভ্রাতার অনুরূপ ও প্রকৃতি অতি মধুর

ছিল। দেবলাদেবী অল্প বয়সেই বন্দিনী হইয়া পাঠান রাজঅন্তঃপুরে নীত হন। তাঁহাদের পরস্পরে দর্শনেই প্রণয়ের সঞ্চার হয়। আলাউদ্দিন তাঁহাদের বিবাহ অনুমোদন করেন। কিন্তু বয়স অল্প বলিয়া কিছুদিন বিবাহ স্থগিত থাকে। উভয়ে এক সঙ্গে খেলা ধূলায় ক্রীড়া কৌতুকে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। এই ভাবে তাঁহাদের প্রগাঢ় প্রণয়ের সঞ্চার হয়। খিজির খাঁর মাতার ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত খিজির খাঁর বিবাহ হয়। সেই জন্য তিনি দেবলাদেবীকে স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু প্রণয়ের প্রকৃতি স্রোতস্বিনীর ন্যায়। বাধা প্রাপ্ত হইলে উভয়েই কুল প্লাবিনী মূর্ত্তি ধারণ করেন। খিজির খাঁ দেবলাদেবীর জন্য অস্থির হইলেন। ইতিমধ্যে মাতার অনুরোধে তিনি মাতুল আলপ্ খাঁর কন্যাকেই বিবাহ করেন। বিবাহের পর তিনি দেবলাদেবী হইতে ভৎর্সনা পূর্ণ এক চিঠি প্রাপ্ত হন। ইহার পর তাঁহার মানসিক যন্ত্রণা অতিশয় বৃদ্ধি পায়। এমন কি তিনি পরিধেয় বস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিড়িয়া ফেলিতেন। মাতা পুত্রের এই অবস্থা দেখিয়া, দেবলাদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহের অনুমতি দিলেন। বিবাহে প্রণয়ী যুগল মিলিত হইয়া পরম সুখী হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের সুখের পথে আবার বিঘ্ন উপস্থিত হইল। সেনাপতি মালিক কাফুর অতিশয় ধূর্ত্ত ছিলেন। কৌশল পূর্ব্বক আলাউদ্দিন ও খিজির খাঁর মধ্যে বিবাদ উৎপাদন করেন। খিজির খাঁ যখন মিরাট অঞ্চলে ছিলেন, তখন হঠাৎ একদিন আলাউদ্দিনের চিঠি পাইলেন যে, খিজির খাঁ যেন বিনা অনুমতিতে রাজ সন্নিধানে উপস্থিত না হন, আর রাজ চিহ্ন স্বরূপ চন্দ্রাতপ, দুর্ব্বাস ও হস্তী যাহা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা যেন অবিলম্বে প্রত্যর্পণ করেন। খিজির খাঁ বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহিত ক্ষুব্ধহৃদয়ে তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন, এবং পিতৃ নির্দ্দেশে অমোরাহে বাস করিবার জন্য গঙ্গা উত্তীর্ণ হইলেন। এই নির্ব্বাসনে তিনি অতিশয় মনঃ কষ্টে যাপন করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং বিনা অনুমতিতেই পিতৃ সন্নিধানে উপস্থিত হন। মালিক কাফুরের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। আলাউদ্দিনের বিদ্বেষ খিজির খাঁর উপর বেশী করিয়া জন্মাইয়া দিলেন। গোয়ালিয়ারের ভীষণ দুর্গে খিজির খাঁ চিরতরে বন্দী হইলেন। দেবলাদেবী তাঁহার সঙ্গিনী হইলেন। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পরে মালিক কাফুর সম্বল নামক দুরাত্মা দ্বারা খিজির খাঁকে অন্ধ করেন। অবশিষ্ট জীবন এই কারাগারেই প্রণয়ী যুগলের অতিবাহিত হইতেছিল। এমন সময়ে মালিক কাফুরের মৃত্যুর পরে, কুতব-

উদ্দিন সম্রাট হইলেন। তিনি দেবলা-দেবীকে দিল্লীতে আনয়ন করিতে লোক প্রেরণ করিলেন। খিজির খাঁ অতিশয় ঘৃণাভরে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহাতে চরিত্র হীন কুতবউদ্দিন খাঁ অতি শয় ক্রুদ্ধ হইয়া সাদ্দ নামক দুরাত্মা দ্বারা তাহার হত্যা সম্পাদন করিলেন। দেবলাদেবী স্বামীকে রক্ষা করিতে যাইয়া নিজেও হত হইলেন।

দেবশক্তি বা দেবরাজ—তিনি ভিল্ল মালের গুর্জ্জর-প্রতীহার-বংশীয় নরপতি ককুস্থের ভ্রাতা। ককুস্থের পরে তিনি ভিল্লমালের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অতিশয় বিষ্ণু ভক্ত ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ভূয়িকা দেবী ছিল। দেব শক্তির পরে তাঁহার পুত্র বৎসরাজ রাজা হইয়া ছিলেন। বৎসরাজই উত্তরা পথ আক্রমণে অগ্রণী ছিলেন। বৎসরাজ ৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে (৭০৫ শকে) বর্ত্তমান ছিলেন।

দেবশর্ম্মা—তিনি কাশ্মীরের দিগ্বিজয়ী নরপতি ললিতাদিত্যের মন্ত্রী মিত্রশর্ম্মার পুত্র। তিনি ললিতাদিত্যের পৌত্র স্বনাম খ্যাত জয়াপীড়ের (৭৪৮-৭৮০ খ্রীঃ) মন্ত্রী ছিলেন। যতদিন মানব-জাতির সদ্‌গুণের প্রতি আদর থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত, প্রভুর হিতার্থে জীবন বিসর্জ্জনকারী এই মন্ত্রী দেবশর্ম্মার নাম সকলে ভক্তির সহিত স্মরণ না করিয়া পারিবে না। জয়াপীড় প্রথমে যখন রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া গৌড়েশ্বরের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন এই বিশ্বস্ত দেবশর্ম্মা, অনেক সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিলিত হন, এবং বলিতে কি একমাত্র তাঁহারই কার্য্য কুশলতায়, জয়াপীড় রাজ্য লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। আর একবার যখন জয়াপীড় নেপাল রাজ কর্ত্তৃক বন্দী হন, তখন দেব-শর্ম্মারই জীবন দানে তিনি জীবন লাভ করেন। দেবশর্ম্মা যখন জানিতে পারি-লেন তাঁহার প্রভু জয়াপীড় নেপালে বন্দী হইয়াছেন, তখন বিস্তর সৈন্য সংগ্রহ-পূর্ব্বক প্রভুর উদ্ধারার্থ নেপালে উপস্থিত হইলেন। কালগণ্ডী নদীর পশ্চিম তীরে শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক, তিনি নেপাল রাজকে সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি বিস্তর ধনরত্নের সহিত কাশ্মীর রাজ্য তাঁহাকে অর্পণ করিতে বাসনা করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিয়াছেন। নেপালরাজ ইহাতে অতিশয় আনন্দিত হইয়া, তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। তখন দেবশর্ম্মা বলিলেন—জয়াপীড় অনেক গুপ্তধনের বিষয় অবগত আছেন, একবার গোপনে তাঁহার সহিত দেখা করিয়া কৌশলে সেই খবর নেওয়া প্রয়োজন। নেপালরাজ ইহাতে সম্মত হইয়া, দেব-শর্ম্মাকে জয়াপীড়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দিলেন। দেবশর্ম্মা

কালগণ্ডী নদীর পূর্ব্ব পারস্থিত প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাসাদে জয়াপীড়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার উদ্ধারার্থ যে তিনি আসিয়াছেন তাহা জানাইয়া বলিলেন—আপনি এই গবাক্ষের ছিদ্র-পথ দিয়া নদীগর্ভে পতিত হউন এবং সন্তরণপূর্ব্বক নদী উত্তীর্ণ হউন। তথায় আপনার সৈন্যগণ অপেক্ষা করিতেছে। শুনিয়া রাজা বলিলেন—দৃঢ় চর্ম্মনির্ম্মিত ভেলার সাহায্য ব্যতীত মানুষ এত উচ্চ হইতে পড়িলে, জল হইতে সহজে উঠিতে পারে না। চর্ম্মভেলা পাইলেও তাহাতে কোন ফলোদয় হইবে না। কারণ এত উচ্চ স্থান হইতে পড়িলে চর্ম্মভেলা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, সুতরাং ইহা মুক্তির সদুপায় নহে। এত অপ-মানিত হইয়া শত্রুকে ধ্বংস না করিয়া, এইরূপে দেহত্যাগ করা আমার অভি-মত নহে। রাজার বাক্য শ্রবণে মন্ত্রী দেবশর্ম্মা স্থির বুদ্ধিতে কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া, রাজাকে বলিলেন--হে নরনাথ! আপনি এখন যে কোন উপায়ে গৃহের বাহিরে দুই দণ্ডকাল অবস্থান করুন। তাহার পরে গৃহে আসিয়া দেখিতে পাইবেন যে, আমি নদী পারের সদুপায় করিয়া রাখিয়াছি। তখন আপনি নির্ভয়ে পলায়ন করিবেন। মন্ত্রীর বাক্যে তিনি বাহিরে শৌচাগারে দুই দণ্ড যাপন করিয়া, গৃহে প্রত্যাগত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে স্তম্ভিত হইলেন। দেখিলেন মন্ত্রী দৃঢ় বস্ত্র খণ্ড দ্বারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এবং স্বীয় নখাগ্রভাগ দ্বারা বিদারিত শরীরের শোণিতে এই কথা কয়টি লিখিয়া রাখিয়াছেন--হে রাজন! আমি এইমাত্র মরিয়াছি, আমার দেহ এখনও বায়ুপূর্ণ আছে, সুতরাং আমার দেহ অতি দৃঢ় চর্ম্মভেলার কাজ করিবে। আমার শরীরে আরোহণপূর্ব্বক নদী পার হউন। আরোহণকারী দৃঢ় বন্ধনের জন্য আমার দীর্ঘ উষ্ণিষ রহিল। রাজা ইহা পাঠ করিয়া প্রথমে বিস্ময়ে ও স্নেহে অভিভূত হইলেন, পরে সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক মৃতদেহের সাহায্যে নদী উত্তীর্ণ হইয়া, স্বীয় সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইলেন। বলাবাহুল্য নেপাল রাজ অরমুড়ি, জয়াপীড়ের পলায়ন ব্যাপার অবগত হইবার পূর্ব্বেই জয়াপীড় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পরাজিত হইলেন।

দেবসিংহ দেব— তিনি মিথিলার অধিপতি ভবসিংহ দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম হাসিনী দেবী। তাঁহারই আদেশে কবি বিদ্যাপতি 'ভূপরিক্রমণ' রচনা করিয়াছিলেন। দেবসিংহের আদেশে শ্রীদত্ত একাগ্নি দান পদ্ধতি নামক স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিত হরিহর তাঁহার প্রধান বিচারপতি

ছিলেন। রাজা দেবসিংহ ব্রাহ্মণগণকে বিস্তর দান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রথ ও সুবর্ণ নির্ম্মিত হস্তী উল্লেখ যোগ্য। তিনি তুলাপুরুষ মহাদান করিয়াছিলেন। ১৪১৩ খ্রীঃ অব্দে (১৩৩৪ শকে) দেবসিংহের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র শিব সিংহ মিথিলার রাজা হইয়াছিলেন।

দেব সেনাচার্য্য—তিনি জৈন দিগম্বর সম্প্রদায় ভুক্ত একজন দার্শনিক পণ্ডিত। 'দর্শন সার' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

দেবস্বামী—তিনি একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার। তাঁহার রচিত একখানা জাতক আছে। বরাহ মিহিরের বৃহজ্জাতকে তাঁহার বিষয় উল্লেখ আছে।

দেবাচার্য্য—তাঁহার জন্ম স্থান উড়িষ্যার দক্ষিণবর্ত্তী তৈলঙ্গদেশ। তাঁহার গুরু কৃপাচার্য্য ছিলেন। বেদান্ত পারিজাতের উপর 'সিদ্ধান্ত জাহ্নবী' নাম্নী তাঁহার বৃত্তি বিশেষ প্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ তিনি ১২শ ও ১৩শ খ্রীঃ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন।

দেবাদিত্য—তিনি মিথিলার রাজা হরসিংহ দেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পুত্র বীরেশ্বর ও পৌত্র চণ্ডেশ্বরও হরসিংহ দেবের মন্ত্রী ছিলেন। দেবাদিত্যের অপর পুত্র 'সুগতি সোপান' নামক গ্রন্থের রচয়িতা গণেশ্বরও কিছুকাল মন্ত্রী ছিলেন। চণ্ডেশ্বর প্রভুর জন্ত নেপাল জয় করিয়াছিলেন।

দেবানন্দ—(১) তিনি উড়িষ্যার নন্দবংশীয় নরপতি শিবনন্দের পুত্র পরানন্দের পৌত্র ও জয়ানন্দের প্রপৌত্র। তাঁহার অন্ত নাম বিলাসতুঙ্গ বা ধ্রুবানন্দ। তিনি ৯১৮ খ্রীঃ অব্দে একখানা তাম্র পত্র দ্বারা ভট্টনামা এক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। জয়ানন্দ দেখ।

দেবানন্দ—(২) তিনি একজন বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। তাঁহার রচিত কতিপয় পদ পাওয়া গিয়াছে।

দেবানন্দ—(৩) তিনি একজন মৈথিল কবি। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—উষাহরণ (নাটক)। মৈথিল কবি হর্ষনাথ ঝারও উষাহরণ নামে একখানা নাটক আছে।

দেবানন্দ খাঁ, রাজা—প্রাচীন ভুলুয়া রাজ্যের (বর্ত্তমান নোয়াখালী) প্রতিষ্ঠাতা রাজা বিশ্বম্ভর শূরের প্রপৌত্র। তাঁহার প্রপৌত্র রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য একজন বিখ্যাত বীর ছিলেন। তাঁহারা ত্রিপুরার সামন্ত নরপতি ছিলেন।

দেবী—অবন্তী দেশে অবস্থান কালে মৌর্য্য ভূপতি অশোক দেবী নাম্নী এক শ্রেষ্ঠীকন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা জন্মগ্রহণ করেন। দেবী ও তাঁহার পুত্র কন্যাদ্বয় বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দেবীলাল—(১) তিনি সূর্য্য সিদ্ধান্তের উপর ১৩৪২ শকে (১৪২০ খ্রীঃ) এক টীকা লিখিয়াছেন। তাঁহার টীকার নাম

আড়ন। তিনি পুরুষোত্তমবাসী ছিলেন। তাঁহার উড়িয়া অক্ষরে লিখিত একখানা অসম্পূর্ণ টীকা পাওয়া গিয়াছে। শ্রীপতি কৃত জাতক পদ্ধতির উপর তাঁহার এক টীকা আছে। তিনি ভাস্করের লীলাবতীর উপর লীলাবতী বিলাস নামে এক টীকা রচনা করিয়াছেন।

দেবীদাস—(২) তিনি একজন বৈষ্ণব কবি। তাঁহার রচিত রাধিকার চৌতিশা নামক এক পুস্তিকা পাওয়া গিয়াছে।

দেবীদাস পণ্ডিত—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—'কর্ম্মবিপাক চিকিৎসামৃত সাগর'।

দেবীদাস মুখোপাধ্যায়—তাঁহার জন্মস্থান নদিয়া জিলার মুড়াগাছা গ্রাম। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি হিজলী নামক মহালের দেওয়ান ছিলেন। এই কার্য্যে থাকিয়া তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। তদনুরূপ সৎকার্য্যও তিনি করিয়াছেন। তিনি সজ্জনসেবী ও আত্মীয় পোষক ছিলেন। তিনি গ্রামে সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর ও শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

দেবীদাস রায়, রাজা—তিনি পাবনা জিলার ছাতক নামক স্থানের একজন প্রাচীন জমিদার। তাঁহার অন্য নাম ঠাকুর কুশলী। তিনি কুলীন ভঙ্গে কাপ হইয়াছিলেন। তিনি ষোড়শ খ্রীঃ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন। কোন কারণে তদানীন্তন বাঙ্গালার নবাব তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁহাকে দমন করিবার জন্য ওমর নামে একজন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। রাজার আঠার পুত্র ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কার্ত্তিক রায় তিন দিন নগর রক্ষা করিয়া যুদ্ধে নিহত হইলেন। পুর মহিলারা বিষ পানে আত্মবিসর্জ্জন করিল। রাজ পুত্রদের মধ্যে ঠাকুর কেশরনাথ রায় ও কাশীনাথ রায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা বর্ত্তমান পাবনা জিলার আমীনপুরের মিয়া বংশে ও ঢাকা জিলার এলাচিপুরের মিয়া বংশ। রাজ ভক্ত ভোলা নাপিত আপন তিন পুত্রকে রাজ পুত্র পরিচয়ে সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করিয়া তিন রাজ পুত্রের জীবন বাঁচাইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম ঠাকুর কালিদাস, ঠাকুর চণ্ডীদাস ও ঠাকুর নরোত্তম। সমস্ত কালিয়াই বংশ তাঁহাদেরই সন্তান।

দেবীদাস সেন—তাঁহার রচিত 'শ্রীমন্তের চৌতিশা' নামক একটী ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাওয়া গিয়াছে।

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী—খ্যাতনামা বাঙ্গালী সাহিত্যব্রতী। ১২৬০ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে (১৮৫৪ খ্রীঃ জানুয়ারী) বরিশাল জিলার অন্তর্গত কালীপুর গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামচন্দ্র রায়

চৌধুরী। তাঁহারা বসুপদবীধারী বঙ্গজ কায়স্থ। ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত উলপুরে তাঁহাদের পৈতৃক নিবাস। গ্রামের পাঠশালায় তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধির পর তিনি কলিকাতায় আনীত হন এবং ভবানীপুর অঞ্চলের একাধিক বিদ্যালয়ে ক্রমে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিয়া, চারি বৎসর মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু মস্তিষ্কের পীড়ার জন্য উহা ত্যাগ করিতে হয়।

পঠদ্দশায় তিনি ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ক্রমে ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করেন। ঐ সময়েই তিনি সাহিত্য সেবা আরম্ভ করেন। তিনি আরও কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া, ভারত সুহৃদ নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিছুকাল পরে উহা বন্ধ হইয়া যায়। ১২৯০ বঙ্গাব্দ হইতে তিনি 'নব্যভারত' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ঐ পত্রিকাখানি তাঁহার নিষ্ঠা ও যত্নে সুদীর্ঘকাল নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎকালীন বহু খ্যাতনামা লেখক ও মনীষীর রচনাতে নব্যভারতের পৃষ্ঠা শোভিত থাকিত। তিনি উহাতে গল্প বা উপন্যাস কখনও প্রকাশ করিতেন না। ইহাই নব্যভারতের এক বিশেষত্ব ছিল। ব্যবসাদারীর খাতিরে নিম্নরুচীর বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া, লাভবান হইবার চেষ্টা করিতেন না। নানা বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া সুদীর্ঘ আটত্রিশ বৎসরকাল তিনি নব্যভারত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরও কয়েক বৎসর উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। নব্যভারত মুদ্রণের জন্য তিনি একটি মুদ্রাযন্ত্রও স্থাপন করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইনের জন্য যখন তাঁহাকে জামীন দিতে বলা হয়, তখন তিনি উহা বন্ধ করিয়া দেন। দেবীপ্রসন্ন প্রথমাবধি পরার্থপর ছিলেন। নিজের আত্মীয় স্বজন ভিন্ন দীর্ঘকাল বহু দুস্থ বালকবালিকাকে গৃহে স্থান দান করিয়া, সন্তানবৎ লালন পালন করেন। অনেক বালিকাকে নিজ ব্যয়ে বিবাহ দেন। নিজে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্ম হইলেও ব্রাহ্মসমাজের দোষ ত্রুটী কখনও প্রদর্শন করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। সমাজের কোনও গলদ তাঁহার গোচরে আসিলে, নির্ভীকভাবে নিজ পত্রিকায় তাহার সমালোচনা করিতেন। এজন্য ব্রাহ্মসমাজের অনেকে তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। ১৩২৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে (১৯২০ খ্রীঃ অক্টোবর) কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

দেবীপ্রসাদ দাস—শ্রীহট্টের অন্তর্গত জৈনপুর নিবাসী দেবীপ্রসাদ কর্তৃক গোটাটিকর নামক স্থানে শ্রীবাপীঠ

আবিষ্কৃত হয়। তিনি উক্ত পীঠস্থান প্রাচীর বেষ্টিতও করিয়া দেন।

দেবীপ্রসাদ মুন্‌সী—তাঁহার জন্মস্থান শ্রীহট্ট সহরের নিকটবর্ত্তী আখালিয়া গ্রাম। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মুন্‌সী ছিলেন। তিনি অনেকগুলি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি পলি-গ্লট গ্রামার (Polyglot Grammar) নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে ইংরেজী, সংস্কৃত, আরবী, ফারসী বাঙ্গালা, হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষার সমাবেশ ছিল।

দেবীপ্রসাদ শুকুল— একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত তিনি যোগদীপিকা নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন।

দেবীবর ঘটক, বন্দ্যোপাধ্যায়—তিনি রাঢ়ীশ্রেণীর মেলবন্ধন কর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার পিতার নাম সর্ব্বানন্দ ঘটক। বল্লাস সেন রাঢ়ীশ্রেণীর পঞ্চ গোত্র হইতে ১৯জনকে কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রদান করেন। কালক্রমে এই কুলীন ব্রাহ্মণদের বংশধর অনেকে নানা দোষ প্রাপ্ত হন। দোষাণাং মেলনং মেলঃ। সেই সময়ে দেবীবর ঘটক মেল বন্ধন করেন। প্রধান মেল চারিটী—খড়দহ ফুলিয়া,, সর্ব্বানন্দী ও বল্লভী। দোষ না হইলে মেলোৎপত্তি হয় না। দোষ দুই প্রকার—মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য দোষের মার্জ্জন হয় না। গৌণ দোষ তিনটী কি চারিটী পর্য্যন্ত মার্জ্জন হয়। এই মেল বন্ধনেরর ফলে কুলীন সন্তানকে শতাধিক বিবাহ করিয়া শ্বশুর বাড়ীতে স্ত্রীকে রাখিয়া দিতে হইত। অপরদিকে শ্রোত্রীয় অনেকে কন্যাভাবে বিবাহ করিতে পারিত না। অথবা অত্যধিক পণ দিয়া কন্যা সংগ্রহ করিতে হইত। এই মেল বন্ধনের ফলে সমাজে অনেক দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছিল। দেবীবরের রচিত 'মেলবন্ধন' ও 'ভাগ-ভাবাদি নির্ণয়' নামে দুইখানি গ্রন্থ আছে। অনুমান চারিশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

দেবীবল্লভ শ্রীচন্দন পাল, রাজা—তিনি মেদিনীপুরের অন্তর্গত নারায়ণ গড়ের রাজা নারায়ণ বল্লভ শ্রীবল্লভ পাল মহাশয়ের পুত্র। তিনি ১৩১৩ খ্রীঃ হইতে ১৩২৯ খ্রীঃঅব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার পিতা, বিনায়ক নামে খয়রা জাতীয় যে দস্যু সর্দ্দারকে বশী-ভূত করিয়া সমস্ত খয়রা জাতীকে কৃষক শ্রেণীতে পরিণত করিয়াছিলেন, তিনি সেই বিনায়ককে অতিশয় ভাল বাসি-তেন। তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য বিনয়গড় নামে একটী দুর্গ স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র হৃদয় বল্লভ ১৩২৯ হইতে ১৩৪৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। গন্ধর্ব্ব শ্রীচন্দন পাল, রাজা দেখ।

দেবী সিংহ—ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ সময়কার একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্ম-

সম্পূর্ণরূপে অপারগ হইলেও, পূর্ণিয়ার দেবী সিংহের অত্যাচরের কথা স্মরণ করিয়া, জমিদারগণ যথাসাধ্য বর্দ্ধিত হারে রাজস্ব দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবী সিংহ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, অধিকতর অর্থ লাভের জন্য নিত্য নূতন অত্যাচারের পন্থা আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রজারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। চারিদিকে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্য প্রেরিত হইলে, কিছুকালের জন্য বিদ্রোহ শান্ত হইল। তদুপরি গুডল্যাড সাহেব প্রজাদিগকে দেবী সিংহের অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় সেইবারের মত সব থামিয়া গেল। অতঃপর বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য, এক সমিতি গঠিত হইল। হেষ্টিংস ঐ সমিতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া, আর একটি নূতন সমিতি স্থাপন করিলেন। ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে ঐ সমিতির মন্তব্য প্রকাশিত হয়। তৎপূর্ব্বেই ১৭৮৫ খ্রীঃ অব্দে হেষ্টিংস এদেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সমিতি বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে দেবী সিংহকে নির্দ্দোষ বলেন। কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ এক কর্ম্মচারী হররাম এক বৎসরের কারাদণ্ড লাভ করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস (Lord Cornwallis) তখন বড়লাট ছিলেন। তিনি দেবী সিংহকে সরকারী কাজ হইতে মুক্তি প্রদান করিলে তাঁহার কর্ম্মজীবন শেষ হইল। অতঃপর জীবনের অবশিষ্টকাল তিনি প্রচুর ধন সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, নশীপুরেই অবস্থান করিতে থাকেন। ১৮০৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহা হইতেই ধরিতে গেলে নশীপুরের বর্ত্তমান রাজবংশ আরম্ভ হয়। তাঁহার নিজের কোনও সন্তান না থাকাতে, তিনি অনুজপুত্র বলবন্ত সিংহকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর বলবন্ত সিংহই সম্পত্তির অধিকারী হন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষি—কলিকাতা যোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশীয় ভূম্যধিকারী ও ব্যবসায়ী প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, এবং স্বনামখ্যাত ধর্ম্মনেতা ও সাধক (দ্বারকানাথ ঠাকুর দ্রষ্টব্য)। ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে (১২২৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ) পৈত্রিক বাসভবনে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ।

তাঁহার বাল্যকালের বিবরণ বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। তৎকালে প্রচলিত ব্যবস্থায় গৃহ শিক্ষকের নিকটেই তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন, এবং কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন।

তাঁহার পিতা রাজা রামমোহন রায়ের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। সেইজন্য বালক দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের সংস্পর্শে আসিবার বিশেষ সৌভাগ্য লাভ করেন। তদ্ভিন্ন তিনি নিজেও বাল্যকাল হইতে চিন্তাশীল ও ধীর প্রকৃতির ছিলেন। রাজোচিত বিলাস ব্যসনের মধ্যে লালিত পালিত হইয়াও কোনওরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহার জীবনকে কলঙ্কিত করেন নাই। কৌলিক প্রথানুযায়ী ষোল বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়।

তাঁহার আঠার বৎসর বয়ক্রমকালে, তাঁহার পিতামহীর মৃত্যু হয়। তিনি শ্মশান ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। সেইখানে তাঁহার মনে যে, এক অভূতপূর্ব্ব ভাব উপস্থিত হয়, তাহার প্রভাব অতি গভীর ভাবে তাঁহার জীবনের উপর পতিত হয় এবং তৎফলে তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। পূর্ব্ব হইতেই তিনি চিন্তাশীল ও জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। এখন হইতে তাঁহার মনে নানারূপ ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্ন উঠিতে লাগিল এবং সেই সকল প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য তিনি নানাবিধ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম্ম ও দার্শনিক গ্রন্থ সকল গভীর ভাবে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ঈশোপনিষদের একটি ছিন্ন পত্র, দৈবচালিত রূপে তাঁহার গোচরে উপস্থিত হয়। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ঐ পত্রোদ্ধৃত শ্লোকটির অর্থ বোঝাইয়া দিলে, দেবেন্দ্রনাথ যেন নূতন আলোকের সন্ধান পাইলেন। তদবধি বিষয় স্পৃহা তাঁহার ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল এবং ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

নিজে ধর্ম্মের মধুরতত্ব সকল লাভ করিয়া তৃপ্ত হইলেন না। অপরকেও তাহা পরিবেশন করিতে ব্যগ্র হইলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে, ধর্ম্মপিপাসু বন্ধুগণকে লইয়া উৎকৃষ্ট তত্ব সকল আলোচনা করিবার জন্য তত্বরঞ্জিনী সভা নামে একটি সভা স্থাপন করিলেন। পরে উহার নাম তত্ববোধিনী সভা হয়। বাঙ্গালা দেশের ধর্ম্মতত্ব আলোচনার ইতিহাসে এই তত্ববোধিনী সভা অতি প্রধান স্থান অধিকার করে। "সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার" উহার উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমে দশজন মাত্র সভ্য লইয়া ঐ সভা আরম্ভ হয়। তৎকালীন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মনস্বী এই তত্ববোধিনী সভার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম প্রদত্ত হইল —পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; রাজনারায়ণ বসু; তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী; রামগোপাল ঘোষ; রাজেন্দ্রলাল মিত্র; কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত; ভূদেব মুখোপাধ্যায়; ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়;

গঙ্গাচরণ সরকার; রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়; রামতনু লাহিড়ী; ব্যবস্থাদর্পণ প্রণেতা শ্যামাচরণ সরকার; বর্দ্ধমানের মহারাজা মহাতাপচাঁদ বাহাদুর; নদীয়ার মহারাজা শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুর; উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়; মহারাজা রমানাথ ঠাকুর; ব্রজসুন্দর মিত্র; শিবচন্দ্র দেব; শম্ভুনাথ পণ্ডিত; দিগম্বর মিত্র; ভূকৈলাসের রাজা সত্যচরণ ঘোষাল ও রাজা সত্যশরণ ঘোষাল; মদনমোহন তর্কালঙ্কার; বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার; প্যারীচাঁদ মিত্র; কিশোরীচাঁদ মিত্র; কাশীপ্রসাদ ঘোষ; হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মধুসূদন দত্ত। এক সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্যদের সংখ্যা চারিশতেরও অধিক হইয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথের বাসভবনেরই নীচের তলার এক ঘরে উহার অধিবেশন হইত। প্রতি সভ্যকে আপনাপন আয়ের চৌষট্টি অংশ সভাকে দান করিতে হইত। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ঐ সভার অধিবেশনগুলিতে আচার্য্যের পদ গ্রহণ করিতেন। তিনি উপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্যার দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন। অন্যান্য সভ্যেরা সময়ে সময়ে বক্তৃতা করিতেন। ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে (১৭৬২ শকে) ঐ সভা হইতে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হয়। মনস্বী অক্ষয়কুমার দত্ত ঐ পাঠশালায় ভূগোল ও পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন। তদ্ভিন্ন ঐ সভা হইতে পাঁচশত সংখ্যা কঠোপনিষদ মুদ্রিত হয়। ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দে বিশেষ সমারোহ সহকারে উহার বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়। উহাতে কুড়িজন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করেন। তৎপর দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিশেষে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপনিষদের ব্যাখ্যান করেন। ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে (১৭৬৫ শক ভাদ্র) তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র স্বরূপ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। অক্ষয়কুমার উহার প্রথম সম্পাদক হন। তিনি ঐ পত্রিকার সম্পাদন কার্য্যকে এক পবিত্র তপস্যার ন্যায় জ্ঞান করিয়া নিজের সকলপ্রকার শক্তি উহার উন্নতি কল্পে প্রয়োগ করেন। ঐ বৎসরই তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা কলিকাতা হইতে হুগলী জিলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া গ্রামে উঠিয়া যায়। কলিকাতায় সকাল ৯টা পর্য্যন্ত পাঠশালা বসিত। ঐ সময় পর্য্যন্ত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পড়ান হইত। তাহার পর ঐ পাঠশালায় ছাত্রেরা ইংরেজি বিদ্যালয়ে গমন করিত। এই ব্যবস্থায় পাঠশালায় ক্রমে ছাত্রাভাব ঘটিতে থাকায় উহা স্থানান্তরিত হয়। ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণী হইতে জানা যায় যে পাঠশালার ছয়টি শ্রেণীতে মোট একশত

সাতাইশ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত। ব্যাকরণ, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় ছাত্রদের পাঠ্য ছিল। ইংরেজিও পড়ান হইত।

এই তত্ত্ববোধিনী সভার অস্তিত্বের সময়েই ব্রহ্মসভা নামে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠান-দ্বয়ের মধ্যে কোনওরূপ বিরোধ ছিল না। কিছুকাল পরে দুইটি পৃথক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রাখা বিশেষ আবশ্যক বোধ না হওয়াতে ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে উভয় প্রতিষ্ঠান একীভূত হইয়া যায়। তদবধি ব্রহ্মসভার আর পৃথক অস্তিত্ব রহিল না। তখনও "ব্রাহ্মধর্ম্ম" বলিয়া কোনও কথা প্রচলিত ছিল না। তত্ত্ববোধিনী সভা অথবা ব্রহ্মসভা কর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্মের নাম ছিল "বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম"। ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে (১২৫০ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ) দেবেন্দ্র-ও তাঁহার কুড়িজন বন্ধু আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যথাবিধি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তদবধি তিনি নিজ জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য নিজের সর্ব্ব প্রকার শক্তি নিয়োজিত করেন। রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজে পরব্রহ্মের পূজার প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ তাহা অনেক পরিমাণে মার্জ্জিত, সুসংস্কৃত ও উন্নত করেন। বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে ব্রাহ্ম-মতবাদক শ্লোকাবলী সংগ্রহ করিয়া "ব্রাহ্মধর্ম্ম" নামে একখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষা দানের প্রণালী সুনিবদ্ধ করেন। এইরূপ নানা ভাবে তিনি ব্রাহ্মমতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দের মধ্যভাগে তাঁহাদেরই এক কর্ম্মচারীর নাবালক ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ আলেকজাণ্ডার ডাফ (Alexander Duff) নামক প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মযাজকের নিকট খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ইহাতে চারিদিকে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ অনাচার ঘটিতে না পারে তজ্জন্য তৎকালীন কলিকাতার প্রায় সমুদয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া "হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়" নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। দেবেন্দ্রনাথ উহার প্রথম কার্য্যাধ্যক্ষ মনোনীত হন। ঐ বিদ্যালয়টি দুই বৎসর পরে উঠিয়া যায়। এই সময়েই তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত খ্রীষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকদিগের ধর্ম্মমত লইয়া ঘোরতর বিতর্ক আরম্ভ হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে এই সূত্রে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহার অধিকাংশই পত্রিকা সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা।

পরবর্ত্তী বৎসর দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। তাঁহার শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত

হইলে, কি প্রণালীতে শ্রাদ্ধ হইবে তাহা লইয়া বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইল। আত্মীয়-স্বজনগণ দেশ প্রচলিত প্রথায় দ্বারকানাথের পদোচিত সমারোহের সহিত শ্রাদ্ধ করিতে পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ নিজ ধর্ম্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধমতে শ্রাদ্ধ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি সর্ব্বপ্রকার পৌত্তলিক আচার ব্যবহার বর্জ্জন করিয়া নিজ উদ্ভাবিত প্রথায় শ্রাদ্ধ সম্পাদন করেন। তাঁহার এই আচরণে আত্মীয় স্বজনগণ অনেকে বিরক্ত হইয়া তাঁহার সংশ্রব পরিত্যাগ করেন।

দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর দেখা যায় যে তিনি যেরূপ লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ প্রভূত ঋণ রখিয়া গিয়াছেন। দেনা পাওনা হিসাব করিয়া দেখা গেল যে সমুদায় ঋণের পরিমাণ এক কোটী টাকা, পাওনার পরিমাণ সত্তর লক্ষ টাকা। দ্বারকানাথ মৃত্যুর পূর্ব্বে অনেক লক্ষ টাকার সম্পত্তি "ন্যাসসম্পত্তি" (Trust Property) রূপে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ সকল সম্পত্তির উপর পাওনাদারদের কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ পিতৃ ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য সেই সকল সম্পত্তিও মহাজনদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত হন। তাঁহার এতাদৃশ সাধুতা এবং স্থির বৈরাগ্যে মহাজনগণ মুগ্ধ হন। পরিশেষে, তাঁহাদিগকে সম্পত্তিচ্যুত না করিয়াও পাওনাদারদের প্রাপ্য মিটাইবার এক ব্যবস্থা হইলে তাঁহারা তাহাতে সম্মত হইলেন। এই পিতৃঋণ পরিশোধ উপলক্ষে দেবেন্দ্রনাথ যে নিস্পৃহতা ও সত্যবাদিতার পরিচয় প্রদান করেন তাহা জগতের ইতিহাসে দুর্ল্ভ।

বর্দ্ধমানের মহারাজা মহাতাপচাঁদ ও নদীয়ার মহারাজা শ্রীশচন্দ্র রায়ের সহিত দেবেন্দ্রনাথেব বিশেষ সম্প্রীতি হয়। দেবেন্দ্রনাথেব ধর্ম্ম জীবনের প্রভাব তাহাদেব জীবনেও পড়িয়াছিল। উভয়েই ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি অনুরক্ত হন। বর্দ্ধমানের মহারাজার অনুরোধে দেবেন্দ্রনাথ তিনজন ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে বর্দ্ধমানে প্রেরণ করেন এবং বর্দ্ধমানে এক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণনগরেও তদ্রূপ মহারাজের উৎসাহে ব্রহ্মমন্দিরেব প্রতিষ্ঠা হয়। মহারাজা তাহার জন্য অর্থ সাহায্য করেন। ঐ সকল ভিন্ন আরও বহু স্থানে যে সকল ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়, দেবেন্দ্রনাথ তাহাদের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের জন্য প্রভূত অর্থ দান করেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশন' (Bengal Land holder's Association), এবং জর্জ টমসন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি মিলিত হইয়া

১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে যখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন (British Indian Association) প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন দেবেন্দ্রনাথ উহার প্রথম কার্য্যাধ্যক্ষ (Secretary) নিযুক্ত হন। দেশের সর্ব্ব প্রকার মঙ্গলকর কার্য্যের সহিত তাঁহার বিশেষ যোগ ছিল। সমুদয় সৎকাজেই তিনি যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিতেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তনে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। বীটন (Bethune) সাহেবের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনীকে তথায় ভর্ত্তি করিয়া দেন। দেশের রাজনীতিক আন্দোলনের সহিত তাঁহার বিশেষ যোগ ছিল এবং তিনি নানা রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের অর্থ সাহায্য করিতেন।

তত্ত্ববোধিনী সভার পক্ষ যে 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম' প্রচারের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার নাম পরে পরিবর্ত্তন করিয়া "ব্রাহ্মধর্ম্ম" কথাটি ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করে। ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দ হইতে এই পরিবর্ত্তনের জন্য অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বসু বিশেষ ভাবে দায়ী ছিলেন। তাঁহারাই প্রধানতঃ বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট কি না তাহা লইয়া বিতর্ক উপস্থিত করেন এবং তাহারই ফলে ঐ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

বাঙ্গালা দেশে বেদ-চর্চ্চার পুনঃ প্রচলনের জন্য দেবেন্দ্র ঠাকুরের বিশেষ কৃতীত্ব ছিল। ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে একজনকে এবং তাহার পরবর্ত্তী বৎসর আরও তিনজন ছাত্রকে বেদ পড়িবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে কাশী প্রেরণ করেন। ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে বেদতত্ত্ব সম্যক রূপে অনুধাবন করিবার জন্য তিনি স্বয়ং লালা হাজারীলাল নামক একজন বিহারী যুবককে সঙ্গে লইয়া চৌদ্দ দিনে কাশী যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বাষ্পীয়-যান প্রবর্ত্তিত হয় নাই। পাল্কীর ডাকে তাঁহাকে যাইত হইয়াছিল। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি কাশীর প্রধান প্রধান বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের লইয়া এক সভা আহ্বান করিলেন। সেই সভায় ব্রাহ্মণগণ তাঁহার অনুরোধে চতুর্ব্বেদ পাঠ করিলেন। অতঃপর বেদ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের সহিত আরও আলোচনা ও অনুসন্ধানাদির পর তিনি কতিপয় স্থান ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আসিবার সময়ে, বেদ অধ্যয়নের জন্য প্রেরিত পূর্ব্বোক্ত ছাত্রগণের মধ্যে আনন্দচন্দ্রকে তিনি সঙ্গে লইয়া আসেন। পরে আনন্দচন্দ্র, "বেদান্তবাগীশ" উপাধি লাভ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম উপাচার্য্য নিযুক্ত হন।

কাশীতে যাইয়া বেদ সম্বন্ধে তিনি যে জ্ঞান অর্জ্জন করেন, তাহাতে তিনি বেদের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ

কৃতিতে উৎসাহী হন। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে (১৭৬৯ শকের ফাল্গুন) তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় এবং ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত উহার প্রকাশ চলিয়াছিল। স্বভাব সুলভ আত্মগোপন স্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি এই কার্য্যে তাঁহার কৃতীত্বের কথা আদৌ প্রকাশ করেন নাই।

১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দ হইতে কয়েক বৎসর দেবেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কলিকাতায় থাকিয়া ধর্ম্ম তত্ত্বালোচনা ও আবশ্যক মত বিষয় কর্ম্ম পরিদর্শন করিতেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন এবং ব্রহ্মদেশের মৌলমেন পর্য্যন্তও সমুদ্রপথে গমন করেন। এই সকল ভ্রমণের সময়েই একবার নৌকায় দামোদর বাহিয়া বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত গমন করেন এবং বর্দ্ধমানে মহারাজা মহাতাপচাঁদের সহিত আলাপ ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ভ্রমণ করিবার জন্য জলপথে যাত্রা করিলেন। উত্তর পশ্চিম ভারতের প্রধান প্রধান স্থান পরিদর্শন করিয়া তিনি সিমলায় উপস্থিত হন। সিমলা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী নানা স্থানে তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্ভোগ ও ধ্যান ধারণায় অতিবাহিত করেন। ঐ সময়ের মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় কিছুকাল তাঁহাকে সিমলা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইয়া থাকিতে হয়। এই সুদীর্ঘকাল হিমালয়ের নির্জ্জনতার মধ্যে বাস করিয়া ধ্যান ধারণার দ্বারা তিনি ধর্ম্মের অনেক গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করেন। এই অভিজ্ঞতা লব্ধ তত্ত্ব সমূহ তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে মহৎ ফল প্রসব করে। দুই বৎসরেরও অধিককাল পরে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ইহার পরে কেশবচন্দ্রের সহিত দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় এবং কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারে দেবেন্দ্রনাথের একজন প্রধান সহায়ক হইয়া উঠেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে কেশবচন্দ্রের পরামর্শে উচ্চ শিক্ষিত যুবকদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবাব জন্য দেবেন্দ্রনাথ "ব্রহ্ম বিদ্যালয়" স্থাপন করেন। প্রতি রবিবার প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ঐ বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম উপদেশ দেওয়া হইত। প্রথমে সিন্দুরিয়াপটির গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে উহার অধিবেশন হইত। পরে চীৎপুরস্থ আদি ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতলে উহার কাজ চলিত। ঐ বিদ্যালয়ে দেবেন্দ্রনাথ যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন সেইগুলি "ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। সিমলা পাহাড়ে যাইবার পূর্ব্বেও তাঁহাদের যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে কৌলিক প্রথানুযায়ী পূজা

হইত। সিমলা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেবেন্দ্রনাথ উহা বন্ধ করিয়া দেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দেরই পূজার বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র ও নিজ মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথকে লইয়া সিংহল ভ্রমণে গমন করেন। সেই বৎসরই তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রহ্মসভার সহিত একীভূত হইয়া যায়। পরবর্ত্তী বৎসর চুঁচুড়া ও ভবানীপুরে ব্রহ্মবিত্তালয়ের শাখা স্থাপিত হয়। পূর্ব্বেই ভবানীপুরে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল (১৮৫২ খ্রীঃ)। শম্ভুনাথ পণ্ডিত, কাশীশ্বর মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ঐ সমাজ স্থাপনে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। সিমলা পাহাড় হইতে ফিরিবার পর প্রতি সোমবার তিনি ভবানীপুর সমাজে উপাসনা করিতেন এবং রবিবার সকালে ব্রহ্ম বিত্তালয়ে উপদেশ দিতেন। চীৎপুরস্থ ব্রাহ্ম সমাজেও তিনি আচার্য্যের কাজ করিতেন। তাঁহার ধর্ম্ম ব্যাখ্যান শুনিবার জন্য বহু লোক সমাগম হইত।

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মিলিত প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজ ক্রমশঃই একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণতঃ হইতে থাকে। ভারতপ্রবাসী খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম প্রচারকগণ ব্রাহ্মসমাজের বর্দ্ধমান প্রভাবকে তাঁহাদের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করিয়া, দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজের মত ব্যক্ত করিবার জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই একমাত্র উপায় ছিল। একটি ইংরেজি পত্রিকার অভাব তাঁহারা বিশেষভাবেই অনুভব করিতেছিলেন। সেই অভাব দূর করিবার জন্য ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দের ১লা আগষ্ট হইতে, দেবেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে এবং কেশবচন্দ্রের বিশেষ উৎসাহে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' (The Indian Mirror) নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। মনোমোহন ঘোষ উহার প্রথম সম্পাদক হন। উহার প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদের 'ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মার' (The Indian Reformer) নামে পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রসিদ্ধ দেশীয় ধর্ম্ম-যাজক ও লেখক লালবিহারী দে উহার সম্পাদক ছিলেন। এই দুই পত্রিকাতে দুই ধর্ম্ম উপলক্ষ করিয়া বহু বাদানুবাদ প্রকাশিত হইত

সামাজিক ক্রিয়াকলাপ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ যথাসম্ভব প্রাচীন প্রথাই রক্ষা করিতেন। কেবল পৌত্তলিক কোনও অনুষ্ঠান করিতেন না। তাঁহার কন্যা সুকুমারীর বিবাহ তিনি ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। তৎফলে তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। অসবর্ণ বিবাহ যাহাতে প্রচলিত হয় সেবিষয়েও তাঁহার ইচ্ছা ছিল এবং রাজবিধিদ্বারা যাহাতে অসবর্ণ বিবাহ সিদ্ধ করা যাইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টিত ছিলেন।

১৮৬২ খ্রীঃ অব্দের প্রথমভাগে ব্রাহ্মেরা দেবেন্দ্রনাথকে 'ব্রাহ্মসমাজপতি ও প্রধান আচার্য্য' এই উপাধি দিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে সমস্ত কার্য্যের ভার তাঁহার উপর প্রদান করেন। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে ভার প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৮৪ শকের ১লা বৈশাখ দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে আচার্য্য পদে নিয়োগ করেন। এই সময় হইতে নানাস্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, ব্রহ্মোপাসনার মন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতি কাজের জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে থাকেন। এই সকল কার্য্যে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উমানাথ গুপ্ত, অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্র প্রমুখ অনেকগুলি ব্রাহ্মের বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ হইতে একটি পৃথক গোষ্ঠির সৃষ্টি হইল। যাঁহারা দেবেন্দ্রনাথের অনুবর্ত্তী ছিলেন তাঁহাদিগকে প্রাচীন এবং যাঁহারা প্রধানতঃ কেশবচন্দ্রের পোষকতা করিতেন তাঁহাদিগকে নব্য দল বলা হইত। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য অথবা উপাচার্য্য যিনি নির্ব্বাচিত হইবেন তিনি সর্ব্বপ্রকার আচার ও ব্যবহারে পৌত্তলিকতার সংশ্রব হইতে বিরত থাকিবেন, ইহাই নব্য দলের বিশেষ দাবী ছিল। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদের দাবী যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া দুইজন উপবীত ত্যাগী উপাচার্য্য নিযুক্ত করেন। ইহাতে প্রাচীন দল ক্ষুব্ধ হন। ইহার কিছুকাল পরেই অন্যান্য নানা বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে নব্য দল দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব পূর্ব্বের ন্যায় আর মানিয়া চলিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু তখনও তাঁহারা পৃথকভাবে কোনও সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তখন পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের পরিচালনাধীনে চীৎপুরস্থ ব্রাহ্মসমাজ 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত ছিল। তৎপরে ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে কেশবচন্দ্র যখন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন তদবধি উহা 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

অত্যধিক মানসিক শ্রমে এবং আরও অন্যান্য কারণে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তদ্ভিন্ন কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্মগণের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাতে তিনি বিশেষ নিরুদ্যম হইয়া পড়েন।

১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে কলিকাতা নিবাসী ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন এবং তাঁহাকে 'মহর্ষি' উপাধি প্রদান করেন। তদবধি তিনি প্রধানতঃ আদি ব্রাহ্ম সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা পরিচালনা এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করা এই দুই কার্য্যেই নিজের সমুদয় চিন্তা ও শক্তি নিয়োজিত করেন।

কেশবচন্দ্র পৃথক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিবার পর ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকাও দেবেন্দ্রনাথের হস্তচ্যুত হয়। তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে নবগোপাল মিত্রের সম্পাদকত্বে 'ন্যাশানেল পেপার (The National Paper) নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে।

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে দেশের প্রাচীন রীতিনীতি যথাসম্ভব রক্ষা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। সেই জন্য কেশবচন্দ্রের চেষ্টায় ব্রাহ্ম বিবাহ করিবার জন্য আইনের সাহায্য লইবার আয়োজন বোধ করেন তখন দেবেন্দ্রনাথ উহা অনুমোদন করেন নাই। বরঞ্চ হিন্দু সমাজে প্রচলিত অনেক আচার অনুষ্ঠান তিনি সংস্কৃত করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তন করেন। তিনি নিজে এককালে উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি আবার পরে নিজ উদ্ভাবিত প্রণালীতে ব্রাহ্মসমাজে উপবীত ধরেণের প্রথা প্রবর্ত্তন করেন।

১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দের মধ্যভাগ হইতে সুদীর্ঘ দশ বৎসরকাল তিনি প্রায় পরিব্রাজকের ন্যায় ভারতের নানাস্থানে পর্য্যটন করেন। ইহার মধ্যে দীর্ঘকাল হিমালয়ের অন্তর্গত নানাস্থানে বাস করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে অল্পকালের জন্য কলিকাতায় আসিতেন মাত্র এই সময়েই তাঁহার ধর্ম্ম পিপাসা অতিশয় বৃদ্ধি পায়; ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুলতা অত্যন্ত তীব্র হয়। এই সময়ের মধ্যেই ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে, তিনি বীরভূম জিলার ভুবনডাঙ্গা নামক স্থানে ভূমি ক্রয় করিয়া নির্জ্জন সাধনার জন্য এক আশ্রম স্থাপন করেন। উহাই বর্ত্তমানে শান্তিনিকেতন নামে পরিচিত। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে হিমালয়ের নানাস্থানে দীর্ঘকাল থাকিবার পর হঠাৎ ভ্রমণব্যপদেশে চীন দেশে গমন করেন। এক বৎসর পরে তিনি চীন দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার স্বাস্থ্য এই সময়ে ক্রমশঃই মন্দ হইতেছিল। স্বাস্থ্যের উন্নতির আশায় কিছুকাল বোম্বাই যাইয়া সমুদ্র তীরে অবস্থান করেন। তদ্ভিন্ন বহুকাল চুচুঁড়াতে গঙ্গা তীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হেতু বৈষয়িক কোনও কাজে যোগ দিতে পারিতেন না। সামাজিক ব্যাপারেও যথাসম্ভব দূরে থাকিতেন। নির্জ্জনতাই তখন তাঁহার বিশেষ কাম্য হইয়াছিল বলিয়া কলিকাতেও তিনি যোড়াসাঁকোর ভবনে বাস করিতেন না। দীর্ঘকাল পার্ক ষ্ট্রীটের এক বাটী ভাড়া করিয়া তথায় বাস করেন। এই ভাবে দীর্ঘকাল জরাজীর্ণ শরীরে ইহ জগতে থাকিয়া ১৩১১ বঙ্গাব্দের ৬ই মাঘ (১৯০৫ খ্রীঃ ১৯শে জানুয়ারী) যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজোচিত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও সংসারের সমস্ত প্রকার কর্ত্তব্য যথাযথ সম্পন্ন করিয়াও কি প্রকারে ঈশ্বরানুগত জীবন যাপন করা যায়, তাহার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিলেন। গত একশত বৎসরের মধ্যে তাঁহার ন্যায় আন্তরিক ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুল মহাপুরুষ আমাদের দেশে অধিক জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার শ্রাদ্ধ বাসরে কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে যাহা নিবেদন করেন তাহা হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে সাহায্য করিবে—'যিনি অচেতন সমাজকে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসায় সজীব করিয়া দিয়াছেন, যিনি নূতন ইংরেজি শিক্ষার উদ্ধত্যের দিনে শিশু বঙ্গ ভাষাকে বহু যত্নে কৈশোরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, যিনি দেশকে তাহার প্রাচীন ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, যিনি তাঁহার তপস্যাপরায়ণ এক লক্ষ্য জীবনের দ্বারা আধুনিক বিষয় লুব্ধ সমাজে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ পুনঃস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন অদ্য আমরা তাহাই স্মরণ করি।'

দেবেন্দ্রনাথ দাস—তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র। ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি হিন্দু স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং ২০৲ টাকা বৃত্তি পান। তাহার দুই বৎসর পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ্‌-এ, পরীক্ষায়, তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। এবং গোয়ালিয়র মেডেল ও মাসিক চল্লিশ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তৎপরে তিনি বিলাতে যাইয়া সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৭শ স্থান অধিকার করেন। কিন্তু নূতন নিয়ম অনুসারে বয়স বেশী বলিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিলেন না। তৎপরে তিনি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। প্রথম বৎসরেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুইশত টাকার পুস্তক পুরস্কার ও মাসিক ষাট টাকার বৃত্তি প্রাপ্ত হন। কিন্তু তৃতীয় বৎসরে রাংলার পরীক্ষায় অকৃত কার্য্য হন।

সিবিল সার্বিস ও রাংলার পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অল্প কিছুকাল পরেই তিনি আবার সস্ত্রীক বিলাত গমন করেন। এইবার তিনি ইউরোপের কয়েকটী ভাষা শিক্ষায় মনোযোগী হইলেন। তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, পার্শী, উর্দ্দু, ইংরেজী, লেটিন, গ্রীক ও ইতালীয় ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। যে সমস্ত ইংরেজ সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দিয়া

ভারতে আসিতেন তাঁহাদেরে হিন্দী, সংস্কৃত, উর্দ্দু ও পার্শী শিক্ষা দিবার জন্য একটী স্কুল খুলেন। এতদ্ব্যতীত কোন কোন বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। এবং অনেক মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। এই সময়ে তিনি ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, সভ্যতা দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে সারগর্ভ কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সকল বক্তৃতার ফলে চারিদিকে তাঁহার খুব সুনাম প্রচারিত হয়।

বিলাতে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে দেশে প্রত্যাগমন করেন। সিটি কলেজে ইংরেজি অধ্যাপকেব কার্য্যে নিযুক্ত হন। এক বৎসর পবেই একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার পরিচালনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার অধ্যাপনার গুণে অচিরেই স্কুলের বিশেষ উন্নতি হইল। তখন তিনি একটী কলেজ খুলিবার সংকল্প করিলেন। ইহাই তাঁহার অবনতির কারণ হইল। কলেজ খুলিয়া অল্পকাল মধ্যেই তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন বাধ্য হইয়া কলেজ ও স্কুল দুইই বন্ধ করিয়া, আবার চাকুরীতে প্রবেশ করেন। এক বৎসর বরিশাল ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউসনে, পরে সিটি কলেজ ও রিপণ কলেজে অধ্যাপকের কার্য্যে তিনি নিযুক্ত ছিলেন।

তিনি বিলাতে অবস্থানকালে ইটালী ভাষা হইতে 'নিরোগী' নামে একখানি নাটক বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। এতদ্ব্যতীত 'পাগলের কথা' নামক স্বীয় আত্মজীবনী নামক একখানা গ্রন্থও তাঁহার আছে। এফ এ ও বি, এ, পরীক্ষার অনেকগুলি নোট বুক তিনি লিখিয়াছিলেন।

১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে মাত্র বায়ান্ন বৎসর বয়সে অকালে এই মনীষী পরলোক গমন করেন।

দেবেন্দ্রনাথ রায়—জন্মস্থান নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর। তিনি কৃষ্ণনগর রাজবংশের দৌহিত্র ছিলেন। ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করিয়া দীর্ঘকাল কলিকাতা ক্যাম্বেল স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। সুচিকিৎসক বলিয়া তৎকালে তাঁহার খুব সুনাম ছিল। বিশেষত তিনি ছাত্রদের পরম উপকারী বন্ধু ছিলেন। গরীব ছাত্রদিগকে বিনা দর্শনীতে তিনি চিকিৎসা করিতেন। তিনি প্র্যাক্‌টিস অব মেডিসিন, হাইজীন ও মেডিকেল জুরিস প্রুডেন্‌স্ নামে তিনখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার একজন বিশিষ্ট নাগরিক ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার গুণের পুরস্কারস্বরূপ রায় বাহাদুর উপাধি দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ৬২ বৎসর বয়সে ১৯০৯ সালের ২৮শে নভেম্বর এই পরোপকারী ছাত্রবৎসল মহাত্মা পরলোক গমন করেন।

দেবেন্দ্রনাথ সেন—বাঙ্গালী কবি হুগলী জিলার পাণ্ডুয়া নিকটবর্ত্তী বলাগড় নামক স্থানে তাঁহার আদি নিবাস এই বংশের কয়েক জন দীর্ঘকাল যাবৎ পশ্চিম প্রবাসী হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ সেনের গাজীপুরে তুলা ও চিনির বিস্তৃত কারবার ছিল।

শিক্ষা সমাপন করিয়া দেবেন্দ্রনাথ যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত গাজিপুরে আইন ব্যবসায় করিতে যান। দীর্ঘকাল পরে তিনি একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে শোকাক্রান্ত হইয়া আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। তৎপরে কিছুকাল গৃহ ত্যাগী সন্ন্যাসী রূপে দীর্ঘকাল ভারতের নানা স্থানে পর্য্যটন করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ মিশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। উহার মুখপাত্র স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ রিভিউ (Review) নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ কবেন। তদ্ভিন্ন কলিকাতাতে শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা নামে একটী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াও দীর্ঘকাল পরিচালনা করেন।

দেবেন্দ্রনাথ স্বভাব কবি ছিলেন। সংসারের নানাঘাত প্রতিঘাতও তাঁহার কবি প্রতিভা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ভারতী, প্রদীপ, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার বহু কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। অশোক গুচ্ছ, গোলাপ গুচ্ছ, শেফালী গুচ্ছ, অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা, ফুলবালা, ঊর্ম্মিলা প্রভৃতি কবিতা গ্রন্থগুলি কাব্য-রস পিপাসুদের আনন্দ বর্দ্ধন করিত।

দেবেন্দ্রনাথ পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তাঁহার চতুর্থ সহোদর যতীন্দ্রনাথ সেন কিছুকাল এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত সিটিজেন (The Citizen) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ সেন এলাহাবাদেরই একজন খ্যাতনামা চিকিৎসাব্রতী ছিলেন।

দেবেন্দ্র বর্ম্মা—(প্রথম) কলিঙ্গ নগরে গঙ্গাবংশীয় নরপতিরা দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর। চিকাকুল নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানা তাম্র শাসন দৃষ্টে জানা যায়, অনন্ত বর্ম্মার পুত্র দেবেন্দ্র বর্ম্মা ৩০০ শত ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্র বর্ম্মা—(দ্বিতীয়) কলিঙ্গপতি দ্বিতীয় গুণার্ণবের পুত্র। তিনি ৯২৪—৯৩৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

দেবেন্দ্র বর্ম্মা—(তৃতীয়) তিনি কলিঙ্গপতি রাজেন্দ্র বর্ম্মার পুত্র। তিনি ৯৯৫ খ্রীঃ অব্দে যে ভূমি দান করেন সেই তাম্র শাসন ঠেকলির রাজার নিকট আছে। তাঁহার পুত্রের নামও রাজেন্দ্র বর্ম্মা, তৃতীয়।

দেবেন্দ্র বর্ম্মা—(চতুর্থ) তিনিও কলিঙ্গের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের

নাম সত্তাবর্ম্মা। সম্ভবতঃ তিনি ১০৮৩ খ্রীঃ অব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্র বোধি—তিনি প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ধর্ম্মকীর্ত্তির সমসাময়িক ছিলেন (৬৫০ খ্রীঃ)। ধর্ম্মকীর্ত্তি 'প্রমাণ বার্ত্তিক নামে একখানা দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন। দেবেন্দ্র বোধি 'প্রমাণ বার্ত্তিক পঞ্জিকা' নামে তাহার এক টীকা রচনা করেন। কথিত আছে প্রথম বারে টীকা লিখিয়া ধর্ম্মকীর্ত্তিকে দেখাইলে, তিনি ইহা নষ্ট করেন। দ্বিতীয়বারে দেখাইলেও তিনি ইহা নষ্ট করিয়া আবার লিখিতে আদেশ করেন। তৃতীয়বারের লিখিত টীকা ধর্ম্মকীর্ত্তির অনুমোদিত হয়।

দেবেশ্বর—আসামের অন্তর্গত কামরূপে শক সংবতের প্রথমভাগে তিনি রাজা ছিলেন। যোগিনী তন্ত্রে তাঁহার বিষয় উল্লিখিত আছে। তিনি শূদ্র জাতীয় ছিলেন।

দেবেশ্বর—(২) তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তাঁহার রচিত কবিকল্পলতা একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

দেবেশ্বর উপাধ্যায়—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম শ্রীবিলাস।

দেলীর খাঁ—সম্রাট আওরঙ্গজীবের একজন বিখ্যাত সেনাপতি। সম্রাটের পুত্র আকবর বিদ্রোহী হইয়া মিবারের রাণা জয়সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। জয়সিংহ আকবরকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। পরে আকবর পলাইয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করেন এবং তথা হইতে পারস্যে যাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। আরঙ্গজীব রাজপুতদিগকে পরাস্ত করিতে যাইয়া, তাঁহাদের রাজ্য আক্রমণ করেন কিন্তু দুইবার পরাস্ত হন। এদিকে দাক্ষিণাত্যে মহারাট্টারাও দিন দিন প্রবল হইতেছিল। এইসব চিন্তা করিয়া আওরঙ্গজীব রাজপুতদের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধিও দেলীরখাঁর অধীনস্থ সেনাপতি বিকানীর রাজ শ্যামসিংহের বুদ্ধি কৌশলে সম্পন্ন হইয়াছিল। দেলীরখাঁও এই সন্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন (১৬৮১ খ্রীঃ)।

দেলাওর খতিব—একজন দরবেশ। তিনি শ্রীহট্টের বিখ্যাত দরবেশ হজরত শাহ জালাল এমনির অন্যতম অনুগত শিষ্য ছিলেন।

দেশান—তিনি পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের পিতামহী ও চরুৎ সিংহের স্ত্রী। রণজিৎ সিংহ দেখ।

দৈবকীনন্দন দাস—তিনি বাঙ্গালা ভাষায় 'বৈষ্ণব বন্দনা' ও সংস্কৃত ভাষায় 'বৈষ্ণবাভিধান' রচনা করেন। তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর সমকালবর্ত্তী ছিলেন। এই ব্রাহ্মণ যুবক প্রথমে অতিশয় বৈষ্ণব বিদ্বেষী ছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট তিনি একটী গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, সেই

অপরাধে তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া মহাপ্রভুর শরণাগত হন। মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট ক্ষমা প্রার্থী হইতে বলেন। দৈবকীনন্দন শ্রীবাসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া নিত্যানন্দের প্রিয় পার্ষদ পুরুষোত্তম কবিরাজের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে বলেন এবং বৈষ্ণব বন্দনা রচনা করিতে আদেশ করেন। কথিত আছে বৈষ্ণব বন্দনা রচনা করিয়া, তিনি রোগ মুক্ত হন। তাঁহার বৈষ্ণব বন্দনায় মহাপ্রভুর সমকালবর্ত্তী বহু বৈষ্ণবের বন্দনা আছে। তাঁহার জন্মস্থান হালীসহর।

দোড্ডয়াচার্য্য—তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী দার্শনিক পণ্ডিত। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'চণ্ডমারুত'। তাঁহার জন্ম স্থান শোলিঙ্গর। তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। তিনি ষোড়শ খ্রীঃ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন।

দোবরা পাথর—১৮২৭ খ্রীঃ অব্দে ময়মনসিংহ জিলার সেরপুর অঞ্চলে প্রজা বিদ্রোহ হয়। দোবরা পাথর সেই বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ছিল। জানকু পাথর দেখ।

দোস্তআলী— আর্কটের নবাব। দিল্লীর সম্রাটের অধীনে দায়ুদ খাঁ আর্কটের নবাব ছিলেন। ১৭১০ খ্রীঃ অব্দে তিনি দিল্লীতে গমন করিতে আদিষ্ট হন। তখন তিনি সাদতুল্লা নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহার প্রতিনিধির কাজ করিবার জন্য আর্কটে রাখিয়া যান। সাদতুল্লা নবাবী পদে ২২ বৎসর ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনের পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দোস্ত আলী কর্ণাটের নবাব হইয়াছিলেন (১৭৩২ খ্রীঃ)। এই পদ গ্রহণ করিবার সময় তাঁহার মনিব নিজামের অনুমতি গ্রহণ করেন নাই। নিজাম এই সময়ে বাজীরাও পেশোয়ার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া, এইদিকে মনোযোগ দিতে পারেন নাই। দোস্ত আলীর দুই কন্যা ছিল। একটীর সহিত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মুর্ত্তজা আলীর ও অপরটীর সহিত চাঁদ সাহেবের বিবাহ হয়। দোস্ত আলীর জামাতা চাঁদ সাহেব বিশ্বাস ঘাতকতাপূর্ব্বক ত্রিচিনপল্লী অধিকার করেন। ইহার পরেই রঘুজী ভোঁসলে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে দোস্ত আলী পরাজিত ও নিহত হন এবং তাঁহার পুত্র সফদর আলী এক কোটী টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হন। পিতার মৃত্যুর পরে তিনিই কর্ণাটের নবাব হইযাছিলেন।

দোস্ত মোহাম্মদ—তিনি আফগানিস্থানের অধিপতি। লর্ড অক্ল্যাণ্ডের শাসন কালে (১৮৩৬—১৮৪২ খ্রীঃ) আফগানিস্থানের সিংহাসন লইয়া শাহ সুজা (আহাম্মদ শাহ দুরাণীর পৌত্র) ও সর্দ্দার দোস্ত মোহাম্মদের বিবাদ সংঘটিত হয়। ১৮২৬ খ্রীঃ অব্দে শাহ

সুজাকে বিতাড়িত করিয়া দোস্ত মোহাম্মদ কাবুল অধিকার করেন। শাহ সুজা ইংরেজদের বন্ধু ছিলেন। সেজন্য তিনি লুধিয়ানায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দে অকল্যাণ্ড দোস্ত মোহাম্মদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিবার জন্য কাবুলে দূত প্রেরণ করেন। এইখানে একটুকু পূর্ব্বাবস্থা বর্ণনা করা অবশ্যক। এই সময়ে এসিয়ায় রুশিয়ার সম্রাট রাজ্য বিস্তার করিতে করিতে আফগানিস্থানের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। আফগান অধিপতিকে হস্তগত করিয়া,রুসরাজ ভারতবর্ষে পাছে গোলযোগের সৃষ্টি করেন, এই আশঙ্কা করিয়া, ইংরেজ সরকার আফগানাধিপতির সহিত পূর্ব্বেই সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক ছিলেন। লর্ড অকল্যাণ্ডের প্রস্তাবে আমীর দোস্ত মোহাম্মদ সন্ধি করিতে সম্মত হইয়া, পেশোয়ার প্রদেশ দাবী করিলেন। এই পেশোয়ার প্রদেশ তখন পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের রাজ্যভুক্ত। বহু পূর্ব্বে আফগানদিগকে পরাস্ত করিয়া রণজিৎ সিংহ ইহা স্বীয় রাজ্য ভুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং এই প্রার্থনা পূরণের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। ইংরেজ এই অন্যায় আবদার রক্ষার জন্য রণজিৎ সিংহের সহিত বিবাদ করিতে অসম্মত হইলেন, সুতরাং সন্ধির প্রস্তাব বিফল হইল। এদিকে আমীর দোস্ত মোহাম্মদ রুসরাজদূতকে কাবুলে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। লর্ড অকল্যাণ্ড বিবেচনা করিলেন, আফগানিস্থানের আমীর ইংরেজের বন্ধু না হইলে, ইংরেজের অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। সুতরাং পলায়িত শাহ সুজাকেই আফগানিস্থানের সিংহাসনে বসাইতে তিনি কৃত সঙ্কল্প হইলেন। বিশেষতঃ শাহ সুজাই আফগানিস্থানের যথার্থ অধিকারী। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দে আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। একদল ইংরেজ সেনা সিন্ধু নদ পার হইয়া, বোলান গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া বেলুচিস্থানের পথে, কান্দাহারের দিকে যাত্রা করিল। তাহারা অচিরে কান্দাহার ও গজনী অধিকার করিল। দোস্ত মোহাম্মদ বোখারায় পলায়ন করিলেন এবং শাহ সুজা আফগানিস্থানের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য সার উইলিয়াম ম্যাকনটন(Sir William Hay Macnaghten) আফগানিস্থানে রহিলেন। পরবৎসর দোস্ত মোহাম্মদ আত্ম সমর্পণ করেন এবং ভারতবর্ষে আনীত হন। আফগানিস্থানে দশ হাজার সৈন্য রাখিয়া লর্ড অকল্যাণ্ড বাকী সৈন্য ফিরাইয়া আনেন। ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দে আফগানিস্থানে আবার বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। এই বিদ্রোহের নেতা হইলেন দোস্ত মোহাম্মদের

পুত্র আকবর খাঁ। তিনি স্বহস্তে ম্যাকনটন সাহেবকে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক হত্যা করেন। ইংরেজ সৈন্য নিরাশ হইয়া ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে কাবুল হইতে ফিরিবার পথে, খাইবার গিরি বর্ত্মের মধ্যে আফগান সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। বহু ইংরেজ সৈন্য নিহত ও কতক বন্দী হইল। ডাক্তর ব্রাইডন্ নামক একজন সেনাপতি মাত্র ১২০ জন অনুচরের সহিত আহত ও ক্লান্ত অবস্থায় জালালাবাদে পৌঁছিয়া জেনারেল সেলকে এই শোচনীয় সংবাদ দিলেন।

১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে লর্ড অক্ল্যাণ্ড চলিয়া গেলেন। লর্ড এলেনবরা (Lord Ellenborough)বড়লাট হইয়া আসিলেন। তিনি অপমানের প্রতিশোধ লইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি জেনারেল নটের অধীনে একদল সৈন্য কান্দাহারে, এবং জেনারেল সেলের অধীনে একদল সৈন্য জালালাবাদে প্রেরণ করিলেন এবং জেনারেল পোলক খাইবার গিরি বর্ত্মের মধ্য দিয়া একদল সৈন্য সহ কাবুলে উপস্থিত হইলেন। আকবর খাঁর সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হইল। তিনি পরাজিত হইলেন। ইংরেজেরা কাবুল বাজার পুড়াইয়া দিলেন।

১৮৪১ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজেরা কাবুল হইতে চলিয়া আসার পরেই শাহ সুজা নিহত হইয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষণ কাবুলে দোস্ত মোহাম্মদকেই ইংরেজেরা পুনরায় স্থাপন করিলেন। লর্ড এলেনবরা আফগানিস্থানের আভ্যন্তরিণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন বলিয়া মনে করিলেন না। দোস্ত মোহাম্মদ অতঃপর ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত নিরাপদে রাজ্যশাসন করিয়া পরলোক গমন করিলেন। তৎপরে শের আলী আফগানিস্থানের আমীর হইয়াছিলেন।

দোস্তমোহাম্মদ খাঁ—তিনি আলীবর্দ্দী খাঁ ও সিরাজদ্দৌলার সময়ে একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। সওকত জঙ্গ তাঁহারই ভৃত্যের গুলির আঘাতে সমর ক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করেন।

দৌলত উজির—ইহার প্রকৃত নাম বহরাম। তাঁহার জন্মস্থান চট্টগ্রাম। লয়লা-মজনু নামক বিয়োগান্ত কাব্য তাঁহারই রচিত। চট্টগ্রামের অধিপতি নিজাম শাহ তাঁহাকে দৌলত উজির উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

দৌলত কাজী—তাঁহার জন্মস্থান চট্টগ্রাম। ১৫৮০ খ্রীঃ অব্দে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার রচিত 'সতী ময়না' ও 'লোর চন্দ্রাণী' নামক কাব্যদ্বয় অতি প্রসিদ্ধ। আরাকানের রাজার প্রধান মন্ত্রী আসরফ খাঁ লস্কর উজিরের আদেশে তিনি লোর চন্দ্রাণী কাব্য রচনা করেন। এই গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে গোহারী দেশের রাজা লোর ও তাঁহার দ্বিতীয়া মহিষী চন্দ্রাণীর

বিবরণ, দ্বিতীয় অংশে লোর রাজার প্রথমা মহিষী মোহরা দেশের রাজকুমারী সতী ময়নামতী ও তাঁহার রূপে মুগ্ধ বণিক পুত্র ছাতনের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। কবি দ্বিতীয় অংশ সম্পূর্ণ করিবার পুর্ব্বেই পরলোক গমন করেন। কবি আলাওল পরে ইহা সম্পন্ন করেন।

দৌলত খাঁ—দিল্লীর সম্রাট সেকেন্দর লোদী পরলোক গমন করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইব্রাহিম লোদী (১৫১৬—১৫২৬ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অতি দুর্ব্বল শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সময়ে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা সকলেই স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁ স্বাধীন হইলেন। ইব্রাহিমের পিতৃব্য আলম খাঁ, তাঁহার ভয়ে কাবুলে বাবরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে ভারতবর্ষ জয় করিতে উত্তেজিত করেন। এদিকে লাহোরের দৌলত খাঁও বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বাবর এই উৎকৃষ্ট সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি অনতিবিলম্বে পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া আলম খাঁকে তাহার শাসনকর্ত্তা করিলেন। দৌলত খাঁ মনে করিয়াছিলেন, বাবর তাঁহাকেই পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিবেন কিন্তু তাহা না করায় অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বাবর সেই প্রদেশ পরিত্যাগ করিবা মাত্র দৌলত খাঁ, আলম খাঁকে বিতাড়িত করিয়া রাজ্য অধিকার করিলেন। আলম খাঁ কাবুলে বাবরের নিকট উপস্থিত হইলেন। বাবর ইহার প্রতীকারার্থ ১৫২৬ খ্রীঃ অব্দে সসৈন্যে আবার পঞ্জাবে উপস্থিত হইলেন। দৌলত খাঁকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন এবং পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন।

এই দৌলত খাঁ একবার যোধপুরপতি রাণা গাঙ্গের হস্তে বিশেষরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন। ১৫১৬ খ্রীঃ অব্দে শূরজমলের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গাঙ্গ সিংহাসনে আরোহণ করেন কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য শাগ সিংহাসন অধিকার করিতে অভিলাষী হইয়া দৌলত খাঁর শরণাপন্ন হন। দৌলত খাঁ এই সুযোগে রাজপুতানায় স্বীয় অধিকার বিস্তারে অভিলাষী হন। কিন্তু গাঙ্গের সহিত সমরে তাঁহার দর্প চূর্ণ হয়।

দৌলত খাঁ লোদী—তিনি একজন আফগান। নানা প্রকার অবস্থা বিপর্য্যয়ের পরে অবশেষে তিনি সুলতান মামুদ তোগলকের সাহায্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করেন এবং 'আজিজ মুমালিক' উপাধি প্রাপ্ত হন। সুলতান মামুদ তোগলকের মৃত্যুর পরে রাজ্যের

সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁহাকেই ১৪১৩ খ্রীঃ অব্দে, দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করেন। পর বৎসর মুলতানের শাসনকর্ত্তা খিজির খাঁ দিল্লী আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন এবং ফিরোজাবাদের দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। দুই মাস পরে বন্দী দশায়ই ১৪১৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দৌলত খাঁ লোদী, শাহ খৈল—তিনি মির্জা আজিজ কোকা, মিরজা আবদুল রহিম খাঁ খান খানান এবং রাজকুমার দানিয়ালের অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি দুই হাজারী সেনাপতি ছিলেন। ১৬০০ খ্রীঃ শতকে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র বিদ্রোহী খাঁ জাহান লোদী সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে বিদ্রোহী হইয়া ১৬৩১ খ্রীঃ শতকে সপুত্র নিহত হন।

দৌলতরাও সিন্ধিয়া—১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দে মাধোজী সিন্ধিয়ার মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। তুকাজী নামে মাধোজীর এক ভাই ছিল। ১৭৬১ খ্রীঃ অব্দে পাণিপথ যুদ্ধে তিনি সমরাঙ্গনে শয়ন করেন। তাঁহার কেদারজী, রাও-লাজী ও আনন্দরাও নামে তিন পুত্র ছিল। তন্মধ্যে আনন্দরাও এর পুত্র এই দৌলতরাওকে মাধোজী সিন্ধিয়া পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। দৌলত-রাও ঘাটকের কন্যাকে বিবাহ করেন। মাধোজীর মৃত্যু সময়ে দৌলতরাও মাত্র ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক ছিলেন ১৮০০ সালে পেশোয়ার বিখ্যাত মন্ত্রী নানা ফড়নবিশের মৃত্যু হয়। ইহার পর হইতেই মারাঠা জাতির দুর্দ্দিন আরম্ভ হইল। মারাঠা রাজ্য অন্তর্বিদ্রোহ ও নায়কগণের ষড়যন্ত্রের ফলে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। যশোবন্তরাও হোলকার, ১৮০২ খ্রীঃ অব্দে পুণার নিকটে একটি যুদ্ধে, পেশোয়া ও সিন্ধিয়ার মিলিত সৈন্য দলকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। পেশোয়া পলায়নপূর্ব্বক ব্রিটিশের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তৎকালের বড়লাট ওয়ে-লেসলী তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করি-লেন। ১৮০২ খ্রীঃ অব্দে বেসিনের সন্ধি সাক্ষরিত হইল। এই সন্ধির ফলে পেশোয়া ব্রিটিশের অধীনতা মূলক মিত্রতা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। ১৮০৩ সালে পেশোয়া ইংরেজের সাহায্যে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অন্যান্য নায়কগণ এই সন্ধিতে সম্মত হইলেন না। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজী-রাও কিন্তু শেষে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন এবং সন্ধি ভঙ্গ করিবার কেবল সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। এই সময়ে যদি মারাঠা নায়কগণ মিলিতে পারি-তেন,তবে ভারতের ইতিহাস অন্য রকম হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অভাব ছিল। হোলকার, সিন্ধিয়া ও ভোঁসলেকে

বিশ্বাস করিতেন না বলিয়া, দূরে সরিয়া রহিলেন। ওয়েলেসলী সিন্ধিয়ার অভিপ্রায়ে সন্দিহান হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সিন্ধিয়া পরাজিত হইয়া ১৮০৩ সালে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন এবং অধীনতা মূলক মিত্রতা স্বীকার করিলেন। ভোঁসলেরও অবস্থা তদনুরূপ হইল। দৌলতরাও সিন্ধিয়া কতক রাজ্যও ইংরেজকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে পিণ্ডারী যুদ্ধে দৌলতরাও ইংরেজের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। দৌলতরাও অপুত্রক ছিলেন বলিয়া, তাঁহার মহিষী বৈজাবাই জনকজীনামক একটি বালককে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। এই বালক বৈজাবাই এর দৌহিত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৮২৭ খ্রীঃ অব্দে দৌলতরাও পরলোক গমন করিলে, জনকজীরাও সিংহাসন লাভ করেন। দৌলতরাওএর সুদীর্ঘ ৩৩ বৎসর রাজত্বকালে, ভারত ইতিহাসের অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়। বলিতে গেলে ভারতে ইংরেজ প্রভুত্ব এই সময়েই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়।

দৌলী—একজন সিদ্ধাচার্য্য। গোরক্ষনাথ দেখ।

দ্বারকাদাস চৌধুরী—তিনি ১৬৫০—১৬৬১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত হিজিলির তাজ খাঁ মসনদ-ই আলার বংশীয়দের রাজস্ব কর্ম্মচারী ছিলেন। বাহাদুর খাঁ ধৃত হইয়া ১৬৬১ খ্রীঃ অব্দে ঢাকায় নীত হইলে হিজলী রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে মাজনা মুটার রাজস্ব আদায়ের ভার তাঁহার উপর প্রদত্ত হয়। তাঁহার বংশধরেরা পরে মাজনা মুটার জমিদার হন। তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা ও বাহাদুর খাঁ দেখ।

দ্বারকানাথ অধিকারী—তাঁহার জন্মস্থান নদীয়া জেলার অন্তর্গত গোস্বামী দুর্গাপুর। 'সুধীর রঞ্জন' নামক কাব্য পুস্তক তাঁহার রচিত। তিনি, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত প্রভাকর পত্রিকায় কবিতা লিখিতেন। তিনি যখন কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, সেই সময়ে দীনবন্ধু মিত্র হিন্দু কলেজে এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহারা তিনজনেই প্রভাকর পত্রিকায় কবিতা লিখিতেন। একবার দ্বারকানাথ 'বুনো কবি' নাম গ্রহণ করিয়া বঙ্কিম ও দীনবন্ধুকে উপলক্ষ্য করিয়া 'সরস্বতীর মোহিনী বেশ ধারণ' নামক কবিতা প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহাদের মধ্যে কবিতার যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল। 'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ' নামে তাঁহাদের কবিতা প্রভাকর পত্রিকায় এক বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল কবিতা পাঠ করিয়া রংপুরের অন্তর্গত কুণ্ডির জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় দ্বারকানাথকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার

প্রদান করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় দ্বারকানাথের অনুমত্যনুসারে সেই টাকা তিনজনের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া কবিতা যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দেন। বড়ই দুঃখের বিষয় দ্বারকানাথ অল্পায়ু হইয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়— প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী দেশকর্ম্মী। নারী শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যাঁহারা বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন, দ্বারকানাথ তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান ছিলেন।

১২৫১ বঙ্গাব্দের ৯ই বৈশাখ (১৮৪৫ খ্রীঃ এপ্রিল) ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত মাগুরখণ্ড গ্রামে এক প্রসিদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণপ্রাণ গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বারকানাথের মাতা ও পিতা পরদুঃখকাতরতা, ধর্ম্মানুরাগ ও দৃঢ়চিত্ততার জন্য সকলের নিকট আদৃত হইতেন। দ্বারকানাথও মাতাপিতার সদ্গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন।

গ্রাম্য পাঠশালায় কিছু শিক্ষা লাভ করিবার পর তিনি ইংরেজি শিক্ষার জন্য পিতার কর্ম্মস্থল ফরিদপুরে গমন করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁহাকে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। পরে কালীপাড়া গ্রামের বিদ্যালয় হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। দারিদ্র্য বশতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ আর তাঁহার হয় নাই। দ্বারকানাথ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তখন যে সকল কুপ্রথা সমাজ-জীবনকে ব্যাধিগ্রস্ত করিত, তাহাদের মধ্যে কুলীন কন্যাদিগকে বধ করা একটি। মাত্র সতের বৎসর বয়সে দ্বারকানাথ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের গ্রামের একটি কুলীন কন্যাকে বধ করা হইয়াছে। এই সংবাদে তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন, এবং অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে এইভাবে কুলীন কন্যা বধ আরও হইয়া থাকে। দ্বারকানাথ ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন এবং তখন হইতেই এই ভয়াবহ কুপ্রথা কিভাবে দূর করা যায়, তাহার উপায় চিন্তনে নিরত হইলেন।

ছাত্রজীবন পরিত্যাগ করিয়া তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে লোনসিং গ্রামে অবস্থানকালে তিনি 'অবলা বান্ধব' নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ভ করেন। তখনকার দিনে নারীজাতির দুঃখ দুর্গতি মোচনের জন্য এইভাবে সংবাদ পত্রিকা প্রকাশের কথা একরূপ স্বপ্নের বিষয় ছিল। নারীর সত্ত্বাধিকার প্রতিপন্ন করিয়া প্রতি সংখ্যায় উদ্দীপনাময়ী ভাষায় প্রবন্ধ প্রকাশ হইতে লাগিল। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে ইংলণ্ডেও তখন নারী জাতির উন্নতি বিধায়ক আন্দোলন মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু দ্বারকানাথ

তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে আরও বেশী উন্নত ও প্রগতিশীলতার প্রচার করিয়া দেশে এক নবজাগরণের সৃষ্টি করিলেন। এক ক্ষুদ্র পল্লী গ্রাম হইতে প্রকাশিত অবলাবান্ধব বাঙ্গালা দেশের প্রধান প্রধান সহরে শিক্ষিত সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিল। পল্লীগ্রাম হইতে নিয়মিতভাবে পত্রিকা প্রকাশ করার পক্ষে অনেক বাধা ছিল, সেই জন্য হিতৈষীবন্ধুগণের পরামর্শে তিনি প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন (১৮৭০ খ্রীঃ)। কলিকাতায় আসিবার পর অবলাবান্ধব চার বৎসর চলিয়াছিল। পত্রিকা সংশ্রবে প্রায় সমুদয় কাজই একেলা তাঁহাকেই করিতে হইত এবং অনেক সময়ে অনাহারে অনিদ্রায় কাটাইতে হইত।

কলিকাতায় দ্বারকানাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (দেশসেবিকা সরোজিনী নাইডুর পিতা) প্রভৃতি ব্রাহ্ম সমাজের উৎসাহী যুবকগণের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহারাই দ্বারকানাথের সকল প্রকার সৎকার্য্যের পরম সহায় হইয়াছিলেন। এইভাবে ধীরে ধীরে দ্বারকানাথ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। কলিকাতার ন্যায় ঢাকাতেও তখন কতিপয় উৎসাহী যুবক নানাবিধ সমাজ সংস্কার মূলক কার্য্যে, বিশেষতঃ বাল্যবিবাহ নিরোধ, স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন ও অসহায়া কুলীন কন্যাগণের উদ্ধার সাধন, এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের শ্বশুর বরদানাথ হালদার প্রভৃতি তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। তাঁহারা 'বাল্য বিবাহ মহাপাপ' নামে পত্রিকা প্রকাশ করিতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহারা যে সকল কুলীন কন্যার প্রাণ নাশের অথবা বৃদ্ধের সহিত বিবাহ হইবার সম্ভাবনা হইত, তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়া কলিকাতায় আনিতেন এবং দ্বারকানাথও সকল সৎকার্য্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক দুর্গামোহন দাসের সাহায্যে সুপাত্রের সহিত তাঁহাদের বিবাহ দিতেন। এইভাবে একটি কুলীন কন্যাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে যাইয়া তাঁহারা বিচারালয়ে অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁহারা মুক্তি পান এবং বিচারপতি তাঁহাদের সৎকার্য্যানুরাগের জন্য বিশেষ প্রশংসা করেন। এই সকল উৎসাহী যুবক বৃন্দের সহিতও তাঁহার বিশেষ যোগ ছিল।

এই সকল কাজ ভিন্ন, নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্যও দ্বারকানাথ বিশেষ চেষ্টা করেন। যে সকল কুলীন কন্যা দুর্গামোহন দাস প্রমুখ দেশহিতব্রতীর গৃহে আশ্রয় পাইতেন প্রধানতঃ তাঁহা-

দের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্তই ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে "হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়" নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উহার সহিত একটি ছাত্রী নিবাসও স্থাপিত হয়। দ্বারকানাথই ঐ বিদ্যালয় স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। দুর্গামোহন দাস ও মনোমোহন ঘোষ এবিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অর্থ সাহায্য করিতেন। কুমারী এক্রয়েড ও কুমারী ফিয়ার নামে দুইটি ইংরেজ মহিলা ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতেন। দ্বারকানাথও অন্যতম শিক্ষক হইয়াছিলেন। আড়াই বৎসর পর উহা উঠিয়া যায়। (দুর্গামোহন দাস ৯৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর ভগিনী ও খ্যাতনামা আনন্দমোহন বসুর পত্নী স্বর্ণপ্রভা, প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি মনোমোহন ঘোষের মাতুল কন্যা কাদম্বিনী (ইনি বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম মেডিকেল কলেজের ছাত্রী হন), দুর্গামোহন দাসের কন্যা সরলা (দার্শনিক পণ্ডিত প্রসন্নকুমার রায়ের পত্নী) ও অবলা (বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের পত্নী), প্রভৃতি ঐ বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী ছিলেন। উক্ত বিদ্যালয় উঠিয়া গেলে ১৮৭৬খ্রীঃ অব্দে তিনি পুনরায় বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় নামে আর একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এইবারও দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করেন। দ্বারকানাথ ভিন্ন দুইটি ইংরেজ মহিলাও এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। সেই সময়ে মেয়েদের শিক্ষার জন্য বেথুন স্কুল ভিন্ন খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচারকদের এবং কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক পরিচালিত কয়েকটি প্রাথমিক শ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু ঐ সকল বিদ্যালয়ে গৃহস্থালী শিক্ষার জন্য কোনও ব্যবস্থা ছিল না। উচ্চ শিক্ষা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থালী শিক্ষা দিবার জন্য দ্বারকানাথ বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং দিবারাত্র দেহ মন দিয়া ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিতে থাকেন। বালিকাদিগকে অঙ্ক, ভূগোল, স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রভৃতি শিখাইবার প্রয়োজন অনুভব করিয়া, সেই সব বিষয়ে নিজেই বাঙ্গালায় পুস্তক রচনা করেন। জাতীয় ভাবে ছাত্রীদিগকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য, তখন পর্য্যন্ত জাতীয় ভাবোদ্দীপক যে সকল সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল, সে সমুদয় সংগ্রহ করিয়া "জাতীয় সঙ্গীত" নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহাই জাতীয় সঙ্গীত সংগ্রহের প্রথম পুস্তক।

কয়েক বৎসর পরে ঐ বিদ্যালয়ের দুইটি ছাত্রী যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন, তখন আর এক বাধা উপস্থিত হইল। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদিগকে পরীক্ষা দিবার

অনুমতি প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। সেই সময়ে সুদূর ইংলণ্ডেও নারীদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শি ক্ষার সুযোগ দেওয়া হইত না। সুতরাং এদেশে যে হইবে না, তাহাতে আর বিচিত্র কি। কিন্তু দ্বারকানাথ নিরুদ্যম হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি অবিরত আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় স্থির হইল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকগণ পূর্ব্বেই একবার ছাত্রীদের যোগ্যতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবেন। সেই পরীক্ষায় ছাত্রীগণ যোগ্য বিবেচিত হইলে তাঁহারা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারিবেন। সেই ব্যবস্থানুযায়ী পূর্ব্বেই ছাত্রীগণের এক পরীক্ষা হইল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাস ও ভূগোলের এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার বাঙ্গালার পরীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহাদের পরীক্ষায় যোগ্য বিবেচিতা হইয়া ছাত্রীরা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার অনুমতি লাভ করিলেন।

দ্বারকানাথের অপর প্রধান কীর্ত্তি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে মহিলা ছাত্রীর শিক্ষার অধিকার স্থাপন। এবিষয়েও পূর্ব্বের ন্যায়, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা বিভাগের উচ্চতর কর্ম্মচারীগণ যথেষ্ট বাধা দিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বারকানাথের অদম্য চেষ্টায় সকল বাধাই দূর হইয়া গেল এবং মেডিকেল কলেজের দ্বার মহিলা ছাত্রীদের জন্যও উন্মুক্ত হইল। (কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ৩৫, ৩৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের কৃতিত্বে প্রীত হইয়া বাঙ্গালার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা সার এস্‌লি ইডেন (Sir Ashloy Eden) উহাকে বেথুন স্কুলের সহিত সংযুক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তৎফলে ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে উহা বেথুন স্কুলের সহিত মিলিয়া যায়।

রাজনীতিক্ষেত্রেও দ্বারকানাথের কৃতিত্ব কম ছিল না। এই ক্ষেত্রে আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন। প্রথমে ছাত্রদের প্রাণে দেশভক্তি ও কর্ম্ম প্রেরণা জাগাইবার জন্য "ছাত্র সমাজ" (Student's Association) নামে এক সভা স্থাপিত হয়। কয়েক বৎসর (পরে ১৮৭৬ খ্রীঃ ২৬শে জুলাই) জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিবার জন্য 'ভারত সভা' (Indian Association) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ভারত সভার কার্য্যে দ্বারকানাথ প্রাণ মন দিয়া পরিশ্রম করিতে থাকেন। ভারত সভার পক্ষ হইতে সুরেন্দ্রনাথ, দ্বারকানাথ, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রচারক) বাঙ্গালা দেশের জিলায় জিলায় ঘুরিয়া বক্তৃতা প্রদান করিতে

লাগিলেন। দ্বারকানাথের চেষ্টায় জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও বগুড়াতে ভারত সভার শাখা স্থাপিত হইল। এই ভাবে, ইহাঁরাই প্রথম এই অভিনব উপায়ে জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রীক চেতনা সঞ্চারের চেষ্টা করেন। বর্ত্তমান সময়ে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের সময়ে যে বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির (Subject Committee) বৈঠক হয়, তাহার প্রবর্ত্তনও দ্বারকানাথ প্রমুখ কতিপয় বাঙ্গালীর চেষ্টাতেই হয়। দ্বারকানাথ চিরদিনই স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন। কয়েকজন নেতার ঘরোয়া বৈঠকের সিদ্ধান্ত জাতীয় সিদ্ধান্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া গণতান্ত্রিকতার বিরোধী। জাতীয় মত স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইতে পারে তখনই, যখন প্রতিনিধিদের নির্ব্বাচিত ব্যক্তিদের লইয়া বিষয় নির্ব্বাচনী সভা গঠিত হইবে এবং সেই সভার নির্দ্ধারণ সাধারণ সভায় বিবেচিত হইয়া গৃহীত হইবে, ইহাই ছিল দ্বারকানাথ প্রমুখ ব্যক্তিদের মত।

দ্বারকানাথের অপর এক মহৎ কীর্ত্তি, আসামের চা বাগানের কুলীদের দুর্দ্দশা মোচনের চেষ্টা করা। এবিষয়েও তিনি সর্ব্বপ্রথম ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে আসামের নানাস্থানে পর্য্যটন করিতে করিতে চা বাগানের কুলিদিগের প্রতি অত্যাচারের বিবরণ জানিতে পারেন। তাঁহার নিকট সকল বিষয় অবগত হইয়া দ্বারকানাথ বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহের জন্য, কুলি সাজিয়া বিভিন্ন চা-বাগানে গমন করেন এবং বহু তথ্য সংগ্রহপূর্ব্বক কলিকাতার 'সঞ্জীবনী' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় বাঙ্গালাতে এবং সুরেন্দ্রনাথের সম্পাদিত বেঙ্গলী (The Bengali) পত্রিকায় ইংরেজিতে, জ্বালাময়ী ভাষায় কুলিদিগের প্রতি অত্যাচার কাহিনী প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে দেশে এক তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়। ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সভাপতিত্বে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তাহাতে আসামের কুলীদের অবস্থার বিবেচনা প্রথম প্রস্তাবরূপে গৃহীত হয়। বিপিনচন্দ্র পাল ঐ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বহু যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা চা-বাগানের কুলীপ্রথা উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করিতে দেশবাসীকে অনুরোধ করেন। তৎপরে দ্বারকানাথ নিজ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে কুলীদের প্রতি কিরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করা হয়, অগ্নিময় ভাষায় তাহার বর্ণনা করেন। তদ্ভিন্ন জাতীয় মহাসমিতিকেও (Indian National Congress) এই বিষয় আন্দোলন করিতে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব

গৃহীত হয়। প্রথম প্রথম অবশ্য এবিষয়ে বিশেষ কিছু ফল হয় নাই। কিন্তু কয়েক বৎসর ধরিয়া আন্দোলন চলিবার পর আসামের শাসনকর্ত্তা (Chief Commissioner) সার হেনরী কটন (Sir Henry Cotton) কুলিদিগের পক্ষে শুভকর আইন প্রণয়ন করেন। তৎফলে চুক্তি বদ্ধ প্রথা (Indentured System) উঠিয়া যায় এবং আড়কাটিদের অত্যাচারও অনেক কমিয়া যায়।

দ্বারকানাথ যখন কলিকাতায় আসিয়া কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করেন, তখনই তিনি ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন এবং কালক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মসমাজের তিনি একজন উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যেও তিনি একজন ছিলেন।

দ্বারকানাথ 'সুরুচীর কুটীর' নামে একখানা উপন্যাস এবং কবিগাথা ও কবিতা কুসুম নামে দুইখানি কবিতা পুস্তক প্রণয়ন করেন। উপন্যাসখানি সেইকালে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত

না জাগিলে সব ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।
অতএব জাগো, জাগো গো ভগিনী
হও বীর জায়া বীর প্রসবিনী,

গানটি এককালে বহু কণ্ঠে গীত হইত।

তেজস্বী, নির্ভিক, সকল সৎকার্য্যের অনুরাগী, সত্যপরায়ণ আদর্শ চরিত্র এই দেশানুরাগী অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দের জুন মাসে (আষাঢ় ১৩০৫ বঙ্গাব্দ) দেহত্যাগ করেন।

দ্বারকানাথ গুপ্ত—(১) ১২৩০ সালের (১৮২৩ খ্রীঃ) ৯ই বৈশাখ যশোহর জিলার ইতিনা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। শৈশবেই পিতা নীলমণি গুপ্ত পরলোক গমন করিলে, মাতা তাহাকে সঙ্গে করিয়া বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাঁচাদিয়া গ্রামে স্বীয় ভ্রাতা রাধানাথ সেনের আশ্রয়ে আগমন করেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই মাতাও পিতার অনুগামী হইলেন। বালক মাসীমার স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় পাইল। প্রখ্যাত নামা গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের জননী তাঁহার মাসীমা ছিলেন। মাতুল রাধানাথ সেন মহাশয় ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া দ্বারকানাথের ইংরেজি ও বাঙ্গালা শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তৎপরে তিনি হার্ডিঞ্জ স্কুলের শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ১২৬৪ সালে তাঁহার 'হেম প্রভা' নামক গদ্য পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার ভাষা বেতাল পঞ্চবিংশতির ভাষার ন্যায় সংস্কৃত বহুল। অত্যল্পকাল মধ্যেই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তৎকালীন বঙ্গ ভাষার উন্নতি বিধায়িনী সভা (Vernacular Literature So-

ciety) তাঁহাকে এই গ্রন্থ লেখার জন্য পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন। ১২৬৮ সালে তাঁহার বিক্রমোর্ব্বশী প্রকাশিত হয়। ইহা কালিদাস প্রণীত বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের উপাখ্যান ভাগ অবলম্বনে লিখিত। হার্ডিঞ্জ স্কুলের কর্ম্ম পরিত্যাগের পর তিনি কিছুদিন কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন। সেকালে আদি ব্রাহ্ম সমাজ শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মিলন স্থান ছিল। গুপ্ত মহাশয় সেই দলে মিশিতেন। তাহারই ফলে তাঁহার 'ত্রি সন্ধ্যা স্তোত্র' নামক অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিরচিত কবিতা গ্রন্থ ১২৭০ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি সোম প্রকাশ, প্রভাকর, পরিদর্শক, মালঞ্চ প্রভৃতি পত্রে নিয়মিত রূপে লিখিতেন।

দ্বারকানাথ গুপ্ত—(২) সাধারণতঃ তিনি ডিঃ গুপ্ত নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি মেডিকেল কলেজের একজন পুরাতন ছাত্র। তাঁহার পেটেন্ট জ্বরঘ্ন ঔষধেই তাঁহাকে অমর করিয়াছে। তাঁহার ঔষধ সাধারণতঃ ডিঃ গুপ্ত নামেই পরিচিত। তিনি এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ গোস্বামী— বর্ত্তমান শ্রীহট্ট জিলার পশ্চিম উত্তরাংশ ও ময়মনসিংহ জিলার পূর্ব্ব উত্তরাংশ লইয়া গৌড় নামে একটী রাজ্য ছিল। তাঁহার শেষ রাজা দিগিন্দ্র দেব অপুত্রক ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি স্বীয় গুরু দ্বারকানাথ গোস্বামীকে রাজ্য দান করিয়া যান। দ্বারকানাথের পরে পরে তাঁহার পুত্র শ্যামসুন্দর গোস্বামী রাজা হইয়া শাক্তদের উপর খুব অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। শাক্তেরা তৎকালীন বাঙ্গালার নবাব শাহ সুজার শরণাপন্ন হন। সুজা গৌড় রাজ্য অধিকার করিয়া, শ্যামসুন্দরকে বিতাড়িত করেন। শ্যামসুন্দর অনন্যোপায় হইয়া ঢাকা জিলার উথুলি গ্রামে বাস করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর— কলিকাতার যোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ও ব্যবসায়ী। জীবিতকালে তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের একজন বিশিষ্ট লোক ছিলেন। দ্বারকানাথের পিতার নাম রামমণি ঠাকুর। কিন্তু রামমণির অগ্রজ রামলোচন নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া অনুজের মধ্যম পুত্র দ্বারকানাথকে পোষ্য গ্রহণ করেন। দ্বারকানাথ ১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি জ্যেষ্ঠতাত-কর্ত্তৃক পোষ্যরূপে গৃহীত হন।

কালপ্রথানুযায়ী গৃহ শিক্ষকের নিকট দ্বারকানাথের শিক্ষা লাভ হয়। তিনি ফারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। প্রথমে সুপরিচিত শেরবোর্ণ সাহেবের স্কুলে তিনি ইংরেজি শিক্ষা করেন। পরে তিনি উইলিয়াম

অ্যাডামস (William Adams) নামে একজন খ্রীষ্ট ধর্ম্মযাজকের নিকট ইংরেজি ভালরূপে শিক্ষা করেন।

উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি কিছু পৈতৃক জমিদারী প্রাপ্ত হন। পরে নিজের অসামান্য ব্যবসায় বুদ্ধি বলে বহু লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া একজন শ্রেষ্ঠ ধনী হইয়াছিলেন।

যৌবনের প্রারম্ভেই দ্বারকানাথ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোং (Mackintosh and Co) নামে একটি প্রসিদ্ধ ইংরেজ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংশ্রবে আসিয়া তাহারও ব্যবসায় বুদ্ধি উদ্‌বুদ্ধ হয় এবং ঐ কারবারের গোমস্তারূপে রেশম ও নীল রপ্তানীর কাজে নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই নিজে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি উক্ত ম্যাকিণ্টস কোম্পানীর একজন অংশীদারও হইয়াছিলেন।

১৮২৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি চব্বিশ পরগণার কালেক্টর ও নিমক মহলের অধ্যক্ষের (Salt Agent) দেওয়ান নিযুক্ত হন। ছয় বৎসর পরে শুল্ক ও আবগারী বিভাগের দেওয়ানী লাভ করেন। এই সব কাজের মধ্যে থাকিয়াও অন্যভাবে ব্যবসায় করিতে তিনি বিরত ছিলেন না। ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে কয়েকজন ইংরেজ অংশীদার লইয়া তিনি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক (Union Bank) প্রতিষ্ঠা করেন। উহার পাঁচ বৎসর পরে তিনি সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে তিনি কার-ঠাকুর কোম্পানী(Kerr-Tagore Company) নামে একটি সওদাগরী আপিস খুলেন। অতঃপর বিভিন্ন স্থানে নীল কুঠী স্থাপন করিয়া, রাণিগঞ্জে কয়লার খনি ইজারা লইয়া, চিনির কল স্থাপন করিয়া তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ীরূপে গণ্য হইলেন।

কর্ম্মজীবনের প্রথমেই সুপ্রীম কোর্টের (Supreme Court) একজন ব্যবহারজীবী, ফার্গুসন সাহেবের সহিত দ্বারকানাথের হৃদ্যতা জন্মে এবং ফার্গুসনের সাহায্যে তিনি আইনের অনেক বিষয় শিক্ষা লাভ করেন। এই আইনজ্ঞান লাভের ফলে তিনি বাঙ্গালা ও বিহারের অনেক জমিদারের আইন পরামর্শদাতা বা মোক্তার (Law Agent) নিযুক্ত হইলেন। এইভাবে জমিদারী কার্য্যেও তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ হয়। ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তিনি বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে জমিদারী ক্রয় করিয়া একজন প্রধান ভূম্যধিকারীও হইয়া উঠিলেন।

দ্বারকানাথ যেরূপ অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিতেন সেইরূপ ভোগবিলাস এবং জনহিতকার্য্যে মুক্ত হস্তে দান,

প্রভৃতি কার্য্যে তিনি অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেন। বৈষয়িক প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার একটা আশ্চর্য্য উদার চিত্ততা, লোকহিতকর কার্য্যে অসাধারণ উৎসাহ ও মননশীলতা ছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার আন্তরিক প্রণয় ছিল এবং রামমোহনের সর্ব্বপ্রকার লোকহিতকর ও সমাজ সংস্কারমূলক কাজে তিনি রামমোহনের প্রধান সহায় ছিলেন। দ্বারকানাথ প্রথম জীবনে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। ক্রমে বৈভব ও জীবন যাত্রার আড়ম্বর বৃদ্ধির সহিত তাঁহার পূর্ব্বের নিষ্ঠা অনেক হ্রাস পায় এবং তিনি অনেক সামাজিক সংস্কার পরিত্যাগ করেন।

দেশের সকল প্রকার উন্নতিমূলক কাজের সহিত তাঁহার আন্তরিক যোগ ছিল। ইংরেজি শিক্ষার জন্য হিন্দু কলেজ এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার জন্য মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণের সময়ে তিনি কয়েক বৎসর দুই হাজার টাকা করিয়া দান করিতেন। হিন্দু ছাত্রেরা যাহাতে শব-ব্যবচ্ছেদ করিতে ঘৃণা বোধ না করে, তজ্জন্য তিনি অনেক সময়ে শব-ব্যবচ্ছেদ কালে ছাত্রগণের নিকটে উপস্থিত থাকিয়া তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে গমন করিবার সময়ে দুইটি চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থী ছাত্রকে নিজ ব্যয়ে ইংলণ্ডে লইয়া যান। ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি (Land-holders' Society) বা জমিদার সভা স্থাপন করেন। জমিদারদিগের সহিত যাহাতে সরকারের সাক্ষাৎ যোগ থাকে এবং জমিদারগণ যাহাতে তাঁহাদের মতামত স্বাধীনভাবে সরকারকে জানাইতে পারেন, ইহাই সেই সভা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দ্বারকানাথের চেষ্টা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় বিধি যখন প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তিনি উহার বিরুদ্ধে বিশেষভাবে আন্দোলন উপস্থিত করেন। তখনকার দিনে যে সকল আইন প্রণীত হইত, সেইগুলি সাধারণ আদালতে রেজিষ্টারী হইত এবং আদালত সেই আইন সম্বন্ধে জনসাধারণের মতামত শুনিতেন। প্রেস আইন যাহাতে রেজিষ্টারী না হয়, তজ্জন্য দ্বারকানাথ প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার পক্ষে, যে সমুদয় সভা আহূত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিতে দ্বারকানাথ ইংরেজিতে যেসকল বক্তৃতা প্রদান করেন, সেইগুলি পড়িলে ইংরেজি ভাষায় তাঁহার আশ্চর্য্য অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। শাসন-কর্তৃপক্ষ অনেক গুরুতর বিষয়ে তাঁহার

সহিত পরামর্শ করা আবশ্যক বোধ করিতেন। বাঙ্গালা দেশে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রধানতঃ তাঁহারই সুপারিশে সৃষ্ট হয়। অশিক্ষিত দারোগা-দের হাতে ছোটখাট বিবাদ নিষ্পত্তির যাহাতে না পড়ে, এবং সুশাসন ও শান্তি দেশের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই-জন্যই ঐ পদের সৃষ্টি। তিনি অন্যতম জাষ্টিস অব-দি পিস্ (Justice of the Peace) হন। তখনকার দিনে তদ-পেক্ষা উচ্চ সম্মানের পদ আর ছিল না।

দেশীয় সমাজে তাঁহার যেরূপ প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল, ইংরেজ মহলেও তদ্রূপ ছিল। ইংরেজ সর-কারের কাছেও তিনি বিশেষভাবে সম্মানিত হইতেন। কিন্তু তাঁহার দেশ-হিতৈষণা কোনও দিন সম্মানলুব্ধতার দ্বারা আচ্ছন্ন হয় নাই। দেশের মঙ্গলের জন্য সরকারের কাজের যেখানে প্রতি-বাদ করা দরকার মনে করিতেন, সেখানে সকলের আগে প্রতিবাদ করিয়াছেন। বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড (Lord Auckland) দ্বারকানাথের একজন বিশেষ বন্ধু হইয়াছিলেন। বারাকপুরের লাট ভবনে দ্বারকানাথ প্রায়ই অতিথি হইতেন এবং তাঁহার বেলগাছিয়ার বাগান বাড়ীতে লাট সাহেব প্রায়ই গমন করিতেন। ঐ বেলগাছিয়ার বাগান বাড়ীতে দ্বারকা-নাথ মধ্যে মধ্যে প্রভুত অর্থ ব্যয় করিয়া, আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা করিতেন। তদুপলক্ষে দেশী ও বিদেশী সকল শ্রেণীর সম্রান্ত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইতেন।

১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে দ্বারকানাথ প্রথমে ইংলণ্ডে গমন করেন। তখনকার দিনে সমুদ্র যাত্রা করা যে, কতখানি মানসিক বলের পরিচায়ক, তাহা বর্ত্ত-মানকালে অনুভব করা কঠিন। পথে ইটালী দেশে রোম নগরে উপস্থিত হইয়া, ধর্ম্মনেতা পোপের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইটালীর সহরগুলির চিত্র, ভাস্কর্য্য ও কারুশিল্প তাঁহাকে মুগ্ধ করে। ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়াও তিনি বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার স্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং মহারাণী একাধিকবার তাঁহাকে আহারে নিমন্ত্রণ করেন। দ্বারকানাথের ঐশ্বর্য্য, আড়ম্বর প্রিয়তা, আভিজাত্যব্যঞ্জক আকৃতি ও শিষ্টাচার, বুদ্ধির অসামান্য তীক্ষ্ণতা প্রভৃতি ইংলণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায়কে মুগ্ধ করে। তাঁহারা দ্বারকানাথকে প্রিন্স (Prince) দ্বারকানাথ বলিয়া অভিহিত করিতে থাকেন। ইংলণ্ডে কিছুকাল অবস্থান করিয়া তিনি ফরাসী দেশে উপস্থিত হন। সেখানেই ফরাসী সম্রাট লুই (Louis) কর্ত্তৃক তিনি বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি পুনরায় ইয়োরোপে গমন করেন।

প্রথমবারে তাঁহার এক ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। দ্বিতীয়বারে তাঁহার অপর এক ভাগিনেয় এবং কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। এইবারই তিনি দুইজন চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষার্থীকে নিজ ব্যয়ে ইংলণ্ডে লইয়া যান। এই যাত্রায় প্যারী নগরীতে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মোক্ষ মুলার (Max Muller) এবং ফরাসী পণ্ডিত বার্ণুফের (Burnouf) সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। বার্ণুফ তাঁহাকে ফরাসী অনুবাদসহ ভাগবত পুরাণ একখণ্ড উপহার প্রদান করেন। প্যারীতে অবস্থান কালে তিনি একদিন সান্ধ্য সম্মিলনীর আয়োজন করেন এবং তদুপলক্ষে সমস্ত ঘরখানা উৎকৃষ্ট ভারতীয় শালদ্বারা সাজাইয়াছিলেন এবং সেই সম্মিলনীতে উপস্থিত সমুদয় ফরাসী মহিলাকে একখানি করিয়া শাল উপহার দিয়াছিলেন। প্যারী হইতে লণ্ডনে যাইয়া তিনি পূর্ব্বের ন্যায় আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করিতে থাকেন।

১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দের প্রথমভাগে গুরুতর পীড়িত হইয়া পড়েন। প্রথম কিছুকাল সমুদ্র তীরে এক স্থানে বাস করেন। কিন্তু পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় লণ্ডনে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁহার পীড়ার সময়ে ইংলণ্ডের অভিজাতবংশীয় অনেক লোক তাঁহার সংবাদ লইতেন। কয়েক মাস রোগাক্রান্ত থাকিয়া, ঐ বৎসরই ১লা আগষ্ট তিনি পরলোক গমন করেন। লণ্ডন নগরের এক প্রসিদ্ধ সমাধি ক্ষেত্রে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। (এতৎসঙ্গে নিম্ন লিখিত নাম কয়টিও দ্রষ্টব্য—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯৬২ পৃঃ; জর্জ্জ টমসন; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর; দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

দ্বারকানাথ দত্ত—তিনি কলিকাতার অন্তর্গত চোরবাগানের দত্ত বংশোদ্ভব। তাঁহার পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত কোম্পানীর কাগজের ব্যবসায় করিয়া প্রচুর ধন উপার্জ্জন করেন। দ্বারকানাথের অসাধারণ ধীশক্তি ছিল। সেজন্য তিনি গণিত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি প্রথম জীবনে ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়েতে টাইম টেব্‌ল বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর পরে গ্রীসদেশীয় বিখ্যাত সওদাগর রেলি ব্রাদার্সের মুৎসুদ্দির পদ শূন্য হইলে, তিনি তাহার জন্য প্রার্থী হইলেন। ঐ কোম্পানীর বড় সাহেব, অন্যান্য কর্ম্ম প্রার্থীদের মধ্যে দ্বারকানাথের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকেই উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। দ্বারকানাথ এক লক্ষ মুদ্রা জমা দিয়া, উক্ত পদ গ্রহণ করেন। তিনি স্বকীয় ক্ষমতায় উন্নতি লাভ করিয়া, হাতীবাগান অঞ্চলে বাসস্থান পরিবর্ত্তন

করেন। তিনি স্বধর্ম্মপরায়ণ, বিনয়ী অতি সজ্জন ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে ধীরেন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ, অমরেন্দ্র নাথ ও বিজয়েন্দ্রনাথ নামে চারি পুত্র বিদ্যমান ছিলেন। তন্মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ ও অমরেন্দ্রনাথ স্বনামেই সর্ব্বত্র পরিচিত।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—খ্যাতনামা বাঙ্গালী পণ্ডিত ও সাংবাদিক। কলিকাতার দক্ষিণে চাঙ্গড়িপোতা নামক গ্রামে এক দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কুলে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়, কলিকাতায় চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনা করিতেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দেশমান্য রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি তাঁহার ছাত্র ছিলেন।

ইং ১৮২০ সালে (১২২৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ) তাঁহার জন্ম হয়। গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া, তিনি কিছুকাল গ্রামেই এক টোলে অধ্যয়ন করেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে তিনি সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ লাভ করেন এবং ক্রমান্বয়ে তের বৎসর সেইখানে শিক্ষা লাভ করেন। মেধাবী ও কৃতীছাত্ররূপে তিনি বিশেষ প্রশংসা এবং অনেক পুরস্কারাদি লাভ করেন। ছাত্রজীবন শেষ করিয়া তিনি কিছুকালের জন্য ঐ শিক্ষায়তনেরই গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ হন। পরে অধ্যাপকের পদ লাভ করিয়া ১৮ বৎসর শিক্ষাদান কার্য্যে ব্রতী থাকেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় দ্বারকানাথকে সহায় করিয়া একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। ঐ মুদ্রাযন্ত্র হইতে দ্বারকানাথের রোম ও গ্রীসের ইতিহাস নামক দুইখানি উৎকৃষ্ট ইতিহাস প্রকাশিত হয়। তদ্ভিন্ন নীতিসার, পাঠামৃত ও ছাত্রবোধ নামে তিনখানি ছাত্র পাঠ্য পুস্তকও রচনা করেন। "প্রকৃত প্রেম" ও "প্রকৃত সুখ" নামে দুইখানি কাব্যও তাঁহার রচিত। প্রথমোক্ত গ্রন্থখানি বিশুদ্ধ ঈশ্বর প্রেমমূলক কাব্য।

দ্বারকানাথের প্রধান কীর্ত্তি "সোমপ্রকাশ" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদন। মার্জ্জিত রুচি, প্রাঞ্জল ভাষা নির্ভীক সমালোচনা প্রভৃতির জন্য প্রকাশের অল্পকাল মধ্যেই উহা শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে সোমপ্রকাশ প্রথম প্রকাশিত হয়। তাহার পূর্ব্বে যে সকল সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হইত, সাধুজনবিগর্হিত ভাষায় পরস্পরকে গালি দেওয়াই তাহাদের অধিকাংশের লক্ষ্য ছিল। গৌরীশঙ্কর (গুড়গুড়ে) ভট্টাচার্য্যের "ভাস্কর" এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "প্রভাকর" এই সকল বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী ছিল। তাঁহাদের

[illegible] অনুকরণ করিয়া আরও অনেক পত্রিকা এইরূপ হীনরুচির পরিচয় প্রদান করিত যে, দেশের চিন্তাশীল সাধু ব্যক্তিগণ চারিদিকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। অধিকাংশ পত্রিকাই প্রায় ভদ্রলোকের অপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ অবস্থার মধ্যে যে কয়েকজন মণীষী সংবাদপত্র পরিচালনাদ্বারা দেশে কলুষিত আবহাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পান, দ্বারকানাথ তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান ছিলেন। এইসময়ের মধ্যে যে কয়েকখানি সাধু প্রকৃতির সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইত, তাঁহাদের মধ্যে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "হিন্দু পেট্রিয়ট" (The Hindoo Patriot); রামগোপাল ঘোষের "বেঙ্গল স্পেক্টটর" (The Bengal Spectator); কাশীপ্রসাদ ঘোষের 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সার (The Hindu Intelligencer); কিশোরীচাঁদ মিত্রের "রহস্য সন্দর্ভ", রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "বিবিধার্থ সংগ্রহ" এবং প্যারিচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত "মাসিক পত্রিকা" বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

"সোমপ্রকাশ" বাহির হইবার পূর্ব্বে দ্বারকানাথের কয়েকজন বন্ধু এই কাজে তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিলে উহার সমুদয় দায়িত্ব দ্বারকানাথের উপরেই পড়িল। তিনি কলেজের অধ্যাপনা কার্য্য করিয়া যা কিছু সামান্য অবসর পাইতেন, সে সমুদয়ই সোমপ্রকাশের কাজে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য এই দুরূহ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে তাঁহাকে অতি গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত। অতি অল্পকাল মধ্যেই সোমপ্রকাশের প্রভাব চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ভাষায় বিশুদ্ধতা ও লালিত্য, মতের উদারতা ও যুক্তিযুক্ততা, নীতির উৎকর্ষতা সকল বিষয়েই সোম প্রকাশ, তৎকালীন সংবাদপত্র জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিল। দ্বারকানাথ কখনও ব্যক্তি বিশেষের তুষ্টি সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অথবা লোক সমাজে আদৃত হইবার লোভে সাধারণের রুচি বা সংস্কারের অনুরূপ করিয়া কিছু লিখিতেন না। নিজে যাহা সমগ্র হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতেন, তাহাই অকপট ভাষাতে ব্যক্ত করিতেন। তিনি পত্রিকার অগ্রিম মূল্য দশ টাকা ধার্য্য করিয়াছিলেন এবং অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকেও পত্রিকা পাঠাইতেন না। তৎসত্বেও, সে সময়ের পক্ষে পত্রিকার বহু গ্রাহক হইয়াছিল। দ্বারকানাথ সরকারী কর্ম্মচারী হইয়াও, নির্ভীকভাবে সরকারের কাজের সমালোচনা করিতে পশ্চাদপদ হইতেন না। রাজনীতি ভিন্ন সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধও, সোমপ্রকাশে অনেক

প্রকাশিত হইত। হেমচন্দ্রের 'ভারত ভিক্ষা' নামক প্রসিদ্ধ কবিতা প্রকাশিত হইবার পর সোমপ্রকাশে উহার এক প্রত্যুত্তর প্রকাশিত হয়। তাহার প্রথম চারি পংক্তি এইরূপ ছিল—

"মিছা শিঙ্গানাদে দাণ্ডায়ে শিখরে
কারে, ক্ষেপা ছেলে, ডাক উচ্চৈঃস্বরে।
কে ঘুমায়ে বল ? জাগ্রত সকল
পড়ে আছে, নাহি উঠিবার বল।

কয়েক বৎসর পরে, স্বাস্থ্যহানী হওয়ায় তিনি সোমপ্রকাশের সম্পাদনে অধিক সময় দিতে পারিতেন না। তজ্জন্য সোমপ্রকাশের পূর্ব্ব প্রভাব কিছু হ্রাস পায়। তিনি কিছুকাল "কল্পদ্রুম" নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অধ্যাপনা কার্য্য হইতে অবসর লই-বার সময়েই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তদুপরি সোমপ্রকাশের জন্য গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত বলিয়া, দ্রুত স্বাস্থ্যের অবনতি হইতে থাকে এবং তিনি দুরারোগ্য বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দের প্রথমভাগে স্বাস্থ্য পুনর্লাভের আশায় তিনি মধ্য-প্রদেশের রেওয়া রাজ্যের অন্তর্গত সাতনা নামক স্থানে গমন করেন এবং সেইখানেই সেই বৎসর আগষ্ট মাসে (১২৮২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র) তাঁহার দেহান্ত হয়।

দ্বারকানাথ মিত্র—কলিকাতা হাই-কোর্টের একজন খ্যাতনামা বিচারপতি। হুগলী জেলার অন্তর্গত আগুনি গ্রামে ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রতিভার প্রভাব বাল্যকালেই তাঁহার মধ্যে দৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার পিতা হরচন্দ্র মিত্র হুগলী আদালতে মোক্তারী করিতেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট স্বচ্ছল না হইলেও, তিনি পুত্রকে রীতিমত শিক্ষাদানে সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালাতেই তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। সাত বৎসর বয়সে তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রতি-ষ্ঠিত হুগলী ব্রাহ্ম স্কুলে আসিয়া ভর্ত্তি হন। তিনি ১৮৪৭ সালে মাসিক আট টাকা জুনিয়র স্কলারসিপ, এবং ১৮৪৯ সালে মাসিক আঠার টাকা করিয়া 'রাণী কাত্যায়ণী' বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দে তিনি সিনিয়র স্কলারসিপ (Senior Scholar-ship) পরীক্ষার প্রথম স্থান অধি-কার করেন। ইং ১৮৫১ সালে তিনি কলেজের পরীক্ষায় মাসিক ৪০৲ চল্লিশ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং একটি উৎকৃষ্ট ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিয়া স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি প্রথমে কলিকাতার অন্যতম ম্যাজিষ্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রের অধীনে দ্বিভাষীর পদ গ্রহণ করেন এবং ক্রমে দুই বৎস-রের মধ্যে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন। ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে হাইকোর্ট স্থাপিত হইলে তিনি এই আদালতে আসিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং প্রতিভাবলে অল্পকালের মধ্যেই তিনি তদানীন্তন সমব্যবসায়ীগণের অগ্রণী হইয়া উঠেন। প্রধান বিচারপতি স্যার বার্ণেস পিকক (Sir Barnes Peacock) তাহার প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে ১৫ই জুন যখন হাইকোর্টে পনের-জন বিচারপতির সমক্ষে বিখ্যাত Rent Case (উহার একপক্ষে জমিদারগণ ও ইংরেজ নীলকরগণ এবং অপর পক্ষে প্রজাগণ) বিচারাধীন হয়, তখন তিনি প্রজাপক্ষ অবলম্বন করেন এবং ক্রমান্বয়ে সাত দিন ধরিয়া নিজ পক্ষ সমর্থনে যেরূপ যোগ্যতা ও তেজস্বিতার পরিচয় প্রদান করেন, তাহাতে বিচারপতিগণ, ব্যবহারজীবীগণ ও জনসাধারণ সকলেই তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা দর্শনে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি হাইকোর্টে সরকারী উকীল (Goverment Pleader) নিযুক্ত হন। ইং ১৮৭১ সালের জুন মাসে বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যু হইলে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ঐ শূন্য পদে হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করেন। সাত বৎসর কাল হাইকোর্টের বিচারপতি পদে আসীন থাকিয়া, তিনি যেরূপ ব্যবহারজ্ঞান, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, তর্কশক্তি ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার একটি মুদ্রাদোষ ছিল। আদালতে বক্তৃতার সময়ে তিনি একটি খাগের কলম মোচড়াইতেন। যতই তাঁহার বক্তৃতার গাঢ়তা প্রকাশ হইত, ততই তিনি কলমটি জোরে মোচড়াইতেন এবং উহা ভাঙ্গিয়া যাইবা মাত্র তাঁহার কেরাণী আর একটি কলম হাতে দিত। কেরাণীকে তজ্জন্য এক তাড়া কলম লইয়া পাশে বসিয়া থাকিতে হইত। তিনি যে সমুদয় মোকদ্দমায় বিচার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তন্মধ্যে দুইটি মোকদ্দমার উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রসিদ্ধ 'অসতী মোকদ্দমার বিচারে হাইকোর্টে এই নিষ্পত্তি হয় যে, হিন্দু বিধবা চরিত্র-ভ্রষ্টা হইলেও বিষয়চ্যুত হইবে না। এই বিচারের বিরুদ্ধে আপিল করা হয় এবং হাইকোর্টের তিনজন বিচারপতি লইয়া গঠিত ফুল বেঞ্চে (Full Bench) উহার শুনানী হয়। তিনি সেই তিনজন বিচারপতির অন্যতম ছিলেন। অন্যান্য বিচারকগণ হাইকোর্টের পূর্ব্ব রায় বহাল রাখেন; কিন্তু তিনি ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া হিন্দু শাস্ত্রের মত সংগ্রহ পূর্ব্বক যেরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি দেশবাসীর যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেন।

দ্বিতীয় মোকদ্দমার বিচার্য্য বিষয় ছিল —কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় উত্তরাধিকারীর অবর্ত্তমানে হিন্দুশাস্ত্র মতে ভাগিনেয় মাতুলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারে কি না। এই মোকদ্দমারও হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চে বিচার হয়: তিনি বিচারে ভাগিনেয়কে মাতুলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী স্থির করেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর বার্ণেস পিকক এবং অন্যান্য বিচারকগণ তাঁহার সহিত একমত হইয়া মোকদ্দমার মীমাংসা করেন। বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলেও (Privy Council) তাঁহার নিষ্পত্তিই স্থির থাকে। তিনি স্বাধীনচিত্ত ও নির্ভীক ছিলেন এবং দরিদ্রের পক্ষ সমর্থন করিতে সর্ব্বদাই আগ্রহান্বিত থাকিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে স্বগ্রামে গমন করেন এবং তথায় বাস করেন।

মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—জীবনের শেষ পর্য্যন্ত—তাঁহার পাঠানুরাগের হ্রাস হয় নাই। তিনি প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন এবং ফরাসী ভাষায় লিখিত এই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা কোঁৎএর (Comte) গ্রন্থগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি খুব মাতৃভক্ত ছিলেন। দেশে বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা নানা প্রকারে, দেশের মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। উচ্চ গণিতে এবং বিজ্ঞানেও তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার ইংরেজী ভাবাজ্ঞান ইংরেজদিগেরও বিস্ময় উৎপাদন করিত। তত্তুল্য প্রতিভাশালী ব্যক্তি বাঙ্গালীর মধ্যে বিরল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হইবার অল্পকাল পরেই, কয়েকবার গুরুতর পীড়িত হওয়ায়, অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং কিছুকাল গলক্ষত (Cancer) রোগে ভুগিয়া ১৯৭৫ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পরলোক গমন করেন।

দ্বারকানাথ রায়—তাঁহার রচিত 'সুশীল মন্ত্রী' নামক উপন্যাস ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে আংশিক ভাবে জ্ঞানোদয় পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থখানি নীতি মূলক এবং ভাব প্রাচীন পন্থী ছিল। কালিদাস কর্ত্তৃক বিক্রমাদিত্যের নিকট বর্ণিত একটি কাহিনী ইহার রচনার বিষয়।

দ্বারকানাথ সেন মহামহোপাধ্যায়—খ্যাতনামা বাঙ্গালী কবিরাজ ও সংস্কৃত পণ্ডিত। তাঁহার পিতার নাম কবিরাজ রাজীবলোচন সেন। ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত খান্দারপাড়া গ্রামে ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দে এক বিখ্যাত পণ্ডিত বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ অভিরাম কবীন্দ্র স্বনামখ্যাত মামুদপুরের রাজা

শ্রীরাম রায়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন। দ্বারকানাথের বৃদ্ধ প্রপিতামহ গোপাল-কৃষ্ণ মহাশয় 'রসেন্দ্র সার সংগ্রহ' নামক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের রচয়িতা।

যথাকালে বিদ্যারম্ভের জন্য তাঁহাকে তাঁহার খুল্লতাত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীকান্ত কবিরঞ্জন মহাশয়ের টোলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি যখন গুরুর নিকট প্রথম পাঠ লইতেছিলেন, তখন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সহসা মেঘ গর্জ্জন হইল। ইহাতে প্রচলিত বিশ্বাসানুসারে সকলেই মনে করিলেন যে, দ্বারকানাথ জ্ঞানার্জ্জনে সমর্থ হইবেন না। তৎফলে তাঁহার টোলে যাওয়াও বন্ধ হইল এবং তিনি ক্রীড়ামোদেই সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে তাঁহাকে ফারসী পড়িবার জন্য মক্তবে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বৎসরখানেক পরে ঐ মক্তবটি উঠিয়া যাওয়াতে সকলেরই পূর্ব্ব ধারণা পুনরায় দৃঢ়ীভূত হইল এবং বালক দ্বারকানাথ পুনরায় ক্রীড়ামোদে মত্ত হইলেন। অতঃপর তাঁহাকে ইংরেজি শিক্ষা দিবার চেষ্টা হইল। সেই সময়ে এদেশে ইংরেজি শিক্ষা সবে মাত্র প্রচলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু ইংরেজি শিখিলে স্বধর্মত্যাগী হইবে এই আশঙ্কায় অনেক মাতাপিতাই সন্তানকে ইংরেজি শিখিতে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তৎসত্ত্বেও অনন্যোপায় হইয়া, দ্বারকানাথের অভিভাবকগণ তাঁহাকে ইংরেজি শিক্ষা দিতেই মনস্থ করিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইতে বাধা জন্মিতে লাগিল। অবশেষে প্রায় পনের বৎসর বয়সে দ্বারকানাথ পুনরায় খুল্লতাতের টোলে প্রবেশ করিলেন। এইবারে তিনি বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়নে ব্রতী হইলেন এবং স্বভাব সুলভ প্রতিভারবলে, অল্পকাল মধ্যেই কৃতীত্বের সহিত শিক্ষার প্রথম স্তর উত্তীর্ণ হইলেন। বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার অনুরাগ দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহার অভিভাবকগণ উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিক্রমপুরে প্রেরণ করিলেন। এই সময়েই দ্বারকানাথের পিতৃবিয়োগ হয়। বিক্রমপুরে কতিপয় বর্ষ অবস্থান করিয়া তিনি নানাশাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন এবং দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বপুরুষদের প্রথানুযায়ী টোল স্থাপন করিলেন। পূর্ব্বাবধিই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তিনি অধ্যাপক হইবেন। কিন্তু পারিবারিক অস্বচ্ছলতা বশতঃ তিনি কিছুকাল পরে চতুষ্পাঠী উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন এবং চাকুরীর সন্ধানে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিছুকাল কলিকাতায় একটি মাদ্রাসায় চাকুরী করিবার পর, বিক্রমপুরবাসী এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পরামর্শে তিনি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নের জন্য মুর্শিদাবাদে গমনপূর্ব্বক

দেশবিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য গঙ্গাধর কবিরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

কতিপয় বর্ষ গঙ্গাধর কবিরাজের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া, তিনি অর্থোপার্জ্জনের জন্য পুনরায় কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তিনি গঙ্গাধর কবিরাজের অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন তজ্জন্য শিক্ষা সমাপন হইলেও গুরু শিষ্যকে বিদায় দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের জন্য বাধ্য হইয়া দ্বারকানাথ গুরুর নিকট হইতে বিদায় লইলেন এবং প্রায় কপর্দ্দকহীনভাবে কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হইলেন।

কলিকাতায় তিনি পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। প্রথম কয়েক বৎসর তাঁহাকে বিশেষ সংগ্রাম করিয়া সংসার চালাইতে হইত। ক্রমে তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্যের বার্ত্তা প্রচারিত হইতে থাকায়, অর্থাগমও যথেষ্ট হইতে লাগিল এবং তিনি কলিকাতার প্রধান আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যদের অন্যতম বলিয়া পরিচিত হইলেন।

পরবর্ত্তী জীবনে চিকিৎসকরূপে দ্বারকানাথ যে, দেশবিস্তৃত সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন, তাহা দেশবাসী সম্যক অবগত আছেন। পণ্ডিতরূপেও তিনি দেশমান্য হইয়াছিলেন। ইয়োরোপের অন্তর্গত অষ্ট্রীয়ার যুবরাজ ভারত ভ্রমণে আসিয়া এদেশের কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা করিলে, সরকারকর্ত্তৃক দ্বারকানাথ সেই পণ্ডিত মণ্ডলীর অন্যতম মনোনীত হন।

দ্বারকানাথের চিকিৎসানৈপুণ্য ভারতীয় রাজন্যবর্গের নিকটও প্রচারিত হইয়াছিল। ১৯০১ খ্রীঃ অব্দে উদয়পুরের মহারাণা সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া, ভারত সরকারের নিকট একজন উপযুক্ত কবিরাজের সন্ধান করেন। তখন সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া, ভারতসরকার দ্বারকানাথকে উদয়পুরে প্রেরণ করেন। তিনি মাসাধিককাল উদয়পুরে থাকিয়া সুচিকিৎসার দ্বারা মহারাণাকে নিরাময় করেন।

১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি প্রাপ্ত হন। উপাধির সনন্দ আনিতে যাইবার সময়ে তিনি সাধারণ বাঙ্গালীর বেশভূষা ধুতি ও উত্তরীয় পরিধান করিয়াই গমন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পর এইরূপ মানসিক বলের পরিচয় আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই।

দ্বারকানাথ স্বোপার্জ্জিত প্রভূত ধনের যথেষ্ট সদ্ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। নিজ গ্রামে একটি বিদ্যালয় ও পাঠাগার স্থাপন করেন এবং বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রকে নিজ বাড়ীতে আহার বাসস্থান প্রদানের ব্যবস্থা করেন। স্বগ্রামে

একটি অতিথিশালাও স্থাপন করেন। কলিকাতায় বাসভবনের সন্নিকটে অপর একটি ভবন নির্ম্মাণ করাইয়া দরিদ্র ছাত্রদিগের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। এই সকল কাজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যথোপযুক্ত অর্থেরও ব্যবস্থা করিয়া যান। প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময়ে, সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট বার্ষিক অর্থ প্রাপ্ত হইতেন। সেই সময়ে শৈশবে মক্তবে যে গুরুর নিকট ফারসী পড়িয়াছিলেন, সেই বৃদ্ধ মুন্‌সী মোবারক আলিও যথাযোগ্য গুরুদক্ষিণা লাভ করিতেন।

১৩১৫ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (ফেব্রুয়ারী, ১৯১৯) এই দেশবিশ্রুত পণ্ডিত ও দাতা দেহত্যাগ করেন।

দ্বিজ কালিদাস—একজন বাঙ্গালী কবি। ইহার রচিত গ্রন্থ "কালী-বিলাস"। কালী-বিলাসে, সপ্তশতী চণ্ডীর উপাখ্যান ভাগ এবং দক্ষযজ্ঞ বৃত্তান্ত ছন্দে লিখিত। উক্ত গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রারম্ভেই একটী করিয়া সেইরূপ ভাবময় সঙ্গীত আছে।

দ্বিজদাস দত্ত—স্বদেশ প্রেমিক শিক্ষাব্রতী ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামচরণ দত্ত। সেই গ্রামেরই মহাত্মা আনন্দমোহন নন্দী (যিনি পরে আনন্দ স্বামী নামে বিখ্যাত হন) মহাশয়ের কন্যা মুক্তকেশী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। যৌবনকালেই তিনি ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবাধীন হন। আনন্দমোহন নন্দী মহাশয় ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য ছিলেন, সুতরাং প্রাচীন সমাজস্থ রামচরণ দত্ত মহাশয় বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বিবাহের রাত্রে দ্বিজদাসকে এক ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। বলা বাহুল্য পরে দ্বিজদাস বাবু এই মুক্তকেশী দেবীকেই বিবাহ করিয়াছিলেন। রামচরণ বাবু পুত্রের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু সুশীলা পুত্রবধুর ব্যবহারে রামচরণ বাবু ও তাঁহার পত্নী পুত্রের প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ করেন।

দ্বিজদাস বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর সরকারী বৃত্তি লইয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে গমন করেন। সেইস্থান হইতে এম, এ পাশ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেশে আসিয়াই তিনি উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করিতে প্রয়াসী হন, কিন্তু এবিষয়ে তাঁহার চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নাই। ঐ সময়েই তাঁহার নিকট আত্মীয় ডাঃ মহেন্দ্রনাথ নন্দী দেয়াশলাই প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। উহাই এ দেশের দেয়াশলাই প্রস্তুতের প্রথম উদ্যম। দ্বিজদাসবাবু প্রথমে মহিলাদের উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়

কলিকাতার বেথুন স্কুল ও পরে কুমিল্লা জিলা স্কুলে কিছুকাল প্রধান শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি খুব স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন। কুমিল্লা জিলা স্কুলে কাজ করিবার সময়ে তিনি বাঁশের ছাতা ও লাঠি ব্যবহার করিতেন, কখনও বিলাতী ছাতা ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার অনুকরণে ছাত্রেরাও বাঁশের ছাতা ও লাঠি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। বর্ষাকালে, জিলা স্কুলের বারান্দা বাঁশের ছাতা ও লাঠিতে পূর্ণ হইয়া যাইত। তিনি পরে শিক্ষকের কাজ ছাড়িয়া ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। বিহার প্রদেশে থাকার সময়ে নীলকর সাহেবরা তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও নির্ভীক বিচারে ভীতিগ্রস্ত হইয়া উঠেন। তাহার ফলে তিনি বঙ্গদেশে ভূমি রাজস্ব বিভাগে (Settlement Officer) বদলী হইলেন। পরে তিনি শিবপুর সরকারী পূর্ত্ত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই স্থানে অবস্থানকালেই তাঁহার পুত্র উল্লাসকর দত্ত, মাণিকতলা বোমার মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হইয়া শাস্তি প্রাপ্ত হন। পুত্রের অপরাধে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং কিছুকালের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পেনসন রহিত করেন।

তিনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। বেদ, সংহিতা, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র বিশেষরূপে পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বেদ সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আরবী, ফারসী ও উর্দ্দু ভাষাতেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

তিনি বাঙ্গালাদেশের পাট চাষ সম্বন্ধে একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে পাট চাষ করিয়া যে কৃষকেরা কিছুমাত্র লাভবান্ হয় না, তাহা অতি পাণ্ডিত্যের সহিত সপ্রমাণ করা হইয়াছে। তিনি কৃষকদের একজন হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। কৃষকদের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন, এই জন্য তিনি প্রবন্ধ লিখিয়া ও বক্তৃতা দিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতেন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার মত খুব উদার ছিল। তিনি শেষ জীবনে কুমিল্লা নগরে অবস্থান করিয়া সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্র হইতে স্বীয় মত সংগ্রহ করিয়া বক্তৃতা দিতেন ও প্রবন্ধ লিখিতেন।

তাঁহার ন্যায় অমায়িক, উদার ও সরল প্রকৃতির লোক অল্পই দেখা যায়। তাঁহার মত সুপণ্ডিত, চিন্তাশীল ও পরদুঃখকাতর ব্যক্তির মৃত্যুতে দেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি ১৩৩১ বঙ্গাব্দে পরলোক গমন করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর— কলিকাতা জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ ঠাকুর-বংশোদ্ভব মনীষী। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সহোদর। ১২৪৬ বঙ্গাব্দের ২৬শে ফাল্গুন (১৮৪০ খ্রীঃ, মার্চ্চ) তাঁহার জন্ম হয়। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। তৎকালে প্রচলিত নিয়মানুসারে কিছু-কাল গৃহশিক্ষকের নিকটেই পাঠ গ্রহণ করেন। বাল্যকালে কৃত্তীবাসের রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত তাঁহার প্রিয় গ্রন্থ ছিল। তদ্ভিন্ন গৃহের এক বৃদ্ধ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে তিনি প্রত্যহ রামায়ণ মহাভারতের গল্প অতি আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন। ঐ সময় হইতেই কিছু লিখিবার জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ ছিল। যাহা কিছু মনে আসিত, তাহাই গদ্যে ও পদ্যে লিখিয়া ফেলিতেন।

প্রথমে তিনি এক বাঙ্গালা বিদ্যা-লয়ে ভর্ত্তি হন। কয়েক বৎসর পরে কলিকাতার সেন্ট পল্‌স (St. Pauls') স্কুলে প্রবেশ করেন। ইংরেজি অপেক্ষা বাঙ্গালা শিখিবার ও লিখিবার আগ্রহ তাঁহার অতি প্রবল ছিল। পরবর্ত্তী-কালে তিনি ইংরেজি সাহিত্যেও কৃতবিদ্য হন। সেক্‌সপীয়ার (Shakespeare), বায়রণ (Byron), কীট্‌স (Keats) প্রভৃতি ইংরেজ কবিগণের কাব্য তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। কাব্য, দর্শন শাস্ত্র এবং উচ্চস্তরের গণিত আলোচনায় তিনি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। আ-যৌবন তিনি গভীর নিষ্ঠার সহিত এই সকলের চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। "স্বপ্ন প্রয়াণ" নামে একখানি উচ্চ ভাবাপন্ন দার্শনিক রূপক কাব্য তিনি রচনা করেন। এই শ্রেণীর গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অধিক নাই। এতদ্ভিন্ন তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থের এবং কালি-দাসের মেঘদূতের পদ্যানুবাদও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি হাস্যরসাত্মক কবিতা রচনাতেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার "গুম্ফ আক্রমণ কাব্য" এককালে সাহিত্যামোদীদের বিশেষ প্রিয় হইয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ দর্শন সম্বন্ধে কয়েকখানি গভীর ভাবপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। তদ্ভিন্ন বহু মাসিক পত্রিকায় তাঁহার সুচিন্তিত উচ্চ ভাবমূলক প্রবন্ধ প্রকা-শিত হইত। উচ্চ গণিত সম্পর্কিত কতকগুলি প্রবন্ধ তিনি রচনা করেন। বলা বাহুল্য বিষয়ের গুরুত্ব হেতু ঐ সকল প্রবন্ধ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সেই-রূপ প্রচারিত হয় নাই। দ্বিজেন্দ্রনাথ গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। গীতা ও উপনিষদাদি হিন্দু শাস্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা তিনি দেশবাসীকে উপহার প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার

অসাধারণ চিন্তাশক্তি ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রতিভার বলে, অন্যে যে সকল সত্যের অস্তিত্ব অনুমান করিতে সমর্থ হন নাই, তিনি শাস্ত্রবচন হইতে তাহা পরিস্ফুট করিতে সমর্থ হইতেন। ভারতীয় দর্শনে তাঁহার অন্তরঙ্গ সাধারণ অধিকারের বিষয় অবগত ছিলেন বলিয়াই, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁহাকে, ইংরেজি ভাষায়, ভারতীয় দর্শনের মূলতত্ত্ব সমূহ পাশ্চাত্য জগতে প্রচার করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু স্বভাব-সুলভ বিনয় বশতঃ তিনি, ইংরেজি ভাষায় যথেষ্ট অধিকার নাই, এই হেতু দর্শাইয়া ঐ অনুরোধ রক্ষা করিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ মনে প্রাণে গভীর জাতীয় ভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কেহ কখনও কোনও প্রকারে জাতীয় সম্মান হানীকর কিছু বলিলে, তিনি গভীর মর্ম্মবেদনা পাইতেন এবং সময়ে সময়ে উত্তেজিত হইয়া তীব্র ভাবে উহার প্রতিবাদ করিতেন। অথচ তাঁহার ন্যায় ধীর শান্ত প্রকৃতির লোক খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিবে, ইহাই তাঁহার জীবনের স্বপ্ন ছিল।

পুত্র পৌত্র, ধনজনবিভব সমস্তের অধিকারী হইয়াও তিনি আজীবন অনাসক্ত গৃহীর ন্যায় জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব হইতে আরম্ভ করিয়া, সামান্য ইতর জীবজন্তুও, তাঁহার স্নেহ ভালবাসা হইতে কখনও বঞ্চিত হয় নাই। শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে যখন পাঠগৃহে জ্ঞানচর্চ্চায় নিমগ্ন থাকিতেন, তখন বাস-সংলগ্ন আমলক কুঞ্জের জীবগুলি অনেক সময়ে তাঁহার ব্যাঘাত জন্মাইত। শালিক, চড়াই, কাঠবিড়ালী প্রভৃতি আসিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত; গায়ের, মাথায় অথবা পাঠ্য পুস্তকাদির উপর নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে বিচরণ করিত। তিনি মধ্যে মধ্যে বিশেষ অসুবিধা বোধ করিলেও কখনও তাহাদিগকে তাড়না করিতেন না।

আজীবন জ্ঞানতপস্বী, অমায়িক সরল প্রকৃতি অথচ তেজস্বী, এই মনীষী দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হইয়াছিলেন। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ৪ঠা মাঘ (১৯২৬ খ্রীঃ জানুয়ারী) ছিয়াশী বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। দ্বিপেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র দীনেন্দ্রনাথ মাত্র তখন বর্ত্তমান ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু—(১) বাঙ্গালী ব্যবহারজীবী। তিনি কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দেশপ্রসিদ্ধ নেতা ভূপেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার পিতৃব্য ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতীছাত্র ছিলেন।

প্রথমে এদেশেই আইন (B. L.) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। পরে ইংলণ্ডে গমন করিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন। তিনি বিশেষ ক্রীড়ামোদী ছিলেন। বাঙ্গালার ব্রতীবালক সঙ্ঘের (Boy Scout Association) তিনি সহঃ সভাপতি ছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি কলিকাতা ফুটবল লিগের (League) সভাপতি এবং ইণ্ডিয়ান ফুটবল য়্যাসোসিয়েশনের সহঃ সভাপতিও হইয়াছিলেন। বেঙ্গল অলিম্পিক য়্যাসোসিয়েশনের (Bengal Olympic Association) সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ক্রীড়াসঙ্ঘ মোহনবাগান ক্লাবেরও অন্যতম কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ মিষ্টভাষী অমায়িক দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার চারি পুত্র ও তিন কন্যা বর্ত্তমান ছিলেন। প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী ও জননায়ক যতীন্দ্রনাথ বসু তাঁহার অগ্রজ। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে কলিকাতা নগরে দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু—(২) লেখক ও দেশকর্ম্মী। বিহার প্রদেশের অন্তর্গত ভাগলপুর সহরে ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে (বঙ্গাব্দের ১২৭২ ৪ঠা পৌষ) তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺ব্রজকিশোর বসু মহাশয় সে সময়ে ভাগলপুর জিলা স্কুলে শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার পিতা একজন সুপণ্ডিত, বিদ্যানুরাগী, প্রসিদ্ধ সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন। স্ত্রী জাতীর উচ্চ শিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। (কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় দেখ)। বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল হইতে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পরে কলিকাতায় আসিয়া এফ্-এ পরীক্ষায় পাশ করেন। শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ আর বি, এ পরীক্ষা সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। কর্ম্মজীবনের প্রথমভাগে তিনি কলিকাতায় বাস করেন। সে সময়ে সর্ব্বদাই সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে উৎসাহের সহিত চর্চ্চা করিতেন। পিতার নিকট হইতে বিদ্যানুরাগ এবং বিশেষতঃ প্রাণীবিদ্যা চর্চ্চায় উৎসাহ লাভ করেন। শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি কিছুদিন যশোহর সম্মিলনী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে কয়েক বৎসর উড়িষ্যার অন্তর্গত ঢেঁকানাল রাজার গৃহশিক্ষক ও অভিভাবকরূপে কাজ করেন। পরে তাঁহার ভগ্নীপতি খ্যাতনামা দেশকর্ম্মী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর, তিনি কিছুদিন কলিকাতা ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশনের (Indian Association) সহঃ-কর্ম্মাধ্যক্ষের কাজ করেন. সুদীর্ঘকাল তিনি জাতীয় মহাসমিতির কার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯০১ খ্রীঃ অব্দে কলি-

কাতায় অনুষ্ঠিত মহাসমিতির অধিবেশনের সহিত যে শিল্প প্রদর্শনী হয়, তিনি তাহার একজন কর্ম্মীরূপে শিল্প সম্ভার সংগ্রহ করিবার জন্য ভারতের নানাস্থানে গমন করেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ বালকবালিকাদের উপযোগী প্রাণীতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি পাঠ্যাবস্থা হইতেই বৈজ্ঞানিক গ্রন্থরাজী পাঠে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন এবং সখা, সখা ও সাথী প্রভৃতি তৎকালে প্রচলিত বালকবালিকাদের পত্রিকায় সরল ভাষায় প্রাণীজগৎ সম্বন্ধে বহু মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি জীব-জন্তু ও কীট পতঙ্গ নামে দুইখানি মনোরম পুস্তক প্রণয়ন করেন। তৎপূর্ব্বে বালকবালিকাদের উপযোগী করিয়া ঐ শ্রেণীর আর কোনও পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। এক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্র বাবু একরূপ পথ প্রদর্শক ছিলেন।

জনহিতকর কার্য্যের সহিতও তাঁহার বিশেষ যোগ ছিল। পূর্ব্বোক্ত ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে তিনি একবার নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও, ছদ্মবেশে আসামের চা-বাগানের কুলীদের অবস্থা জানিবার জন্য গমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কলিকাতার ভাড়াটিয়া মোটর যানচালক (Taxi-Drivers' Association) সমিতির কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন।

১৩২৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে (১৯২১ সালের নবেম্বর) মাত্র পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি অকৃতদার ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—খ্যাতনামা কবি ও নাট্যকার। ১২৭০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে (১৮৬৯ খ্রীঃ জুলাই) নদীয়া কৃষ্ণনগরে পিতৃভবনে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় নদীয়া রাজাদের দেওয়ান ছিলেন (কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় দ্রষ্টব্য)। তাঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। দ্বিজেন্দ্রলালের মাতা প্রসন্নময়ী শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের বংশীয় কালাচাঁদ গোস্বামীর কন্যা ছিলেন।

প্রথমে কৃষ্ণনগরের য়্যাংলো বার্ণাকুলার (Anglo Vernacular) স্কুলে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। তৎপরে তিনি তথাকার কলেজ সংলগ্ন বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৮৮৪ খ্রীঃ)। তৎপরে যথাসময়ে হুগলী কলেজ হইতে এফ্-এ (First Arts) কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে বি-এ এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সী (Presidency) কলেজ হইতে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দশ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন এবং এম্-এ পরীক্ষাতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

পাঠ্য জীবন শেষ করিয়া সামান্য

কিছুকাল বিহারের অন্তর্গত রাজেনগঞ্জ [illegible] কৃ[illegible] বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। [illegible] অগ্রজ রাজেন্দ্রলাল তথাকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তৎপরে সরকারী বৃত্তি পাইয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে গমন করেন। তিন বৎসর তথায় থাকিয়া বিখ্যাত সিরেন্সেষ্টারের (Cirencester) কৃষি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া বিবিধ উপাধি (F. R. A. S.; M. R. A. C. ও M. R. S. A. E.) লাভপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন (১৮৮৬ খ্রীঃ ডিসেম্বর) এবং জরিপ ও জমাবন্দী বিভাগে (Survey and Settlement) উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। এই সময়েই কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কন্যা সুরবালার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করিয়া তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভের জন্য কিছুকাল মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত রায়পুরে প্রেরিত হন। তৎপরে বাঙ্গালা দেশেরই (সেই সময়ে বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর একই ছোটলাটের শাসনাধীন থাকিয়া বাঙ্গালা Bengal নামে পরিচিত ছিল) নানাস্থানে গমন করেন। প্রায় ছাব্বিশ বৎসর কাল বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া ১৯১২ খ্রীঃ অব্দে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হেতু অবসর গ্রহণ করেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল সাহিত্যিক হিসাবেই সমধিক খ্যাত ছিলেন। অতি অল্পকালেই তাঁহার কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আট নয় বৎসর বয়সেই সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিয়া বয়োজ্যেষ্ঠগণের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন। তাঁহার অধিকাংশ কবিতা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমূলক ছিল। তিনি ঐ বয়সেই অপেক্ষাকৃত অল্পভাষী ও গম্ভীর ছিলেন। সেইজন্য বাল্যকালের কবিতাগুলি প্রায়ই বিষাদময়। বিদ্যালয়ে পাঠকালে নিয়মিত কবিতা ও গান রচনা করিতেন। তাঁহার দ্বাদশ হইতে সপ্তদশ বৎসরের মধ্যে রচিত কবিতা ও গানগুলি "আর্য্যগাথা" (১ম) নামে প্রকাশিত হয় (১৮৮২ খ্রীঃ)। আর্য্যদর্শন, নব্যভারত, বান্ধব প্রভৃতি তৎকাল খ্যাত মাসিক পত্রিকাগুলিতে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইত। পরে স্বাস্থ্যহানী বশতঃ এবং অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকায় দীর্ঘকাল আর বিস্তৃতভাবে সাহিত্য চর্চ্চা করিবার সুযোগ পান নাই। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি কিছু কিছু ইংরেজি কবিতাও রচনা করেন এবং Lyrics of Ind নামে একখানি কবিতার পুস্তকও রচনা করেন। গ্রন্থখানি খ্যাতনামা ইংরেজ কবি সার এডউইন আর্ণল্ডকে (Sir Edwin Arnold) উৎসর্গ করেন। এই পুস্তক প্রকাশ দ্বারা তিনি ইংলণ্ডের

সাহিত্য রসিকগণের সহিত বিশেষ পরিচিত হন। দেশে ফিরিয়া আসিবার পর কর্ম্ম জীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও কতকগুলি ইংরেজি কবিতা রচনা করেন। সেইগুলির আর পরে সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ইংলণ্ডে অবস্থান-কালে তাঁহার অন্যতম অগ্রজদ্বয় জ্ঞানেন্দ্র-লাল ও হরেন্দ্রলাল সম্পাদিত "পতাকা" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্র-লালের অনেক পত্র প্রকাশিত হয়। ঐ সকল পত্রে নানা বিষয়ে তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ শক্তি ও দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কর্ম্মজীবনের প্রথমভাগে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত আর্য্যগাথার ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়। পরে আলেখ্য, ত্রিবেণী ও মন্দ্র নামে আরও তিনখানি উচ্চাঙ্গের কাব্য প্রণয়ন করেন। "মন্দ্র" কাব্যের কবিতাগুলি গভীর ভাবোদ্দীপক ও পবিত্র ভাবপূর্ণ।

হাস্যরসাত্মক কবিতা ও সঙ্গীত রচনাতেও দ্বিজেন্দ্রলাল সেই সময়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁহার ব্যঙ্গ কবিতা সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে, নূতন ধরণের সুরে এবং রচিত ব্যঙ্গ সঙ্গীতগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কাব্যগুলির মধ্যে আষাঢ়ে ও হাসির গান সমধিক প্রসিদ্ধ। হাসির গানের অনেক সঙ্গীত পরবর্ত্তীকালে প্রণীত নাটকগুলির অন্তর্ভুক্ত হয়। সামাজিক কুসংস্কার, কপটতা ভণ্ডামী প্রভৃতি আক্রমণ করিয়া তিনি যে সকল সঙ্গীতাদি রচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকগুলির মূলে সত্য ঘটনা ছিল।

নাট্যকাররূপে দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতি আরও অধিক ছিল। তাঁহার নাটক-গুলি প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর ছিল—পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক। ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে মেবার পতন, সাজাহান, দুর্গাদাস, নূরজাহান ও প্রতাপসিংহ সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহা-দের প্রত্যেকটিতে তিনি একটি আদর্শ চরিত্র অঙ্কণ করিতে প্রয়াস পান। এই নাটকগুলির ভিতর দিয়া তিনি দেশাত্ম বোধ প্রচার করিবার যে চেষ্টা করেন। তাহা যে বিশেষ ফলদায়ক হইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্য ও রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাসবেত্তারা সমধিক অব-গত আছেন। বিভিন্ন নাটকাবলীর অন্তর্গত অনেকগুলি সঙ্গীত বহুকাল বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল যে সকল সঙ্গীত রচনা করেন, তাহাদের মধ্যে "আমার দেশ" (বঙ্গ আমার জননী আমার ইত্যাদি) এবং "আমার জন্মভূমি" (ধন ধান্য পুষ্পভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা ইত্যাদি) শীর্ষক জাতীয় ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত দুইটি এককালে গভীর উন্মাদনার সৃষ্টি করিত। বাঙ্গালার জাতীয় সঙ্গীত সমূহের মধ্যে উহাদের তুল্য প্রাণোন্মা-দক সঙ্গীত অধিক নাই। তদ্ভিন্ন বঙ্গ

ভাষা ও সাহিত্যকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার "বঙ্গ-ভাষা" (আজি গো তোমার চরণে জননি ইত্যাদি) নামক সঙ্গীতটিও বহুকাল সহস্র কণ্ঠে গীত হইত। তাঁহার অন্যান্য সঙ্গীতগুলিও ভাব ও ভাষার মাধুর্য্যে বাঙ্গালা ভাষার শ্রেষ্ঠ রত্নসমূহের অন্যতম।

কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি সরকারী চাকুরীয়া হইলেও দেশাত্মবোধ, তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার জন্য সর্ব্বদাই সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। শেষোক্ত দুইটি কারণে বহুবার উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। একবার বাঙ্গালার অন্যতম ছোটলাট সার চার্লস ইলিয়াট (Sir Charles Elliot) সাহেবের সহিতও তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ছোটলাট সাহেব তাঁহার নির্ভীক আচরণে ও স্পষ্ট বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে বিড়ম্বিত করিতে চেষ্টা করেন। সুখের বিষয় দ্বিজেন্দ্রলালের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা তাঁহার কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট থাকায় ছোটলাটের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। ইহা ভিন্ন পরেও কয়েকবার উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয় এবং চাকুরী জীবনের প্রায় শেষভাগে তিনি মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া, আমলাতন্ত্রের কার্য্য প্রণালীর তীব্র সমালোচনা করিয়া "Honesty is not the Best Policy" (সততা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পন্থা নহে) নামে এক বক্তৃতা প্রদান করেন।

ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিবার জন্য অনেকে চেষ্টা করেন। সেই কারণে তাঁহার বিবাহের সময়েও অনেকে তাঁহার সহিত সামাজিক সংশ্রব পরিহার করেন। কিন্তু তিনি শত অনুরোধেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে সম্মত হন নাই। ঐ সময়ে আচার-সর্ব্বস্ব, সমাজপতিদের ব্যবহারে, অতিমাত্র বিরক্ত হন। তাঁহার অনেক হাসির গানে ও কবিতায় ঐ সকল প্রাণহীন ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীদিগকে তীব্র কশাঘাত করেন। ইংলণ্ড হইতে ফিরিবার পর তিনি অনেক বিষয়ে সংস্কারপন্থী হন এবং আচার ব্যবহারে খানিকটা পাশ্চাত্য ভাব অবলম্বন করেন।

ইংলণ্ডে অবস্থান কালেই তাঁহার মাতা ও পিতার পরলোক প্রাপ্তি হয়। বিবাহিত জীবনের ষোড়শ বর্ষে তিনি বিপত্নীক হন। পত্নীর মৃত্যু তাঁহার জীবনের এক বিশেষ পরিবর্ত্তন আনয়ন করে।

বাল্যকাল হইতেই তিনি তীক্ষ্ণধী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার প্রাক্কালে তাঁহার এক ইংরেজী রচনা প্রেসিডেন্সী কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক রো সাহেবের (F. J. Rowe) বিশেষ প্রশংসা লাভ করে।

কৃষ্ণনগরে স্কুলে পড়িবার সময়েই তিনি এক "চাদর নিবারণী সভা" স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি শৈশব হইতে সুকণ্ঠ ছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে উৎকৃষ্টরূপে ইংরেজি সঙ্গীতও শিক্ষা করেন। তাঁহার অনেক বাঙ্গালা গানের সুরে ইংরেজি সুরের মিশ্রণ আছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল সাহিত্যরসিকও ছিলেন। বন্ধুবান্ধবগণকে লইয়া সামাজিক আলাপ পরিচয়, সাহিত্য চর্চ্চা প্রভৃতির জন্য তিনি "পূর্ণিমা সম্মিলন" নামে একটি অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করেন। ১৩১১ বঙ্গাব্দের দোলপূর্ণিমার দিন উহার প্রথম অধিবেশন দ্বিজেন্দ্রলালের বাটিতে অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু খ্যাতনামা সাহিত্যরসিক সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তৎপরে ক্রমে ঔপন্যাসিক ৺দামোদর মুখোপাধ্যায়, নাট্যকার ৺অমৃতলাল বসু, অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু, বিচারপতি ৺সারদাচরণ মিত্র, সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী, দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি বিভিন্ন মনস্বীগণের আমন্ত্রণে তাঁহাদের গৃহে বিভিন্ন পূর্ণিমায় ঐ সম্মিলনীর অনুষ্ঠান হয়। কর্ম্মজীবনের প্রথমভাগে তিনি ও তাঁহার কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া এক "ডাকাতের ক্লাব" প্রতিষ্ঠা করেন। উহা সামাজিক মেলামেশার এক প্রধান স্থান ছিল। প্রতি রবিবার সকাল হইতেই উহার অধিবেশন আরম্ভ হইত। সঙ্গীতালাপ, সাহিত্য আলোচনা, আবৃত্তি, গল্প পাঠ প্রভৃতি কাজে সমস্ত দিন উহার অধিবেশন চলিত। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যরথীগণও ঐ দলের "ডাকাত" ছিলেন। ঐ ডাকাতের ক্লাবের বিভিন্ন অধিবেশন উপলক্ষেই দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক বাঙ্গ সঙ্গীত রচিত হয়। কর্ম্মজীবনের শেষভাগে, কলিকাতায় অবস্থান করিবার সময়ে, পুনরায় কিছুকালের জন্য পূর্ণিমা সম্মিলনীর অধিবেশনের আয়োজন করেন। এই সময়েই, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের "মন্দির" প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তিনি পূর্ব্বোক্ত 'বঙ্গ ভাষা' নামক সঙ্গীতটি রচনা করেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করেন। (ক) নাটক—চন্দ্রগুপ্ত, পাষাণী, সিংহল বিজয়, বঙ্গনারী, তারাবাঈ, মেবার পতন, রাণা প্রতাপ, সীতা, পরপারে, দুর্গাদাস, নূরজাহান, সাজাহান, ভীষ্ম ও প্রায়শ্চিত্ত। (খ) প্রহসন—বিরহ, পুনর্জন্ম, ত্র্যহস্পর্শ, কল্কি অবতার, আনন্দ বিদায়, একঘরে। (গ) গীতিনাট্য—সোরাবরুস্তম। (ঘ) কাব্য—আর্য্যগাথা ১ম ও ২য় ভাগ, আলেখ্য, ত্রিবেণী, মন্দ্র,। (ঙ) সঙ্গীত হাসির গান।

সাহিত্যিক জীবনের মধ্যভাগে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে শুচিতার অভাব ও অস্পষ্টতার জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের

বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন এবং কয়েক বৎসর এই বিষয় লইয়া বহু সাহিত্যিকদের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি পড়িয়া দ্বিজেন্দ্রলালের ধারণা হয় যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সকল রচনার জন্য ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা (divine inspiration) দাবী করেন। এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পত্রালাপ হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত উত্তর, দ্বিজেন্দ্রলালের মনঃপূত না হওয়ায়, তিনি মাসিক পত্রিকায় এই বিষয় আলোচনা আরম্ভ করেন।

কর্ম্মজীবনের শেষভাগে কয়েক বৎসর ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং সন্ন্যাস রোগের আক্রমণে তাঁহার কর্ম্ম ক্ষমতা বিশেষ হ্রাস পায়। মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পূর্ব্বে, অধুনা বিখ্যাত "ভারতবর্ষ" নামক মাসিক পত্রিকার প্রকাশের সূচনা হয়। দ্বিজেন্দ্রলালই তাহার প্রথম সম্পাদক হইবেন এইরূপ স্থির হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পূর্ব্বেই ১৩২০ বঙ্গাব্দের ৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৯১৩ খ্রীঃ মে) কলিকাতায় বাটীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের একমাত্র কন্যা মায়ার সহিত, দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র ভবশঙ্করের বিবাহ হয়। খ্যাতনামা গায়ক ও কবি দিলীপকুমার দ্বিজেন্দ্রলালের একমাত্র পুত্র।

দ্রোণ মহামুনি—এই ভক্ত সাধু মীনা বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্রুটক—একজন বৌদ্ধ স্থবির। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা মানবের কল্যাণ সাধনে তাঁহার জীবন উৎসৃষ্ট ছিল।

দ্রমিড়াচার্য্য—দাক্ষিণাত্যের একজন দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি খ্রীঃ তৃতীয় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি বিশিষ্টা দ্বৈতবাদী ছিলেন। তাঁহার রচিত ভাষ্যের নাম দ্রমিড় ভাষ্য। তাঁহার রচিত গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। রামানুজ তাঁহার শ্রী-ভাষ্যে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

দ্রুপদমুনি—একজন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। গো প্রভৃতি লক্ষণ নামক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

দ্রোণসিংহ—তিনি বল্লভীপুরের মৈত্রক বংশের প্রতিষ্ঠাতা ভটার্কের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ৫০৯ হইতে ৫২৬ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে কোনও সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ধরসেন (প্রথম) দেখ।

ধঙ্গদেব—তিনি প্রাচীন কাণ্যকুব্জ নগরের চন্দেল্ল বংশীয় যশোধর্ম্ম দেবের পুত্র। খজুরাহ গ্রামে বিশ্বনাথ মন্দিরে আবিষ্কৃত শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় ১০৫৯ বিক্রমাব্দে (১০০২ খ্রীঃ) এই পরাক্রান্ত নরপতি রাঢ় ও অঙ্গ দেশ জয় করিয়াছিলেন।

ধঙ্গরনাথ—একজন নাথপন্থী যোগী। তিনি প্রণব সাধন বিশেষ করিয়া প্রচলন করেন। তাঁহার অন্যান্য মত গোরক্ষপন্থীদের ন্যায়।

ধণবাল (সং—ধনপাল)—একজন জৈন কথা গ্রন্থকার। তিনি 'ভবিসত্ত কথা' নামে অপভ্রংশ ভাষায় একখানি কথাগ্রন্থ রচনা করেন। জৈন ধর্ম্মের কোনও অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনই পুস্তকখানির প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনি কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই।

ধগুল—মোহাম্মদ ঘোরীর আক্রমণে কনৌজরাজ জয়চন্দ্র পরাজিত হইলে তাঁহার পৌত্র শিবাজী ১২১২ খ্রীঃ অব্দে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া, রাজপুতানার মরুভূমিতে আশ্রয় লইয়া ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অশ্বথামা। অশ্বথামার অন্যতম পুত্র ধগুল গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা এখনও রাজপুতানায় বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

ধনকৃষ্ণ সেন—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত খাঁড় গ্রামে ১২৭১ বঙ্গাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামপরাণ সেন। জাতি উগ্র ক্ষত্রিয়। গ্রামের পাঠশালাতে তিনি ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তৎপরে বর্দ্ধমানে মহারাজার কলেজে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। এই কলেজ হইতেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেই সময় হইতেই তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। যথা সময়ে তিনি এফ্-এ পরীক্ষা দেন। অতঃপর তিনি 'সুন্দরী' নামক একখানি উপন্যাস রচনা করিতে আরম্ভ করেন, তাহার প্রায় অর্দ্ধেক অংশ ও 'দস্যুদুহিতা' নামক একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস 'উগ্র ক্ষত্রিয় প্রতিনিধি' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১২৯৪ সালে বি-এ পড়িবার মানসে তিনি কলিকাতা আসিয়া মেট্রোপলিটন কলেজে বি-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে ১২৯৫ সালে প্রথম 'সুদর্শনের রাজ্যাভিষেক' নামক নাটক রচনা করেন। ক্রমে তিনি, সতী মালাবতী, অনুধ্বজের হরিসাধন, অভিমন্যু বধ, সত্যনারায়ণ মাহাত্ম্য, গোবর্দ্ধন মিলন, পৃথুরাজার শতাশ্বমেধ যজ্ঞ, উষাতারা বা জটিল, পাণ্ডব মিলন বা কর্ণ বধ, ধর্ম্মমঙ্গল বা বিল্বমঙ্গল, হংসধ্বজের মহামুক্তি, ধর্ম্মধ্বজ রাজার হরিবাসর, মহামিলন ও মহাপরীক্ষা এই পৌরাণিক নাটকগুলি রচনা করেন। ১৩০২ সা[ল]

তিনি নবদ্বীপের অদূরবর্ত্তী সমুদ্রগড় গ্রামে তারাপ্রসন্ন রায়ের জমিদারীর ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ঐ পদে চারি বৎসর কার্য্য করেন। তৎপর শ্রীরাম-পুরের নন্দলাল গোস্বামী মহাশয়ের ষ্টেটের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ১৩০৯ সালে মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের কেবল-মাত্র পৃথুরাজার শতাশ্বমেধ যজ্ঞ, কর্ণ বধ ও সতীমালাবতী নামক গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাধাকৃষ্ণ সেন কর্ত্তৃক তাঁহার রচিত গ্রন্থের আরও দুই-খানি প্রকাশিত হইয়াছে।

ধনগুপ্ত—যে সকল ভারতীয় পণ্ডিত বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র তিব্বতীয় ভাষায় অনু-বাদ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়—আমে-রিকাপ্রবাসী একজন খ্যাতনামা বাঙ্গালী অধ্যাপক ও লেখক। ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে কলিকাতায় তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায় তমলুকে ওকালতী করিতেন। তিনি ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, পিতামাতার অজ্ঞাতসারে প্রথমে জাপানে, পরে তথা হইতে আমেরিকায় চলিয়া যান এবং শস্যক্ষেত্রে, হোটেলে, গৃহস্থের বাটীতে ও ফলের বাগানে নানা রকম চাকরী করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া-ছিলেন। তিনি কালিফর্ণিয়ার অন্তর্গত ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমা-পন করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হন এবং সাহিত্য সেবায় মন দেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় সাহিত্যিক বলিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রভূত অর্থও উপার্জ্জন করিয়া ছিলেন। প্রসিদ্ধ ফরাসী প্রাজ্ঞ রোমা রোলাঁ তাঁহার লিখিত পুস্তক পাঠ করিয়াই, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি একজন ভাল বক্তাও ছিলেন। ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে নানাস্থানে বহু বক্তৃতা করিয়া বিদেশীদের কৌতু-হল চরিতার্থ করিতেন। মিস মেয়ো নামক মার্কিন মহিলা, যখন 'মাদার ইণ্ডিয়া' নামক পুস্তক লিখিয়া, বিদেশে ভারতবাসীদের কুৎসা প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি তাহার উত্তর স্বরূপ এক পুস্তক প্রকাশ করায়, ভারতবাসীদের সম্বন্ধে আমে-রিকার লোকের ভ্রান্ত ধারণা অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছিল। ইং১৯১৭ সালে তিনি এক মার্কিণ মহিলাকে তথায় বিবাহ করেন। তাঁহার ষোল বৎসর বয়স্ক একটি পুত্র আছে, তাহার নাম নরেন্দ্রগোপাল। তিনি বহু পুস্তক

রচনা করিয়া গিয়াছেন। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত Caste and Out Caste নামক গ্রন্থে তাঁহার জীবনের অনেক কথা বর্ণনা করিয়াছেন। ১৯২৪ সালে My Brother's Face নামক গ্রন্থে তাঁহার ভারত ভ্রমণের বিবরণ বর্ণিত আছে। তাঁহার লিখিত কতক গুলি পুস্তকের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল— Gay Neck, The Face of Silence, The Secret Listeners of the East, A Son of Mother India Aanswer, Devotional Passages from the Hindu Bible. Visit India with Me, Disillusioned India, Rama the Hero of India, Kari the Elephant, Jungle Beasts and Men, Hari the Jungle God, Ghond the Hunter, The Chief of the Herd.

১৯২১ ও ১৯৩২ সালে জন্মভূমি দর্শনার্থ তিনি দুইবার এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি মহারাজ ৺শিবানন্দ স্বামীর মন্ত্র শিষ্য ছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় ১৯৩৬ সালের ১৫ই জুলাই (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) মানসিক অশান্তি লাঘবের জন্য তিনি আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে আত্মহত্যা করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

ধনঞ্জয়—(১) খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাটলীপুত্র নগরে সমুদ্রগুপ্ত সম্রাট ছিলেন। তিনি দক্ষিণাপথের কুস্থলপুর-রাজ ধনঞ্জয় ও অন্যান্য বহু নরপতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

ধনঞ্জয়—(২) মালবের অধিপতি মুঞ্জ বাক্‌পতি রাজদেবের রাজত্বকালে (৯৭৪—৯৯৫ খ্রীঃ) ধনঞ্জয় ও ধনিক নামে দুই ভ্রাতা তাঁহার রাজসভায় বিদ্যমান ছিলেন। ধনঞ্জয় 'দশরূপক' নামে একখানি অলঙ্কার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ধনিক 'অবলোক' নামে উক্ত দশরূপকের এক টীকা প্রণয়ন করেন। ধনঞ্জয় তাঁহার গ্রন্থে গুণাঢ্য বিরচিত 'বৃহৎকথার' উল্লেখ করিয়াছেন।

ধনঞ্জয়—(৩) একজন জৈন আচার্য্য। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'নামমালা' নামে একখানা সংস্কৃত অভিধান রচনা করেন।

ধনঞ্জয় দৈবজ্ঞ—বৎস কুলোদ্ভব ধনঞ্জয় দৈবজ্ঞ একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'জাতক চন্দ্রোদয়' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে বহু গ্রন্থকারের নাম ও তাঁহাদের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পুরীর শঙ্কর মঠে আছে।

ধনঞ্জয় ভাদুড়ী—তিনি পাবনা জিলার অন্তর্গত পোরজনা নামক স্থানের জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহারা "কুসুমাঞ্জলী" প্রণেতা বিখ্যাত পণ্ডিত উদয়নাচার্য্যের বংশধর। এই বংশের শাখা নানাস্থানে বিস্তার লাভ করি-

রাছে। মুকুন্দনাথ ভাদুড়ী পোরজনায় ভাদুড়ী বংশের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। তিনি তিনটী শিশুপুত্র রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করেন।

ধনদেব—অযোধ্যায় মূলদেব, ধনদেব, বায়দেব, বিশাখদেব, সত্যমিত্র, শিবদত্ত, সূর্য্যমিত্র, সঙ্ঘমিত্র, বিজয়মিত্র, মাধব-বর্ম্মা, বহসতিমিত্র, অয়ুমিত্র, দেব-মিত্র, ইন্দ্রমিত্র, কুমুদসেন, অজবর্ম্মা প্রভৃতি রাজাদের নামের প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই সকল মুদ্রায় ব্রাহ্মী অক্ষরে রাজাদের নাম লিখিত আছে। সম্ভবতঃ অযোধ্যা প্রদেশেই তাঁহাদের রাজ্য ছিল।

ধনপতি—এই দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত 'জ্ঞান মুক্তাবলী' নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

ধনপতি সূরী—তিনি 'ভাবোৎকর্ষ দীপিকা' নামে মহাভারতের একখানি উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত আরও গ্রন্থ ছিল। তিনি শঙ্করাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। তাঁহার সকল গ্রন্থ এক্ষণে বহু অনুসন্ধানেও পাওয়া যায় নাই।

ধনপাল—(১) একজন সংস্কৃত কবি। তিনি ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত ছিলেন। পরে জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার অগ্রজ শোভন 'শোভন স্তুতি' নামে জৈন তীর্থঙ্করদের একটি বন্দনাগ্রন্থ রচনা করেন এবং ধনপাল উহার একখানি অতি উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন। তাঁহার পিতার নাম সর্ব্বদেব এবং ভ্রাতার নাম শোভন। তিনি মালব প্রদেশের ধারা নগরীর অধিপতি বাক্‌পতির রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি বাণ রচিত কাদম্বরীর অনুকরণে 'তিলক মঞ্জরী' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ৯৭২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার 'পাইয় লচ্ছী' নামক প্রাকৃত অভিধান রচিত হয়। তিনি জৈন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ঋষভ পঞ্চাশিকা নামে পঞ্চাশটী শ্লোকে ঋষভদেবের একটী প্রাকৃত ভাষায় রচিত স্তোত্র রচনা করেন।

ধনপাল—(২) চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়ান চাংএর গুরু। তিনি 'বিজ্ঞপ্তি মাত্রতা সিদ্ধি শাস্ত্র' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। এই ধনপাল নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্যতম উপাধ্যায় ছিলেন। তাঁহার অন্যতম শিষ্য ছিলেন চন্দ্রকীর্ত্তি। এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সময়ে বহুদূর দেশ হইতে অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য আগমন করিতেন।

ধনবিজয় সিংহ—গয়া জিলার টিকারী রাজবংশের তৃতীয় রাজা। এই রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা রিপুমর্দ্দন সিংহ তাঁহার পিতামহ ছিলেন। রিপুমর্দ্দন সিংহ উত্রেণবাসী একজন মধ্যবিত্ত ভূস্বামী ছিলেন। ধনবিজয়ের পিতা রণজিৎ সিংহ। ধনবিজয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির লোক ছিলেন। তিনি বিহারের

সুবাদারের নিকট হইতে সম্রাটের আদেশে চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র বীরসহায় বা ধীরসহায় সিংহ। এই ধীরসিংহের পুত্রগণ হইতেই বর্ত্তমান টিকারী ও মুকুন্দপুরের রাজবংশের উদ্ভব হইয়াছে। ধনবিজয় সম্রাট জাহান্দর শাহ, ফরুকশীয়ার এবং মোহাম্মদ শাহের সমসাময়িক ছিলেন।

ধনমাণিক—আসামের অন্তর্গত জয়ন্তিয়ার অধিপতি। তিনি প্রতাপ রায়ের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। দিমারুয়ার রাজা প্রভাকরকে তিনি পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন। প্রভাকর উপায়ন্তর না দেখিয়া ব্রহ্মপুরের (হৈড়ম্ব বা কাছাড়) রাজা শত্রু দমনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। শত্রু দমন জয়ন্তিয়াপতি ধনমাণিককে পরাস্ত করিয়া কর দিতে বাধ্য করেন। অধিকিন্তু ধনমাণিক স্বীয় কন্যাদ্বয়ের সহিত শত্রুদমনের বিবাহ দিয়া, স্বীয় উত্তরাধিকারী ও ভাগিনেয় যশোমাণিককে প্রতিভূস্বরূপ ব্রহ্মপুরে রাখিতে বাধ্য হন। ১৬১২ খ্রীঃ অব্দে ধনমাণিকের মৃত্যুর পর যশোমাণিক রাজা হইয়াছিলেন।

ধনরাজ—একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। তিনি ১৫৫৭ শকে (১৬৩৫ খ্রীঃ) মহাদেব কৃত "মহাদেবী সারণী" গ্রন্থের "মহাদেবী সারণী দীপিকা" নামে এক টীকা প্রণয়ন করেন।

ধনরাম সিংহ—যশোহরের রাজা সীতারাম রায়ের অন্যতম সেনাপতি। সীতারামের পিতা ভীমরায়ের এক চণ্ডালিনী উপপত্নী ছিল, তাঁহার গর্ভে মেনারাম ও ধনারাম নামে দুই পুত্র জন্মে। তাঁহারা অতিশয় সাহসী বীর ছিলেন। সীতারাম তাঁহাদিগকে মেনা হাতী ও হামলা বাঘ বলিয়া ডাকিতেন। এই ধনারাম সিংহ ও মেনারাম সিংহ, সীতারামের সহিত মুসলমানদের যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

ধনুর্দ্দাস—তিনি রামানুজের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম হেমাম্বা। তিনি অতিশয় স্ত্রৈণ ছিলেন। রামানুজের কৃপায় তিনি ভগবদ্ ভক্তি লাভ করিয়া রামানুজের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী হেমাম্বাও রামানুজের কৃপা লাভ করিয়া অতিশয় ভক্তিমতী হইয়াছিলেন।

ধনুর্দ্দাসের ভক্তি দেখিয়া রামানুজ তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আচার্য্য ধনুর্দ্দাসের হস্তধারণ করিয়া পথ চলিতেন, স্নানান্তে হস্তধারণ করিয়া মঠে আসিতেন। ইহা দেখিয়া আচার্য্যের কতিপয় ব্রাহ্মণ শিষ্য ধনুর্দ্দাসকে খুব ঈর্ষা করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহারা আচার্য্যের সমীপে যাইয়া বলিলেন,—"প্রভু! আপনি শূদ্রকে এত প্রশ্রয় দিতেছেন কেন? আমরা আপনার এত ব্রাহ্মণ শিষ্য থাকিতে আমাদের দ্বারা

কি আপনার এই কার্য্য চলিতে পারে না? প্রভু! আমরা কি অপরাধ করিয়াছি?" রামানুজ মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"করি কি সাধে? তাঁহার বহু গুণ আছে, তাহা তোমরা জান না? তাঁহার নিরভিমানিতা ও সৎ-স্বভাবের পরিচয় ক্রমে তোমরা জানিতে পারিবে।" একদিন আচার্য্য এক শিষ্যকে বলিলেন,—"দেখ, রাত্রিকালে যখন অন্যান্য শিষ্যগণের আর্দ্র বস্ত্র শুষ্ক হইতে থাকিবে, তখন তুমি ঐ বস্ত্রগুলির এক প্রান্তের কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া দিবে এবং তৎপর যাহা ঘটে আমাকে জানাইবে।" শিষ্য তাহাই করিল। পরদিন প্রাতে শিষ্যগণ বস্ত্রের প্রান্তে কিয়দংশ ছিন্ন দেখিয়া অতি নীচ লোকের ন্যায় জঘন্য ভাষায় পরস্পর কলহ বিবাদ আরম্ভ করিয়া দিলেন। আচার্য্য ইহা শুনিতে পাইয়া, ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং সুমিষ্ট তিরস্কারে তাঁহাদিগকে শান্ত করেন। তৎপরে অপর একদিন তিনি কলহকারী শিষ্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ, ধনুর্দ্দাসকে পরীক্ষা করিতে হইবে। সে যখন রাত্রিতে আমার নিকট উপদেশাদি শ্রবণ করিবে, তখন তোমরা তাঁহার বাটীতে যাইয়া তাঁহার নিদ্রিত পত্নীর গাত্র হইতে অলঙ্কারাদি অপহরণ করিয়া আনিবে। তাঁহারা আচার্য্যের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন না, গুরুর আজ্ঞা বিচার না করিয়াই তাঁহারা তাহাতে সম্মত হইলেন। রাত্রিতে ধনুর্দ্দাস আচার্য্যের নিকট আসিলে, সেই শিষ্যগণ তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া, হেমাম্বার গাত্র হইতে অলঙ্কারাদি উন্মোচন করিতে লাগিলে, হেমাম্বা জাগরিত হইয়াও চুপ করিয়া রহিলেন, কারণ বৈষ্ণবগণ যাহাতে ভয়ে পলায়ন করিয়া না যায়। ক্রমে চৌরগণ তাঁহার এক পার্শ্বের অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া, অপর পার্শ্বের গুলি উন্মোচনের চেষ্টা করিলেন। ইহা দেখিয়া হেমাম্বা স্বয়ং নিদ্রিতার ন্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। তাঁহারা ইহাতে ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। অতপর হেমাম্বা প্রদীপজ্বালিয়া স্বামীর আগমনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে দেখিয়া আচার্য্য ধনুর্দ্দাসকে গৃহে যাইতে বলিলেন। ধনুর্দ্দাস চলিয়া গেলে শিষ্যগণ আচার্য্য সমীপে আসিয়া সমস্ত বলিলেন। আচার্য্য বলিলেন,—"বেশ হইয়াছে, এক্ষণে যাও, তাঁহারা কিরূপ কথাবার্ত্তা বলে গোপনে সব শুনিয়া আসিয়া আমাকে বল।" তখন শিষ্যগণ পুনরায় ধনুর্দ্দাসের গৃহপ্রান্তে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ধনুর্দ্দাস গৃহে প্রবেশ করিলে, হেমাম্বা আনন্দের সহিত সমুদয় বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট বলিলেন। তিনি ইহা শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া হেমাম্বাকে বলিলেন—"ছিঃ এখনও

তোমার জ্ঞান হইল না, তুমি কি জন্য পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলে? তুমি দিলে চৌরগণের উপকার হইবে—তোমার এই ধারণার বশেই তুমি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়াছিলে? কিন্তু তোমার এ ধারণার মূলে যে অভিমান রহিয়াছে, তাহা তুমি বুঝিতে পারিলে না? কে দেয়—আর কে নেয়—ইহা কি তোমার মনে উদয় হইল না? ছিঃ আমি এজন্য বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। শিষ্যগণ এই সব কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা লজ্জায় অবনত মস্তকে গুরুর নিকটে আসিয়া সমুদয় বলিলেন। গুরুদেব তখন বলিলেন,—"কি ব্রাহ্মণত্ব অভিমানি মূর্খগণ! সে দিন তোমাদের বস্ত্র ছিন্ন দেখিয়া তোমরা কি করিয়াছিলে? আর আজ যে হেমাম্বার মূল্যবান্ অলঙ্কার অপহৃত হওয়ায়, তাঁহারা কি করিতেছে দেখিলে। বল দেখি—কে ব্রাহ্মণ, আর কে শূদ্র? যদি কল্যাণ চাও তবে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইও।" রামানুজের জীবিতকালেই ধনুর্দ্দাস ও তাঁহার পত্নী হেমাম্বা মৃত্যু মুখে পতিত হন।

ধনুষনাথ—নাথপন্থী একজন যোগী। অপান নাথ দেখ।

ধনেশ্বর—(১) একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত। তিনি সূর্য্য সিদ্ধান্তের উপর এক টীকা রচনা করেন।

ধনেশ্বর—(২) একজন জৈন গ্রন্থকার। তিনি বল্লভীবংশীয় শিলাদিত্য নামক রাজার আদেশে শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া 'শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্য' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভ দেবের জীবন চরিত ঐ পুস্তকের অন্তর্ভূত আছে। এই ধনেশ্বর খুব সম্ভব খ্রীঃ ৭ম অথবা ৮ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

ধনেশ্বর—(৩) খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীর একজন জৈন গ্রন্থকার। তিনি 'সুরসুন্দরী চরিতম্' নামে প্রাকৃত ভাষায় একখানি সুবৃহৎ কাব্য রচনা করেন।

ধম্মা—(১) বৌদ্ধ যুগের অনেক রমণী শিক্ষা দীক্ষায় তাঁহাদের পুরুষ ভ্রাতাদের সমকক্ষ ছিলেন। 'দীপবংশ' গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে ধম্মা নাম্নী প্রতিভা সম্পন্না ও শাস্ত্রজ্ঞা একটি মহিলার উল্লেখ আছে।

ধম্মা—(২) মধ্যযুগের ভারতীয় একজন সাধক। তিনি সহজ পথের ও যুগ পথের একজন বিশিষ্ট সাধক ছিলেন। সাধক সুন্দর দাস কৃত 'সহজানন্দ' গ্রন্থে তাঁহার বিষয় বিশেষরূপ বর্ণিত আছে।

ধন্যমাণিক্য—(১৪৯০—১৫২৬ খ্রীঃ) ত্রিপুর রাজবংশের সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী নরপতি। তাঁহার অভিষেক মুদ্রার তারিখ ১৪১২ (১৪৯০ খ্রীঃ) শকাব্দ। তাঁহার প্রধান মহিষীর নাম কমলা দেবী। কসবার বিখ্যাত

কমলাসাগর দীঘি এই রাণীর নাম চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। সিংহাসন আরোহণের পর, তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা সেনাপতিগণের হাত হইতে আত্ম-রক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে গোপনে বধ করিয়া সৈন্য বিভাগের আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করেন এবং বড়ুয়া, সরদার, হাজারি প্রভৃতি পদের সৃষ্টি করিয়া, নিজের অধীনে এক পরাক্রমশালী বিপুল সেনাদল গঠিত করিয়া তোলেন। ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্রে মেহারকুল পাটিকারা, গঙ্গামণ্ডল, বগাসাইর প্রভৃতি দেশ এবং উত্তরে বেজুরা, ভানুগাছ প্রভৃতি ভূখণ্ড তিনি জয় করিয়া রাজ্যের অন্তর্ভূত করিয়াছিলেন এবং বরদা খাতের জমীদার প্রতাপ রায় গৌড়ের নবাবের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হন। দক্ষিণ দেশে খণ্ডলের বিদ্রোহী 'দ্বাদশ ভৌমিক'কে বধ করিয়া উক্ত পরগণা কাড়িয়া লন। তৎপর, তাঁহার প্রধান সেনাপতি রায় চয়চাগ পূর্ব্বাঞ্চলের থানাসি প্রভৃতি কিরাতভূমি সম্পূর্ণ হস্তগত করেন। তখন হইতেই কুকী জাতি ত্রিপুরার অধীনতা স্বীকার করিয়া আসিয়াছে।

ধন্যমাণিক্যের প্রধান কীর্ত্তি গৌড়েশ্বর হোসেন শাহার সৈন্যকে পরাজয় করা। ১৪৩৫ শকে (১৫১৩ খ্রীঃ) পাঠান সৈন্য তাড়াইয়া দিয়া তিনি সর্ব্ব প্রথম চট্টগ্রাম অধিকার করেন। তাহা শুনিয়া হোসেন শাহা গৌর মল্লিক নামক সেনাপতির অধীনে বিপুল সৈন্য প্রেরণ করিয়া, ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করেন। মেহারকুলের পথে পাঠান সৈন্য অগ্রসর হইলে চণ্ডীগড় হইতে ত্রিপুর সৈন্য গোমতী নদী বাঁধ দিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয় এবং ক্রমে চট্টগ্রাম পুনরধিকার করে—ইহা ১৪৩৭ শকের (১৫১৫ খ্রীঃ) ঘটনা। হোসেন শাহ পুনরায় বিপুলতর সৈন্য সহ হৈতন খাঁকে পাঠাইয়া সরাইল ও কসবার পথে ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। পাঠান সৈন্য বিজয়ী হইয়া ক্রমশঃ বহু গড় কাড়িয়া লইল। কিন্তু এবারও গোমতী বান্ধিয়া, ভেলা বানাইয়া এবং বনে আগুন জ্বালাইয়া কৌশলে ত্রিপুর সৈন্য তাহাদিগকে পরাজিত করিল।

ধন্যমাণিক্যের নানাবিধ কীর্ত্তি-কলাপ তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। তিনি "ধন্যসাগর" নামে এক বৃহৎ দীঘি উদয়পুরে খনন করাইয়াছিলেন। ১৪২৩ শকে পীঠদেবী ত্রিপুরা-সুন্দরীকে স্বপ্নাদেশ পাইয়া চট্টগ্রাম হইতে আনয়ন-পূর্ব্বক মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং এক মণ সোণা দিয়া ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, তিনি আরও অনেক দেবমন্দির দেশের নানাস্থানে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৪৪৮ শকে বসন্ত রোগে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ধন্বন্তরি—(১) উজ্জয়িনীর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম। বিক্রমাদিত্য দেখ।

ধন্বন্তরি—(২) কাশীর রাজা বাহুকের পুত্র দিবোদাস ধন্বন্তরি নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। ধন্বন্তরির শিষ্যবৃন্দের মধ্যে ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔরভ্র পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুররক্ষিত ও সুশ্রুতই সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন। ধন্বন্তরির শিষ্যগণও স্ব স্ব নামে আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা প্রণয়ন করিয়া ছিলেন। তন্মধ্যে সুশ্রুত প্রণীত সংহিতাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ধন্বন্তরি প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে—বিদ্যাপ্রকাশ চিকিৎসা, ঔষধি প্রয়োগ, চিকিৎসা দীপিকা, চিকিৎসা-সার সংগ্রহ, চিকিৎসা-সার, চিকিৎসা তত্ত্বজ্ঞান, নামমালা, বাল চিকিৎসা, যোগ চিন্তামণি, যোগ দীপিকা, বিদ্যা-রহস্য প্রকাশ চিকিৎসা। এই সকল গ্রন্থ একই ধন্বন্তরি প্রণীত অথবা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ধন্বন্তরি নামে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি প্রাদর্ভূত হইয়া রচনা করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

ধবল রায়— ধারানগরীর অধিপতি ধবল রায় খ্রীঃ একাদশ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার কন্যাকে যশল্মীরপতি বিজয়াদিত্য বিবাহ করিয়াছিলেন।

ধম্মা—ব্রহ্মদেশীয় কাহিনীতে আছে মৌর্য্যবংশীয় নরপতি বিন্দুসারের প্রধানা মহিষী। ধম্মার গর্ভে অশোক জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থে ধম্মা নামের পরিবর্ত্তে সুভদ্রাঙ্গী নাম দৃষ্ট হয়।

ধরঘোষ—তিনি ওদুম্বর জাতীয় এক-জন নরপতি ছিলেন। তাঁহার রজত ও তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই মুদ্রার একদিকে খরোষ্ঠি ও অন্যদিকে ব্রাহ্মী অক্ষরে রাজার ও জাতির নাম আছে। এই সকল মুদ্রা পাঞ্জাবের পূর্ব্বভাগে কাঙ্গারা জিলায় ও গুরুদাস পুর জিলায় পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবত ওদুম্বর জাতি তাহারই নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিত।

ধরণীধর ভট্টচার্য্য, কথক—তিনি যদু-নাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র ও প্রসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীশের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি একজন বিখ্যাত কথক। কথকতা ব্যবসায়ে প্রচুর ধন উপার্জ্জন ও ব্যয় করিয়াও মৃত্যুকালে তিনি লক্ষাধিক টাকা রাখিয়া যান। তাঁহারই পুত্র সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মুরলী-ধর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধরসেন (প্রথম)—তিনি বল্লভী নগরের মৈত্রক বংশীয় নরপতি ভটার্কের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই বল্লভী রাজ্য কাথিবার উপদ্বীপের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত ছিল (প্রাচীন সৌরাষ্ট্র)। বল্লভী নগরের অস্তিত্ব বর্ত্তমান ভবনগরের কয়েক ক্রোশ

উত্তর পশ্চিম কোণে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কথিত আছে ধ্রুবসেন নামে সূর্য্যবংশীয় এক রাজকুমার সৌরাষ্ট্র দেশের লোহ-কূট নামক স্থানে আগমন পূর্ব্বক তথাকার রাজাকে পরাস্ত করিয়া ১৪৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। তৎপরে তিনি বীরনগরে স্বীয় রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। তাঁহার অধস্তন চতুর্থ পুরুষ বিজয়সেন বিজয়পুর নগর (বর্ত্তমান ঢোলকা নগর) স্থাপন করেন। তাঁহারা সম্ভবতঃ গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে সামন্ত নরপতি ছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে তাম্রশাসন পাঠে জানিতে পারা যায় যে, এই বংশীয় ভটার্ক নামে এক নরপতি ৫০৯ খ্রীঃ অব্দে বল্লভী নগরে মগধের গুপ্ত সম্রাটদের সামন্ত নরপতিরূপে রাজ্য শাসন করিতেন। এই ভটার্কই বল্লভী নগরের মৈত্রক বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার ধরসেন, দ্রোণসিংহ, ধ্রুবসেন (প্রথম) ও ধরপট্ট নামে চারি পুত্র ছিল। তাঁহারা পর পর সকলেই রাজা হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ধরসেন নিজের নামের শেষে সেনাপতি উপাধি ধারণ করিতেন। কিন্তু দ্বিতীয় দ্রোণসিংহ মহারাজ উপাধি গ্রহণ করেন। ইহাতে মনে হয় যে, তাঁহারা গুপ্ত সম্রাটদিগের সামন্ত নরপতি ছিলেন, তাঁহাদের ক্ষমতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গেই মৈত্রকেরা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। ধ্রুবসেন সম্ভবতঃ ৫২৬—৫৩৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপূর্ব্বে তাঁহার অগ্রজ ধরসেন (প্রথম) ও দ্রোণসিংহ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার অনুজ ধরপট্ট ইং ৫৩৬—৫৩৯ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে ধরপট্টের পুত্র গুহসেন (৫৩৯—৫৬৯) রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বের তিনখানা তাম্রশাসন ও একখানা শীলালিপি পাওয়া গিয়াছে। রাজস্থানের ইতিহাসে তিনি গোহিল নামে অভিহিত হইয়াছেন।

এই সময়ে গুপ্তবংশের শেষ নরপতি দ্বিতীয় কুমার গুপ্ত (৫৩৫ খ্রীঃ) বর্ত্তমান ছিলেন। গুহ সেনের পরে তৎপুত্র দ্বিতীয় ধ্রুবসেন রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত পাঁচখানা তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে দুইখানাতে তাঁহার উপাধি মহা সামন্ত বলিয়া উল্লেখ আছে। তিনি ৫৬৯—৫৮৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র প্রথম শীলাদিত্য রাজা হন। তিনি পরম শৈব ছিলেন। ৫৮৯—৬০৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতা খরগ্রহ প্রথম রাজা হইয়া ইং৬০৯—৬১৬ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ধরসেন ইং ৬১৫ সাল হইতে ৬২০ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার পরে তাঁহার ভ্রাতা তৃতীয় ধ্রুবসেন রাজা

হইয়া ৬২০—৬৪০ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি স্থাণ্বীশ্বরের (বর্ত্তমান থানেশ্বর) রাজা হর্ষবর্দ্ধনের (৬০৭—৬৫৭ খ্রীঃ অব্দ) জামাতা ছিলেন। তিনি স্বীয় শ্বশুরের সঙ্গে বহু যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি প্রয়াগ ক্ষেত্রে হর্ষবর্দ্ধনের পঞ্চবার্ষিকী সর্ব্বস্ব দানের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতেন। (হর্ষবর্দ্ধন দেখ)। তৃতীয় ধ্রুবসেনের পুত্র তৃতীয় ধরসেন পিতার মৃত্যুর পরে রাজা হইয়া ৬৪০ সাল হইতে ৬৫০ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি মৈত্রক বংশের একজন শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তাঁহার উপাধি রাজচক্রবর্ত্তী ছিল। তিনি একজন বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। তাঁহারই অনুগ্রহে শ্রীধর স্বামীর পুত্র ভট্টি প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন। এই রাজ সভায় থাকিয়া ভট্টি রাম চরিত অবলম্বনে ভট্টিকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তৃতীয় ধরসেন অপুত্রক ছিলেন বলিয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পিতামহ প্রথম শীলাদিত্যের পৌত্র, ধ্রুবভট্টের পুত্র চতুর্থ ধ্রুবসেন রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইং ৬৫০—৬৫৬ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার পরে তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় ধরগ্রহ ইং ৬৫৬—৬৬৬ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র তৃতীয় শীলাদিত্য ৬৬৬—৬৭৫ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার উপাধি পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ ছিল। তৎপরে তাঁহার পুত্র চতুর্থ শীলাদিত্য ৬৭৫—৬৯৮ সাল পর্য্যন্ত, তাহার পরে তাঁহার পুত্র পঞ্চম শীলাদিত্য ৬৯৮—৭২২ সাল পর্য্যন্ত, তৎপরে তাঁহার তনয় ষষ্ঠ শীলাদিত্য ৭২২—৭৬০ সাল পর্য্যন্ত, তৎপরে তাঁহার তনয় সপ্তম শীলাদিত্য ৭৬০—৭৬৬ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

সপ্তম শীলাদিত্যের সময়েই বল্লভী নগরের মৈত্রক বংশের পতন হয়। এই সময়ে (৭১২ খ্রীঃ অব্দে) মোহাম্মদ বিন কাশিম সিন্ধু দেশ আক্রমণ করেন ও রাজা দাহিরকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া সেই দেশ অধিকার করেন। কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। পরবর্ত্তী সময়ে ৭৫৫ খ্রীঃ অব্দের সমকালে মুলতানের আমীর ও সিন্ধু দেশের অন্তর্গত মনসুরের (বর্ত্তমানে অস্তিত্ব নাই) আমীর বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারাও খুব প্রবল ছিলেন না। রঙ্ক নামে এক বিদ্রোহী প্রজা সপ্তম শীলাদিত্যের উপর কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া, প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য, মনসুরের আমীরকে বল্লভী নগর আক্রমণ করিতে আহ্বান করেন। আমীর পরদেশ আক্রমণের এই উৎকৃষ্ট সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি জলপথে কয়েক সহস্র অনুচর সহ হঠাৎ রাত্রিযোগে বল্লভী নগর আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিলেন। এই আক্রমণেই বল্লভী নগর

[illegible] তাঁহার পরে এই নগর নাকি আর কয়েক বৎসর বর্ত্তমান ছিল।

গৃহশত্রু বল্লভী নগরের পতনের কারণ হইলেও অন্যবিধ কারণও ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অহিংসাবাদ প্রচারের ফলে লোকেরা অতিশয় অহিংসাপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছিল।

ধরসেন—(দ্বিতীয়) তিনি গুজরাটের অন্তর্গত প্রাচীন বল্লভীপুরের মৈত্রক বংশীয় নরপতি প্রথম খরগ্রহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ৬১৫—৬২০ খ্রীঃঅব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ধরসেন (প্রথম) দেখ।

ধরসেন—(তৃতীয়) তিনি গুজরাটের অন্তর্গত প্রাচীন বল্লভীপুরের নরপতি তৃতীয় ধ্রুবসেনের পুত্র। তিনি ৬৪০—৬৫০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি মৈত্রক বংশের একজন শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। ধরসেন (প্রথম) দেখ।

ধরপট্ট্য—তিনি গুজরাটের অন্তর্গত প্রাচীন বল্লভীপুরের মৈত্রকবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভটার্কের চতুর্থ পুত্র। সম্ভবতঃ তিনি ৫৩৬—৫৩৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহারই পুত্র প্রসিদ্ধ গুহসেন। ধরসেন (প্রথম) দেখ।

ধারু—তিনি খ্যাতনামা রাজা টোডরমলের পুত্র। আকবর শাহ তাঁহাকে সাতশতী মনসব প্রদানপূর্ব্বক সম্মানিত করিয়াছিলেন। ধারু বিলাসী ও আড়ম্বর প্রিয় ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি সোনা দিয়া অশ্বের ক্ষুর বাঁধাইতেন। সিন্ধুযুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ধর্ম্ম—খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গের পালবংশীয় নরপতি ধর্ম্মপালের রাজত্ব সময়ে (৭৯৫-৮৩৪ খ্রীঃ) উত্তর রাঢ় দেশে পরিতোষ নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার তনয় ধর্ম্ম বৈদিক ক্রিয়ায় পরম জ্ঞানী ছিলেন।

ধর্ম্মকার—একজন চীন দেশবাসী বৌদ্ধ শ্রমণ। তাঁহার চীনা নাম ফা-য়োঙ্ (Fa Yong)। খ্যাতনামা চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান (Fa-Hien) স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর তাঁহার সাফল্যে উৎসাহান্বিত হইয়া, বহু চীন দেশীয় শ্রমণ পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আসিবার জন্য যাত্রা করেন। ফা-য়োঙ্ ওরফে ধর্ম্মকার এইরূপ চব্বিশজন ভিক্ষুসহ (খুব সম্ভব খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে) কাশ্মীরে উপনীত হন। দীর্ঘকাল ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ ও বৌদ্ধ তীর্থস্থান সমূহ দর্শন করিয়া, তাঁহারা জলপথে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহারা অনেক বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থ চীনদেশে লইয়া যান।

ধর্ম্মকীর্ত্তি—একজন বিখ্যাত বৌদ্ধ নৈয়ায়িক। তাঁহার জন্মস্থান দক্ষিণ ভারতের চোল রাজ্যের অন্তর্গত ত্রিমলয় নামক স্থানে। তাঁহার পিতা করুণানন্দ পরিব্রাজক ছিলেন। এই করুণানন্দেরই ভ্রাতা বিখ্যাত কুমারিল ভট্ট ছিলেন।

অষ্টাদশ বর্ষ বয়সেই তিনি বেদ, বেদাঙ্গ, ব্যাকরণ প্রভৃতি বহু শাস্ত্রে পারদর্শী হন। তিনি শাস্ত্র জ্ঞানের জন্ম পিতৃব্য কুমারিলের শিষ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মে আকৃষ্ট হওয়ায় গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া মগধে গমন করেন। মগধের মঠাধ্যক্ষ বৌদ্ধ গুরু প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপালের নিকট বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সুপণ্ডিত হন। পরে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কুমারিলকে বিচারে পরাস্ত করেন। তাহাতে পণ অনুসারে কুমারিল বৌদ্ধ হইতে বাধ্য হন। বৈশেষিক মতাবলম্বীগণ দীর্ঘকাল ধর্ম্ম-কীর্ত্তির সহিত বিচার করিয়া পরাস্ত হন। এইরূপে জৈনগণও তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি কুমারিলভট্টের নিকট গুরু ধর্ম্মপালের পরাজয়ে অতিশয় দুঃখিত হইয়া আর কুমারিলের সম্মুখীন হইলেন না। কলিঙ্গ দেশের এক অরণ্যে আশ্রম স্থাপন করিয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে—(১) প্রমাণ-বার্ত্তিক কারিকা, (২) প্রমাণ-বার্ত্তিক বৃত্তি, (৩) প্রমাণ বিনিশ্চয়, (৪) ন্যায়বিন্দু, (৫) হেতুবিন্দু বিবরণ, (৬) তর্কন্যায় বা বাদন্যায়, (৭) সন্তানান্তরা সিদ্ধি, (৮) সম্বন্ধ পরীক্ষা ও (৯) সম্বন্ধ পরীক্ষাবৃত্তি প্রধান। ধর্ম্মকীর্ত্তি খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইৎ-চিঙ তাঁহাকে ৬৭৪ খ্রীঃ অব্দে দেখিয়াছিলেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি সম্বন্ধে নিম্নরূপ বিবরণও পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় ব্রাহ্মণ সমাজপতিগণ তাঁহাকে সমাজচ্যুত করেন। অতঃপর ধর্ম্মকীর্ত্তি অন্যান্য বৌদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া, ব্রাহ্মণগণের গুহ্যশাস্ত্রসমূহ শিক্ষা করিবার জন্য, ছদ্মবেশে খ্যাতনামা কুমারিল ভট্টের গৃহে ভৃত্যের কাজ গ্রহণ করেন। এবং কুমারিলকে পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট করিয়া গুহ্যশাস্ত্রসমূহ শ্রবণের সুযোগ লাভ করেন।

পরবর্ত্তী জীবনে ধর্ম্মকীর্ত্তি বহু ভিন্ন মতাবলম্বী তীর্থিককে তর্কযুদ্ধে পরাজয় করিয়া স্বমতে আনয়ন করেন। কণাদমতাবলম্বী কণাদগুপ্তকে তিনি বিচারে পরাজিত করিয়া স্বমতে আনয়ন করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কুমারিলও তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। কুমারিল সেই বিচারে পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি হয়। তাঁহারই চেষ্টায় দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে বহু বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিঙ্গ দেশে তাঁহার মৃত্যু হয়।

লামা তারানাথের মতগ্রহণ করিলে ধর্ম্মকীর্ত্তিকে খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীর লোক বলিতে হয়। ইউয়ান চ্যাং তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে ধর্ম্মকীর্ত্তির

কোনও উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী চীন পরিব্রাজক ইৎ-সিঙ্ ধর্ম্মকীর্ত্তির বিশেষ গৌরব ঘোষণা করেন। তিনি ধর্ম্মপালের শিষ্য ছিলেন।

ন্যায়বার্ত্তিক প্রণেতা ব্রাহ্মণ দার্শনিক উদ্যোতকর ধর্ম্মকীর্ত্তির সমসাময়িক ছিলেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি তদ্রচিত ন্যায়বিন্দু ও বাদন্যায় গ্রন্থে উদ্যোতকরের মত খণ্ডন করেন। উদ্যোতকরও সেইরূপ ন্যায়বার্ত্তিক গ্রন্থে ধর্ম্মকীর্ত্তির মত খণ্ডন করেন। সুভূতি শ্রীশান্তি নামে একজন ভারতীয় পণ্ডিত ধর্ম্মকীর্ত্তির 'প্রমাণ বার্ত্তিক কারিকা' খানি তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। প্রমাণবার্ত্তিক বৃত্তি ও প্রমাণবিনিশ্চয় গ্রন্থদ্বয়েরও মূল পাওয়া যায় না, তিব্বতীয় অনুবাদ পাওয়া যায় মাত্র। মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ নামক গ্রন্থে ধর্ম্মকীর্ত্তির পুস্তক হইতে একাধিক বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ন্যায়বিন্দু গ্রন্থখানি কলিকাতার রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছিল।

কোনও কোনও তিব্বতীয় গ্রন্থে ধর্ম্মকীর্ত্তিকে যে কুমারিলের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তিব্বতীয় পণ্ডিত লামা তারানাথ তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য দিঙ্নাগেরও অনেক মত খণ্ডন করেন।

ধর্ম্মকীর্ত্তিশ্রী—মৈত্রেয়নাথ কৃত 'অভিসময়ালঙ্কার কারিকা' নামক যোগাচার পন্থী বৌদ্ধদিগের যে গ্রন্থ আছে, ধর্ম্মকীর্ত্তিশ্রী তাহার একখানা উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তিনি একজন অসাধারণ বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

ধর্ম্মকৃতযশ—একজন ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণ। তিনি মধ্য ভারতের কোনও স্থানের অধিবাসী ছিলেন। খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারার্থ চীনদেশে গমন করেন এবং সেই দেশে অবস্থানকালে কতিপয় বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করেন।

ধর্ম্মখেদী—তিনি কাঞ্চণপাদ্র নামক স্থানের অধিপতি এবং উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নরপতি। বজ্রহস্তের (১০৩৮—১০৬৮ খ্রীঃ) সামন্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ভীমখেদী; ১০৫৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভূমি দান করেন।

ধর্ম্মগুপ্ত—(১) প্রাচীন নাট্যকার। তাঁহার পিতা রামদাস নেপালের রাজগুরু ছিলেন। ধর্ম্মগুপ্ত প্রথমে মিথিলাপতি যূথসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তদ্রচিত রামায়ণ নাটক, নেপালরাজ জয়স্থিতির পুত্রের জন্মোৎসবে রাজসভায় অভিনীত হয়।

ধর্ম্মগুপ্ত—(২) একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সঙ্ঘাচার্য্য। মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইবার পর, হীনযান ও মহাযান মতাবলম্বী অনেকগুলি শাখাসঙ্ঘের

উদ্ভব হইয়াছিল। স্থবির ধর্ম্মগুপ্তের নামে পরিচিত ধর্ম্মগুপ্তির ঐরূপ একটি শাখা। এই সকল বিভিন্ন শাখাসমূহ যে সকল শাস্ত্র নিজস্ব বলিয়া প্রচার করিতেন তাহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য দৃষ্ট হয়। চীন পরিব্রাজক ইংচিঙ-এর মতে ধর্ম্মগুপ্তির সম্প্রদায় সর্ব্বাস্তিবাদ (নামান্তর আর্য্যমূলসর্ব্বাস্তিবাদ) সম্প্রদায়েরই একটি শাখা। সকলে অবশ্য এই মত গ্রহণ করেন না।

ধর্ম্মগুপ্ত—(৩) একজন বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্য। খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি 'সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরিক' এবং আচার্য্য অসঙ্গকৃত 'বজ্রচ্ছেদিকা টীকা' চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করেন।

ধর্ম্মঘোষ—জৈন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের চন্দ্রগচ্ছের অন্তর্গত একজন আচার্য্য। চন্দ্রপ্রভ সূরী তাঁহার গুরু ছিলেন।

ধর্ম্মচন্দ্র—তিনি পঞ্জাবের জালন্ধর (বর্ত্তমান কাঙ্গাড়া) প্রদেশে ১৫২৮—১৫৬৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিত শত্রুঘ্ন তাঁহারই অনুরোধে 'মন্ত্রার্থ দীপিকা' নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ধর্ম্মত্রাত—একজন বৌদ্ধ শ্রমণ। তিনি খ্যাতনামা বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধুর নিকট আত্মীয় ছিলেন। ধর্ম্মত্রাতই সংস্কৃত ধর্ম্মপদ (উদান বর্গ) সংকলন করেন বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন।

ধর্ম্মদাস—বৌদ্ধ শূন্যবাদী প্রসিদ্ধ রামাই পণ্ডিতের পুত্র। তাঁহার চারি পুত্র—মাধব, সনাতন, সুলোচন ও শ্রীধর। ধর্ম্মদাসের বংশে অনেক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা ধর্ম্মপণ্ডিত নামে পরিচিত।

ধর্ম্মদাস বসু—উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে (১২৫৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ) ইংরেজ অধিকারাধীন চন্দননগরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা পার্ব্বতীচরণ বসু মহাশয় ডাক বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। বাল্যকালেই ধর্ম্মদাস পিতৃহীন হন। তাঁহার মাতা অতি বুদ্ধিমতী নারী ছিলেন। তিনি কষ্টের সহিত সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে হুগলী কলেজ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দশ টাকা বৃত্তি পান। তৎপরে কলিকাতায় থাকিয়া এক সঙ্গে মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা বিদ্যা ও জেনারেল এসেমব্লী ইনষ্টিটিউটে (General Assembly Institute বর্ত্তমান Scottish Church College) এফ্-এ (First Arts) পড়িতে থাকেন। কিন্তু স্বাস্থ্যহানী হওয়াতে এফ্-এ পড়া ছাড়িয়া দেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি মেডিকেল কলেজের উপাধি (L. M. S.) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় স্থানীয় হইয়াছিলেন।

পাঠ সমাপন করিয়া কিছুকাল মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন হাসপাতালের অন্যতম চিকিৎসকের (House Surgeon) কাষ করেন। কিন্তু উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া উচ্চতর চাকুরীর যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য ইংলণ্ডে যাইবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রথমে কুলি-জাহাজের চিকিৎসক হইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। তাহাতে সফলকাম না হইয়া চন্দননগরের জনহিতৈষী প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরীর মহাশয়ের অর্থসাহায্যে ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দের মধ্যভাগে ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং দুই বৎসর পরে I. M. S. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপরে সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল অতি সুখ্যাতির সহিত বাঙ্গালা ও বিহারের বিভিন্ন জিলায় প্রধান চিকিৎসকের (Civil Surgeon) কাজ করিয়া ১৯০২ খ্রীঃ অব্দে অবসর গ্রহণ করেন। কর্ম্মজীবনে সর্ব্বত্রই তিনি অমায়িক ব্যবহার, চিকিৎসা নৈপুণ্য, পরোপকার স্পৃহা প্রভৃতি মহৎ গুণের জন্য জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। অর্থলোভ তাঁহার আদৌ ছিল না। রোগীর যথাসাধ্য উপকার করাই তিনি জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন।

কর্ম্মজীবনের মধ্যভাগে তিনি একবার ছুটী লইয়া ইংলণ্ডে গমন পূর্ব্বক চিকিৎসা বিদ্যার আনুষঙ্গিক কোনও কোনও বিষয়ে (Bactereology ও Histology) জ্ঞান লাভ করেন। তিনি British Medical Association এবং Royal Institute of Public Health নামক সমিতিদ্বয়ের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি লেপ্টনাণ্ট কর্ণেলের (Lieutenant Colonel) মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন।

ধর্ম্মদাস কর্ত্তব্যপরায়ণ, ধর্ম্মভীরু ও নির্ভীক ব্যক্তি ছিলেন। কার্য্যব্যপদেশে যেখানেই গিয়াছেন সর্ব্বত্রই লোকে তাঁহার বিবিধ সদ্‌গুণে মুগ্ধ হইয়াছে। ছাত্রজীবনেই তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হন নাই। শেষজীবনে দুর্গামোহন প্রমুখ ধর্ম্মবন্ধুগণের আকর্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হয়েন। গভীর ধর্ম্মভাবের জন্য তিনি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। "ধর্ম্ম জীবন" নামে একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করেন। ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হইবার পর ময়মনসিংহ, যশোহর, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে ব্রহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব (Hygiene and Public Health) নামে তিনি জনসাধারণের উপযোগী স্বাস্থ্যবিজ্ঞান

সম্বন্ধে একখানি পুস্তকও প্রণয়ন করেন।

১৯২৬ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে (১৩৩৩ বঙ্গাব্দে, অগ্রহায়ণ) কলিকাতা নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ধর্ম্মদাস সুর—বাঙ্গালা থিয়েটারের প্রাথমিক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্পী। ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা বাগবাজারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে অভিনেতৃরূপে তিনি দুই একটী সখের থিয়েটারে যোগদান করেন। তাঁহারই চেষ্টায় ও পরিশ্রমে ষ্টেজ্ ও দৃশ্যপট প্রস্তুত হইয়া কলিকাতা শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রপালের বাটীতে লীলাবতী নাটকের অভিনয় আরম্ভ করা হয়। ইহা হইতে সাধারণ নাট্যশালা স্থাপনের সংকল্প হয় এবং ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে যোড়াসাঁকোতে মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে নীলদর্পণ নাটক লইয়া ন্যাশানাল থিয়েটার নামে বাঙ্গালীর প্রথম সাধারণ নাট্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থ সাহায্যে ও তাঁহার ঐকান্তিক পরিশ্রমে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার দৃশ্যপটাদি তিনি স্বয়ংই অনেকগুলি তৈয়ারী করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি এই থিয়েটার লইয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন পূর্ব্বক প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন কোহিনুর থিয়েটারের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা থিয়েটারের প্রাথমিকযুগে তাঁহার ন্যায় নাট্যমঞ্চের শিল্পী অন্য কেহ ছিল না। ১৯১০ সালের ২৮শে জুলাই তিনি পরলোক গমন করেন;

ধর্ম্মদাসী— 'দীপবংশের' অষ্টাদশ অধ্যায়ে থেরী ধর্ম্মদাসীর উল্লেখ আছে। তিনি বিনয়পিটক, সুত্তপিটক ও অভিধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে উপদেশ প্রদান করিতেন।

ধর্ম্মদিন্না—(ধর্ম্মদত্তা) একজন বৌদ্ধসাধিকা। তিনি রাজগৃহ নগরের এক সম্পন্ন গৃহস্থের কন্যা ছিলেন। তাঁহার স্বামী বিশাখ বুদ্ধদেবের উপদেশ শুনিয়া সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন। ধর্ম্মদিন্নাও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রবেশ করেন এবং সাধনা দ্বারা বিশেষ উন্নত জীবন লাভ করিয়া বৌদ্ধ সাধনমার্গের উচ্চস্তরের বিষয়গুলিও বিশেষ আয়ত্ব করেন। ত্রিপিটকের অন্তর্গত মজ্ঝিম নিকায় গ্রন্থে তাঁহার অনেকগুলি ধর্ম্মতত্বের ব্যাখ্যান আছে। থেরি-গাথা নামক বৌদ্ধ সাধিকাদের রচিত গাথা সমূহের মধ্যে তাঁহার রচিত একটি সুমধুর গাথাও আছে। অনেক ধর্ম্মপিপাসু নারী তাঁহার উপদেশ শুনিয়া ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রবেশ করেন।

ধর্ম্মদেব—ভারতবর্ষ হইতে চীন দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারার্থ বহু জ্ঞানী ব্যক্তি

খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী হইতেই যাতায়াত আরম্ভ করেন। খ্রীঃ দশম শতাব্দীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম আচার্য্য ধর্ম্মদেব চীন দেশে গমনপূর্ব্বক সংস্কৃত হইতে বহু গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের জন্য চীন সম্রাট তাঁহাকে নানা প্রকার উচ্চ উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মধর(স্বধর্ম্মপা বা ছেংকাবাগ)—একজন ত্রিপুরবংশীয় নরপতি, তিনি বাৎস্য গোত্রীয় নিধিপতি দ্বারা এক যজ্ঞ সম্পাদন করান। তখন তাঁহার রাজধানী কৈলাড়গড়ে (বর্ত্তমান কৈলাসহরে) ছিল। যজ্ঞান্তে তিনি নিধিপতিকে এক বিশাল জনপদ দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করেন। তিনি খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিধর একজন বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। নিধিপতি দেখ।

ধর্ম্মধর মহাস্থবির—একজন প্রবীণ ও খ্যাতনামা বৌদ্ধ ভিক্ষু। তিনি দক্ষিণ সিংহলের আম্বালা গোড়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। সেই স্থানে এক পেগোডায় ধর্ম্মধর বাল্যকালে শিক্ষা লাভ করেন। বার বৎসর বয়সে তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন এবং বিশ বৎসর বয়সে ভিক্ষু হন। সিংহলের প্রসিদ্ধ ভিক্ষু ও পণ্ডিত বালীগাম সুমঙ্গল তাঁহার গুরু ছিলেন। ধর্ম্মধর সংস্কৃত পালি ও প্রাকৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইং১৯১৫ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে আগমন করেন এবং পালি ভাষার অধ্যাপনা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বহু বৎসর বৌদ্ধ সাহিত্যের গবেষণায় রত ছিলেন। ইং১৯২১ সালে প্রিন্স অব ওয়েলস কলিকাতায় আসিলে ভিক্ষু ধর্ম্মধরকে তাঁহার সহিত পরিচিত করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি সিংহলে চলিয়া যান এবং ইং১৯৩৬ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি সিংহলেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য বুদ্ধদত্ত সিংহলের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি।

ধর্ম্মধ্বজপাল বা ধর্ম্মনারায়ণ—তিনি আসামের চুটিয়া রাজবংশের অন্যতম রাজা। ১৫১৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি আহম রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন; প্রথমে পরাভূত হন, কিন্তু পরে জয়লাভ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধ ক্রমাগত ১৫১৩—১৫২৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসর চলিয়াছিল। অবশেষে আহমেরাই জয়লাভ করিয়া, চুটিয়াদের রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মনন্দী—একজন ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণ। তিনি খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারে গমন করিয়া তিনি বহু বৌদ্ধ শাস্ত্র চীন ভাষায় অনুবাদ করিতে সাহায্য করেন। ঐ সকল অনূদিত

পুস্তকের কতকগুলি পরে গৌতম সঙ্ঘদেব নামক অপর এক মহাজ্ঞানী শ্রমণ কর্ত্তৃক সংশোধিত হয়।

ধর্ম্মনাথ বা ধরমনাথ—নাথ পন্থী সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মচ্ছেন্দনাথের বাইশ জন শিষ্যের অন্যতম ছিলেন। খুব সম্ভব তিনি পঞ্জাবের অধিবাসী ছিলেন। তিনি পেশোয়ার হইতে কাটিওয়াড়ে আসিয়া ছিলেন। তৎপরে তপস্যার্থ কচ্ছদেশে গমন করেন। সরমনাথ ও গরীবনাথ নামে তাঁহার প্রধান দুইজন শিষ্য ছিলেন। তিনি সন্তনাথ সম্প্রদায় ভুক্ত ও ১৪৩৮ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

ধর্ম্মনারায়ণ বাচস্পতি— বিগত খ্রীঃ ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিক্রমপুর পণ্ডিত সমাজের অন্যতম প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার বাড়ী ধীপুর গ্রামে ছিল।

ধর্ম্মপাদ—একজন সিদ্ধাচার্য্য। তাঁহার অন্য নাম গুণ্ডরীপাদ। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি গান আছে। তিনি সহজ মতের প্রচারক ছিলেন। তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি প্রাচীন বাংলা ও সংস্কৃত মিশ্রিত।

ধর্ম্মপাল—(১)তিনি আসামের প্রাচীন কালের রাজা। তিনি ভারতবর্ষের পশ্চিম অংশ হইতে আসিয়া গৌহাটির পশ্চিমদিকে এক রাজ্য স্থাপন করিয়া তথায় স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুকে আনয়ন পূর্ব্বক স্বীয় রাজ্যে স্থাপন করেন। কেন্দুকুলাই নামক সাধু তাঁহার রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন। পদ্মনারায়ণ, চন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি রাজারা তাঁহার পরে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই বংশের শেষ নরপতি রামচন্দ্রের মাজুলীর অন্তর্গত রত্নপুরে রাজধানী ছিল। এই রত্নপুরে আরও অনেক রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তাহাদের সময় নিরূপণ করা এক প্রকার অসম্ভব।

ধর্ম্মপাল—(২) একজন বৌদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীপুর নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা কাঞ্চীপুর পতির মন্ত্রী ছিলেন। তিনি যৌবন প্রারম্ভে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক মগধের নালন্দা বিহারে গমন করেন। প্রসিদ্ধ শীলভদ্র তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তিনি যোগাচার মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান। (১) আলম্বনপ্রত্যয় ধ্যানশাস্ত্র ব্যাখ্যা, (২) বিদ্যামাত্র সিদ্ধিশাস্ত্র ব্যাখ্যা, (৩) শতশাস্ত্র বৈপুল্য ব্যাখ্যা প্রভৃতি। তিনি কৌশাম্বী নগরে বিপক্ষদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ৬০০—৬৩৫ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। কথিত আছে ধর্ম্মপাল ও ভর্ত্তৃহরি মিলিত হইয়া পাণিনী ব্যাকরণের বেদ-

বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত কুমারিল ভট্ট ধর্ম্মপালের নিকট বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরে বিচারে স্বীয় গুরু ধর্ম্মপালকেই পরাস্ত করেন। ধর্ম্মপাল বিচারের প্রতিশ্রুতি অনুসারে তুষানলে প্রাণত্যাগ করেন। (কুমারিল ভট্ট দেখ)। ধর্ম্মপাল একবার ধর্ম্ম প্রচারার্থ তিব্বতও গমন করিয়াছিলেন। চীন দেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ইৎচিঙ্গের গ্রন্থ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মহাস্থবির ধর্ম্মপাল ভারতীয় শিক্ষা ও সাধনার অনুশীলনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য সুমাত্রা দ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি দেখ।

ধর্ম্মপাল, রাজা—(৩) তিনি দণ্ডভুক্তির রাজা ছিলেন। দণ্ডভুক্তি বর্ত্তমান মেদিনীপুর জিলার দক্ষিণভাগে ছিল। দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল দণ্ডভুক্তিরাজ ধর্ম্মপালকে পরাজিত ও নিহত করেন।

ধর্ম্মপাল, রাজা—(৪) বঙ্গের পালবংশের স্থাপয়িতা গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপাল পিতার মৃত্যুর পরে বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম দেদ্দদেবী। ধর্ম্মপাল পালবংশের একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে নবম শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত তিনি উত্তরাপথের ইতিহাসে একজন প্রধান নায়ক ছিলেন। তাঁহার বীরত্ব প্রভাবে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, কীর, গান্ধার প্রভৃতি দেশের নরপতিগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বিক্রমশীলার মঠ বা বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয় তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন। বিক্রমশীলা ভাগলপুর জিলার পাথরঘাটা নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটবংশীয় নরপতি পরবলের কন্যা রন্নাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার ত্রিভুবনপাল ও দেবপাল নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ত্রিভুবনপাল পিতার জীবদ্দশায় প্রাণত্যাগ করেন। দেবপাল রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল অনুমান ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপাল—(৫) সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও টীকাকার। বর্ত্তমান মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত কঞ্জিবরম (কাঞ্চিপুর) নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ টীকাকার বুদ্ধঘোষের সমসাময়িক ছিলেন এবং খুব সম্ভব একই বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা লাভ করেন। ধর্ম্মপাল অনেকগুলি বৌদ্ধ গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশগুলি ত্রিপিটকান্তর্গত খুদ্দক (খুদ্দক) নিকায়ের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলি

গ্রন্থের। তদ্ভিন্ন বুদ্ধ ঘোষের কয়েক খানি টীকারও তিনি ভাষ্য রচনা করেন। সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক ইউয়ান চাং যখন তীর্থ পর্য্যটনে কাঞ্চিপুরে গমন করেন, তখন তিনি তৎস্থানবাসী বৌদ্ধদের নিকট ধর্ম্মপালের পরিচয় প্রাপ্ত হন। ধর্ম্মপাল তাহার পূর্ব্বেই পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মপালের রচনা প্রণালীর সহিত আচার্য্য বুদ্ধঘোষের রচনা প্রণালীর অনেক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। তাঁহার রচিত টীকাগুলির সাধারণ নাম পরমত্থ (পরমার্থ) দীপনী। ক্ষুদ্রক নিকায়ের অন্তর্গত নিম্নলিখিত গ্রন্থ গুলির তিনি টীকা (অর্থকথা) রচনা করেন—থেরগাথা, থেরিগাথা, পেতবত্থু (প্রেতবস্তু), বিমানবত্থু, চরিয়া পিটক, ইতিবুত্তক (ইত্যুক্তক) ও উদান।

সিংহলে রচিত 'সাসন বংস' নামক বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে উল্লিখিত আছে যে ধর্ম্মপাল, বিশুদ্ধি মগ্‌গো, দীঘনিকায়, মজ্‌ঝিম নিকায় এবং সংযুক্ত নিকায়ের ও টীকা অট্‌ঠকথা রচনা করেন। কিন্তু এই সকল গ্রন্থের রচয়িতা ধর্ম্মপাল ও পরমার্থ দীপনীর রচয়িতা ধর্ম্মপাল একই ব্যক্তি কিনা তদ্বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত নহেন।

ধর্ম্মবিবর্দ্ধন— চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়ান অশোকের ধর্ম্মবিবর্দ্ধন নামে এক পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

ধর্ম্মভূষণ—একজন দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। খ্রীঃ ষোড়শ শতকে তাঁহার 'ন্যায় দীপিকা' গ্রন্থ রচিত হয়। যশোবিজয় গণী তাঁহার তর্কভাষা গ্রন্থে ধর্ম্মভূষণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ধর্ম্মমাণিক্য (প্রথম)—বিখ্যাত ত্রিপুর নরপতি। পিতা মহামাণিক্যের জীবদ্দশাতেই তিনি সন্ন্যাসী হইয়া তীর্থ ভ্রমণ করিতেছিলেন। কাশীতে একদা নিদ্রিতাবস্থায় এক সর্পরাজ তাঁহার মস্তকোপরি ফণা বিস্তার করিয়াছিল। কৌতুক নামক বিপ্র দৈবাৎ তদ্দর্শনে তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তি অনুমান করে। মহামাণিক্যের মৃত্যুর পর অরাজকতা নিবারণ জন্য তাঁহার অন্বেষণে লোক প্রেরিত হয় এবং তিনি উক্ত কৌতুক প্রভৃতি আটজন ব্রাহ্মণসহ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার চারি ভাই গগন খাঁ প্রভৃতিরা তাঁহার অমাত্য হইয়াছিলেন। তিনি রাজধানী উদয়পুরে "ধর্ম্মসাগর" নামক দীঘি খনন করাইয়া তাহার চারি পাশে উক্ত কৌতুকাদি বিপ্রকে বসাইয়া তাম্রশাসন দ্বারা ১৩৮০ শকাব্দে (১৪৫৮ খ্রীঃ) ২৯ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন এবং নানাবিধ সৎকর্ম্ম দ্বারা নিজনামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি "রাজমালা" রচনা করান। তাঁহারই

প্ররোচনায় তাঁহার সভাসদ শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর নামক পণ্ডিতদ্বয় দুর্লভেন্দ্র চন্তাই নামক চতুর্দ্দশ দেবতার-পূজকের সাহায্যে উক্ত গ্রন্থের প্রথমাংশ (মহামাণিক্যের রাজত্ব পর্য্যন্ত) রচনা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মমাণিক্য অনুমান ১৭৩১ খ্রীঃ অব্দে বসন্ত রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ধর্ম্মমাণিক্য (দ্বিতীয়)—ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ রামমাণিক্যের অন্যতম পুত্র। তিনিই ত্রিপুরার শেষ স্বাধীন নরপতি। ভ্রাতা মহেন্দ্রমাণিক্যের মৃত্যুর পর ১৭১৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি রাজ্য লাভ করেন। তাঁহার অভিষেক মুদ্রার তারিখ ১৬৩৬ শকাব্দ (১৭১৪ খ্রীঃ)। তাঁহার প্রধানা মহিষীর নাম ধর্ম্মশীলা দেবী। রাজত্বের প্রথম ভাগে তিনি যুদ্ধ করিয়া ঢাকার নবাব প্রেরিত মুঘল সৈন্যকে কস্‌বা নগরে পরাজিত করিয়াছিলেন। আট মাস ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিয়াছিল এবং তাঁহার প্রধান সেনাপতি রণভীমনারায়ণ উহার প্রধান নেতা ছিলেন। তৎপরে ১৭১৮খ্রীঃ অব্দে জ্ঞাতি শত্রু কাদবার রাজা জগৎমাণিক্য ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া বিপুল সৈন্যসহ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন এবং কুমিল্লা হইয়া চণ্ডীগড় পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু রাজসৈন্য তাঁহাকেও পরাস্ত করে। এই যুদ্ধে ধর্ম্মমাণিক্য আরাকানের মঘরাজা জয়বীরের সাহায্য পাইয়াছিলেন এইরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অতঃপর ১৭২৮ খ্রীঃ অব্দে মুঘল সৈন্যের হস্তে তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন এবং তখন হইতে ত্রিপুরা রাজ্যের সমতলক্ষেত্র মুঘল শাসনের অধীন হইয়া "রোসনাবাদ" আখ্যা লাভ করে। এই যুদ্ধে মুঘল সৈন্যের পরিচালক ছিলেন বিখ্যাত মীর হবিব ও তাঁহার সুহৃদ পাঠসারের পরগণার জমীদার। আকা সাদেক এবং উল্লিখিত জগৎমাণিক্য রাজ্য প্রাপ্তির আশায় প্রলুব্ধ হইয়া মুঘল সৈন্যের পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। ধর্ম্মমাণিক্য এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মুরশিদাবাদ গিয়া তদানীন্তন জগৎশেঠ ফতেচাঁদের সাহায্যে নবাবের প্রীতি উৎপাদন পূর্ব্বক রাজ্য ফিরিয়া পান এবং এক বৎসর কাল পুনঃ রাজত্ব করিয়া ১৭২৯ খ্রীঃ অব্দের মধ্যভাগে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পতিব্রতা মহিষী তাঁহার সহমৃতা হন। মুঘল বিজয়ের পর হইতে বৃটিশ শাসনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একজন "ফৌজদার" ত্রিপুরায় নিযুক্ত থাকিত। উল্লিখিত আকা সাদেকই ত্রিপুরার প্রথম ফৌজদার।

ধর্ম্মমাণিক্য তাঁহার দীর্ঘ ১৬ বৎসর রাজত্বকাল মধ্যে বহুবিধ ধর্ম্ম কার্য্য করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। সর্ব্বদা পুরাণ পাঠ শ্রবণ, তুলাপুরুষ দান ও তড়াগ প্রতিষ্ঠা তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য.

তিনি "ধর্ম্মসাগর" নামে নানা স্থানে অনেক দীঘি খনন করাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কুমিল্লা নগরীর বিশাল দীঘিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে তিনি প্রচুর ভূমি দান করিয়াছিলেন এবং তৎপ্রদত্ত বহু নিষ্করের সনদ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ধর্ম্মমিত্র—একজন বৌদ্ধ শ্রমণ। তিনি কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভেই ভগবান তথাগতের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উহা প্রচার করিবার জন্য মধ্য এসিয়ায় গমন করেন। তৎপরে তিনি চীনদেশেরও নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে ন্যানকিং সহরে উপনীত হন। তিনি কয়েকখানি বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করেন।

ধর্ম্মমিত্র—মৈত্রেয়নাথ কৃত 'অভিসময়ালঙ্কার কারিকা' নামক যোগাচার পন্থী বৌদ্ধদিগের যে গ্রন্থ আছে ধর্ম্মমিত্র তাহার একখানা উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তিনি একজন অসাধারণ বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

ধর্ম্মমিত্র—(২) একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। বঙ্গের পালবংশীয় নরপতি নারায়ণপাল দেবের নবম রাজ্যাঙ্কে অঙ্গ বিষয়ের অধিবাসী ধর্ম্মমিত্র মগধের কোন স্থানে (খুবসম্ভব উদ্দণ্ডপুর নগরে) একটী বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বলিয়া জানা যায়।

ধর্ম্মরক্ষ—(১) মগধের একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত। তিনি ১০০৪ খ্রীঃ অব্দে চীন দেশে গমন করিয়া বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলন। ১০৫৮ খ্রীঃ অব্দে চীন দেশেই তিনি পরলোক গমন করেন।

ধর্ম্মরক্ষ—(২) মোঙ্গলজাতীয় একজন বৌদ্ধ শ্রমণ। বাল্যকালেই বৌদ্ধ শ্রমণদিগের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অন্যান্য শ্রমণদিগের সহিত বহু স্থানে পর্য্যটন করেন। তিনি খুব সম্ভব ভারতবর্ষেও আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ছয়ত্রিশটি ভাষা জানিতেন বলিয়া কথিত হয়। তিনি একটি সুবৃহৎ মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং বহু বৌদ্ধ শাস্ত্র চীন ভাষায় অনুবাদ করেন। তদ্ভিন্ন তিনি বহু শিষ্যকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিয়া অনুবাদ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাঁহার অনুদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতা, দশভূমকসূত্র মৈত্রেয় ব্যাকরণ, সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরিক, রত্নকারণ্ডব্যূহসূত্র, ললিত বিস্তর প্রভৃতি প্রধান। তিনি সুবক্তাও ছিলেন। তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি সুদীর্ঘকাল চীনদেশের দূরবর্ত্তী স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল। ধর্ম্মরক্ষ খ্রীঃ তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩১৩ খ্রীঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ধর্ম্মরাজ—তাঁহার অন্য নাম অমান-ভীত। তিনি উড়িষ্যার শৈলোদ্ভব বংশীয় নরপতি প্রথম মধ্যমরাজের পুত্র ও দ্বিতীয় অযশভীতের পৌত্র। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় মধ্যমরাজ। ৭৪৫ খ্রীঃ অব্দের তাঁহার লিখিত একখানা দানপত্র পাওয়া গিয়াছে। তিনি জ্যেষ্ঠ বলিয়া রাজ্য লাভ করিলে, মাধব নামে এক ব্যক্তি (সম্ভবতঃ তাঁহার ভ্রাতা) তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হন। তিনি মাধবকে পরাজিত ও নিহত করেন।

ধর্ম্মরাজাধ্বরী—তাঁহার জন্মস্থান দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কণ্ডবমাণিকম্। তিনি রুচিদত্ত প্রণীত তত্ত্বচিন্তামণি প্রকাশ নামক গ্রন্থের একটী উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছেন।

ধর্ম্মাকর দত্ত—একজন কাশ্মীরী বৌদ্ধ পণ্ডিত। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যের গুরু ছিলেন।

ধর্ম্মাকর শান্তি—একজন বৌদ্ধ আচার্য্য। খ্রীঃ একাদশ শতকে তিনি বিক্রমশীলা বিহারের একজন প্রধান অধ্যাপক ছিলেন।

ধর্ম্মাদিত্য—খ্রীঃ ষষ্ঠ শতকে বঙ্গদেশে ধর্ম্মাদিত্য নামে এক রাজা ছিলেন।

ধর্ম্মালোক—একজন বৌদ্ধাচার্য্য। যে সকল বৌদ্ধ পণ্ডিত সংস্কৃত বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

ধর্ম্মাশোক—দাক্ষিণাত্যের চোলবংশীয় একজন নরপতি।

ধর্ম্মেশ্বর—(১) একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। নারায়ণ ভট্টকৃত 'চমৎকার চিন্তামণি' নামক জাতকের তিনি 'অন্বয়ার্থ দীপিকা' নামে এক টীকা রচনা করিয়াছেন। কেশব কৃত জাতক পদ্ধতির উপরও তিনি বাসনাভাষ্য নামে টীকা রচনা করেন।

ধর্ম্মেশ্বর-(২) প্রভাকরের পুত্র ধর্ম্মেশ্বর একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত একখানা জাতক পদ্ধতি আছে।

ধর্ম্মোত্তর বা উত্তর ধর্ম্ম—বৌদ্ধধর্ম্মের নানা সম্প্রদায় ও উপ সম্প্রদায় আছে। তিনি কনিষ্কের রাজত্বকালে (৭৮ খ্রীঃ অব্দে) কাশ্মীরের সৌত্রান্তিকসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন এবং এই সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চাঙ খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার মতে খ্রীঃ তৃতীয় শতাব্দীতে কুমারলব্ধ এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তক্ষশীলার অধিবাসী এবং নাগার্জ্জুন, আর্য্যদেব ও অশ্বঘোষের সমসাময়িক।

ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য—একজন বৌদ্ধভিক্ষু। তিনি শুধু ধর্ম্মোত্তর বা আচার্য্য ধর্ম্মোত্তর নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি কাশ্মীর দেশীয় পণ্ডিত কল্যাণরক্ষিত ও ধর্ম্মাকর

দত্তের শিষ্য ছিলেন। তিনি খ্রীঃ নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। সম্ভবত তিনিও কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। সেই সময়ে বঙ্গদেশে বনপাল রাজা ছিলেন। ৯৯১ খ্রীঃ অব্দে শ্রীধর এবং ৯৬২ সালে ধর্ম্মোত্তর টিপনক গ্রন্থ প্রণেতা জৈন মল্লবাদী তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ১১৮১ খ্রীঃ অব্দে 'স্বাদ-বাদ রত্নাকরাবতারিকা' গ্রন্থের রচয়িতা প্রসিদ্ধ রত্নপ্রভ সূরীও তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে 'ন্যায় বিন্দু টীকা' একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহা ধর্ম্ম কীর্ত্তি প্রণীত ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের ব্যাখ্যা পুস্তক। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'প্রমাণ পরীক্ষা' তৃতীয় গ্রন্থ 'অপোহ নামপ্রকরণ' চতুর্থ গ্রন্থ 'পারলোক সিদ্ধি', পঞ্চম গ্রন্থ 'ক্ষণ ভঙ্গ সিদ্ধি', ষষ্ঠ গ্রন্থ প্রমাণ বিনিশ্চয় টীকা। ইহা ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রণীত প্রমাণ বিনিশ্চয় গ্রন্থের ব্যাখ্যা পুস্তক। মূল সংস্কৃত গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। কিন্তু কাশ্মীরী পণ্ডিত পরহিত ভদ্রকর্ত্তৃক তাহার এক তিব্বতী অনুবাদ আছে।

ধীমান—একজন শিল্পী। গৌড়ের রাজা দেবপাল ও ধর্ম্মপালের রাজত্ব-কালে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পুত্র বীতপালও একজন শিল্পী ছিলেন। পিতাপুত্র উভয়েই প্রস্তর ও ধাতু মূর্ত্তি নির্ম্মাণে এবং চিত্রাঙ্কণে দক্ষ ছিলেন। বীতপাল বঙ্গদেশে বাস করিতেন এবং তিনি ধাতু মূর্ত্তি নির্ম্মাণে পূর্ব্বদেশীয় রীতির শ্রেষ্ঠ স্থাপয়িতা বলিয়া গণ্য হইতেন; ধীমানও পূর্ব্বদেশের চিত্রকর গণের প্রধানরূপে গণ্য হইতেন। বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, স্থির করিয়াছেন যে তাঁহাদের চিত্রশালায় সংগৃহীত মূর্ত্তি সমুহের মধ্যে ধীমান নির্ম্মিত কতকগুলি প্রস্তর মূর্ত্তি আছে।

ধীরনারায়ণ— আসামের অন্তর্গত সিদলীর রাণী চন্দ্রেশ্বরীর পুত্র। স্বামীর মৃত্যুর পরে নাবালক ধীরনারায়ণকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাণী চন্দ্রে-শ্বরী সপত্নী পুত্র ইন্দ্রনারায়ণকে পুত্রের অভিভাবক নিযুক্ত করিলেন। রাণীর মৃত্যুর পরে ইন্দ্রনারায়ণই রাজ পদ অধিকার করেন। ধীরনারায়ণ বয়প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রনারায়ণকে বিতাড়িত করিয়া, রাজ্য লাভ করেন। কিন্তু তিনি ইহা বেশী দিন ভোগ করিতে পারেন নাই। ইন্দ্রনারায়ণ ভোটানের রাজার সাহায্যে আবার রাজ্য অধিকার করেন। সিদ-লীর বর্ত্তমান রাজবংশ ইন্দ্রনারায়ণেরই বংশধর।

ধীরপাল—বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ ও সংস্কৃত হইতে বৌদ্ধ গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য, যে সকল পণ্ডিত তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। খুব সম্ভব খ্রীঃ দশম শতকে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

ধীরশিব—শঙ্করাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। তিনি পরমাণু কারণবাদী ছিলেন। প্রয়াগে অবস্থানকালে শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিয়া শিষ্য করেন।

ধীরসমসের সিংহ—তিনি নেপালের বিখ্যাত সেনাপতি জঙ্গবাহাদুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইং১৮৫৫ সালের তিব্বত যুদ্ধে তিনি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়া নেপালের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন তিনি পরে নেপালের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

ধীরসিংহ—তিনি মিথিলার রাজা নরসিংহ দেবের অন্যতম পুত্র। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। মধুসূদন মিশ্র প্রণীত জ্যোতিঃ প্রদীপাঙ্কুর গ্রন্থের মতে তিনি শতাধিক গাভী ও সুবর্ণ কঙ্কন ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। ১৪৩৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভৈরবেন্দ্র গৌরেশ্বরকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ধীরসিংহের মৃত্যুর পরে তাহার কণিষ্ঠ ভ্রাতা ভৈরবেন্দ্র বা ভৈরবসিংহ রাজা হইয়াছিলেন। ধীর-সিংহের পুত্র রাঘবেন্দ্র।

ধীরাজ, রাজ—তিনি একজন আয়ু-র্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'চিকিৎসা-সার'।

ধীরাজরাজ—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত। হিন্দী ভাষাতে তিনি 'চিকিৎসা-সার' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সংক্ষেপে ইহাতে রসাদি বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিধি উল্লিখিত হইয়াছে।

ধীরানন্দ স্বামী (কৃষ্ণলাল মহারাজ) —বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী। ১২৭৭ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। রামকৃষ্ণ দেবের অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী শিষ্যগণের (বরাহনগর এবং আলম বাজার মঠে) আধ্যাত্মিক সাধনায় আকৃষ্ট হইয়া যে কয়জন যুবক সংসার ত্যাগ করিয়া রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করিয়া-ছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তিনি পরমহংসদেবের সহধর্ম্মিণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তিনি রাজপুতানা ও উত্তর ভারতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বেলুড় মঠের একজন ন্যাস রক্ষক (Trustee)এবং রামকৃষ্ণ মিশনের পরি-চালক সঙ্ঘের সভ্য ছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের কোষাধ্যক্ষও ছিলেন। তিনি অতিস্নেহ প্রবণ ছিলেন এবং দীন দরিদ্র ও অসহায় অনাথের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট দয়া ছিল। ১৩৪২ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে (ইং ১৯৩৫ অক্টোবর) পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বেদান্তবাগীশ —অধ্যাপক ও দার্শনিক পণ্ডিত। ১২৭৭ সালের ভাদ্র মাসে ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইলমহকুমার অন্তর্গত নাগরপুরের এক প্রসিদ্ধ জমিদারবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মাধবলাল চৌধুরী এবং মাতা দ্রৌপদীসুন্দরী। পিতামাতা উভয়ই অতি ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। গ্রাম্য মধ্য-ইংরেজি স্কুলে অধ্যয়নকালে স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাঁহার শান্ত ধীর প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার নাম ধীরেন্দ্রনাথ রাখেন। তখন হইতেই তিনি সেই নামে পরিচিত হন। ষোড়শ বৎসর বয়সে স্কুলে পাঠ্যাবস্থা হইতেই, তাঁহার তৃতীয় অগ্রজ যশোদালালের সহিত প্রথমে ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরেই যশোদালাল পরলোক গমন করেন। সেইসময় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ও পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত 'ব্রহ্মতত্ত্ব' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় তিনি দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। এই প্রকারে ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করিতে করিতে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। অবসর সময়ে তিনি পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের নিকট যাইয়া দার্শনিক জটিল প্রশ্ন সমূহের সমাধান হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিতে থাকেন। এইভাবে তাঁহার জ্ঞানপিপাসা ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তিনি কলেজে অধ্যয়ন কালে তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত Theological Societyর (তত্ত্ববিদ্যা সভা) সভ্য হইয়া প্রতি অধিবেশনে নিয়মিতরূপে যোগ দিতে লাগিলেন ও দার্শনিক প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় আত্মীয় স্বজনেরা প্রাচীন মতে হিন্দু সমাজে তাঁহার বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। কারণ হিন্দু প্রথানুসারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ না হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ হইতে পারে না। তিনি হিন্দু সমাজের এই অর্থহীন প্রথার বাধা দিবার জন্যই কনিষ্ঠের বিবাহ না হইলে তিনি বিবাহ করিবেন না—এই মত প্রকাশ করেন। তৎপর কনিষ্ঠের বিবাহ হইয়া গেল। এম্-এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার কিছুকাল পরে তিনি ব্রাহ্ম সমাজে বিবাহ করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন কিন্তু অনেক আত্মীয় স্বজনের সন্তানদিগকে নিজ আশ্রয়ে রাখিয়া প্রতিপালনপূর্ব্বক শিক্ষাদান করেন।

তাঁহার স্বদেশ প্রীতি প্রবল ছিল। প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি কটকে ছিলেন, তখন তাঁহার গৃহে বহু স্বদেশসেবক সম্মিলিত হইতেন। সেখানে অনেক সময় স্বদেশ-প্রীতি-উদ্দীপক তেজোময় বক্তৃতাদি করিয়া তিনি স্বদেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। তথায় তিনি পাঁচ বৎসরকাল ছিলেন। পরে

বরিশালে আসিয়া ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। বরিশালেও তিনি তাঁহার অগ্নিময়ী স্বদেশী বক্তৃতায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতেন। তৎপর তিনি দিল্লী হিন্দু কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ক্রমে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। দিল্লীতে পাঁচ বৎসরকাল থাকার পর দিল্লী দরবারের ঠিক পরেই দিল্লী হিন্দু কলেজের কার্য্যভার আর্য্য সমাজিদের হস্তগত হওয়াতে এবং তাঁহার মত তাঁহাদের অনুমোদিত না হওয়ায় তিনি অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিয়া পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে (Edward College) দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। পাবনায় বার বৎসরকাল অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া তিনি চাকরী পরিত্যাগ করেন এবং কলিকাতায় আসিয়া অবস্থিতি করিতে থাকেন। তিনি যে স্থানেই থাকিতেন সেখানেই ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা ও বক্তৃতাদিদ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেন। পাবনা থাকিতে তিনি একদিন শুনিতে পাইলেন যে, কোন ধনী পরিবারের এক ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত লোহার সিন্দুকের চাবির তত্ত্বাবধান করিতেছেন। অজ্ঞানাবস্থার মধ্যে মধ্যে যখন তাঁহার সামান্য জ্ঞান হয় তখনই "চাবি কৈ, সিন্দুকে তালা আছে কি না?" ইত্যাদি প্রশ্নে সকলকে উত্যক্ত করিতেন। অবশেষে যখন তাঁহাকে লোহার সিন্দুকের উপর শোয়াইয়া সিন্দুকের তালার উপর হাতখানি রাখা হইল, তখন মুমূর্ষু ব্যক্তির সান্ত্বনা আসিল। এই ঘটনায় তাঁহার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল এবং ইহার পরেই তিনি পাবনা কলেজের চাকরী পরিত্যাগ করেন।

পাবনা কলেজের কর্ম্ম ত্যাগের পরেও পিঠাপুরের মহারাজার ছেলের গৃহশিক্ষকের পদ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব আসিয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। এই সময়ে মফঃস্বলে ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যের জন্য তিনি নানাস্থানে গমন করিতেন। দিল্লী থাকাকালে তিনি বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের সম্পাদক ত্রিবেদী মহাশয়ের আহ্বানে একবার বোম্বাইয়ে গমন করিয়া, তথায় বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে তিনি একবার মাদ্রাজেও গমন করিয়াছিলেন। সেখানেও তাঁহার বক্তৃতার বেশ সমাদর হইয়াছিল।

পরোপকার করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। অনেক দরিদ্র ছাত্র তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিত। তিনি গোপনেই দান করিতে ভালবাসিতেন।

তিনি আজীবন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ও সেবক ছিলেন। ব্রাহ্ম

সমাজ মন্দিরে তাঁহার উপাসনা কিংবা বক্তৃতায় সকলেই আকৃষ্ট হইতেন। সমাজ মন্দিরে সন্ধ্যা বেলা তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত প্রাত্যহিক মণ্ডলীর অধিবেশনে প্রতিদিন যোগ দিতেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও উহার কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর সম্পাদকরূপে কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং বহু দিন সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য ছিলেন। তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায়ই হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি 'সংস্কার ও সংরক্ষণ', 'মহাপুরুষ প্রসঙ্গ', 'ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধন', নামে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শেষোক্ত গ্রন্থে ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বগুলি সরল ভাষায় গল্পচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন মূলতঃ এক, কেবল যুগে যুগে জ্ঞানী মহাজনের সাধনলব্ধ অনুভূতি অনুসারে ইহা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও সংস্কৃত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। 'মৈত্র্যুপনিষদ' তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থ। 'In Search of Jesus Christ' গ্রন্থে তিনি অতি বিচক্ষণতার সহিত প্রমাণ করিয়াছেন যে, যীশুখ্রীষ্ট নামে কোন ব্যক্তি ছিলেন না। শেষ জীবনে কয়েক বৎসর যাবত তিনি বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি হাজারীবাগ চলিয়া যান এবং সেইখানেই ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ১৭ই বৈশাখ (১৯৩৮ খ্রীঃ, ৩০শে এপ্রিল) ৬৮ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

ধুটুকড়ানন্দ—দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনকালের একজন রাজা। কাণাড়া প্রদেশের উত্তরাংশে প্রাপ্ত কতকগুলি দীর্ঘাকার সীসক নির্ম্মিত মুদ্রায় ধুটুকড়ানন্দ ও মুড়ানন্দ নামক দুইজন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে। এই সকল মুদ্রার একদিকে সুমেরু পর্ব্বত ও অন্যদিকে বোধিবৃক্ষ মুদ্রিত আছে। এই সকল মুদ্রার সময় এখনও নিরূপিত হয় নাই।

ধুন্দভিস্সোসা—একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। তিনি স্থবির মজ্‌ঝিমের সঙ্গে হিমবন্ত প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন। মজ্‌ঝিম দেখ।

ধূর্ত্তঘোষ—রাঢ়দেশে ধূর্ত্তঘোষ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র বালঘোষ, তৎপুত্র ধবলঘোষ। ধবলঘোষের মহিষী সদ্ভাবা দেবীর গর্ভে ঈশ্বরঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের রাজত্বকাল এখনও স্থির হয় নাই।

ধৃতিকর—পণ্ডিত দ্বিবেদী দৈবজ্ঞ বসন্ত নামক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

ধোয়ণা—একজন সিদ্ধাচার্য্য। গোরক্ষনাথ দেখ।

ধোবী—একজন সিদ্ধাচার্য্য। গোরক্ষ নাথ দেখ।

ধোয়িক বা ধোয়ী—বাঙ্গালী কবি। তিনি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের অনুকরণে তাঁহার 'পবনদূত' কাব্য রচনা করিয়াছেন। বঙ্গাধিপ লক্ষ্মণসেন ইহার নায়ক এবং মলয়াচলবাসী গন্ধর্ব্বতনয়া কুবলয়াবতী ইহার নায়িকা। লক্ষ্মণ সেন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া মলয়াচলে উপস্থিত হইলে, কুবলয়াবতী তাঁহার রূপে ও গুণে তৎপ্রতি অনুরাগিণী হন। রাজা লক্ষ্মণ সেন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, কুবলয়াবতী বিরহ ব্যথা সহ্য করিতে অসমর্থা হইয়া, পবনকে তাঁহার অবস্থা রাজ-সমীপে জ্ঞাপন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কবি ধোয়ী, দূত মলয়ানিলের পথ বর্ণনা প্রসঙ্গে মলয়াচল হইতে গৌড়দেশ পর্য্যন্ত প্রদেশের বিবরণ অতি সুন্দর ভাবে মন্দাক্রান্তা ছন্দে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার উপাধি 'কবিক্ষ্মাপতি' ছিল। কবি ধোয়ীর নিজ জন্মস্থান নবদ্বীপের নিকট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ধ্বজনারায়ণ—তিনি আসামের দরঙ্গ রাজবংশের শেষ স্বাধীন নরপতি। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া দরঙ্গ রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে,(১৭৮৯ খ্রীঃ) দরঙ্গরাজ্য আসামের আহম রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হয়।

ধ্বজ মাণিক্য—ত্রিপুরার বিখ্যাত নরপতি ধন্য মাণিক্য ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫২০ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধ্বজ মাণিক্য রাজা হইয়াছিলেন। তিনি মাত্র দুই বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৫২২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার শিশুপুত্রকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, তাঁহার পিতৃব্য দেবমাণিক্য সিংহাসন অধিকার করেন।

ধ্রুব—তিনি রাষ্ট্রকূট বংশীয় নরপতি কৃষ্ণরাজের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি স্বীয় অগ্রজ দ্বিতীয় গোবিন্দকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি অতিশয় প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। কেবল চালুক্যবংশ নয়, তিনি পল্লববংশীয়দিগকেও বিশেষরূপে নির্য্যাতন করিয়া করপ্রদ করিয়াছিলেন।

ধ্রুবধারা বর্ষ—তিনি রাষ্ট্রকূটবংশীয় প্রথম কৃষ্ণের পুত্র। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম দন্তিবর্ম্মা সম্ভবতঃ খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। দন্তিদুর্গের পুত্র প্রথম ইন্দ্ররাজ, তৎপুত্র প্রথম গোবিন্দ, তৎপুত্র প্রথম ক, তৎপুত্র দ্বিতীয় ইন্দ্র। এই ইন্দ্ররাজের পুত্র দ্বিতীয় দন্তিদুর্গ বা দন্তিবর্ম্মা। তিনি চালুক্যবংশীয় এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। এই পরাক্রান্ত নরপতি বাতাপীপুরের চালুক্য রাজ দ্বিতীয় কীর্ত্তি বর্ম্মাকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

তদ্ব্যতীত তিনি, কাঞ্চী, কেরল, চোল, পাণ্ড্য, শ্রীহর্ষ বজ্রাট, মালব প্রভৃতি দেশের নরপতিদিগকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন। তিনি অপুত্রক পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পিতৃব্য প্রথম কৃষ্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। জৈন গ্রন্থ মতে তিনি ৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে (৭০৫ শকে) বর্ত্তমান ছিলেন। প্রথম কৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র ধ্রুবধারা বর্ষ (প্রথম), গুর্জ্জরের প্রতীহারবংশীয় বৎস রাজাকে পরাস্ত ও মরুভূমিতে বিতাড়িত করেন। এই ধ্রুবধারা বর্ষের তনয় তৃতীয় গোবিন্দ প্রভূত বর্ষ, বৎসরাজ-তনয় দ্বিতীয় নাগভটকে পরাস্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কর্ক গুর্জ্জর রাষ্ট্রের দ্বারে অর্গল স্বরূপ হইয়া, তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজ্যে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। ৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে রাষ্ট্রকূটপতি কৃষ্ণরাজ জীবিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রথম ধ্রুবধারা বর্ষ ৭৮৩ হইতে ৭৯৪ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই রাষ্ট্রকূট বংশের উন্নতি আরম্ভ হয়। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিতীয় গোবিন্দকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, রাজ্য অধিকার করেন। তিনি দক্ষিণাপথের গঙ্গবংশীয় কাঞ্চীনগরের পল্লববংশীয় এবং আরও বিভিন্ন দেশের রাজগণকে পরাস্ত করিয়া তিনি তিনটী শ্বেতছত্র অধিকার করিয়াছিলেন। দন্তিবর্ম্মা (প্রথম) দেখ।

১৩১—১৩২

ধ্রুবমিত্র—অহিপুত্র প্রাচীন পঞ্চাল রাজ্যের রাজধানী। এই স্থানে অনেকগুলি তাম্র মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কোন কোন মুদ্রায় ধ্রুবমিত্রের নাম পাওয়া গিয়াছে। ফরিদপুরে আবিষ্কৃত একটী শীলালিপিতেও তাঁহার নাম পাওয়া গিয়াছে।

ধ্রুবসেন (প্রথম)—তিনি গুজরাটের অন্তর্গত প্রাচীন বল্লভীপুরের মৈত্রকবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভটার্কের তৃতীয় পুত্র। তাঁহার অগ্রজ দ্রোণ সিংহের মৃত্যুর পরে তিনি রাজা হইয়া ৫২৬—৫৩৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ধরসেন (প্রথম) দেখ।

ধ্রুবসেন (দ্বিতীয়)—তিনি গুজরাটের অন্তর্গত প্রাচীন বল্লভীপুরের মৈত্রক বংশীয় নরপতি গুহসেনের পুত্র। তিনি ৫৬৯—৫৮৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ধরসেন (প্রথম) দেখ।

ধ্রুবসেন, (তৃতীয়)—গুর্জ্জর প্রদেশের প্রাচীন বল্লভীপুরের মৈত্রক বংশীয় নরপতি প্রথম খরগ্রহের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার রাজত্বকাল ইং ৬২০—৬৪০। ধরসেন (প্রথম) দেখ।

ধ্রুবসেন, (চতুর্থ)—তিনি গুজরাটের অন্তর্গত প্রাচীন বল্লভীপুরের মৈত্রক বংশীয় নরপতি প্রথম শীলাদিত্যের পৌত্র ও ধ্রুবভট্টের পুত্র। তিনি ৬৪০—৬৫৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ধরসেন (প্রথম) দেখ।

ন.

নজাবত খাঁ - বাঙ্গালার নবাব সুজা-উদ্দিন মোহাম্মদ খাঁর সময়ে (১৭২৫—১৭৩৯ খ্রীঃ) বীরভূমের জমিদার বদিউজ্জামান অতিশয় প্রবল হইয়াছিলেন। নওয়াজ খাঁ তাঁহারই দেওয়ান ছিলেন।

নকিব খাঁ—নকিব খাঁ উপাধি, তাঁহার প্রকৃত নাম—মির গিয়াসউদ্দিন আলী। তিনি কাজবিনের সৈয়দবংশীয় ছিলেন। তাঁহার পিতামহ মির এহিয়া একজন ধর্ম্ম শাস্ত্রবেত্তা ও দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াও সুন্নি সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন বলিয়া পারস্য রাজ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে নির্য্যাতিত হন। এমন কি তাঁহার পুত্র মির আবদুল লতিফ (নকিব খাঁর পিতা) প্রাণ ভয়ে ভারতবর্ষে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। সেই সময়ে মুঘল সম্রাট আকবর শাহ সবেমাত্র রাজ্যলাভ করিয়াছেন। সম্রাট তাঁহাকে অতিশয় সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। অল্পকাল পরেই তিনি সম্রাটের শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। তিনি একজন সুবক্তা ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং গোঁড়া মুসলমান ছিলেন না।* ১৫৭৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং আজমীরে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

* মির আবদুল লতিফের কয়েকটী পুত্র ছিল। তন্মধ্যে নকিব খাঁ অন্যতম। তিনি পিতার সঙ্গে এদেশে আসিয়াছিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই আকবর শাহের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ১৫৭৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি মালব ও গুজরাট অভিযানে সম্রাটের সঙ্গে ছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে বাঙ্গালার বিদ্রোহ দমনেও তিনি সম্রাটের সঙ্গে ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার ভ্রাতা কমর খাঁ ও তিনি উভয়ে রাজা টোডর মল্লের অধীনে সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। যদিও তিনি মাত্র এক হাজারী মনসবদার ছিলেন, তবু রাজদরবারে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। কারণ তাঁহার এক সম্পর্কিত মহিলাকে তাঁহারই অনুরোধে সম্রাট বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। দিল্লীর মুগল সম্রাট আকবর শাহের রাজসভায় ফৈজি, নকিব খাঁ, মোল্লা মোহাম্মদ, মোল্লা সাবরি, সুলতান হাজী, বদায়ুনী প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান ছিলেন। সাম্যবাদী আকবর শাহের যত্নে ও উৎসাহে এই সকল পণ্ডিত সমাজে সংস্কৃত চর্চ্চায় বহুল প্রচার হইয়াছিল। যে সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সিতে অনূদিত হইত তিনি তাহা দেখিয়া দিতেন। জাহাঙ্গীর শাহের রাজত্বকালে তিনি দেড় হাজার সৈন্যের সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হন। ১৬১৪ খ্রীঃ অব্দে আজমীরে তিনি পরলোক গমন করেন। দরবেশ মৈন উদ্দিন চিস্তির দরগাতে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

নকুল—চিতোরের মহারাণা খোমানের আহ্বানে যে সকল স্বদেশ প্রেমিক মহাপ্রাণ বীর স্বদেশ শত্রু যবনদিগকে তাড়াইবার জন্য খোমানের পতাকাতলে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। মণ্ডলগড়ের অধিপতি নকুল তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। খোমান দেখ।

নকুল—একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি শালিহোত্র মুনিগণের অশ্বচিকিৎসা-শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া, ১৮শ অধ্যায়ে অশ্ব জাতির লক্ষণ, জাতি ও রোগচিকিৎসা সম্বন্ধে স্বীয় অশ্ববৈদ্যক বা বৈদ্যকসর্ব্বস্ব গ্রন্থ রচনা করেন।

নকুলরাম—উত্তর কাছাড়ের স্বাধীন রাজা তুলারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি নিশোমা নাগাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইয়া নিহত হন। তুলারাম দেখ।

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ—একজন খ্যাতনামা সাংবাদিক ও শিক্ষাব্রতী। সাধারণতঃ তিনি এন, এন ঘোষ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে (১২৬১ বঙ্গাব্দ) তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ভগবতীচরণ ঘোষ। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল ছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ প্রথমে কলিকাতা ব্রাহ্ম স্কুলে (বর্ত্তমান হেয়ার স্কুল) শিক্ষা আরম্ভ করেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে উক্ত বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষায় (First Arts) তিনি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন এফ-এ পরীক্ষায় তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বি-এ চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত গমন করেন। কিন্তু পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া মিডল্ টেম্পল্এ (Middle Temple) আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (ব্যারিষ্টার) হইয়া ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তিনি প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহাতে তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া, এই ব্যবসা ত্যাগ করেন। বঙ্গবাসী পত্রিকার বিরুদ্ধে ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে রাজদ্রোহের মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে, তিনি বঙ্গবাসীর পক্ষে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ব্যবহারজীবিরূপে ইহাই তাঁহার কেবলমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

আইন ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া তিনি অধ্যাপনা ও সংবাদপত্র সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সংবাদপত্র পরিচালনা প্রথমে তাঁহার নিকট অনেকটা সখের বিষয় ছিল এবং সেইভাবে তিনি দুই একখানি সংবাদপত্র তিনি পরিচালনাও

করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের অনুবাদক মহেন্দ্রনাথ সোম কর্তৃক ১৮৮০খ্রীঃ অব্দে 'ল রিভিউ' (Law Review) নামে একখানা পত্রিকা বাহির হইলে, তিনি উহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে তিনি মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তৎপরে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ বৈদ্যনাথ বসু মহাশয় অবসর গ্রহণ করিলে তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হন। আমরণ তিনি এই কলেজের অধ্যক্ষ পদে আসীন থাকিয়া বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করেন ও যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তাঁহার শিক্ষা প্রণালীও উন্নত ধরণের ছিল। কোনও সময়ে এক ছাত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, কি উপায়ে ভাল ইংরেজী শিক্ষা করা যায়? তদুত্তরে তিনি তাঁহাকে বলেন—'ইংরেজীতে কথা বলিবে, ইংরেজীতে চিন্তা করিবে, এমন কি ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখিবে। তাহা হইলে উত্তমরূপে ইংরেজী শিক্ষা করিতে পারিবে। কোন একটী এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ ডালি তাঁহার অধ্যক্ষতাকালে মেট্রোপলিটন কলেজে কিছুদিনের জন্য অধ্যাপক ছিলেন।

১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি দুর্গাচরণ লাহা মহাশয়ের সহযোগে 'ইণ্ডিয়ান নেশন' (Indian Nation) নামক একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করেন। অল্পকালের মধ্যেই ইহা শিক্ষিত সমাজে এরূপ সমাদৃত হইয়াছিল যে, ইহার মূল্য অর্দ্ধ আনা হইতে চারি আনা হইয়াছিল। এই পত্রিকা সম্পাদনায় তিনি রাজপুরুষদিগেরও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের টাইম্‌স্ পত্রিকাও (The Times) ইণ্ডিয়ান নেশন ও উহার সম্পাদকের বিশেষ প্রশংসা করিতেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরূপে তিনি বিশ বৎসরকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। কিছুকাল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান পরীক্ষক ছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে আর কেহই তৎপূর্ব্বে ঐ সম্মান লাভে সমর্থ হন নাই। নূতন নিয়মানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মনীতি রচনার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। কিছুদিন সিমলায় অবস্থান করিয়া তিনি এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তিনি ভারতে ইংরেজ "শাসন" (England's Work in India) সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ রচনার ভার প্রাপ্ত হন। দুঃখের

পূর্ব্বদিন তিনি ইহার কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্ব্বাচিত সদস্যও (কমিশনার) হইয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জীর (Sir Alexander Mackenzie) ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আটাশজন পদত্যাগকারী সদস্যের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন এবং ঐ সময় যে নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন প্রণয়ন হইতেছিল তিনি ইহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতা পুলিশ আদালতের অবৈতনিক বিচারপতি (Honorary Presidency Magistrate) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিতও তাঁহার যোগ ছিল। ইণ্ডিয়ান নেশনে তাঁহার সুচিন্তিত রাজনীতি বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ বাহির হইত। ঐ সব প্রবন্ধে তাঁহার রাজনীতি বিষয়ে প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা ও রাজনীতিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইত। দুইবার তিনি (কলিকাতা ও এলাহাবাদ) প্রতিনিধিরূপে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে যোগদান করেন। একবার তিনি মেদিনীপুরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে সভাপতি হইয়াছিল।

তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'কৃষ্ণদাস পালের জীবনী আলোচনা' এবং 'রাজা নবকৃষ্ণের জীবনী' জনসমাজে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার ছাত্রপাঠ্য বহু বিদ্যালয়ে পঠিত হইত।

দর্শনশাস্ত্রেও তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি দর্শনাচার্য্য মার্টিনিউর (Dr. Martineu) নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভারত সচিব লর্ড মর্লের (Lord Morley) তিনি খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। অবসর সময়ে তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রও আলোচনা করিতেন। শেষ জীবনে তিনি 'রাধাস্বামী সৎসঙ্গ' সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। তিনি বিলাত ফেরৎ হইলেও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল। বিলাত হইতে স্বদেশে আগমনের পর তিনি হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।

১৩১৪ বঙ্গাব্দের ২৩শে চৈত্র (১৯০৯ খ্রীঃ অব্দের ৩রা এপ্রিল) পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি একজন কর্ম্মযোগী পুরুষ ছিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই তিনি বেরিবেরি রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। এই অসুস্থ অবস্থায় তিনি যথারীতি কার্য্য করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত তিনি ইণ্ডিয়ান নেশনের কার্য্য করিতেছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—বক্তা, লেখক ও ধর্ম্ম প্রচারক। হুগলী জিলার অন্তর্গত বাঁশবেড়ে গ্রামে ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে (১২৫০ বাং কার্ত্তিক) তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম দ্বারকানাথ (ভট্টাচার্য্য) চট্টোপাধ্যায়। তাঁহারা কাশ্যপগোত্রীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বরিশাল জিলার অধিবাসী ছিলেন। বাঁশবেড়ের বর্ত্তমান ভূম্যধিকারী বংশের পূর্ব্বপুরুষ রামেশ্বর রায় মহাশয় পূর্ব্বোক্ত ভট্টাচার্য্য বংশীয় কাশী-প্রবাসী রামশরণ তর্কবাগীশ মহাশয়কে বাঁশবেড়িয়াতে স্থাপন করেন। তর্কবাগীশ মহাশয় নগেন্দ্রনাথের পিতামহের প্রপিতামহ ছিলেন।

অতি শৈশবেই নগেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ হইলে জননী তারাসুন্দরী বিশেষ কষ্ট সহকারে তাঁহাকে পালন করেন। সাংসারিক অসচ্ছলতা বশতঃ উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ নগেন্দ্রনাথ করিতে পারেন নাই। চুঁচুড়া, হুগলী ও কলিকাতার দক্ষিণ ভাগে রসাপাগলা স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে তিনি কৃষ্ণনগরে গমন করেন এবং পরবর্ত্তী বৎসর তথাকার কলেজ সংলগ্ন বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দুই বৎসর পরে পরবর্ত্তী এফ্.এ (First Arts) পরীক্ষা দেন। কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। অতঃপর ছাত্রজীবন তাঁহার শেষ হয়।

কলিকাতার রসাপাগলাতে অবস্থান করিবার সময়েই তিনি ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ লাভ করেন। তদবধি তিনি নিয়মিত বেহালা ব্রাহ্মসমাজ ও যোড়াসাঁকোর আদি ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগ দিতেন। বেহালা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে তাঁহাকে নানারূপে সাহায্য করিতেন। নগেন্দ্রনাথের অভিভাবক বর্গ এজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর নানারূপ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ভবানীপুরে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলে নগেন্দ্রনাথ ও সিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় উহার ছাত্র হন এবং পাঠ সমাপন করিয়া প্রশংসাপত্র লাভ করেন। কৃষ্ণনগরে গমন করিয়া তিনি আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দিবার সুযোগ পান। ঐ স্থানে মাত্র আঠার বৎসর বয়সে তিনি (যখন বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা শ্রেণীর ছাত্র) ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদ লাভ করেন। তাহার পর হইতে আজীবন কায়মনোবাক্যে গভীর নিষ্ঠার সহিত ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। অনেক সময়ে গভীর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া চলিতে হইলেও এক দিনের জন্যও জীবনের আদর্শ হইতে চ্যুত হন নাই।

যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই তাঁহার বক্তৃতাশক্তি পরিস্ফুট হয় এবং পরবর্ত্তী জীবনে একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী বক্তারূপে খ্যাতি লাভ করেন। বস্তুতঃ তৎকালে নগেন্দ্রনাথের স্থায় বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্টরূপে বক্তৃতা করিতে সমর্থ ব্যক্তি অধিক ছিল না। অতি গভীর ধর্ম্মতত্ব বা দার্শনিক বিষয়েও অতি প্রাঞ্জল ও সরস ভাষায় বক্তৃতা করিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। সাকার ও নিরাকার উপাসনার শ্রেষ্ঠতা লইয়া প্রসিদ্ধ সনাতন-পন্থী পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির সহিত তাঁহার কিছুকাল ধরিয়া বক্তৃতা-যুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহা বাঙ্গালা দেশের সামাজিক ইতিহাসের এক প্রধান বিষয়। শশধর তর্কচূড়ামণি ও নগেন্দ্রনাথ উভয়েই স্ব স্ব মত বিশ্বাসে ক্ষমতাবান ছিলেন। তাঁহাদের সেই বক্তৃতা তৎকালে বাঙ্গালা দেশে এক মহা উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল।

নগেন্দ্রনাথ চিন্তাশীল ও ধর্ম্মের উচ্চ তত্ত্ব সমূহের অনুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার "ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা" নামক পুস্তকখানি উদার ধর্ম্মতত্ত্ব জানিবার একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক। তদ্ভিন্ন তিনি মার্কিন মনীষী থিয়োডার পার্কারের (Theodore Parker) একখানি উৎকৃষ্ট জীবন চরিতও রচনা করেন। তাঁহার রচিত ভগবৎ সঙ্গীতগুলিও অতি গভীর ভাবপূর্ণ।

কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময়েই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের (প্রেততত্ব) প্রতি আকৃষ্ট হন. পরে অনুরাগ আরও বৃদ্ধি পায় এবং সমগ্র জীবন ঐ বিষয়েরও গভীর আলোচনা করেন। কলেজের ছাত্র রূপেই তিনি সাহিত্য চর্চ্চা আরম্ভ করেন। পরবর্ত্তীকালে প্রভাকর, বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, সাধারণী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পত্রিকায় তাঁহার বহু চিন্তাপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হয়। জনহিতকর কার্য্যেও এই সময়ে তিনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। বালবিধবাদের দুঃখ তাঁহাকে বিধবা বিবাহের অনুকূল করে। নিজের চেষ্টায় তিনি কৃষ্ণনগরে একটি বিধবা-বিবাহ সম্পাদন করেন। কৃষ্ণনগরের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে উৎসাহ দান করেন।

১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ দেশনেতাগণ কর্ত্তৃক ভারত সভা (Indian Association) প্রতিষ্ঠিত হয় (২৬শে জুলাই)। নগেন্দ্রনাথ প্রথমাবধি উহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সভার কর্ম্ম পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় সুরেন্দ্রনাথ ও তিনি পরবর্ত্তী বৎসর উত্তর ভারতের আগ্রা, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, কাশী, লাহোর, অমৃতসর, মীরাট প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা

করেন। ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে, সুরেন্দ্রনাথের কারামুক্তির পর জাতীয় ধনভাণ্ডার সংস্থাপন কল্পে যে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হয়, তাহার জন্যও নগেন্দ্রনাথ বহুস্থানে স্বভাব সিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির চেষ্টায় যে প্রথম জাতীয় সভা ও স্বদেশী হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা হয়, সেই মেলাতে নগেন্দ্রনাথ "স্বদেশ প্রীতি" নামে এক জাতীয় ভাবোদ্দীপক অতি উন্মাদনা সূচক বক্তৃতা প্রদান করেন। শেষ জীবনে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হেতু আর প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিতে পারিতেন না বলিয়া সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিয়া বলিতেন "কবে সুস্থ হইয়া দেশের যুবকগণকে জ্ঞানে, ধর্ম্মে ও দেশসেবার কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিব"।

সাহিত্য সেবায় নগেন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি রাজা রামমোহন রায়ের বিস্তৃত জীবনী প্রকাশ। উহা বাঙ্গালা ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ জীবন চরিতগুলির মধ্যে একখানি প্রধান গ্রন্থ। ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পদে বরিত হন। তাহার পর হইতে দীর্ঘকাল বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালার বাহিরে বহুস্থানে ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে পর্য্যটন করেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা জনসাধারণের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিত। জন্মভূমি বাঁশবেড়িয়াতে তিনি যুবকদিগকে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য "ছাত্র সমাজ" প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় ভূম্যধিকারীরা তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সৎকার্য্যে তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেন।

১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয়। তাহার পর হইতে আংশিক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত থাকিয়া ১৯১৩ খ্রীঃ অব্দের জুন মাসে (১৩২০ বঙ্গাব্দ জ্যৈষ্ঠ) কলিকাতা নগরে তিনি পরলোক গমন করেন।

নগেন্দ্রনাথ বসু—প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক ও আভিধানিক। ১২৭৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে (১৮৬৬ খ্রীঃ জুলাই) তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম নীলরতন বসু। তাঁহারা মাহিনগর সমাজের মুখ্য কুলীন কায়স্থ। নগেন্দ্রনাথের পূর্ব্বপুরুষেরা হুগলী জিলার অন্তর্গত মাহেশে বাস করিতেন। তাঁহার পিতামহ তারিণীচরণ বসু বিবাহ সূত্রে কলিকাতাবাসী হন।

যৌবনেরপ্রারম্ভেই নগেন্দ্রনাথ নানা ভাবে সাহিত্য চর্চ্চা আরম্ভ করেন। প্রথমে কিছুকাল ছদ্ম নামে নানা পত্রিকায় তাঁহার অনেক কবিতা প্রকাশিত হইত। তপস্বিনী নামে একখানি মাসিক পত্রিকায় "অর্দ্ধচাঁদ" নামে একখানি

উপন্যাস প্রকাশিত হয়। তদ্ভিন্ন সেই পত্রিকাতে ইংরেজ কবি সেক্সপীয়রের প্রসিদ্ধ নাটক ম্যাকবেথ (Macbeth) গ্রন্থেরও "কর্ণবীর" নামক বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। ১২৯০ বঙ্গাব্দে ঐ অনুবাদ সমাপ্ত হয়। ইহার অল্পকাল পরেই "তপস্বিনী"র প্রকাশ বন্ধ হইয়া গেলে, কতিপয় বন্ধুর সহিত মিলিয়া তিনি "ভারত" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ঐ পত্রিকাখানিতে নগেন্দ্রনাথ সেক্সপীয়রের হ্যামলেট (Hamlet) নাটকের অনুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই পত্রিকাখানি উঠিয়া যাওয়ায় অনুবাদ আর শেষ হইতে পারে নাই। এই সময়ের মধ্যেই হরিরাজ, পার্শ্বনাথ, লাউসেন প্রভৃতি কয়েকখানি গদ্য পদ্যময় এবং শঙ্করাচার্য্য নামে একটি ধর্ম্মমূলক নাটক রচনা করেন। ঐ নাটকগুলি তৎকালীন কোনও কোনও অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায়কর্ত্তৃক অভিনীত হইত।

উক্ত নাটকগুলি রচনার জন্য ইতিহাস আলোচনা করিতে করিতে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ জন্মে এবং ভারতীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব আলোচনার জন্য সংস্কৃত ভাষায় রূপ অধিকার থাকা আবশ্যক বুঝিয়া, তিনি মনোযোগের সহিত সংস্কৃত, সাহিত্য ও দর্শনঅধ্যয়ন করিতে থাকেন।

১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে "শব্দেন্দু-মহাকোষ" নামে ইংরেজি ও বাঙ্গালা ভাষায় একখানি বৃহৎ কোষগ্রন্থ প্রকাশ হইতে আরম্ভ করে। নগেন্দ্রনাথ উহা সঙ্কলনকার্য্যে যোগ দিয়া কাজ করিতে থাকেন। কিছুকাল পরে নানা কারণে উহার প্রকাশ কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। নগেন্দ্রনাথ তখন রাজা সার রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র, সুপণ্ডিত আনন্দকৃষ্ণ বসুর উপদেশে সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত অভিধান "শব্দকল্পদ্রুমের" সঙ্কলনকার্য্যে সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে তিনি অসীম অধ্যবসায় সহকারে বিবিধ মূল্যবান গ্রন্থাদি পাঠ করিতে থাকেন।

ইহার কিছুকাল পরে তিনি "বিশ্বকোষ" নামক মহাগ্রন্থ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই পুস্তকখানি প্রথমে খ্যাতনামা কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি "অ" বর্ণ মাত্র শেষ করিয়া কাজ বন্ধ রাখেন। ঐ পুস্তকের অভাব অনেকেই বোধ করিতে থাকেন। তখন কয়েকজন বন্ধুর উৎসাহে নগেন্দ্রনাথই উহা পরবর্ত্তী অংশ প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়া রঙ্গলালের সম্মতি প্রার্থনা করেন। রঙ্গলাল নগেন্দ্রনাথের কার্য্যক্ষমতায় আস্থাবান হইয়া আনন্দের সহিত উহার সকল স্বত্ব তাঁহাকে প্রদান করেন। অতঃপর

নগেন্দ্রনাথ অনন্ত কর্ম্মা হইয়া ঐ মহাগ্রন্থ সংকলনে প্রবৃত্ত হন এবং সুদীর্ঘ সাতাইশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া উহা সম্পন্ন করেন। ঐ মহাগ্রন্থের সংকলনে নগেন্দ্রনাথ যে অসাধারণ ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করেন, তাহার তুলনা অধিক পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য দেশে এই শ্রেণীর মহাগ্রন্থ বহু পণ্ডিতের সমবেত চেষ্টায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমাদের দেশে একা নগেন্দ্রনাথ দারিদ্র্যের সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিয়া এই মহাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া যান। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পুর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার এই বিরাট কীর্ত্তির কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। নগেন্দ্রনাথ তখন বিশেষ অসুস্থ ছিলেন। মহাত্মা তাঁহার এই জীবনব্যাপী সাধনার জন্য ভূয়সী ধন্যবাদ প্রদান করেন। নগেন্দ্রনাথ যদি আর কিছু নাও করিতেন, তথাপি এক বিশ্বকোষই তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিত। এই মহাগ্রন্থে একটি হিন্দি সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি উহার পরিশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

শব্দেন্দু মহাকোষের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়েই তিনি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতগণের সহিত পরিচিত হন এবং কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য মনোনীত হন। উক্ত পরিষদের বিভিন্ন অধিবেশনে তিনি অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেইগুলির প্রত্যেকটিই পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করে। বঙ্গের সেনরাজগণ সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা করিয়া তিনি ইতিহাসের ঐ অধ্যায়ের অনেক সন্দেহজনক স্থানের মীমাংসা সাধন করেন এবং তাঁহার মীমাংসাই তৎকালে পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। বিশ্বকোষে অন্তর্ভূক্ত করিবার জন্য তিনি প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের যে মানচিত্র প্রকাশ করেন তাহা সুধীজন কর্ত্তৃক বিশেষ প্রশংশিত হয়।

প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিবার উপকরণ সংগ্রহের জন্য তিনি নানাস্থানে, বিশেষভাবে উড়িষ্যার বহু তীর্থ ও দুর্গম স্থানে গমন করেন এবং বহু শিলালিপি, তাম্রশাসন পুঁথি প্রভৃতি সংগ্রহ করেন। ঐ সকল উপকরণ যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়া তিনি ইতিহাসের অনেক অপরিজ্ঞাত বিষয়ের তথ্য প্রদান অথবা সন্দেহ মূলক বিষয়ের সুমীমাংসা করেন। দেবনাগরী অক্ষরের উৎপত্তি বিষয়ে গবেষণা করিয়া তিনি যে গভীর তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন, তাহা পাশ্চাত্য দেশের সুধীজন কর্ত্তৃকও বিশেষ আদৃত হয়

হিন্দি, গুজরাট ও তৈলঙ্গী ভাষায় ঐ প্রবন্ধের অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

তিনি সুদীর্ঘকাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কতিপয় বর্ষ উহার কর্ম্ম-সচিব এবং পত্রিকা সম্পাদকের পদও অলঙ্কৃত করেন। উক্ত পরিষদের পক্ষ হইতে তিনি পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী, চণ্ডী দাসের অপ্রকাশিত পদাবলী, জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল, ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিনী, রাজকবি জয়নারায়ণের কাশীপরিক্রমা প্রভৃতি বহু মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদন করেন।

নড়াইল-হাটবাড়িয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের অর্থানুকুলে "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" নামক আর একখানি মহা মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। আমাদের দেশে ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাস না থাকিলেও, বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের যে কুলগ্রন্থ আছে, তাহা হইতে মূল্যবান সামাজিক ইতিহাস সংকলিত হইতে পারে। নগেন্দ্রনাথ ঐ সকল কুলগ্রন্থ হইতে এই জাতীয় ইতিহাস সংকলন করেন। উহার মোট ছয়টি "কাণ্ড" প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুকাল পরেই তিনি উহার পত্রিকা-সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং কতিপয় বর্ষ বিশেষ যোগ্যতার সহিত উহা পরিচালন করেন। ভারতবর্ষের সকল কায়স্থের বর্ণ নিরূপণকল্পে তিনি কায়স্থের বর্ণ নির্ণয় নামে একখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন।

কিছুকাল তিনি উড়িষ্যার অন্তর্গত ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে পুরাতত্ত্ব বিভাগের উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে সকল তথ্য আবিষ্কার করেন, সেইগুলি অবলম্বনে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন,। যশোহরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাস শাখার তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ভারতের পুরাতত্ত্বে তাঁহার অসীম পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি "প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব" উপাধি প্রাপ্ত হন। "বিশ্বকোষ গ্রন্থ" সম্পূর্ণ হইলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক তিনি সিদ্ধান্তবারিধি উপাধি ভূষিত হন। পূর্ব্বে উল্লিখিত কয়েকখানি পুস্তক ভিন্ন তিনি Modern Buddhism and its followers in Orissa, Social History of Kamrup নামে দুইখানি গ্রন্থও রচনা করেন।

১৩৪৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে (১৯৩৮ খ্রীঃ অক্টোবর) কলিকাতা নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র বিশ্বনাথ কয়েকবৎসর পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পর তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। শেষ জীবনের কয়েক বৎসর তিনি নানারূপ পীড়ায় ভুগিতেছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ সেন—কলিকাতাবাসী খ্যাতনামা কবিরাজ। 'কেশরঞ্জন' নামক দেশবিখ্যাত তৈলের নাম তাঁহাকে জনসমাজে পরিচিত করিয়াছিল। তিনি বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কালনার এক প্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ বিনোদলাল সেন, জবাকুসুম তৈলের আবিষ্কর্তা চন্দ্রকিশোর সেন প্রমুখ কলিকাতার কলুটোলা অঞ্চলের বিখ্যাত কবিরাজগণ তাঁহার নিকট আত্মীয়। নগেন্দ্রনাথ কলিকাতার ক্যাম্বেল স্কুল (Campbel Medical School) হইতে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াও কবিরাজী মতে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনি অমায়িক, পরোপকারী সুচিকিৎসক ছিলেন। তিনি অনেক কবিরাজী গ্রন্থ সংকলন ও বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী, সরস্বতী—খ্যাতনামা মহিলা কবি ও সাহিত্যসেবিকা। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে (১৯৭৮ খ্রীঃ) হুগলী জেলার অন্তর্গত পালাড়া নামক মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা নৃত্যগোপাল সরকার সুলেখক ছিলেন।

নগেন্দ্রবালা তের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অধিকাংশ সময়ই পিতার সঙ্গে চট্টগ্রামে থাকিতেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই। শৈশবকালে মাত্র একটী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বলে তিনি বাঙ্গালা, উড়িয়া, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। দশম বৎসরের হুগলী জেলার অন্তর্গত সুখড়িয়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব খগেন্দ্রনাথ মিত্র মুস্তোফী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। মুস্তোফী মহাশয় একজন সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী ছিলেন।

শৈশবেই নগেন্দ্রবালা তাঁহার পিতার নিকট হইতে সাহিত্যে চর্চ্চার অনুপ্রেরণা লাভ করেন এবং সাহিত্য সেবায় ব্রতী হন। বার বৎসর বয়সের সময়ই তিনি কবিতা রচনা করিতে থাকেন। তিনি আজীবন নানা প্রকার রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও নিম্ন লিখিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন— ১। দানব নির্ব্বাণ, ২। ঊষা পরিণয়, ৩। মর্ম্মগাথা, ৪। চামেলী, ৫। গীতাবলী, ৬। প্রেমগাথা, ৭। ব্রজগাথা, ৮। নারীধর্ম্ম, ৯। গার্হস্থ্যধর্ম্ম, ১০। অমিয় গাথা, ১১। শিশুমঙ্গল, ১২। কুসুম গাথা, ১৩। খবলেশ্বর। মর্ম্মগাথা, প্রেমগাথা, ব্রজগাথা, নারীধর্ম্ম ও খবলেশ্বর নামক পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে।

অন্য পুস্তকগুলি মুদ্রিত হয় নাই। তাঁহারা স্বামী স্ত্রী উভয়ই বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ব্রজগাথা পুস্তক শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, দানলীলা, নৌকা-বিলাশ প্রভৃতি দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। রাধার বিশুদ্ধ প্রেম প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

প্রেমগাথার কবিতায় সন্তুষ্ট হইয়া হেয়ার প্রাইজ এসে ফণ্ডের (Hare Prize Essay) অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে পুরস্কার দিয়াছিলেন। কবিতা রচনায় পারদর্শিনী ছিলেন বলিয়া তিনি 'সরস্বতী' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি নব্য-ভারত, সাহিত্য, রামাবোধিনী, বীরভূম, পূর্ণিমা, জন্মভূমি প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা এবং আনন্দবাজার প্রভৃতি সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন।

১৩১৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে মাত্র উনত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি চিন্তাশীল, সুগৃহীনি, স্বাস্থ্যতত্ত্বাভিজ্ঞা, অতিথি বৎসলা ও দানশীলা মহিলা ছিলেন।

নগ্নজিৎ—তিনি একজন শাস্ত্রের গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ হইতে বরাহ মিহির তাঁহার বৃহৎ সংহিতায় বহু বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

নজমা দেবী—তিনি উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নরপতি চতুর্থ বজ্রহস্তের পত্নী ও প্রথম রাজ রাজের জননী। বজ্রহস্ত চতুর্থ দেখ।

নজফ খাঁ—তাঁহার উপাধি আমির-উল-ওমরা-জুলফিকার আবদুল্লা ছিল। পারস্যের সফিরি রাজ বংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। বাল্যকালেই তিনি সেই বংশের অন্যান্য ব্যক্তিগণের ন্যায় বন্দী হন। নাদির শাহের ভারত আক্রমণের পর দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহ নবাব সফদর জঙ্গকে পারস্যে নাদির শাহের নিকটদূত স্বরূপ প্রেরণ করেন। সেই সময়ে মোহাম্মদ শাহের ভ্রাতা মির্জা মুহসিন খাঁও ছিলেন। এই মির্জা মুহসিন খাঁর অনুরোধেই নজফ খাঁ ও তাঁহার এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী মুক্তি লাভ করেন। পরে নজফ খাঁ তাঁহার সেই ভগিনীকে মির্জা মুহসিনের নিকট বিবাহ দেন এবং তিনি ভগিনীর সঙ্গে দিল্লীতে আগমন করেন। নজফ খাঁ মির্জা মুহসিনের মৃত্যুর পরে, বাঙ্গালার নবাব মির কাশিম খাঁর অধীনে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বক্সারের যুদ্ধে মির কাশিম পরাজিত হইলে, তিনি বুন্দের খণ্ডের সর্দ্দার গুমাউ সিংহের অধীনে কিছুদিন কাজ করেন। পরে তিনি ইংরেজদিগের অধীনে কাজ করিতে সম্মত হন এবং নিজেকে এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা বলিয়া ঘোষণা করেন; তদনুসারে ইংরেজ সরকার তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করেন। পরে সুজাউদ্দৌল্লার সহিত ইংরেজদিগের সন্ধি হইলে তিনি দুই

লক্ষ টাকা বৃত্তি গ্রহণে এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তার পদ ত্যাগ করেন। ১৭৭১ খ্রীঃ অব্দে তিনি দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের অধীনে একজন আমির-উল-ওমারার পদ গ্রহণ করেন। তিনি নয় বৎসর কাল ঐ পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যকালে দিল্লীর শক্তি পুনঃ উদ্দীপিত হইয়াছিল। ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দের ২২শে এপ্রিল (হিঃ ১২৬৯) তাঁহার মৃত্যু হয়।

নজবউদ্দৌলা—তিনি সেকেন্দ্রাবাদের জায়গীদার ছিলেন। ১৭৬১ খ্রীঃ অব্দে পাণিপথের যুদ্ধের পরে আমেদ শাহ আবদালী কর্ত্তৃক তিনি দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পাণিপথের যুদ্ধের পরে দিল্লী ও উহার চতুঃপার্শ্বে ভীষণ বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় সমস্ত রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

নজম-উদ্-দৌল্লা—বাঙ্গালার নবাব। তিনি নবাব মীরজাফরের পুত্র এবং মীরজাফরের মৃত্যুর পর ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি মসনদ লাভ করেন।

মীরজাফরের মৃত্যুর পূর্ব্বেই বাংলাতে ইংরেজ কোম্পানীই প্রকৃতপক্ষে দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা হইয়াছিলেন। নজম্-উদ্-দৌল্লা যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন কোম্পানী তাঁহার সহিত এক নূতন সন্ধি করেন। তাহাতে এমন কয়েকটি নূতন সর্ত্ত যোগ করা হয় যাহার ফলে নূতন নবাবের প্রকৃত ক্ষমতা আর কিছুই রহিল না। ঐ সকল সর্ত্তের ফলে মহারাজ নন্দকুমারের পরিবর্ত্তে মোহম্মদ রেজা খাঁ দেওয়ান-সুবাদার নিযুক্ত হন।

পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালার নবাবেরা, নামতঃ দিল্লীর বাদশাহের অধীন ছিলেন। তাহা হইলেও সকল নবাবকেই, মসনদে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে দিল্লীর বাদশাহের পরোয়ানা লাভ করিতে হইত। কারণ তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে দিল্লীর বাদশাহের অধীন বাঙ্গালা বিহার সুবার শাসনকর্ত্তা (সুবাদার) মাত্র। এই ব্যবস্থানুসারে, মীরজাফরের মৃত্যুর পরই মহারাজ নন্দকুমারের চেষ্টায় দিল্লীর বাদশাহের পরোয়ানা উপস্থিত হয়। মুঘল সাম্রাজ্যের রীতি অনুসারে, পরোয়ানা গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ দরবার অনুষ্ঠিত হইত। নন্দকুমারের ইচ্ছা ছিল যে পূর্ব্ব রীতিই প্রতিপালিত হয়। কিন্তু কোম্পানীর প্রতিনিধি (গবর্ণর) বলিলেন যে নজম্-উদ্-দৌল্লাকে কোম্পানীর নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। নবাব একরূপ বাধ্য হইয়াই এই প্রস্তাবে (আদেশ?) সম্মত হন। ইহার ফলে, দিল্লীর বাদশাহের নবাবের উপর যেটুকু নামেমাত্র প্রভুত্ব ছিল, তাহাও আর রহিল না।

নবাব নজম্-উদ্-দৌলা মাত্র এক বৎসর রাজত্ব করিয়া বসন্ত রোগে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা সইফুদ্দিন নবাব হন।

নজিবআলী খাঁ, নবাব বাহাদুর—১৭৫১ খ্রীঃ অব্দে তিনি শ্রীহট্টের ফৌজদার ছিলেন।

নজিমউদ্দৌল্লা—একজন রোহিলা সর্দ্দার ও শাসনকর্ত্তা। তাঁহার প্রকৃত নাম নজিব খাঁ। নজিম উদ্দৌল্লা তাঁহার উপাধি। তিনি বশারত খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। আলি মোহাম্মদ খাঁর সময়ে তিনি রোহিল খণ্ডে আগমন করেন এবং ক্রমে ক্রমে উন্নতি করিয়া রোহিলা সর্দ্দার ডুন্দি খাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। পরে সম্রাট আহম্মদ শাহ কর্ত্তৃক নজিব উদ্দৌলা উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি দিল্লীর নিকটবর্ত্তী প্রদেশ ন্যায়ানুসারে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ১৭৭০ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ১১৮৪) তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র জাবিতা খাঁ পৈতৃক সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

নটবর—একজন পদকর্ত্তা। তাঁহার রচিত দুইটী পদ পাওয়া গিয়াছে।

নটবর ঘোষ—একজন কবি গান রচয়িতা। বর্দ্ধমান জেলায় তাঁহার বাসস্থান ছিল। তাঁহার পিতা অক্ষয়কুমার ঘোষও একজন ব্যঙ্গ কবিতা রচয়িতা ছিলেন। তাঁহারা জাতিতে গোপ। চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে নটবর একজন বিখ্যাত কবিওয়ালা ছিলেন।

নন্দেব—এই জ্যোতিষী পণ্ডিত মুহূর্ত্ত সিদ্ধি নামক গ্রন্থের প্রণেতা।

নন্দেরচাঁদ পাল—একজন পাঁচালীকার। বীরভূম জেলার অন্তর্গত গৌড়েশ্বর থানার অধীনে হাটপ্রচন্দ্রপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১২৮২ বঙ্গাব্দে তাঁহার রচিত 'রামশক' নামক পাঁচালী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁহার এই গ্রন্থে বালীবধ, অজামিলোপাখ্যান, রামচন্দ্রের বনযাত্রা, সীতাহরণ ও দাতাকর্ণ এই পাঁচটি পালা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ননীগোপাল মজুমদার—খ্যাতনামা প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। তিনি যশোহর জিলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। ১৯১৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি বি-এ পরীক্ষায় এবং ১৯২০ খ্রীঃ অব্দে সংস্কৃত কলেজ হইতে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (Ancient Indian History & Culture) বিষয়ে কৃতীত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি স্বভাবতঃই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন।

এম-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ১৯২০ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভারতীয়

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। এবং ক্রমে নিজ অসাধারণ বুদ্ধি ও কর্ম্মক্ষমতা বলে ক্রমশঃ উচ্চতর পদলাভ করেন। মোহেন জো দরোতে ১৯২৫—১৯২৬খ্রীঃ অব্দে তিনি সার জন মার্শালের (Sir John Marshal) অধীনে গবেষণা আরম্ভ করেন। ১৯২৯—১৯৩০ এবং ১৯৩০—১৯৩১ খ্রীঃ অব্দে তিনি দুইবার সিন্ধু প্রদেশের অনেক স্থানে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ হইতে জরীপ করিয়া এরূপ কুড়িটি ভগ্নাবশেষ-বহুল স্থান আবিষ্কার করেন যে তদ্দ্বারা মোহেন জো দারো যুগের অনেক নূতন কিছু জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। তিনি এই সকল বিষয় গবেষণা করিয়া একখানা পুস্তক রচনা করেন। উহা ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বঙ্গের পাহাড়পুরেও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করিয়াছিলেন। ১৯৩১ খ্রীঃ অব্দে অর্থাভাবহেতু সরকার সিন্ধুদেশের গবেষণা কার্য্য বন্ধ রাখেন। ইহার পর তিনি কলিকাতা আগমন করেন এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ব শালার (Indian Musuem) প্রত্নতত্ত্ব শাখার সহকারী তত্ত্বাবধায়ক (Superindent) নিযুক্ত হন এবং ক্রমে তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছিলেন। তিনি যাদুঘরের বহু পুরাতন সংগৃহীত জিনিষ গুলির একটী উৎকৃষ্ট তালিকা প্রস্তুত করেন। তৎপরে সরকার পুনরায় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ গঠন করিতে মনস্থ করেন এবং তাঁহাকে পুনরায় সিন্ধুপ্রদেশে গবেষণা করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি তিনজন সহকারী লইয়া সিন্ধুপ্রদেশের দক্ষিণ ভাগে জঙ্গলাকীর্ণ দাদু জেলায় কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেকার অসমাপ্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ২২শে কার্ত্তিক (১৯৩৮ খ্রীঃ অব্দের ১১ই নবেম্বর) তাঁবুতে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মাত্র তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে অকালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পূর্ব্বে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত এই বিভাগে আর কোনও বাঙ্গালী এইরূপে উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালী জাতীর দুর্ভাগ্য যে তিনি অকালে অপ্রত্যাশিত ভাবে দস্যুহস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। নতুবা তাঁহার পক্ষে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আরও উচ্চতর পদে লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল।

ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—একজন প্রবাসী বাঙ্গালী খ্যাতনামা ব্যবহারজীবি সাময়িক ও কবি। ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে (১২৬৩ বঙ্গাব্দ পৌষ) কলিকাতার দক্ষিণভাগে বড়িশা বেহালা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বড়িশা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রথমে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং উক্ত বিদ্যালয় হইতেই তিনি প্রবেশিকা

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে তিনি ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারী কলেজে (London Missionary College) অধ্যয়ন করেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই মেধাবী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও পরিশ্রমী ছাত্র ছিলেন এবং শৈশবেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। সহপাঠীগণের মধ্যে তিনি সর্ব্বদাই প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। তাঁহার পাঠস্পৃহা এরূপ প্রবল ছিল যে, বহু দূর স্থান হইতে ভাল ইংরেজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ আনাইয়া পাঠ করিতেন। কলেজে অধ্যয়নকালে কেশবচন্দ্র সেনের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। কেশবচন্দ্র তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন।

কিছুকাল পরে তাঁহার কলেজের পড়া বন্ধ হয়। তৎপর তিনি মেডিক্যাল কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় উহাও ত্যাগ করিতে হয়। ইহার পর ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি এলাহাবাদে গমন করেন এবং সেইখানেই ওকালতী পড়িতে আরম্ভ করেন। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ প্রদেশেরই মির্জ্জাপুরে তিনি কিছুদিন আইন ব্যবসায় করেন। তৎপরে ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি মৈনপুরীতে যাইয়া ওকালতী আরম্ভ করেন। এবং সেখানেরই স্থায়ী অধিবাসী হন। অল্পকাল মধ্যেই তিনি মৈনপুরীর একজন খ্যাতনামা উকীল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি একজন পরদুঃখকাতর ব্যক্তি ছিলেন। কোনও দরিদ্র ব্যক্তি কোন মোকর্দ্দমা নিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি পারিশ্রমিক গ্রহণ না করিয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতেন এবং প্রকৃত নির্দ্দোষ ব্যক্তির মুক্তির জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। তিনি সেই স্থানের সমস্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। আইন ব্যবসায় এবং নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও তিনি নিয়মিত ভাবে সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদিত প্রসিদ্ধ 'আর্য্যদর্শন' এবং 'সুরভি ও পতাকা' প্রভৃতি সংবাদপত্রে তাঁহার বহু সুচিন্তিত রচনা ও কবিতা প্রকাশিত হইত। তিনি 'পরিব্রাজক' এই ছদ্মনামে এই সকল রচনা কবিতা এবং ছোট ছোট গল্প ও উপন্যাস গুলি প্রকাশ করিতেন। 'অমৃতপুলিন' নামক তাঁহার প্রণীত উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণকালে তিনি তাঁহার নিজ নাম প্রকাশ করেন। তৎপর তিনি 'যুগলপ্রদীপ' প্রভৃতি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইংরেজীতে তিনি ভাল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। ঐ অঞ্চলের ইংরেজ ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ইংরেজী বক্তৃতায় বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৮৮৯

খ্রীঃ অব্দে মৈনপুরী একম্যান ক্লাবের কোন সভায় বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তিনি একটি ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ অধিবেশনের সভাপতি মৈনপুরীর সেসন জজ একম্যান সাহেব তাঁহার এই প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লাযর উহা মুদ্রিত করিয়া ইংলণ্ডে তাঁহার বন্ধুগণের নিকট প্রেরণ করেন। কংগ্রেসের উন্নতির জন্যও তিনি মৈনপুরীতে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া এলাহাবাদ বোম্বাই প্রভৃতি নানা স্থানে কয়েকবার কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

নন্দ—(১) বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক গৌতম বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তিনি শুদ্ধোধনের অপরা পত্নী, সিদ্ধার্থের পালয়িত্রী মহাপ্রজাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া যখন সিদ্ধার্থ প্রথম কপিলাবস্তু নগরে গমন করেন, তখন নন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। বুদ্ধদেব কতকটা নন্দের অনিচ্ছাসত্ত্বেও, তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দান করেন। এই নন্দের বিবাহ, প্রব্রজ্যা প্রভৃতি ঘটনার বিবরণ লইয়া মহাকবি অশ্বঘোষ সংস্কৃত ভাষায় 'সৌন্দরানন্দ' নামে একখানি সুমধুর কাব্য প্রণয়ন করেন।

নন্দ—(২) মগধের একজন রাজা। বিভিন্ন পুরাণে তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রে প্রাপ্ত বিবরণ হইতে পৃথক। পুরাণের মতে তিনি মহানন্দির ঔরসে এক শূদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনদের বিবরণীতে তাঁহার পিতার নাম দিবাকীর্ত্তি পাওয়া যায়। মাতা খুব সম্ভব দিবাকীর্ত্তিরই একজন উপপত্নী। শেষোক্ত বিবরণীতে আছে যে পাটলিপুত্রের রাজা উদায়ীর মৃত্যুর পর মন্ত্রীগণ নন্দকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। এই নন্দ হইতেই মগধের প্রসিদ্ধ নন্দ বংশ আরম্ভ হয়। তিনি খুব সম্ভব খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রাজত্ব করেন। অনেকের মতে ৪৬৬ অব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। নন্দবংশে সর্ব্বমোট নয় জন রাজা রাজত্ব করেন। এই নন্দবংশের শেষ নরপতিকেই সিংহাসনচ্যুত করিয়া চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। কোনও কোনও পুরাণের মতে প্রথম নন্দেরই নামান্তর মহাপদ্ম।

এলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক গ্রীক এক রাজকর্ম্মচারীর বিবরণী হইতে জানা যায় যে মহারাজ নন্দ ক্ষৌরকার বংশ-সম্ভূত ছিলেন। তিনি কোনও কারণে মগধ রাজমহিষীর প্রিয়পাত্র হন এবং তাঁহাই অনুগ্রহে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রাজাকে বধ করেন এবং নাবালক রাজপুত্রের অভিভাবকের পদ

গ্রহণ করিয়া প্রকৃতপক্ষে নিজেই রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করেন। জৈন কথাসাহিত্য হইতেও এই ধরণের বিবরণ পাওয়া যায়। নন্দ খুব সম্ভব কালাশোক-কাকবর্ণকে বধ করেন।

মৎস্য, বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে মহারাজ নন্দ সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন এবং সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে বধ করিয়াছিলেন। তৎকালীন অন্যান্য কাহিনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে নন্দের রাজ্য বিশেষ বিস্তৃত ছিল। আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সমুদয় অংশ তাঁহার অধীন হইয়াছিল। পাটলিপুত্র নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি কত বৎসর রাজত্ব করেন তদ্বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, তিনি বাইশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার আট পুত্র ক্রমান্বয়ে বার বৎসর রাজত্ব করেন।

পুরাণ সমূহে নন্দের এক পুত্রের উল্লেখ আছে। কিন্তু সিংহলের "মহাবোধিবংস" নামক গ্রন্থে তাঁহার পণ্ডুক, পণ্ডুগতি, ভূতপাল, রাষ্ট্রপাল, গোবিষণক, দশসিদ্ধক, কৈবর্ত্ত ও ধন নামে আট পুত্রের উল্লেখ আছে। গ্রীক লেখক কার্টিয়াসের (Curtius) এর মতে মহারাজ নন্দের কুড়ি হাজার অশ্বারোহী, দুই লক্ষ পদাতিক সৈন্য, দুই হাজার চতুরশ্বযোজিত যুদ্ধ রথ, এবং তিন হাজার যুদ্ধ হস্তী ছিল। তাঁহার প্রভূত ঐশ্বর্য্যের কাহিনী অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হিউয়ান চ্যাং ভারতে আসিয়া লোকমুখে মহারাজ নন্দের ঐশ্বর্য্যের কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য অথবা কৌটিল্য নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করেন বলিয়া একাধিক স্থানে বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু কোনও কোনও বিবরণী হইতে অনুমতি হয় যে পরবর্ত্তী নন্দরাজগণ অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তৎফলে দেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য সেই বিদ্রোহের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নন্দবংশ ধ্বংশ করেন।

নন্দকিশোর—একজন আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'চিকিৎসা-সার-সাগর'।

নন্দকিশোর দাস—একজন কবি। 'বৃন্দাবন-লীলামৃত' ও 'রসপুষ্প কলিকা' নামক দুইটী বৃহৎ কাব্য গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন। বৃন্দাবন-লীলামৃত গ্রন্থখানা তিনি বরাহ সংহিতা অবলম্বনে রচনা করিয়াছেন। ইহাতে পঞ্চাশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। 'রসপুষ্প-কলিকা' গ্রন্থখানিতে ষোড়শ অধ্যায়ে রাধা ও কৃষ্ণের বিলাস বর্ণিত হইয়াছে।

নন্দকিশোর প্রামাণিক—ময়মন-

সিংহ জিলার অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র নদের তীরস্থ নরগুন্দা গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী কৃষ্ণদাস প্রামাণিকের পুত্র। তিনিও তাঁহার পিতারই ন্যায় নানাবিধ সৎকার্য্য করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পৈত্রিক বাসস্থান নরগুন্দা গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাটাখালি নামক স্থানে আসিয়া বিশাল পুরী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে তিনি বৎসর ব্যাপী উৎসব করিয়াছিলেন। এই সময়েই তিনি বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন, দোলমঞ্চ, জলবাথ জলটঙ্গী, গোল দালান, শিবমন্দির, রাসমণ্ডপ, একুশ রত্ন প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া বহু লোককে অন্ন বস্ত্রদ্বারা পালন করিয়াছিলেন। এখন তাহাদের ভগ্নস্তূপ, তাঁহার বংশধরদের দৈন্যতা সূচনা করিতেছে।

নন্দকিশোর সিদ্ধান্ত—একজন গ্রন্থকার তাঁহার পিতার নাম রুক্মিণী চক্রবর্ত্তী। তিনি 'মন্ত্রবোধিনী' নামে বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা সংবলিত একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

নন্দকুমার—তিনি চিতোরের রাণা বাপ্পা রাওয়ের পৌত্র এবং অপরাজিতের দ্বিতীয় পুত্র। নন্দকুমার দাক্ষিণাত্যস্থিত দেবগড়ের রাজা ভীম সেনকে পরাস্ত করিয়া তদীয় রাজ্য হস্তগত করেন।

নন্দকুমার বসু (দেওয়ান)—কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে, চব্বিশপরগণা জিলার বহড়ু গ্রামের জমীদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পিতা রামচরণ বসু কাশীমবাজারের জমীদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবুর (রাজা কৃষ্ণকান্ত) জমিদারীর একজন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক সামান্য গোমস্তারূপে তিনি কর্ম্ম জীবন আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন কুঠীর ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী হন। পাটনার কুঠীর দেওয়ানীকালে তাঁহার ব্যবস্থায় ঐ কুঠীর আয় প্রায় দ্বিগুণ হয়। এই কর্ম্মদক্ষতার জন্য তিনি বহু অর্থ পুরস্কার লাভ করেন। পরে তিনি কলিকাতার শুল্ক বিভাগেও (Custom House) দেওয়ান হন। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক শেষজীবনে তিনি বৃন্দাবন-বাসী হন এবং তথায় অনেক বিগ্রহ স্থাপন করিয়া কয়েকটি সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ করান। ইং ১৮২১ সালে তিনি মদনমোহনের পুরাতন মন্দিরের পার্শ্বে একটি নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ঐ সকল বিগ্রহের সেবার জন্য তিনি যথোপযুক্ত ভূসম্পত্তিও দান করেন। নিজ গ্রামেও তিনি বহু মূল্য প্রস্তরের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বিগ্রহের পূজা-পার্ব্বণাদির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তিনি বহু দেবোত্তর সম্পত্তিও দান করেন। তিনি বিশেষ দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। বৃন্দা-

বন অঞ্চলে এখনও তাঁহার নাম লোক-মুখে শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হয়। ১২৪১ বঙ্গাব্দে (১৮৩৫ খ্রীঃ) বৃন্দাবনেই তিনি দেহরক্ষা করেন।

নন্দকুমার ভট্টাচার্য্য, কবিরত্ন—একজন কবি। ধলুক নামক গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। তাঁহারা রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ এবং রাধা-কান্তপুরের অধিবাসী ছিলেন। 'কালী কৈবল্য দায়িনী' ও 'শুকবিলাস' নামক দুইখানা কাব্য গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তন্মধ্যে কালী কৈবল্য দায়িনী গ্রন্থখানি বৃহৎ, চারিশত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ রচনায় পূর্ব্বে তিনি যোড়া-বাগানের অধিবাসী নৃসিংহলাল দাস কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ এবং দেবী কাত্যায়নী কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়াছিলেন। স্বপ্নাদেশ সম্বন্ধে কবির উক্তি এইরূপ,—

"মিথ্যা নাহি বোধকর,
আমার আদেশ ধর,
প্রকাশ দশভুজা তত্ত্ব।
দুর্গোৎসব প্রকরণ,
দুইকালে নিরূপণ,
বিস্তারিত সকল তত্ত্ব॥
মার্কণ্ডেয় প্রকাশিলা,
ভাগুরি যে করেছিলা,
রচ তুমি সেই অনুসারে।
সংস্কৃতে শব্দে তাই,
ভাষায় সঙ্গীত নাই,
তুমি ভাষা করহ বিস্তার॥
ইহা বলি কাত্যায়নী,
অদর্শনা নারায়ণী,
চেতন পাইয়া উঠিলাম।
নৃসিংহ কহিলা যাহা,
বিশ্বাস হইল তাহা,
আসিয়া তাহারে কহিলাম"॥

এই গ্রন্থ সাত খণ্ডে রচিত। প্রতি খণ্ডে এক এক জন কর্ত্তৃক দুর্গা পূজার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। অনুমান ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে এই গ্রন্থ রচনা শেষ হয়। শুক-বিলাস গ্রন্থে বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে নানা কাহিনী পদ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাঁহার জন্ম মৃত্যুর তারিখ অজ্ঞাত।

নন্দকুমার রায়—একজন কবি। হুগলী জিলার অন্তর্গত গয়ৌকা নামক গ্রামের বৈদ্যবংশে তাঁহার জন্ম হয়। হুগলী কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করিয়া-ছিলেন। তিনি অভিজ্ঞান শকুন্তলের বঙ্গানুবাদ করেন এবং ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার রচিত 'ব্যাকরণ দর্পণ' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহা পদ্যে রচিত হইয়া-ছিল। অভিজ্ঞান শকুন্তলের মূল গ্রন্থে যে যে শ্লোক সেইগুলি তিনি ছন্দে অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি সৈনিক বিভাগের কেরাণীর পদে কার্য্য করিতেন।

নন্দকুমার রায়, দেওয়ান—এক-জন শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চুপী গ্রামে তাঁহার

জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ব্রজকিশোর রায় বর্দ্ধমানপতি কীর্ত্তিচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। চুপীর রায় বংশ বংশানুক্রমে দেওয়ানের কার্য্য করিতেন বলিয়া নন্দকুমারও দেওয়ান বলিয়া পরিচিত হইতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনাথ রায় সঙ্গীত রচনায় অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতা ব্রজকিশোর রায়ও সঙ্গীত রচনা করিতেন।

নন্দকুমার রায়, মহারাজ—মুসলমান রাজত্বকালের প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারী। আনুমানিক ১৭০৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম পদ্মনাভ রায়। তাঁহারা রাঢ়ী শ্রেণীর কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। বীরভূম জিলার ভদ্রপুর গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের নিবাস জড়ুল গ্রামে ছিল। পদ্মনাভ মুসলমান রাজসরকারে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পাঁচ সন্তানের মধ্যে নন্দকুমার তৃতীয় এবং পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন।

কালোচিত প্রথানুযায়ী তিনি প্রথমে ফারসী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। পদ্মনাভ যখন মুর্শিদকুলি খাঁর অধীনে নায়েব আমীন ছিলেন, তখন নন্দকুমার তাঁহারই অধীনস্থ কর্ম্মচারীরূপে ফতেসিং, ঘোড়াঘাট, সাতপাইকা প্রভৃতি পরগণার রাজস্বসংক্রান্ত নানা কাজে নিযুক্ত থাকিয়া ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দে হিজলী মহিষাদল পরগণার আমীন নিযুক্ত হন। এই সময়ে আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। বর্গীর অত্যাচারে নন্দকুমারের অধীনস্থ স্থানসমূহে রাজস্ব অনাদায় হওয়াতে চিন্ময় রায় নামক একজন রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক নন্দকুমার কারারুদ্ধ হন। পদ্মনাভ অর্থ প্রদান করিয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করিলে, নন্দকুমার আত্মরক্ষার জন্য কলিকাতায় প্রস্থান করেন।

ইহার পর নন্দকুমার নবাবের সেনাপতি মুস্তাফা খাঁর নিকট কর্ম্মপ্রার্থী হন। সৈন্যদের বেতন বাকী পড়াতে নবাব, জমিদারদের নিকট প্রাপ্য আদায় করিয়া লইতে মুস্তাফাকে আদেশ দেন। জমিদারগণ অত্যাচারের আশঙ্কায় নন্দকুমারের পরামর্শ প্রার্থী হন এবং তিনি তাঁহাদিগের নিকট প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করিয়া দিবার জন্য জামিন হন। কিন্তু যথোচিত রাজস্ব আদায় না হওয়াতে মুস্তাফা নন্দকুমারকে বন্দী করিবার আদেশ দেন। নন্দকুমার পুনরায় প্রাণভয়ে কলিকাতায় পলায়ন করেন এবং ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে মুস্তাফার মৃত্যু হইলে তিনি মুর্শিদাবাদে গমন করেন।

অতঃপর নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ নন্দকুমারকে হুগলীর ফৌজদারের অধীনে

দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু ফৌজদারের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে গমন করেন এবং কিছুকাল পরে মহম্মদ ইয়ার বেগ হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হইলে তিনি পুনরায় দেওয়ানী লাভ করেন। ইহার পর ইয়ারবেগ মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কিছুকালের জন্য নন্দকুমার কর্ম্মচ্যুত অবস্থায় থাকেন। তাহার পর শেখ উমর উল্লা ফৌজদার নিযুক্ত হইলে, তিনি তৎকালীন নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা কর্ত্তৃক পুনরায় দেওয়ান নিযুক্ত হন।

এই সময়ে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লার সহিত ইংরেজদিগের বিশেষ মনোমালিন্য চলিতেছিলে। নবাব ইংরেজদিগের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। ফরাসীরা বরং অপেক্ষাকৃত তাঁহার প্রীতিভাজন ছিলেন। ইংরেজেরা কলিকাতা ও হুগলী আক্রমণ করিতে মনস্থ করিয়া মাদ্রাজ হইতে সাহায্য প্রাপ্তির আশায় কলিকাতার দক্ষিণে ফলতায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। নবাব নন্দকুমার ও মাণিকচাঁদকে কলিকাতা রক্ষার ভার প্রদান করেন। নন্দকুমার ইংরেজদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করেন। কিন্তু মানিকচাঁদ গোপনে ইংরেজদিগকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। মাদ্রাজ হইতে সাহায্য আসিয়া পৌছিলে ইংরেজেরা কলিকাতা আক্রমণ করেন এবং বিশ্বাসঘাতক মানিকচাঁদ মুর্শিদাবাদে পলায়ন করেন। এই ব্যাপারে হতবুদ্ধি হইয়া নন্দকুমার কলিকাতার পরিবর্ত্তে হুগলী রক্ষার জন্যই বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে থাকেন। ফৌজদারের সাময়িক অনুপস্থিতিতে নন্দকুমারকেই ফৌজদারের কাজ করিতে হইতেছিল।

মাণিকচাঁদের নিকট কলিকাতা ইংরেজ অধিকৃত হইয়াছে জানিতে পারিয়া নবাব হুগলী রক্ষার জন্য বিশেষ আয়োজন করেন। এই সময়ে ইয়োরোপে ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইব নবাবের ফরাসীপ্রীতির কথা জানিতেন। তিনি ইয়োরোপের যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া প্রথমে চন্দননগর আক্রমণ করিবার আয়োজন করেন। চন্দননগর আক্রান্ত হইলে, নবাবের নির্দ্দেশে নন্দকুমার ফরাসীদিগকে সাহায্য করিতে পারেন এইরূপ অনুমান করিয়া, ক্লাইব প্রথমে নন্দকুমারকে কি উপায়ে বিরত রাখা যায় তাহাই চিন্তা করিতে থাকেন। প্রথমে চন্দননগরের পরিবর্ত্তে সামান্য ভাবে হুগলী আক্রমণ করিয়া ক্লাইব বিফল মনোরথ হন। অতঃপর তিনি প্রলোভন দেখাইয়া নন্দকুমারকে, চন্দন-নগর আক্রমণকালে ফরাসীদিগকে সাহায্য করিতে বিরত রাখেন।

চন্দননগরের পতন হইলে নবাব সন্দেহ বশে সাময়িক ভাবে নন্দকুমারকে পদচ্যুত করেন। কিন্তু ক্লাইবও নন্দকুমারকে, ফরাসীদিগকে সাহায্য দানে বিরত থাকিলে যে পুরস্কার দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, চন্দননগর অধিকৃত হইলে, সেই প্রতিশ্রুতি আদৌ রক্ষা করেন নাই। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই প্রসিদ্ধ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পতন হয় এবং ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় মীরজাফর বাঙ্গালার মসনদ লাভ করেন। তখন রাজা দুর্লভরাম বাঙ্গালা সুবার দেওয়ান হইলেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর নবাব মীরজাফরের সুপারিশে নন্দকুমার হুগলী, হিজলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া প্রভৃতি স্থানে রাজস্ব সংক্রান্ত উচ্চ দায়ীত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত থাকেন। যুদ্ধের পর, পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যে বিপুল অর্থ ইংরেজ কোম্পানীকে দিতে হয় সেই অর্থ সংগ্রহের জন্যই নন্দকুমারকে নিযুক্ত করা হয়। তাঁহার উপর ভার ছিল যে পূর্ব্বোক্ত স্থানের রাজস্ব আদায় করিয়া কোম্পানীর দেনা শোধ করিবেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে তাঁহাকে তহশীলদারের পদে নিযুক্ত করা হয়। এই সময়ে হেষ্টিংস সাহেব (Warren Hastings) বর্দ্ধমানের রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। বর্দ্ধমানের রাজার খাজনা তাঁহারই নিকট প্রথম প্রথম জমা হইত। নন্দকুমার তহশীলদার হইয়া বর্দ্ধমানের রাজাকে খাজনার টাকা তাঁহার নিকট পাঠাইতে নির্দ্দেশ দেন। হেষ্টিংস সাহেব ইহাতে অসন্তুষ্ট হন। এই বিষয় লইয়াই নন্দকুমারের সহিত তাঁহার বিরোধের প্রথম সূত্রপাত হয়।

ক্লাইবের সাহায্যে বাংলার মসনদ লাভ করিয়া মীরজাফর অল্পকাল মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে ইংরেজ কোম্পানীই বাস্তবিক দেশের কর্ত্তা, তিনি নামে মাত্র নবাব। তখন হইতে প্রকৃত ক্ষমতা লাভ করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই বিষয়ে নন্দকুমার তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনিও মীরজাফরের ন্যায়, ইংরেজ কোম্পানীর উপর আদৌ প্রসন্ন ছিলেন না। মীরজাফরের সুপারিশে খুব সম্ভব, এই সময়ে দিল্লীর বাদশাহ নন্দকুমারকে রাজোপাধি প্রদান করেন। কিন্তু মীরজাফর অথবা নন্দকুমার কেহই, ইংরেজ কোম্পানীর ক্ষমতা হ্রাস করিবার বিশেষ কিছু উপায় স্থির করিবার পূর্ব্বেই, হলওয়েল সাহেব (John Zephania Hollwell) মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া মীরকাশিমকে নবাব করেন। ইহাতে নন্দকুমার আরও ক্রুদ্ধ হইয়া নানা ভাবে ইংরেজ কোম্পানীর অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে

থাকেন। বলা বাহুল্য মীরজাফরও এ বিষয়ে তাঁহার সহায় ছিলেন। নন্দকুমার দিল্লীর মুঘল বাদশাহ শাহ আলমকে এবং অযোধ্যার নবাব-উজীর সুজা-উদ্-দৌল্লাকে অনুরোধ করিয়া পাঠান তাঁহারা যেন মীরজাফরকে পুনরায় নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। মীরকাশিম পূর্ব্বাবধিই জানিতেন নন্দকুমার মীরজাফরেরই পক্ষপাতি। তদ্ভিন্ন মীরজাফরের পক্ষে লিখিত নন্দকুমারের কতকগুলি পত্র মীরকাশিমের হস্তে পতিত হওয়ায় তিনি আরও শঙ্কিত হইলেন এবং নন্দকুমারের ষড়যন্ত্রের কথা ইংরেজ কোম্পানীকে জানাইলেন। কিন্তু কলিকাতার ইংরেজ-কোম্পানী তখনও নন্দকুমারের প্রতি বিশেষ বিরূপ হন নাই। তাঁহারা মীরকাশিমের আশঙ্কাকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। কিন্তু নবাব স্থির থাকিতে না পারিয়া কিছুকালের জন্য নন্দকুমারকে নিজের বাসগৃহে অন্তরীণ করেন। কিছুকাল পরে তিনি মুক্তি লাভ করিয়া সেনাপতি কুটের (Sir Eyre Coote) দেওয়ান নিযুক্ত হন। নবাব তাহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহাকে অভয় দেওয়া হয়। কিন্তু নবাব নিঃশঙ্ক হইতে পারিলেন না। তিনি ১৭৬২ খ্রীঃ অব্দে পুনরায়, নন্দকুমারকে দেশ হইতে বহিষ্কার করিবার জন্য ইংরেজ কোম্পানীকে অনুরোধ করিয়া পাঠান।

নন্দকুমারের শত্রুরও অভাব ছিল না। তাহাদের অনেকের গোপন চেষ্টায় তাঁহার বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ আনীত হয় এবং তিনি কারারুদ্ধ হন। কতদিন তাঁহাকে কারারুদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল তাহা ঠিক জানা যায় না খুব সম্ভব মীরকাশিমের পতনের পর মীরজাফর পুনরায় নবাবী না পাওয়া পর্য্যন্ত (জুলাই, ১৭৬৩ খ্রী) তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন। কিন্তু মীরজাফর পুনরায় নবাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নন্দকুমারের অদৃষ্ট পুনরায় সুপ্রসন্ন হয়। ঐ সালেরই ডিসেম্বর মাসে তিনি পুনরায় রাজস্ব বিভাগের অন্যতম দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। কোম্পানী এবিষয়ে খুব সন্তুষ্ট না থাকিলেও তাঁহাদের আপত্তি নবাব-উজীর সুজা-উদ্-দৌল্লা গ্রহণ করেন নাই।

মীরজাফর দ্বিতীয়বার নবাব হইবার পর মীরকাশিম পলায়ন করিয়া বিহারে গমন করেন। সেইখানে তিনি অযোধ্যার নবাব উজীরের সাহায্য লাভ করেন। নবাব উজীর তাঁহার পক্ষ লইয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধেই বিহার আক্রমণ করেন। মীরজাফরের বিরুদ্ধে তাঁহার কোনও বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু মীরজাফর কতকটা বাধ্য হইয়াই যেন কোম্পানীর পক্ষ লইয়া, নবাব উজীর ও মীরকাশিমের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। নন্দ-

কুমার ত পূর্ব্বাবধিই কোম্পানীর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি, অনেকের মতে মীরজাফরের প্ররোচনায়, গোপনে কাশীর রাজা, বলবন্তসিংহকে উজীরের পক্ষ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। এই সংবাদ কলিকাতার ইংরেজ শাসন-কর্ত্তার (Governor) নিকট পৌঁছিলে তিনি মীরজাফরকে লিখিলেন যে কোম্পানী ও নবাব, উভয়েরই হিতের জন্য নন্দকুমারকে পদচ্যুত করা উচিত (এপ্রিল, ১৭৬৪ খ্রীঃ)। কিন্তু পত্রখানি শেষ পর্য্যন্ত নবাবের নিকট হয়ত পৌঁছায় নাই কারণ এবিষয়ে পরে আর কিছু উচ্চবাচ্য শোনা যায় নাই।

১৭৬৪ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগে অযোধ্যার নবাব উজীর ও মীরকাশিমের মিলিত শক্তি সেনাপতি মনরোর হস্তে পরাজিত হওয়ায় মীরকাশিমের সমুদয় আশা চিরতরে বিনষ্ট হইল (কাশিম-আলি খাঁ দ্রষ্টব্য)। উহার কয়েক মাস পরে নবাব মীরজাফর মহারাজ নন্দকুমারকে খালিশা শরিফায় বসিয়া রাজ্যশাসন কার্য্য এবং রাজস্ব সম্বন্ধীয় সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে মহারাজ নন্দকুমার প্রত্যেক জিলার কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া রাজস্ব সংগ্রহের আদেশ প্রদান করিতে থাকেন। কিন্তু এই সম্মান নন্দকুমার অধিক দিন ভোগ করিতে পারেন নাই। পরবর্ত্তী বৎসরের প্রথম ভাগেই নবাব মীরজাফর গুরুতর পীড়িত হইয়া পড়েন। নিজের জীবনাশঙ্কা করিয়া তিনি নজমুদ্দৌল্লাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। মীর-জাফরের নির্দ্দেশে নন্দকুমার সমুদয় বিষয় কলিকাতায় ইংরেজ কোম্পানীর গোচর করেন। তদুপলক্ষে প্রেরিত পত্রে নন্দকুমার মীরজাফরের মৃত্যুর (১৭৬৫ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী) অব্যবহিত পরেই লিখিয়াছিলেন "পরলোকগত নবাবের ইংরেজের প্রতি যেরূপ প্রীতি ছিল, নবাব নজমুদ্দৌল্লা তদপেক্ষা অধিক প্রীতি প্রদর্শন করিবেন। ইংরেজের হিতকারী বন্ধুর কর্ত্তব্য সাধনে এই লেখক (অর্থাৎ নন্দকুমার স্বয়ং) পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক তৎপর হইবেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে পরলোকগত নবাব পত্রলেখককে (অর্থাৎ নন্দকুমারকে) ইংরেজের রক্ষণাধীনে রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তিনি আশা করেন যে নবাবের শেষ আশা অপূর্ণ থাকিবে না।"

কিন্তু কলিকাতার ইংরেজ কোম্পানী নবাবের এই নন্দকুমার প্রীতি আদৌ সুনজরে দেখিলেন না। কিন্তু তখনকার মত কিছু উচ্চবাচ্য না করিয়া, অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিলেন মাত্র।

নূতন নবাব নজম্-উদ্-দৌল্লাকে ইংরেজেরা পূর্ব্ব পদ্ধতি অনুযায়ী দিল্লীর বাদশাহের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের নিকট

হইতে সুবাদারীর সনন্দ গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন (নজ্‌ম-উদ্‌-দৌল্লা দ্রষ্টব্য) তাহাতে নন্দকুমার ইংরেজদের উপর আরও ক্রুদ্ধ হন। তিনি যে বাদশাহের দরবারে পূর্ব্ব নবাবের প্রতিনিধি রাজা সীতাব রায়ের দ্বারা নজ্‌ম-উদ্দৌল্লার নামে সুবাদারীর পরোয়ানা আনয়ন করাইয়াছিলেন, ইংরেজেরা তাহাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলেন না। কিন্তু উপায়ান্তর না পাইয়া নন্দকুমার তখন কার মত নীরব রহিলেন।

নূতন নবাবের সহিত ইংরেজদের যে নূতনভাবে পুনরায় সন্ধি হইল, তাহাতে নন্দকুমারের দেওয়ানীর অবসান হইল। তাঁহার পরিবর্ত্তে মোহাম্মদ রেজা খাঁ নায়েব সুবাদার নিযুক্ত হইলেন। এই নিয়োগ নবাব বাধ্য হইয়াই অনুমোদন করেন। তিনি নন্দকুমারকেই তাঁহার প্রধান হিতাকাঙ্খী বলিয়া মনে করিতেন। মুর্শিদাবাদে অবস্থিত ইংরেজ কোম্পানীর প্রতিনিধি সকল দিক দেখিয়া কলিকাতায় সংবাদ প্রেরণ করেন যে নূতন নবাব অনেক বিষয়ে নন্দকুমারের পরামর্শ অনুসারেই কাজ করিতেছেন। তাহা শুনিয়া কলিকাতা হইতে প্রধানকর্ত্তা (গবর্ণর) সাহেব নবাবকে লিখিলেন যে নন্দকুমারকে যেন অবিলম্বে কলিকাতায় প্রেরণ করা হয়, কারণ তাহার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে। কলিকাতা হইতে নবাবকে লিখিত পত্রের বিষয় অবগত হইয়াই, মুর্শিদাবাদের কুঠীর সাহেবেরা কৌশলে নন্দকুমারকে তাঁহাদের কুঠীতে আটক করিলেন। নবাব তাহা জানিতে পারিয়া স্বয়ং মতিঝিলে অবস্থিত কুঠীতে যাইয়া নন্দকুমারকে মুক্ত করিয়া আনেন। ইহার ইহার কিছুকাল পরে কলিকাতা হইতে বারংবার তাগিদ আসিতে থাকাতে ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে নন্দকুমার কলিকাতায় উপনীত হইলেন।

মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি কোম্পানীর বিরুদ্ধে কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহকে সুজা-উদ্‌-দৌল্লার পক্ষ সমর্থন করিতে অনুরোধ করেন। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে বলিতেই হইবে, যে এই অভিযোগ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে কখনই আনা চলিত না। কারণ তিনি কোম্পানীর কর্ম্মচারী বা অনুগৃহীত ব্যক্তি ছিলেন না। সুতরাং কোম্পানীর স্বার্থহানীকর কোনও কাজ অপর কাহাকেও করিতে বলিয়া তিনি কোম্পানীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই। বরঞ্চ তিনি তাঁহার প্রকৃত প্রভু নবাবের পক্ষ লইয়া যাহা করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃত প্রভুভক্তির কাজই হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে যদিও হেষ্টিংস সাহেবই তাঁহার বিরুদ্ধে জাল দলিলের অভিযোগ আনয়ন করেন, এক্ষেত্রে

হেষ্টিংস নন্দকুমারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ গ্রাহ্য করেন নাই।

নন্দকুমারের পরিবর্তে নিযুক্ত দেওয়ান মোহাম্মদ রেজা খাঁ নানাভাবে অত্যাচার আরম্ভ করাতে তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকগুলি গুরুতর অভিযোগ আনীত হয়। বিচারে রেজা খাঁ পদচ্যুত হন। কিন্তু হেষ্টিংস নন্দকুমারকে আবার দেওয়ান নিযুক্ত না করিয়া তাঁহার পুত্র রাজা গুরুদাসকে নাবালক নবাব মোবারক-উদ-দৌল্লার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। সেই সময়ে কলিকাতার মন্ত্রণা সভার তিনজন সদস্য হেষ্টিংসএর বিরোধী ছিলেন। নন্দকুমার তাহা জানিতে পারিয়া, হেষ্টিংসএর নামে উৎকোচ গ্রহণ এবং আরও কতকগুলি অভিযোগ আনয়ন করেন। কিন্তু অভিযোগগুলি প্রমাণিত না হওয়ায় হেষ্টিংস ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সহকর্মী রিচার্ড বারওয়েল (Richard Barwell) দ্বারা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করার জন্য মোকর্দ্দমা উপস্থিত করান। এই অভিযোগের নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বেই হেষ্টিংস তাঁহার বিরুদ্ধে দলিল জাল করার আর এক অভিযোগ আনয়ন করেন। জনহাইড ও লেমেষ্টার (John Hyde and Lemaister) নামক সুপ্রীম কোর্টের (Supreme Court) দুইজন বিচারপতির নিকট উহা প্রথম উপস্থিত করা হয়। তাঁহারা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য প্রধান বিচারপতি সার ইলাইজা ইম্পের (Sir Elijah Impey) নিকট প্রেরণ করেন। ইম্পে, পূর্ব্বোক্ত হাইড ও লেমেষ্টার এবং সার রবার্ট চেম্বার্স (Sir Robert Chambers) এই চারিজন একত্রে উহার বিচার করেন। ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দের ৮ই জুন এই স্মরণীয় মোকর্দ্দমা আরম্ভ হয় এবং আট দিন ব্যাপিয়া উহা চলে। বারজন ইংরেজ জুরীর সাহায্যে ১৬ই জুন মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি হয়। বিচারে নন্দকুমার দোষী সাব্যস্ত হন এবং তৎকাল প্রচলিত ইংলণ্ডীয় আইন অনুসারে তাঁহার প্রাণ দণ্ডের আদেশ হয়। ইংলণ্ডের রাজার নিকট আপীল করিবার জন্য ফাঁসীর দিন স্থগিত রাখিতে নবাব বাহাদুরও অনুরোধ করেন। কিন্তু কোনও অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। কিঞ্চিদধিক দেড়মাস পরে, ৫ই আগষ্ট প্রাতে বর্ত্তমান খিদিরপুর অঞ্চলের এক স্থানে তাঁহার ফাঁসী হয়।

নন্দকুমারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনীত হয় তিনি তাহার সম্বন্ধে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে কয়েকদিন তিনি ঈশ্বরচিন্তায়ই নিরত ছিলেন। যে দিন তাঁহার ফাঁসী হয়, সে দিন কলিকাতাবাসী হিন্দুরা অরন্ধন পালন করেন। ব্রহ্মহত্যার জন্য কলিকাতা অপবিত্র হইল মনে করিয়া

অনেকে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গঙ্গার পশ্চিম তীরে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।

নন্দকুমারের পূর্ব্বপুরুষগণ শাক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। তিনি দরিদ্রের বন্ধু ও অত্যাচারিতের সহায় ছিলেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে তিনি মুক্ত হস্তে অন্ন বিতরণ করিয়া সহস্র সহস্র নরনারীর প্রাণ রক্ষা করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধর রাধামোহন ঠাকুরের নিকট তিনি বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হন।

বুলাকীদাস নামক একজন জহরত ব্যবসায়ী কতকগুলি জহরত বা তাহার মূল্যবাবদ অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। বুলাকীদাসের জীবিতকালে নন্দকুমার কিছুই পান নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর বুলাকীদাসের বিধবা পত্নী অর্থ প্রদান করেন। কিন্তু হেষ্টিংস, মৃত বুলাকীদাসের আমমোক্তারকে উৎসাহিত করিয়া এক অভিযোগ আনয়ন করান যে নন্দকুমার বুলাকীদাসের অঙ্গীকার পত্র জাল করিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের নিকট হইতে অনেক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এই জাল দলিলের অভিযোগেই বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।

নন্দনমিশ্র—শ্রীহট্টের অন্তর্গত বাণিয়াচঙ্গের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কেশবমিশ্রের পুত্র দক্ষ, দক্ষের পুত্র নন্দন, নন্দনের পুত্র গণপতি ও কল্যাণ। কেশবমিশ্র পদ্মনাভ দেখ।

নন্দনরাম মিশ্র—একজন জ্যোতিষ পণ্ডিত। ১৬৯৯ শকে (১৭৭৭ খ্রীঃ অব্দ) তিনি 'সঙ্কেত চন্দ্রিকা' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন।

নন্দপণ্ডিত—একজন জ্যোতিষ গ্রন্থকার। 'জ্যোতিষ সার সমুচ্চয়' নামে তিনি একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

নন্দরাজ— একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। 'কেরল প্রশ্নরত্ন' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

নন্দরাম—একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত। 'গ্রহপদ্ধতি' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

নন্দরাম দাস – একজন কবি। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সিঙ্গি নামক গ্রামে কায়স্থ বংশে তাঁহার জন্ম হয়। মহাভারত রচয়িতা সুবিখ্যাত কাশীরাম দাস তাঁহার পিতা। নন্দরাম মহাভারতের ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণপর্ব্বের পদ্যে অনুবাদ করেন। ১০৮৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি সিঙ্গি গ্রামের পৈতৃকভিটা পুরোহিতকে দান করিয়াছিলেন। মতান্তরে তিনি কাশীরাম দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি মহাভারতের যে সকল পর্ব্ব অনুবাদ করেন তাহাদের শ্লোক সংখ্যা ১৫০০ এবং উহা ১১৬২ সনে রচিত। কাশীদাসের মহাভারতের দ্রোণ পর্ব্ব ও নন্দ রামের দ্রোণ পর্ব্ব, এই উভয়ের ভাষাগত হুবুহু সাদৃশ্য

অনেকে মনে করেন যে নন্দরাম পৃথক কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নাই। পিতৃব্য কাশীরামকেই পুস্তক প্রণয়নে সাহায্য করেন।

নন্দরাম মিশ্র—একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। ১৭৯৩ শকে (১৮৭১ খ্রীঃ অব্দ) তিনি 'যন্ত্রসার' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন 'শ্রীকৃষ্ণ জন্মপত্র' নামক গ্রন্থও তাঁহার রচিত।

নন্দলাল গুহ সরকার—বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ও বিশিষ্ট আইন ব্যবসায়ী। কলিকাতার কালীঘাটে তাঁহার বাস ছিল। প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকাল তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করিয়াছিলেন। যুক্তিপূর্ণ সওয়াল জবাবের জন্য তিনি বেশ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বাংলা সংস্কৃত ও ইংরেজী ব্যতীত পারসীক, লাটিন ও গ্রীক ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কালীঘাট উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের তিনি যথাক্রমে সম্পাদক ও সভাপতি ছিলেন। তিনি বহুকাল বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর ও ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ সমাজের সভ্য ছিলেন। ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ২৩শে শ্রাবণ (১৯৩৩ খ্রীঃ ৮ই আগষ্ট) তিনি পরলোক গমন করেন।

নন্দলাল চৌধুরী—একজন কবি গান রচয়িতা। তিনি বীরভূম জিলার অন্তর্গত সিউড়ী গ্রামের অধিবাসী এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। খোঁড়ানন্দ নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন।

নন্দলাল ন্যায়রত্ন—একজন পণ্ডিত ও শ্যামা সঙ্গীত রচয়িতা। তিনি ভট্টপল্লীর অধিবাসী গৌতম গোত্রজ আল্লার ভট্টের সন্তান। তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। তিনি শক্তি বিষয়ক বহু গান এবং নানা বিষয়ে অনেক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ১২৮২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—একজন তান্ত্রিক সাধক। তিনি নদীয়া জিলার অন্তর্গত উলা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার একটী 'পঞ্চমুণ্ডি' আসন ছিল। একটী অনতি বৃহৎ ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহে তিনি এই আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই গৃহের চারি কোণে চারিটি এবং হোম কুণ্ডের নীচে পাঁচটী চণ্ডাল দেহ দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রোথিত ছিল। তিনি শ্মশান হইতে নরমুণ্ড সংগ্রহ করিয়া স্বগৃহে আনয়নপূর্ব্বক ঐগুলিকে মন্ত্রপূত করিয়া সাজাইয়া রাখিতেন। পরদিবস প্রাতে নরমুণ্ড গুলির মধ্যে যাহাকে স্থান ভ্রষ্ট দেখা যাইত তাহাকে রাখিয়া অন্যগুলি ফেলিয়া দিতেন। তিনি অতি দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন এবং ১৭০৭ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা উলার ব্রহ্মচারী বলিয়া খ্যাত।

নন্দলাল বসু—(১) অনুমান ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতা হইতে চন্দননগরে গমন পূর্ব্বক তথায় বাস করিতে থাকেন। তিনি পূর্ব্বেকার সিনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছিলেন। চন্দননগরেরসেণ্ট্ মেরিস্ ইনষ্টিটিউশন (বর্ত্তমান ডুপ্লে কলেজ) ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাতায় তিনি বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ফরাসী ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। বাঙ্গালা ভাষায় তিনি ফরাসী বর্ণ-পরিচয় ও ফরাসী ব্যাকরণ নামক দুইখানি বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ফাদার বার্থের সহিত পরামর্শ ক্রমে তিনি বাঙ্গালা হইতে ফরাসী এবং ফরাসী হইতে বাঙ্গালা দুইখানি অভিধান সংকলন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন দৈব কারণে তাঁহার কার্য্য অসমাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

নন্দলাল বসু—(২) কলিকাতা বাগবাজারের একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার। কলিকাতা কাঁটাপুকুরের প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বসু বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা মাধবলাল এবং পিতামহ জগচ্চন্দ্র ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন।

নন্দলালের মাতুলানী নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি পরলোক গমন করিলে নন্দলাল তাঁহার গয়া জিলাস্থ বিশাল জমিদারীর অধিকারী হন। তৎপরে তিনি বাগবাজারে প্রাসাদোপম এক বৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বসতি করেন। দেশহিতকর সকল অনুষ্ঠানেই তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। তিনি কায়স্থ সভার একজন উৎসাহী সভ্য ও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার সহিত যুক্ত থাকিয়া কায়স্থ সমাজের কারিকা প্রকাশ এবং এই সমাজের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বাগবাজারের অধিবাসী সীতারাম দে'র কন্যাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র বিনোদবিহারী, বিপিনবিহারী, শম্ভুবিহারী, বনবিহারী ও বটবিহারী। তিনি উদারপ্রাণ, মিষ্টালাপী ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত হিন্দুর ধর্ম্ম ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিতেন।

নন্দা—(১) গৌতম বুদ্ধের জীবতকালে কপিলাবস্তুর খেমক নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা। তিনি অলৌকিক রূপবতী ছিলেন বলিয়া অভিরূপা নন্দা নামে পরিচিতা হইয়াছিলেন। চরভুত নামক এক শাক্য যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হইবার পরেই তাঁহার ভাবীপতি পরলোক গমন করেন। এই কারণে তাঁহার মাতা পিতা তাঁহাকে, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভিক্ষুনী সঙ্ঘে প্রেরণ করেন। নন্দার তখনও পার্থিব, সুখভোগের বাসনা তিরোহিত হয় নাই। তিনি

সেইজন্য যথাসম্ভব বুদ্ধদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইতেন না। বুদ্ধদেব তাহা জানিতে পারিয়া একবার বিশেষভাবে তাঁহাকেই উপদেশ দিবার জন্য অন্যান্য ভিক্ষুণীগণসহ তাঁহাকে আহ্বান করেন। নন্দা প্রথমে নিজে না যাইয়া আর একজনকে প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করেন। বুদ্ধদেব ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন। পরে বুদ্ধদেব দৈহিকরূপের নশ্বরতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলে তিনি সম্যগ্-জ্ঞান লাভ করেন এবং উচ্চস্তরের সাধিকা হন। থেরিগাথা গ্রন্থে তাঁহার রচিত একটি সুমধুর গাথা আছে।

নন্দা—(২) একজন বৌদ্ধ সাধিকা। তিনি রাজা শুদ্ধোধনের অন্যতমা মহিষী মহাপ্রজাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অলৌকীক রূপলাবণ্যের জন্য তিনি 'সুন্দরী নন্দা জনপদ কল্যাণী' নামে পরিচিতা ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা নন্দ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার পর তিনিও পার্থিব সুখভোগে বীতরাগ হইয়া ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রবেশ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই অতি উচ্চস্থান অধিকার করেন। থেরিগাথা নামক গ্রন্থে তাঁহার রচিত একটি মনোহর তত্ত্বজ্ঞান-প্রদায়ক গাথা আছে।

নন্দাভিরাম—একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত। ইষ্ট-দর্পণ নামক ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ তাঁহারই রচিত। লক্ষ্মীপতি 'ইষ্টদর্পণ উদাহরণ' নামে এই গ্রন্থের এক টীকা রচনা করিয়াছেন।

নন্দি—একজন জ্যোতিষ গ্রন্থকার। বরাহের বৃহৎ সংহিতার টীকাকার উৎপল ভট্ট স্বীয় গ্রন্থে তাঁহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রচিত গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না।

ভট্ট দেখ:

নন্দিকেশ্বর—একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত। 'গণক মণ্ডল' ও জ্যোতিষ সংগ্রহ সার' নামকগ্রন্থ তাঁহার রচিত।

নন্দী- আর্য্যাবর্ত্তের একজন রাজা। গুপ্তবংশীয় নরপতি সমুদ্রগুপ্ত আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণ করিয়া তাঁহার রাজ্য ধ্বংশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন বিবরণ জানা যায় না।

নন্দীপোতবর্ম্মা—কাঞ্চির পল্লববংশীয় শেষ রাজা। তিনি খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিতেন। খুব সম্ভব তিনি চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যকর্ত্তৃক তিনি যুদ্ধে পরাজিত হন। কিন্তু কাঞ্চীনগরী দেবস্থান ছিল বলিয়া বিক্রমাদিত্য চালুক্য উহা ধ্বংশ বা লুণ্ঠন করেন নাই। নন্দীপোতবর্ম্মা দীর্ঘকাল (কাহারও কাহারও মতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর) রাজত্ব করেন।

নন্দীবর্ম্মা—কাঞ্চীপুরের চালুক্য-বংশেরই এক শাখার আদি পুরুষ। এই শাখার চারিজন মাত্র রাজার নাম পাওয়া যায়। নন্দীবর্ম্মা ৭১৭—৭৭৯

খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পর দন্তীবর্ম্মা রাজা হন।

নন্দীবিজয় সূরী—একজন জৈন আচার্য্য। ১৬৮২ খ্রীঃ অব্দ হইতে সম্রাট আকবরের রাজ সভায় যে সকল জৈন আচার্য্যগণ থাকিতেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি অষ্টাবধানী ছিলেন। সম্রাট আকবর তাঁহার এই-রূপ অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে 'খুশ্ ফহম' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়—দেশকর্ম্মী ও সমাজ সংস্কারক। ১২৫২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে (১৮৪৫ খ্রীঃ অক্টোবর) ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত পশ্চিমপাড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। তিনি ঢাকার একজন প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ছিলেন। সেই সময়ে ঢাকায় ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত হইতেছিল। কাশীকান্ত সেই প্রভাব রোধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহারই বিশেষ উদ্যোগে ঢাকায় 'হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিণী সভা' সংস্থাপিত হয় এবং ঐ সভার মুখপত্র স্বরূপ 'হিন্দু হিতৈষিণী' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হইতে থাকে। কাশীকান্ত ধর্ম্মবিশ্বাসী, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। আইন ব্যবসায়ে তিনি সর্ব্বদাই নির্ভীকভাবে, নিজের সদ্‌বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সকল কাজ করিতেন। কখনও অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই ন্যায়পথে থাকিয়া পরোপকার করিতে উৎসুক ছিলেন। তিনি অতিথিপরায়ণ, জনহিতকর কার্য্যে উৎসাহী ও বিদ্যোৎসাহী পুরুষ ছিলেন। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কাশীকান্তের মধ্যম পুত্র ছিলেন। পিতৃগৃহেই তাঁহার বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। সাত বৎসর বয়সে কাশীকান্ত শিক্ষার জন্য তাঁহাকে ঢাকায় লইয়া যান। সেইখানে নবকান্ত ইংরেজি বাংলা ও ফারসী পড়িতে থাকেন। কিছুকাল পরে ফারসী পড়া ত্যাগ করিয়া, ঢাকায় সরকারী স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিন বৎসর পরে তিনি এফ্-এ (First Arts) পরীক্ষা দেন কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই।

কলেজ পরিত্যাগ করিবার পর কয়েক বৎসর তিনি ধামরাই, শ্রীনগর, ঢাকার পোগোজ স্কুল প্রভৃতি নানা জায়গায় কাজ করিয়া, ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে ঢাকার জগন্নাথ স্কুলে শিক্ষকের পদ লাভ করেন। ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে ঐ বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া জুবিলি স্কুল হয়। ঐ বিদ্যালয়ে নবকান্ত প্রায় পঁচিশ বৎসর কাজ করেন। নীতি-পরায়ণ সত্যবাদী, ছাত্রবৎসল সুশিক্ষক-

রূপে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে নবকান্তের পিতার মৃত্যু হয়। পিতার জীবিতকালেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। কাশীকান্ত পুত্রকে স্ব-ধর্ম্মে আস্থাবান রাখিতে নানাভাবে চেষ্টা করেন, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে কাশীকান্ত যখন বুঝিতে পারেন যে, নবকান্ত হয়ত ব্রাহ্মধর্ম্মই গ্রহণ করিবেন, তখন নিজ চরম পত্রে (Will) ব্যবস্থা করিয়া যান যে, যদি তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে শ্যামাকান্ত, নবকান্ত ও নিশিকান্ত ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন, তবে তাঁহারা সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবেন না। সমুদয় বিষয় অপর পুত্র শীতলাকান্ত লাভ করিবেন। এইভাবে পিতৃবিষয় হইতে চ্যুত হইবার সম্ভাবনা জানিয়াও নবকান্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বিরত থাকেন নাই। পিতার মৃত্যুর পর নানাভাবে ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে (১২৭৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ) তিনি এবং আরও প্রায় চল্লিশজন যুবক ঢাকা নগরে কেশবচন্দ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন।

কর্ম্মজীবনে নবকান্ত সমাজ সংস্কারমূলক বহু কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন। ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে ঢাকার উন্নতপন্থী লোকদিগের সমবেত চেষ্টায় 'ঢাকা শুভসাধিনী সভা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ঢাকার ব্রাহ্মগণই এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। সুরা পান নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের আয়োজন, সুলভ পত্রিকা প্রচারদ্বারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার প্রভৃতি কার্য্য এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 'শুভসাধিনী' নামে এক পয়সা মূল্যের একখানি সাপ্তাহিক পত্রও ঐ সভা হইতে প্রকাশিত হইত। 'বান্ধব' সম্পাদক রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রমুখ বিদ্বজ্জনগণ উহার লেখক ছিলেন। নবকান্ত প্রথমাবধি ঐ সভার কার্য্যাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এবং উহার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতেন। শুভসাধিনী সভা স্থাপিত হইবার প্রায় দুই বৎসর পরে ঢাকা নগরীতে "বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং ঐ সভার পক্ষ হইতে ১২৮০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস হইতে "মহাপাপ বাল্যবিবাহ" নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। নবকান্ত উক্ত পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। প্রতি মাসেই "বাল্যবিবাহ নিবারণী সভার" অধিবেশন হইত এবং পত্রিকাখানিও প্রায় দুই বৎসরকাল চলিয়াছিল। কোনও এক বিশেষ সামাজিক সংস্কারের পক্ষাবলম্বী এই

শ্রেণীর কোনও পত্রিকা পূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। ঐ পত্রিকা প্রকাশের ফলে দেশে এক বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। সুদূর গুজরাট প্রদেশের আহম্মদাবাদ নগরের "বাল্য-বিবাহ নিবারণী সভা" ঐ পত্রিকার বিশেষ প্রশংসা করিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। সুদূর ইংলণ্ড হইতে ভারতহিতৈষী ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা সহানুভূতি জ্ঞাপন ও সাহায্য দান করিতে থাকেন।

কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী কর্ম্মী উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 'বামাবোধিনী' সভার অনুকরণে ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে (শ্রাবণ, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ) নবকান্তবাবু ও প্রাণকুমার দাসের মিলিত চেষ্টায় ঢাকা নগরীতে "অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা" স্থাপিত হয়। নবকান্ত উক্ত সভার প্রথম সম্পাদক হন। ঐ সভার উন্নতির জন্য নানাস্থান হইতে দান সংগ্রহ করিয়া, ছাত্রীদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইত। ঐ সভার কার্য্য বিশেষ সন্তোষজনক ভাবে চলিতে থাকায়, সরকার পক্ষ হইতে বার্ষিক দেড়শত টাকা সাহায্য প্রদান করার ব্যবস্থা হয়। প্রায় তের বৎসরকাল ঐ সভার কার্য্য সুচারুরূপে চলিয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত শুভসাধিনী সভার পরিচালনাধীনে ঢাকার খ্যাতনামা অভয়চন্দ্র দাস মহাশয়ের বাসভবনে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরে উহার নাম হয় 'ঢাকা যুবতী বিদ্যালয়' (Dacca Adult Female School) তখন নবকান্ত বাবু কিছুকালের জন্য উহার সম্পাদক হন। আরও কিছুকাল পরে উহা আনন্দচন্দ্র দাস প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের সহিত মিলিত হইয়া বর্ত্তমান ইডেন ফিমেল (Eden Female) স্কুল নামে অভিহিত হয়। প্রথম কয়েক বৎসর নবকান্ত উহার সহযোগী সম্পাদক, এবং দীর্ঘকাল উহার পরিচালক সভার সদস্য ছিলেন।

নারীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করা ভিন্ন আরও নানাভাবে নবকান্ত তাহাদের উপকার করিবার চেষ্টা করিতেন। অসহায়া কুলীন কন্যাগণকে সামাজিক উৎপীড়নের হাত হইতে উদ্ধার করা ও সুপাত্রে তাহাদের বিবাহ দেওয়া, পুনর্বিবাহে সম্মতা বালবিধবাদের বিবাহ দেওয়া, আত্মীয় স্বজনদের অত্যাচার অথবা সামাজিক উৎপীড়ন হইতে উদ্ধার করিয়া অসহায়া বিধবাদিগের সুশিক্ষা প্রদানদ্বারা সৎপথে থাকিবার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি বহুবিধ সৎকাজে তিনি পরম উৎসাহী ছিলেন। এই সকল কার্য্যে তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইত এবং অধিকাংশস্থলে নিজের বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইত। কলিকাতায় ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির ন্যায় ঢাকায় নবকান্ত বাবু এই সকল কার্য্যে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। উক্ত মহোদয়গণের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভিন্ন অপর সকলেই প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত ছিলেন। (দুর্গামোহন দাস ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

দেশে মদ্যপান নিবারণ কল্পে তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। মদ্যপানের বিরুদ্ধে দেশের লোককে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তিনি 'সুরাবিষ' নামে পুস্তিকা প্রচার করেন।

বাবু গোবিন্দপ্রসাদ রায় যখন 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তখন হইতে দশ বৎসরেরও অধিককাল ঢাকা প্রকাশে বহু বিষয়ে তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ইংলণ্ডে অবস্থানকালে যে সকল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, নবকান্ত ঢাকা প্রকাশে তাহার অনেকগুলির অনুবাদ প্রকাশ করেন। কিছুকাল তিনি ঢাকার প্রসিদ্ধ 'ঈষ্ট' (The East) পত্রিকাও পরিচালনা করেন।

কলিকাতার 'ভারত সভা'র অনুকরণে বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে রাজনীতি আন্দোলনের জন্য সভা স্থাপিত হয়। (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখ)। ঢাকাতে ঐরূপ পিপল্‌স অ্যাসোসিয়েশন (The People's Association) প্রতিষ্ঠিত হয়। নবকান্ত ও তাঁহার অনুজ শীতলাকান্ত প্রথমাবধি উহার কার্য্যাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ছাত্রদিগকে নীতিশিক্ষা দানের জন্য তিনিই প্রধানতঃ উদ্যোগী হইয়া এক রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঢাকার জগন্নাথ স্কুল ভবনে উহার কার্য্য হইত। ঢাকার খ্যাতনামা আদর্শ চরিত্র শিক্ষক রজনীকান্ত ঘোষ, জগবন্ধু লাহা প্রভৃতি উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দীর্ঘকাল ঐ নীতি বিদ্যালয় সুপরিচালিত হইয়া ঢাকার বালক বালিকাদের নৈতিক জীবনের উন্নতি সাধনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। নিজ গ্রাম পশ্চিমপাড়াতে তিনি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া কিছুকাল নিজ ব্যয়ে উহা পরিচালনা করেন। রায় সাহেব দীননাথ সেন, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির চেষ্টায় ঢাকার গেণ্ডেরিয়া পল্লীতে যে বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তিনি দীর্ঘকাল উহার সম্পাদক ছিলেন।

ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করিয়া তিনি আন্তরিক বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহিত জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ রক্ষা করিয়া চলিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ও ব্রাহ্ম সমাজ সংসৃষ্ট সমুদয় কাজে তাঁহার অদম্য উৎসাহ ছিল। ধর্ম্মমতের আদর্শকে রক্ষা করা তিনি জীবন রক্ষার

চেষ্টার ন্যায় গুরুতর বলিয়া মনে করিতেন। এই কারণে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কন্যার সহিত কুচবিহারের মহারাজার বিবাহ সম্বন্ধ লইয়া ব্রাহ্ম-সমাজে যখন ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়। তখন তিনি নিজমত ও বিশ্বাস অনুযায়ী নানাপ্রকারে তীব্রভাবে কেশবচন্দ্রের ঐ কার্য্যের প্রতিবাদ করেন।

নবকান্ত বিবিধ জনহিতকর কাজে যুক্ত থাকিয়াও জ্ঞানান্বেষণে বিরত থাকিতেন না। তাঁহার নিজের গ্রন্থ সংগ্রহের মধ্যে জীবন চরিত, ইতিহাস ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের বহু মূল্যবান গ্রন্থ ছিল। তৎকালীন প্রায় সমুদয় সাময়িক পত্রিকার তিনি গ্রাহক ছিলেন। তিনি নিজে 'সঙ্গীত মুক্তাবলী' নামে বাংলা পারমার্থিক সঙ্গীতের একখানি সুবৃহৎ সংগ্রহ পুস্তক তিন খণ্ডে প্রকাশ করেন। প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতাগণের নাম ও পরিচয়সহ ভারতের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও জাতীয় সঙ্গীত, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম সঙ্গীত এবং অন্যান্য নানা বিষয়ের সঙ্গীতের এইরূপ সংগ্রহ পুস্তক এদেশে তৎপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। তদ্ভিন্ন তিনি আরও প্রায় সতের আঠারখানা ক্ষুদ্র বৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাহাদের মধ্যে বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তকও অনেক প্রকার ছিল। পুস্তকগুলির মধ্যে মহাত্মা রামমোহন রায়ের ইংরেজি ও বাঙ্গালা জীবনী, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী; ডাঃ নিশিকান্ত ও শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী, সঙ্গীত রসমঞ্জরী, সরল গৃহ চিকিৎসা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নবকান্ত একবার কিছুকালের জন্য ব্যবসায়ে ব্রতী হইয়াছিলেন। তদানীন্তনকালে উচ্চবর্ণের সম্ভ্রান্ত পরিবারের ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতেন না। ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ে সাধারণের ভ্রান্ত ধারণা দূর করা এবং সততা রক্ষাই ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র ইহা প্রমাণ করাই তাঁহার ঐ কার্য্যে ব্রতী হওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। দুঃখের বিষয় তাঁহার ন্যায় আদর্শবাদীর পক্ষে ব্যবসায় পরিচালনা সম্ভব হয় নাই। ঋণগ্রস্ত হইয়া তিনি ব্যবসায় তুলিয়া দিতে বাধ্য হন।

বিবিধ সৎকর্ম্মানুরাগী এই জনহিতব্রতী ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে (১৩১১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন) ৫৯ বৎসর বয়সে ঢাকা নগরে পরলোক গমন করেন।

নবকিশোরী, রাণী—সাতোড়ের রাজা অবনীনাথের কন্যা ও ভাতুড়িয়ার রাজা গণেশের পুত্রবধূ। গণেশের পুত্র যদুনারায়ণের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। যদু আজম শাহের কন্যা আশমান তারাকে বিবাহ করিয়া মুসলমান হন

এবং জালালউদ্দিন নাম গ্রহণ করেন। তদবধি যদুর মাতা রাণী ত্রিপুরা নবকিশোরীর গর্ভজাত যদুর পুত্র অনুপনারায়ণকে লইয়া সাতগড়ায় যাইয়া বাস করিতে থাকেন। সেইখানে অনুপনারায়ণ যদুর কুশপুত্তলিকা দাহ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন এবং রাণী নবকিশোরী তদবধি বৈধব্যবেশ ধারণ করেন। অনুপনারায়ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহার যথারীতি অভিষেক ক্রিয়া ও বিবাহ সম্পন্ন হয়। তাহার পর হইতে রাণী নবকিশোরী সধবার চিহ্নজ্ঞাপক অলঙ্কারগুলি যদুর রাণীর নিকট পাঠাইয়া দিয়া, কঠোরতর ব্রত উপবাসাদিতে রত হন। অনুপনারায়ণের বিবাহের চারি বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নবকৃষ্ণ ঘোষ—কলিকাতার পাথুরিয়া ঘাটা অঞ্চলের প্রসিদ্ধ কায়স্থ ঘোষ বংশে ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ইংরেজি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারতাগমন উপলক্ষে তিনি এক কবিতা (The Ode in Welcome to Prince Albert) রচনা করিয়া বিশেষ খ্যাতি ও পুরস্কার লাভ করেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় 'জ্যোতিষ প্রকাশ' নামে প্রথম জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সামান্য কেরাণীর পদ হইতে তিনি বাঙ্গালা সরকারের হিসাব বিভাগে উচ্চ পদ লাভ করেন।

নবকৃষ্ণ দেব, মহারাজা বাহাদুর—কলিকাতার শোভাবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১১৩৯ বঙ্গাব্দে (১৭৩২ খ্রীঃ অব্দ) কলিকাতার গোবিন্দপুরে (বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ম) মৌলিক কায়স্থবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামচরণ দেব। তাঁহাদের অতি আদি পুরুষ শ্রীহরি দেব মুরশিদাবাদের অন্তর্গত কাণসোনা গ্রামে বাস করিতেন। নদীয়া জিলার মুড়াগাছার মজুমদারগণও এই বংশ সম্ভূত। নবকৃষ্ণের প্রপিতামহ রুক্মিণীকান্ত মজুমদার মুরশিদাবাদের তদানীন্তন নবাব কর্ত্তৃক মুড়াগাছার নাবালক জমিদার কেশবরাম রায় চৌধুরীর জমিদারীর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন এবং নবাব তাঁহাকে ব্যবহর্ত্তা (রাজকর্ম্মচারী) উপাধি প্রদান করেন। সেই সময় হইতে এই বংশ ব্যবহর্ত্তা নামে অভিহিত হয়। রুক্মিণীকান্ত এই পরগণারই পঞ্চ গ্রামে বাস করিতেন।

রুক্মিণীকান্ত পরলোক গমন করিলে তৎপুত্র রামেশ্বর পিতৃপদে নিযুক্ত হন। কিন্তু রামেশ্বর কেশবরামের বিরাগ ভাজন হইয়া, কেশবরাম কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন। রামেশ্বরের পুত্র রামচরণ (নবকৃষ্ণের পিতা) মুড়াগাছা পরগণার রাজস্ব আরও বৃদ্ধি করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতিতে নবাব কর্ত্তৃক উক্ত পরগণার

উদেদার নিযুক্ত হন এবং এই সুযোগে পিতৃবৈরী কেশবরামকে কারারুদ্ধ করিয়া পিতাকে কারামুক্ত করেন। তৎপরে রামচরণ মুড়াগাছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোবিন্দপুরে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। ইহার পর রামচরণ নবাবের নিকট কর্ম্ম প্রার্থী হইলে নবাব তাঁহাকে হিজলী, তমলুক প্রভৃতি কয়েকটী স্থানের নিমক মহলের কর সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন। সেই সময়ে এদেশে বর্গীদের উপদ্রব আরম্ভ হয়। তখন আরকটের নবাবের ভ্রাতা মনিরুদ্দিন খাঁকে কটকের সুবেদার ও রামচরণকে কটকের দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া উভয়কে বর্গীর অত্যাচার দমন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। মেদিনীপুর হইতে কটকে যাওয়ার পথে পিণ্ডারী দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাঁহারা উভয়েই নিহত হন। রামচরণের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা স্ত্রী তিনটি পুত্র পাঁচটি কন্যা নিয়া অতিকষ্টে দিনাতিপাত করিতেছিলেন। ঐ সময় তাঁহাদের গোবিন্দপুরের বাটী গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হইলে তিনি সুতানুটীর অন্তর্গত শোভাবাজারে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তিনি এইরূপ কষ্টে দিনাতিপাত করিয়াও পুত্রদিগের (রামসুন্দর, মাণিকচন্দ্র ও নবকৃষ্ণ) রীতিমত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

নবকৃষ্ণ জননীর ঐকান্তিক চেষ্টায় ও স্বীয় মেধাশক্তির বলে অল্প সময়ের মধ্যেই ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত হন। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালা, উর্দ্দু, আরবী এবং ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা করেন। ষোল বৎসর বয়সের সময় হইতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, অধ্যবসায়, শিষ্টাচার প্রভৃতি গুণের বিকাশ হইতে থাকে। সেই সময় কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী নকুধরের সহায়তায় নবকৃষ্ণ ইংরেজদিগের সহিত পরিচিত হন।

১৭৫০ খ্রীঃ অব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস ফারসী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য নবকৃষ্ণকে তাঁহার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। হেষ্টিংস ও নবকৃষ্ণ সমবয়সী হওয়ায় তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিশেষ বন্ধুতা জন্মে। ১৭৫৩ খ্রীঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকর্ত্তৃক ওয়ারেন হেষ্টিংস মুরশিদাবাদের কুঠীতে বদলী হন এবং নবকৃষ্ণও তাঁহার সঙ্গে সেইখানে গমন করেন।

১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে সুপ্রসিদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু হইলে তদীয় দৌহিত্র ও একমাত্র উত্তরাধিকারী সিরাজউদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিরাজউদ্দৌলা অপরিণামদর্শী ও স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। নানা কারণে ইংরেজদিগের সহিতও তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়। তিনি ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া প্রথমে কাশিম-

বাজারস্থ কুঠী লুণ্ঠন করেন এবং ওয়া-রেন হেষ্টিংস ও অন্যান্য ইংরেজদিগকে কারারুদ্ধ করেন। নবকৃষ্ণ বিপদ দেখিয়া এই সময় কলিকাতা চলিয়া আসেন; কিন্তু কলিকাতা আসিয়াও তিনি অধিক দিন কর্ম্মহীন অবস্থায় ছিলেন না। নবাব কাশিমবাজারের কুঠী লুণ্ঠন করিয়া সৈন্যসহ ক্রমে কলি-কাতা অভিমুখে আসিতেছেন শুনিয়া কলিকাতাস্থ ইংরেজগণ ভয়ে অস্থির হইয়া পড়েন। এমন সময় সিরাজের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া মহারাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি নবাবের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণ ইংরেজদিগকে সাহায্য করিবেন বলিয়া একজন বিশ্বস্ত হিন্দু কর্ম্মচারীর দ্বারা ড্রেক সাহেবের নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন, পত্রে এই কথাও লিখা ছিল যে, পত্রখানি কোন বিশ্বস্ত হিন্দুর দ্বারা পাঠ করাইয়া তাঁহার দ্বারাই যেন উত্তর লেখান হয়। সেই সময় তোজাউদ্দিন খাঁ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুন্সী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বিশ্বাস করা অনুচিত বিবেচনায় ড্রেক সাহেব পূর্ব্ব পরিচিত নবকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়া তাঁহার উপর এই কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। নবকৃষ্ণ এই কার্য্য সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিয়া বিশেষ বুদ্ধি-মত্তার পরিচয় প্রদান করেন। ড্রেক সাহেব তাঁহার এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন এবং তোজা-উদ্দিনের স্থলে তাঁহাকে মুন্সীপদে নিযুক্ত করেন। এজন্য রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণে তিনি 'নবু মুন্সী' নামে অভিহিত হইতেন।

মুন্সীর পদে নিযুক্ত হইয়া নবকৃষ্ণ এইরূপ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন যে, মুন্সী দপ্তরের কার্য্য ভিন্ন ক্লাইব তাঁহাকে কোনও কোনও সময় দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে দ্বিতীয়বার কলিকাতা আক্রমণ করিবার মানসে নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন হালসী বাগানে উমীচাঁদের উদ্যানে শিবির সংস্থাপন করেন, তখন নবকৃষ্ণ উপ-ঢৌকনসহ সন্ধি প্রার্থনায় দূতরূপে তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। সুচতুর নবকৃষ্ণ প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক নবাব শিবিরের যে বিস্তৃত গুপ্ত সংবাদ দিলেন। তাহাতেই সাহসী হইয়া ক্লাইব পরদিবস প্রত্যূষে সিরাজউদ্দৌলাকে আক্রমণ করেন। ক্লাইবের বীরত্ব দর্শনে ভীত হইয়া, নবাব তখন তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। সন্ধি স্থাপিত হইল বটে কিন্তু নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইল না। ইংরেজদের প্রতি বিরূপভাবের জন্য যাঁহারা এক-বার নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা পুন-রায় তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। জগৎশেঠ, মীরজাফর

উমিচাঁদ ও খোজা ওয়াজিদ প্রভৃতি ক্লাইবের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহাকে সৈন্যসহ মুরশিদাবাদে আগমন করিবার জন্য এক পত্র প্রেরণ করিলেন। তৎপরে দুই মাস ধরিয়া এই ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল। নবকৃষ্ণ সেই সময় মুন্সী পদে থাকিয়া ক্লাইবের পক্ষের সমস্ত লেখা পড়া সম্পন্ন করিতেন। পলাশীর যুদ্ধের পর, মীরজাফর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তিনজন ইংরেজ সৈনিক কর্ম্মচারী এবং দেওয়ান রামচাঁদ রায় ও মুন্সী নবকৃষ্ণ দেব ইংরেজদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ ধনাগার তত্ত্বাবধান করিতে গমন করেন। উহাতে মাত্র দুই কোটী টাকা ছিল। এই টাকা ক্লাইব প্রভৃতি বিভাগ করিয়া লন। কিন্তু উহা ব্যতীত অন্তঃপুরে নবাবের আর একটি গুপ্ত ধনাগার ছিল, ঐ ধনাগারে প্রায় আট কোটী টাকা মূল্যের স্বর্ণ, রৌপ্য এবং রত্ন গুপ্তভাবে রক্ষিত ছিল। এই বিত্ত মীরজাফর, আমীরবেগ খাঁ, রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ বণ্টন করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। এইরূপে নবকৃষ্ণ এককালীন বহু অর্থ প্রাপ্ত হন। ক্লাইবের সহিত নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের সম্মিলন নবকৃষ্ণ দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছিল। উভয়ের মধ্যে দেওয়ানী সম্বন্ধে যে অঙ্গীকার পত্র লিখিত হইয়াছিল, নবকৃষ্ণ তাঁহার মধ্যেও ছিলেন।

মীরজাফর সুবেদার হইলেন, বটে কিন্তু তিনি এইরূপ গুরুতর কার্য্যের অযোগ্য ছিলেন। কয়েক বৎসর অত্যন্ত পরিশ্রমের ফলে ক্লাইবের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায়, তিনি বিশ্রামের জন্য ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে স্বদেশে গমন করেন। কলিকাতা কাউন্সিলের সভ্য ভান্সীটার্ট (Henry Vansittart) সাহেব তাঁহার স্থলে কোম্পানীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু ভান্সীটার্ট সাহেব ক্লাইবের ন্যায় তেজস্বী ও যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। সেই সময় মীরজাফরের অবিবেচনা ও অবিমৃষ্যকারিতা দোষে এবং কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের স্বেচ্ছাচারিতায় সমগ্র দেশে ভয়ানক অরাজকতার সৃষ্টি হয়। এই গোলযোগের নিবারণ কল্পে ভান্সীটার্ট এবং হেষ্টিংস সাহেব সসৈন্যে মুরশিদাবাদে গমন করেন এবং মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার সুযোগ্য জামাতা মীরকাশিমকে বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দে শুল্ক ব্যাপারে ও অন্যান্য কারণে ইংরেজদিগের সহিত মীরকাশিমের সংগ্রাম আরম্ভ হয়। মেজর এডামস (Major Thomas Adams) সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং তাঁহাকে কাটোয়ার নিকট যুদ্ধে পরাস্ত করেন। সেই সময় নবকৃষ্ণ এডামসের

সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মেজর এডামস অসুস্থ হইয়া পড়িলে নবকৃষ্ণের উপর তাঁহার তত্ত্বাবধান ও কলিকাতায় প্রত্যানয়নের ভার অর্পিত হয়। ইহার কিছুকাল পরে (মে, ১৭৬৫ খ্রীঃ) ক্লাইব পুনরায় বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা এবং প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরবর্ত্তী জুন মাসে ক্লাইব যখন এলাহাবাদে গমন করেন, নবকৃষ্ণও তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন। দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলম এবং অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্‌দীনের সহিত ক্লাইবের যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাতে নবকৃষ্ণ দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং সন্ধিপত্রের মুসাবিদা করিয়াছিলেন।

ক্লাইব নবকৃষ্ণের উপর বারাণসী সম্বন্ধে কাশীরাজ বলবন্ত সিংহের সহিত ও বিহার সম্বন্ধে মহারাজ সিতাব রায়ের সহিত বন্দোবস্ত করিবার যে ভার প্রদান করেন তাহাও তিনি অতিশয় নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করেন। এই সকল দুষ্কর কার্য্য তাঁহার দ্বারা সুসম্পন্ন হওয়ায় ক্লাইব তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে তাঁহাকে 'রাজা বাহাদুর' ও মনসবপাঁচ হাজারী উপাধি ও সেই সঙ্গে তিন হাজার অশ্বারোহী, ঝালরদার পাল্কী ও নাকাড়া রাখিবার অধিকার আনাইয়া দেন। পর বৎসর ১৭৬৬ খ্রীঃ অব্দে 'মহারাজা বাহাদুর' ও ষষ্ঠ হাজারী উপাধি এবং চার হাজার অশ্বারোহী রাখিবার অধিকার আনয়ন করিয়া দেন। ক্লাইব তাঁহাকে কোম্পানীর বাংলা, বিহার ও উৎকলের দেওয়ানির রাজনৈতিক মুৎসুদ্দির সম্মানিত পদে নিযুক্ত করেন। 'মহারাজ বাহাদুর' উপাধির সনন্দ ও খেলাত প্রদান উপলক্ষে ক্লাইব কলিকাতায় যে দরবার করেন তাহাতে কলিকাতার সমস্ত ইংরেজ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ক্লাইব কোম্পানীর প্রতিনিধিস্বরূপ মহারাজা নবকৃষ্ণকে ফারসীভাষায় খোদিত একটী স্বর্ণপদক, মুল্যবান পরিচ্ছদ, তরবারি চর্ম্মফলক এবং মুক্তাদি বহু মূল্য রত্ন প্রদান করেন। দরবার সমাপ্ত হইলে ক্লাইব তাঁহাকে সুসজ্জিত হস্তীর উপর রৌপ্য হাওদায় আরোহণ করাইয়া দেন। তিনি মহাসমারোহে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে বহু সংখ্যক অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য, তুর্যাজীব আশাবরদার প্রভৃতি গজানুগামী হইয়াছিল।

মহারাজ নবকৃষ্ণ নিম্নলিখিত কার্য্যগুলির অধ্যক্ষ ছিলেন—(১) মুন্‌সীদপ্তর অর্থাৎ ফারসী ভাষা বিভাগের সেক্রেটারীর অফিস (২) আর্জবেগী দপ্তর অর্থাৎ যেখানে আবেদন সকল গৃহীত হইত (৩) জাতিমালা কাছারী অর্থাৎ

যেখানে জাতি ঘটিত অভিযোগের বিচার হইত (৪) খাজনাখানা অর্থাৎ যেখানে কোম্পানীর টাকা রক্ষিত হইত (৫) মাল আদালত অর্থাৎ চব্বিশ পরগণার রাজস্ব সম্বন্ধীয় বিচারালয় (৬) তহশীল দপ্তর অর্থাৎ চব্বিশ পরগণার কালেক্টারীর অফিস। রাজবাড়ীতে বসিয়াই তিনি সমুদয় কার্য্য দেখিতেন।

নবকৃষ্ণের ধন মান এবং পদবৃদ্ধি দেখিয়া অনেকেই তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হন এবং মহারাজা নন্দকুমার, গিউবাহাদুর এবং সেই সময়ের মেয়ার আদালতের ভূতপূর্ব্ব কার্য্যাধ্যক্ষ (অল্ডার ম্যান) উইলিয়ম বোলষ্ট সাহেবের কুমন্ত্রণায় রামনাথ দাস, রামসোনার ঘোষ প্রভৃতি তাঁহার বিরুদ্ধে ১৭৬৭ খ্রীঃ অব্দে উৎকোচ গ্রহণ, বলপূর্ব্বক অর্থসংগ্রহ এবং তাঁহাদের পরিবারের প্রতি বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন। এই সকল গুরুতর অভিযোগের বিচারের জন্য একটী বিশেষ বিচারক গোষ্ঠি (Select Committe) গঠিত হয় এবং তদানীন্তন নাগরিক জমিদার (ম্যাজিষ্ট্রেট) চারলস্ ফ্লয়ার সাহেবের উপর ইহার তদন্তের ভার অর্পণ করা হয়। ফ্লয়ার সাহেব অনুসন্ধান করিয়া সমুদয় অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য ইহা অভিযোগকারীদের একটী ষড়যন্ত্র বলিয়া মন্তব্য করেন। ফ্লয়ার সাহেবের নির্দ্দেশে অভিযোগকারীরা মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করার অপরাধে গুরুতর শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে নবকৃষ্ণের বাল্যবন্ধু ওয়ারেন হেষ্টিংস গবর্ণর হন এবং তাঁহার অনুগ্রহে নবকৃষ্ণ প্রচুর সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। তখন হইতে তের বৎসরকাল নবকৃষ্ণ প্রবল ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁহাকে নপাড়া প্রভৃতি গ্রামের বিনিময়ে সূতানুটির জমিদারী স্বত্ব প্রদান করেন। এই জমিদারীর স্বত্ব প্রদানকালে কলিকাতার পূর্ব্বতন অধিবাসীরা বাগবাজার নিবাসী দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়কে অধিনায়ক করিয়া, ইংরেজ সরকারে এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছিলেন যে, মহারাজা নবকৃষ্ণ সহরের নূতন অধিবাসী এবং তাঁহারা তাঁহার বহুপূর্ব্ব হইতে কলিকাতায় বাস করিতেছেন; অতএব তাঁহারা তাঁহার প্রজা হইয়া থাকিতে গেলে তাঁহাদের সম্মানের হানী হয় এবং ইহা ছাড়াও তাঁহার দ্বারা প্রজাদের উৎপীড়নের সম্ভাবনা আছে। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের এই আপত্তি অগ্রাহ্য হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে লর্ড ক্লাইব ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের অনুগ্রহে মহারাজা নবকৃষ্ণ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন।

বর্দ্ধমানের মহারাজা ত্রিলোকচাঁদ

বাহাদুরের মৃত্যু হইলে, তদীয় বিস্তৃত জমিদারীর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন না হওয়ায়, প্রায় নয় লক্ষ টাকা রাজস্ব বাকী পড়িয়াছিল। এই রাজস্ব আদায় না করিলে জমিদারী নীলামে বিক্রয় হইত। সেই সময় হেষ্টিংস নবকৃষ্ণকে ঐ টাকা কর্জ্জ দিবার জন্য অনুরোধ করেন এবং ১৭৮০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে নাবালক মহারাজ কুমার তেজচন্দ্রের অভিভাবক ও তাঁহার জমিদারীর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। এই কার্য্যের জন্য তিনি বর্দ্ধমান রাজসরকার হইতে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন প্রাপ্ত হইতেন। নাবালক তেজচন্দ্র সেই সময় নবকৃষ্ণের শোভাবাজারের ভবনে তিন বৎসর কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

পলাশী যুদ্ধের পর সিরাজউদ্দৌলার গুপ্তধনের যে এক অংশ নবকৃষ্ণ পাইয়াছিলেন, তাহা হইতে মাত্র তিন মাসের মধ্যে তিনি পূজার দালান নির্ম্মাণ করাইয়া মহাসমারোহে দুর্গোৎসব করেন। প্রতি বৎসর এই মহোৎসবে ব্রাহ্মণ, দরিদ্র প্রভৃতিকে অর্থ, বস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্যাদি বিতরণ করা হইত, আত্মীয় স্বজন, নাগরিক হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি আরমাণি, ইংরেজ প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করা হইত, পক্ষকাল ব্যাপিয়া নানা রকম নৃত্যগীত বাদ্যাদি অবিরাম চলিত। এই শারদীয় উৎসবে ক্লাইব প্রভৃতি অন্যান্য সমস্ত রাজপুরুষেরা তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইতেন। তিনি স্বীয় ভবনে মহাসমারোহে ও বহু অর্থ ব্যয়ে শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ ও শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউ নামে দুইটী দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। মাহেশের রাধাবল্লভ জীউর সেবার জন্য তিনি বল্লভপুর নামে একখানি তালুক এবং নন্দদুলালের সেবার জন্য চারগ্রাম প্রদান করেন। স্বীয় ভবনস্থ বিগ্রহ দুইটীর আহ্নিক সেবা অধিক ব্যয়সাধ্য ছিল। ইহা ছাড়া তিনি দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী এবং চড়ক উৎসবেও বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে নানা স্থান হইতে কুলীন ব্রাহ্মণ ও কুলীন কায়স্থদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করেন এবং প্রত্যাবর্ত্তনকালে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া তাঁহাদের পদোচিত সম্মান রক্ষা করেন। তদানীন্তন বঙ্গদেশের তিনজন সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ ত্রিলোকচন্দ্র, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং রায় রেঁয়ে মহারাজ রাজবল্লভ রায়ও সভাস্থ হইয়াছিলেন। মহারাজা রাজবল্লভ অতিশয় আত্মাভিমানি ব্যক্তি ছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় তিনি তাঁহার মন্ত্রণা পরিষদের সভ্য ছিলেন। সেই সময় একদিন হেষ্টিংস নবকৃষ্ণকে কোন প্রয়োজনীয় কাগজে স্বাক্ষর করাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। নবকৃষ্ণ এই

কাগজ নিয়া তাঁহার বাগবাজারস্থ ভবনে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে বসিবার কথা না বলিয়াই কাগজখানি পাঠ করিতে বলেন। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া ইহা পাঠ করেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে রাজবল্লভ ইহাতে স্বাক্ষর করিয়া দেন। মহারাজা নবকৃষ্ণ তাঁহার এই ব্যবহারে নিজকে অতিশয় অপমানিত মনে করিলেন এবং তখনই ঐ কাগজ-সহ পদত্যাগের একখানি দরখাস্ত লিখিয়া হেষ্টিংসের নিকট গমন করিলেন। হেষ্টিংস সমুদয় বিষয় অবগত হইয়া অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং শীঘ্রই ইহার প্রতিকার করিবেন বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক দরখাস্ত প্রত্যর্পণ করিলেন। ইহার কিছুদিন পরই মন্ত্রণা পরিষদে এদেশীয় সভ্যের পদ উঠিয়া যায়।

মহারাজ নবকৃষ্ণের সর্ব্ব প্রধান কাজ তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ। এই শ্রাদ্ধে প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব হইতে নানা স্থানের অসংখ্য ভাট, ফকির, কাঙ্গালী ও অন্যান্য অর্থপ্রয়াসী লোক দলে দলে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি এইসব কাঙ্গালীদের জন্য যে সকল পর্ণকুটীর প্রস্তুত এবং খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা পর্য্যাপ্ত হইল না। ক্রমে বাজারে তণ্ডুল, তরকারি, ফলমুল ফুরাইয়া গেল। দেশের কদলী বৃক্ষ সকল পত্রহীন হইল, কুমারটুলীর হাঁড়ি কলসী নিঃশেষ হইয়া গেল, তথাচ কাঙ্গালীদের আহারের সংকুলান হইল না। তখন কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের ভদ্রলোকেরা স্ব স্ব ভবনে তাহাদিগের আতিথ্য সৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ বলেন যে উপরোক্ত শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে সভা হয় এবং সমাগত ভদ্রলোক, পণ্ডিতগণ এবং কাঙ্গালীদিগের জন্য যে পণ্যবীথিকা সংস্থাপিত হয় তাহা হইতে এই স্থানের নাম 'সভাবাজার' হইয়াছে।

মহারাজ নবকৃষ্ণ পুত্রাভিলাষে ক্রমে ক্রমে সপ্তমবার বিবাহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে একটী মাত্র কন্যা এবং অনেকদিন পরে চতুর্থা স্ত্রীর গর্ভে একটী পুত্র দুইটী কন্যা জন্মিয়াছিল। পূর্ব্বে পুত্র লাভে বঞ্চিত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামসুন্দরের তৃতীয় পুত্র গোপীমোহনকে, পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। তাঁহার চতুর্থা স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্র জন্মিয়াছিল, তিনিই রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর। তাঁহার জন্মোৎসব উপলক্ষে তিনি জমিদারীর প্রজাদের খাজনা মাপ করিয়া দেন এবং দরিদ্রদিগকে অনেক অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী প্রদান করেন। তদ্ভিন্ন কলিকাতার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে ও চতুষ্পাঠিতে তৈল, সন্দেশ এবং রৌপ্য ও তৈজস বাসনাদি পাঠাইয়া দেন। ইহার দুই বৎসর পরে

(১৭৪৮ খ্রীঃ) তাঁহার দত্তকপুত্র গোপী মোহনের ঔরসে তাঁহার একটী পৌত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই হিন্দু সমাজ চূড়ামণি রাজা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর।

মহারাজা নবকৃষ্ণ ১৭৯১ খ্রীঃ অব্দে খানাকুল নিবাসী কুলীন শ্রেষ্ঠ রামানন্দ (বসু) সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের কন্যার সহিত স্বীয় পুত্র রাজকৃষ্ণের পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করেন। বিবাহ কার্য্য সিমুলিয়াতে সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রধান শাসনকর্ত্তা, প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য ইংরেজগণ বরযাত্র হইয়া নবকৃষ্ণের সম্মান বর্দ্ধন করেন। তিনি মহারাজা উপাধি লাভের সঙ্গে যে চারি হাজার অশ্বারোহী সৈন্য রাখিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা কেবল এই সময়ে কার্য্যে পরিণত করেন। ফোর্ট উলিয়াম দুর্গ হইতে চারি হাজার অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া বরের সহগামী হইয়াছিল। পুত্রের বিবাহের কিছুদিন পরে, নবকৃষ্ণ তাঁহার পৌত্র রাধাকান্তের পরিণয় কার্য্য গোপীনগরের গোপীকান্ত সিংহ মহাশয়ের প্রপৌত্রী ও রামকান্তের দুহিতার সহিত সম্পন্ন করেন। এই গোপীকান্ত সিংহের বংশে গোষ্ঠীপতিত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। গোপীকান্তের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারীরা ধনের খর্ব্বতা হেতু গোষ্ঠীপতিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ ছিলেন না। গোপীকান্তের পৌত্র রামকান্ত এক সময়ে নবকৃষ্ণের নিকট হইতে অনেক টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি এই ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন নাই। এই সুযোগে মহারাজা নবকৃষ্ণ তাঁহার দুহিতার সহিত স্বীয় পৌত্রের বিবাহ এবং গোষ্ঠীপতিত্ব মান্যের মূল্য স্বরূপ ঋণের টাকা পরিত্যাগ করিবার প্রস্তাব করেন। রামকান্ত এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াই কন্যার বিবাহ দেন। তৎপরে নবকৃষ্ণ বঙ্গের নানাস্থান হইতে প্রধান কুলীন কায়স্থ ও কুলাচার্য্যদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করেন, আদান প্রদান এবং অন্যান্য কার্য্যানুসারে তাঁহাদিগের কুল-মর্য্যাদা স্থিরীকৃত হয়। তৎকালে সমাগত কুলীন এবং কুলাচার্য্যগণ নবকৃষ্ণকে একাদশ গোষ্ঠীপতি বলিয়া স্বীকার ও বরণ করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার বংশের কেহ কোন সামাজিক কার্য্যের সভায় উপস্থিত হইলে, গোষ্ঠীপতির বংশোদ্ভব বলিয়া, অগ্রে স্বীয় গলদেশে পুষ্পমাল্য ও কপালে চন্দনের ফোটা প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু বর্ত্তমানে এই প্রথাটি এক প্রকার তিরোহিত হইয়াছে।

মহারাজা নবকৃষ্ণ অতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, রাধাকান্ত তর্কবাগীশ, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ, শ্রীকণ্ঠ, কমলকান্ত, বলরাম

শঙ্কর প্রভৃতি তাঁহার সভার পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহু যত্নে ও অর্থ ব্যয়ে সংস্কৃত এবং ফারসী ভাষায় লিখিত অনেকগুলি পুঁথি সংগ্রহ করেন; কলিকাতার গঙ্গাতীরে তিনি দুইটী ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাট প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে ষ্টুয়ার্ড কোম্পানীর কারখানা স্থাপিত হইবার পর, তিনি একখানি শকট নির্ম্মাণ করান। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনি প্রথম অশ্বচালিত শকট ব্যবহার করেন বলিয়া, যে দিবস তিনি উক্ত শকটে আরোহণ করেন, সেই দিন রাজবাড়ীতে অনেক জনতা হইয়াছিল।

তিনি বেহালা গ্রাম হইতে কুল্পী পর্য্যন্ত দ্বাত্রিংশ মাইল দীর্ঘ 'রাজার জাঙ্গাল' নামে একটী রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কলিকাতা সহরেও নিজ ব্যয়ে স্বীয় নামে তিনি একটী রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কলিকাতা পাথুরিয়া গির্জ্জা যেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা ও তৎসন্নিহিত স্থান (যাহা কবর দিবার জন্য ব্যবহৃত হইত) তিনি কোম্পানীকে দান করেন; রাজবাড়ীর 'দেওয়ান খানা' নামক বৃহৎ হল-ঘর পলাশী যুদ্ধ জয় স্মরণার্থে নবকৃষ্ণ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে কোম্পানীর ধনাগারে অর্থকৃচ্ছ্রতা হেতু হেষ্টিংস সাহেব কয়েক মাস বেতন না পাওয়ায়, অত্যন্ত অর্থ কষ্টে পতিত হন। সেই সময় তিনি তাঁহাকে তিন লক্ষ টাকা ধার দেন। হেষ্টিংস ঐ টাকা আর পরিশোধ করেন নাই। নবকৃষ্ণের অনুগ্রহে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র 'মহারাজা রাজেন্দ্রবাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় অগ্রজদ্বয়কে 'রায়' এবং রাধাকান্ত তর্কবাগীশকে 'পণ্ডিত প্রধান' উপাধি দেওয়াইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত স্বীয় শিশু পুত্রকে 'রাজাবাহাদুর' উপাধি দেওয়ান।

১৭৯৭ খ্রীঃ অব্দে ২২শে নবেম্বর (১২০৪ বঙ্গাব্দ) পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি রাজকার্য্যে নিরত ছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংসের পদত্যাগের পর আর কোন বৈতনিক কার্য্য করিতেন না। স্যার জন ম্যাকফারসন, লর্ড কর্ণওয়ালিস এবং স্যার জন সোর প্রভৃতি ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তাগণ গুরুতর রাজকার্য্যে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবে তাঁহার ভবনে আগমনপূর্ব্বক, তাঁহার গৌরব বর্দ্ধন করিতেন। স্বধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। তিনি নিয়মিত পূজাদি এবং দেবদেবী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। দীন দরিদ্রকে তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। বহু আত্মীয়স্বজন তাঁহার আশ্রয়ে থাকিত এবং যতদিন

না তাঁহারা কৃতকর্ম্মা হইয়া, স্বতন্ত্র অবস্থিতি করিবার ক্ষমতা লাভ করিতেন, ততদিন তাঁহাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিতেন।

মহারাজা নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁহার ঔরসজাত পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণ ও পোষ্যপুত্র রাজা গোপীমোহনের মধ্যে বিষয় লইয়া গোলযোগের সৃষ্টি হয় এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সুপ্রিম কোর্টে মোকর্দ্দমা করেন। অবশেষে সমস্ত বিষয় উভয়ের মধ্যে সমান ভাগে বিভক্ত হয়।

নবগোপাল মিত্র—বাংলার প্রথম-যুগের একজন স্বদেশ-হিতব্রতী। আজকাল নবগোপাল মিত্রের নাম শিক্ষিত লোকের নিকটও একরূপ অপরিজ্ঞাত। কিন্তু বাংলা দেশে জাতীয়-আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁহার নাম উজ্জ্বলভাবে লিখিত থাকার যোগ্য। ইংরেজী শিক্ষার প্রথমযুগে যে সকল মনস্বী দেশে জাতীয় ভাব, স্বদেশ প্রেম উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রয়াস পান, নবগোপাল তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মনস্বী রাজনারায়ণ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন।

নবগোপাল বাবুর প্রধান কীর্ত্তি "হিন্দু মেলা" স্থাপন। এই কাজে তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বহু লোক তাঁহাকে সাহায্য করেন। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম অগ্রজ, প্রথম ভারতীয় সিবিলিয়ান (I. C. S.) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ মেলার জন্য একটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচনা করেন। উহার প্রথম কয়েক পংক্তি এইরূপ—

মিলে সবে ভারত সন্তান
  এক তান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশো গান।
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী
  শত খনি রত্নের নিধান
  হোক ভারতের জয়
  গাও ভারতের জয়
কি ভয়, কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

এই সঙ্গীতটি হিন্দু মেলায় গীত হইয়াছিল। নামে, ভাবে ও কার্য্যে উহা সম্পূর্ণ "হিন্দু" মেলা হইয়াছিল। উহার অনুষ্ঠাতৃগণ সকলেই হিন্দু ছিলেন এবং উহাতে যে সকল বক্তৃতাদি প্রদত্ত হইয়াছিল, সে সকল হিন্দু ভাবের দ্বারা প্রণোদিত ও হিন্দুর গুণ গরিমায় পুষ্ট ছিল।

নবগোপাল অতিশয় ইংরেজ বিদ্বেষী ছিলেন। কি করিয়া ইংরেজকে শীঘ্র ভারত হইতে বিতাড়িত করা যায়, ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তা ছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ইংরেজ বাহুবলে এদেশ অধিকার করিয়াছে। সুতরাং ইংরেজকে তাড়াইতে হইলে

বাহুবলেরই ভজনা করিতে হইবে। এই সময়ে সার জন ক্যাম্বেল (Sir John Campbel) ভারতের ছোটলাট ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে এদেশে শিক্ষায়তন সমূহে ব্যায়াম চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত হয়। প্রধানতঃ ইংরেজি ধরণের ব্যায়ামই শিক্ষা দেওয়া হইত। নবগোপালও একটি ব্যায়াম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার "আখড়ার" ছাত্রদিগকে তিনি তরোয়াল খেলা, লাঠি খেলা, বন্দুক ছোঁড়া প্রভৃতিও অভ্যাস করিতে দিতেন (তখন অস্ত্র-আইন প্রবর্ত্তিত হয় নাই)।

বাহুবলের সাধনায় মনোনিবেশ করিলেও অন্ন সংস্থানের চিন্তাও তিনি করিতেন। ইংরেজ ভারতবর্ষে নিজ ব্যবসায় বাণিজ্য বিস্তার করিয়া দেশকে অন্নহীন করিয়া তুলিতেছে, ইহাই ছিল নবগোপালের অপর ধারণা। অন্নবস্ত্রের চিন্তা দেশের লোককে জরাজীর্ণ করিতেছে। অতএব স্বজাতির বাহুবলের প্রতিষ্ঠা করিতে, দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যকে নিজেদের আয়ত্বে আনিতে হইবে, ইহাই ছিল নবগোপালের অপর বদ্ধমূল ধারণা। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি হিন্দু মেলার প্রবর্ত্তন করেন। বর্ত্তমানকালেও নানাস্থানে যে সকল শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, তাহাদের মূলেও সেই এক উদ্দেশ্য।

নবগোপালের হিন্দু মেলাতে স্বদেশী পণ্য দ্রব্য প্রদর্শিত হইত, ব্যায়ামাদির পরীক্ষা হইত, জাতীয়তা-উদ্বোধক সঙ্গীত ও বক্তৃতাদি হইত, এবং পণ্য ও ব্যায়াম প্রদর্শকদিগকে প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত করিয়া যথাযোগ্য মূল্যবান্ পুরস্কার দেওয়া হইত। মেলা বৎসরে একবার বসিত কিন্তু উহার আয়োজনে নবগোপাল ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণকে প্রায় সমস্ত বৎসরই ব্যস্ত থাকিতে হইত। এই হিন্দু মেলাতেই ত্রিপুরা জিলার সরাইল পরগণার অন্তর্গত কালিকচ্ছ গ্রাম নিবাসী খ্যাতনামা চিকিৎসক মহেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয়ের উদ্ভাবিত নূতন ধরণের তাঁত প্রদর্শিত হয়। এই হিন্দু মেলা কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। শেষবারের মেলায় একটি ফিরিঙ্গির অশিষ্ট আচরণে মেলার মধ্যে তুমুল মারামারি উপস্থিত হয়। দেশপ্রসিদ্ধ বিপিনচন্দ্র পালের সহিতই প্রথম ফিরিঙ্গিটি অশিষ্ট আচরণ করে।

নবগোপাল বাবু "ন্যাশানাল পেপার" (The National Paper) নামে একখানি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন করিতেন। উহার ইংরেজি রচনায় অত্যন্ত ভুল থাকিত। নবগোপাল তজ্জন্য লজ্জিত হইতেন না। তিনি উহা স্বাদেশিকতারই একটি লক্ষণ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বলিতেন "ও ত আমার নিজের ভাষা নয়। ও ম্লেচ্ছ ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল"।

নবদ্বীপচন্দ্র দাস—সাধক ও ধর্ম্ম-প্রচারক। ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর (১২৫৩ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ) মাসে ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত এক বৈষ্ণব কায়স্থ পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম নিমাইচন্দ্র দাস। গ্রামের এক চতুষ্পাঠীতে তাঁহার শিক্ষারম্ভ হয়। পরে বালিয়াটি গ্রামের মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা গমন করেন এবং তথাকার নর্ম্মাল স্কুলে অধ্যয়ন শেষ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। প্রধানতঃ উত্তর বঙ্গের কয়েক স্থানে কাজ করিয়া ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে কর্ম্মত্যাগ করেন।

বালিয়াটিতে অধ্যয়ন করিবার সময়েই তিনি তথাকার জমিদার মহাশয়ের বাটীতে কলিকাতার আদি ব্রাহ্ম সমাজ হইতে প্রকাশিত পুস্তকাদি এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রভৃতি পাঠ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ঐ বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকও ব্রাহ্ম-ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের নিকটে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত হইবার সুযোগ পান। ঢাকায় থাকিবার সময়ে নিয়মিত ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করিতেন। ঐখানে তিনি আরও ঘনিষ্ঠভাবে ব্রাহ্ম সমাজের সহিত যুক্ত হইলেন। কর্ম্মজীবনে তিনি একবার কিছুকাল সন্তঃপুষ্করিণী গ্রামে বাস করেন। সেইখানেও কতিপয় ব্রাহ্ম-ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তির সহিত মিলিত হন। এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর কয়েক বৎসর চাকুরী করিয়া, সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্ম সমাজের কাজে নিজেকে সমর্পণ করিবার জন্য তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক ব্রত গ্রহণ করেন। তদবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত ধর্ম্ম প্রচার ও নানাভাবে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

তিনি অকৃতদার ছিলেন। কিন্তু সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের লোকের সহিত তিনি গভীর প্রীতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সূত্রে বদ্ধ ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকল প্রকার লোকের নিকট সমভাবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি আর কেহ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। সকল লোকের সুখ দুঃখের সাথী হইয়া তিনি সকলের সমান প্রিয় হইয়াছিলেন।

চাকুরী করিয়া যে সামান্য কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজে গচ্ছিত রাখিয়া সেই টাকার উপসত্ত্ব হইতেই তিনি নিজ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি বলিষ্ঠ দেহ বা উত্তম স্বাস্থ্যবান ছিলেন না, তথাপি অদম্য উৎসাহে রোগাক্রান্ত দেহ লইয়াও কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর থাকিতেন। পরি-

চিত অপরিচিত নির্ব্বিশেষে সকল লোকের যথাসাধ্য সেবা বা উপকার করাতেই তিনি আনন্দ উপভোগ করিতেন। আজীবন নিস্বার্থ-পরহিতব্রতী এই সাধক ১৯২৪ খ্রীঃ অব্দের ২৪শে জানুয়ারী (১০ই মাঘ ১৩৩০ বঙ্গাব্দ) নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। সাধন সঙ্কেত, সাধক সঙ্গী, ব্রাহ্মধর্ম্মতত্ত্ব, দাস, করুণাধারা প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তিকা তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাব ও ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুলতার পরিচায়ক।

নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা বাহাদুর, প্রিন্স—নবদ্বীপ বাহাদুর নামেই তিনি বিশেষ পরিচিত। ১২৫৭ বঙ্গাব্দে (১৮৫০ খ্রীঃ) ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা সহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহারাজ ঈশানচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার তিন বৎসর বয়সের সময় মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে মহারাজ ঈশানচন্দ্র পরলোক গমন করেন। তখন তাঁহার খুল্লতাত মহারাজ বীরচন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে মহারাজ বীরচন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্র নবদ্বীপচন্দ্রকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত না করিয়া, স্বীয় পুত্র রাধাকিশোরকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করেন। নবদ্বীপচন্দ্রের মাতা আশা করিয়াছিলেন যে, মহারাজ বীরচন্দ্র নবদ্বীপচন্দ্রকেই যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করিবেন। কিন্তু মহারাজ বীরচন্দ্র তাহা না করায় তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন এবং পুত্রসহ কুমিল্লায় চলিয়া যান।

নবদ্বীপচন্দ্র কখনও কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই, কুমিল্লা নিজ গৃহে থাকিয়াই তিনি অধ্যয়ন করিতেন। তিনি নিজের চেষ্টায় ইংরেজী, বাঙ্গালা উর্দ্দু, ফারসী, মণীপুরী ও ত্রিপুরা ভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন।

ত্রিপুরারাজের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যান্তর্গত চাকলা জমিদারীর অংশ প্রাপ্তির জন্য তিনি ব্রিটিশ আদালতে মকর্দ্দমা করেন। এই মকর্দ্দমা অনেকদিন চলিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যই জয় লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি ত্রিপুরারাজ্যের এক মণিপুরী ক্ষত্রিয় পরিবারে বিবাহ করিয়াছিলেন। একাদিক্রমে অনেক বৎসর তিনি ত্রিপুরা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানেরপদে নিযুক্ত থাকিয়া বহু লোকের উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। কুমিল্লা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানরূপে তিনি কুমিল্লা সহরের নানাবিধ উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহ এবং চেষ্টায় কুমিল্লা সহরে 'থিয়োসফিকেল সোসাইটি' স্থাপিত হয় এবং তিনি তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য পরলোক গমন করিলে, তৎপুত্র বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ

করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কিছুকাল পরেই পিতৃব্য নবদ্বীপ-বাহাদুরকে অনেক চেষ্টা করিয়া আগর তলা আনয়ন করেন এবং মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। নবদ্বীপচন্দ্র দীর্ঘকাল মন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার অবসর গ্রহণের পর মহারাজা বীরেন্দ্র-কিশোর অকালে পরলোক গমন করেন। সেই সময় ইংরেজ সরকার যুবরাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যের হস্তে রাজ্যের শাসন ভার অর্পণ না করিয়া রাজ্য পরিচালনার জন্য এক শাসন পরিষদ গঠন করেন। নবদ্বীপ বাহাদুর সেই পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং সভাপতিরূপে সুশৃঙ্খলার সহিত রাজ্য শাসন করিয়া বিশেষ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন। তৎপর যুবরাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে 'মহামান্যবর' উপাধি প্রদানপূর্ব্বক সম্মানিত করেন এবং রাজ্যের প্রধান কার্য্য পরিচালক সঙ্ঘের সভাপতি এবং ব্যবস্থা পরিষদের সহ-সভাপতি নিযুক্ত করেন। মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর রাজ্যের সোনামুড়ার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়টিরও 'নবদ্বীপচন্দ্র ইনষ্টিটিউশন' নাম প্রদান করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

১৩৩৭ বঙ্গাব্দে মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর যখন ইউ-রোপ ভ্রমণে গমন করেন। সেই সময় রাজ্যের কার্য্য পরিচালনার জন্য ষ্টেট 'এডভাইজারী কাউন্সিলের' (State Advisory Council) ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া উহাই ষ্টেট কাউন্সিলে' পরিণত করেন এবং নবদ্বীপচন্দ্রকে তাহার (State Council) সভাপতি নিযুক্ত করেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি মহা-রাজার অনুপস্থিতকালে সুনিয়মিতভাবে রাজ্যশাসন করিয়া সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

সাহিত্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ-দের ত্রিপুরা শাখা গঠিত হওয়ার সময় হইতে, তিনি উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। 'রবি' পত্রিকায় 'বাংলা সাহিত্যের চারি যুগ' নামক তাঁহার রচিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া-ছিল। ঐ প্রবন্ধে বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। 'ত্রিবেণী' নামক মাসিক পত্রি-কায়ও তাঁহার 'আবর্জ্জনার ঝুড়ি' প্রকা-শিত হইয়া সুধী সমাজে সমাদৃত হইয়া-ছিল। কিন্তু পরে 'ত্রিবেণী পত্রিকা' বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তাঁহার আবর্জ্জনার ঝুড়ি সম্পূর্ণ হয় নাই। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে 'ত্রিপুরা হিতসাধনী সভার' বার্ষিক অধি-বেশনে তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ১৯শে ভাদ্র

(১৯৩১ খ্রীঃ, সেপ্টেম্বর) মঙ্গলবার একাশী বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি অতিশয় সৎ-স্বভাবাপন্ন, অমায়িক, নিরলস, নিরহঙ্কার, নির্ব্বিরোধী ও নিঃস্বার্থপর ব্যক্তি ছিলেন। উদার ও নম্র ব্যবহারে তিনি ত্রিপুরাবাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে বর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠ ক্যাপ্টেন কুমার প্রফুল্লকুমার ত্রিপুরা রাজ্যের মিলিটারী সেক্রেটারী, দ্বিতীয় কুমার কিরণকুমার পাতিয়ালা ষ্টেট ফোর্সের লেপ্টেনেণ্ট পদে কার্য্য করিতেছেন। কনিষ্ঠ পুত্র কুমার শচীন্দ্র-কুমার বর্ত্তমানে বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ও বংশীবাদক।

নবনীত, কবি— তিনি একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার। 'অরিষ্ট নবনীত' নামক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

নবরঙ্গ রায়, রাজা—বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জিলার উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলে চারিপাড়া অথবা ভোগবেতাল নামক গ্রামে রাজা নবরঙ্গ রায় রাজত্ব করিতেন। তিনি রাঢ় অঞ্চল হইতে আসিয়া ঐ স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তাঁহার দুই সহোদরও তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন এবং ভূঁইয়া উপাধিধারী তাঁহার স্বজাতীয় চারিজন সামন্ত রাজাও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা কমলাবাড়ী, উলুকান্দি, তোলচারা ও ভোগপাড়ার ভূঁইয়া বলিয়া খ্যাত। রাজা নবরঙ্গ রায়ের বংশধরগণ ভোগবেতালের রায় চৌধুরী নামেও পরিচিত। নবরঙ্গ রাজা কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা সঠিক নির্ণিত হয় নাই। পারিপর্শ্বিক ঘটনাবলী আলোচনা করিয়া তাঁহাকে খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর লোক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

নবরঙ্গ রায়ের রাজ্য কি ভাবে বিনষ্ট হইল তৎসম্বন্ধে সঠিক ঐতিহাসিক বিবরণ বিশেষ পাওয়া যায় না। তবে ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত অনেক গাথা হইতে জানা যায় যে, দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ঈশা খাঁ কৌশলে নবরঙ্গ রায়কে পরাজিত করিয়া ভোগবেতাল রাজ্য অধিকার করেন।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে গৌড়াধিপের সহিত রাজা লাউসেনের যে যুদ্ধ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে নবরঙ্গ রায়ের উল্লেখ আছে। সেই সময়ে তিনি খুব সম্ভব গৌড়েশ্বরের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন।

নবলরাও সখীরাম আড়বাণী—সিন্ধু দেশের একজন প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক, ধর্ম্ম সংস্কারক ও স্বদেশ প্রেমিক ব্যক্তি। বাঙ্গালা দেশের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম নেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বোম্বাই নগরস্থ বক্তৃতা শ্রবণ

করিয়া ও তাঁহার ধর্ম্মভাব দর্শন করিয়া ব্রাহ্ম সমাজেরদিকে তিনি আকৃষ্ট হন। বোম্বাই হইতে তাঁহার স্বদেশ হায়দরাবাদে (সিন্ধু) গমন করিয়া স্বদেশের সকল রকম সংস্কার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতা হীরানন্দ সখীরাম আড়বাণী ও মতিরাম সখীরাম আড়বাণীকে তিনি কলিকাতায় শিক্ষার্থ প্রেরণ করেন। তিনি বাঙ্গালীদিগকে শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নত চরিত্রে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন। সেই জন্যই তিনি তাঁহার সহোদরদ্বয়কে বাঙ্গালা দেশে প্রেরণ করেন। তাহার ফলে তাঁহারা নবল রাওএর সকল প্রকার কাজের প্রধান সহায় হইলেন। হীরানন্দ অচিরকাল মধ্যেই 'সাধু হীরানন্দ' নামে সকলের শ্রদ্ধাঞ্জলি পাইয়াছিলেন।

নবল রাও কলিকাতার স্বাধীন স্কুলের আদর্শে সিন্ধুদেশে স্কুল স্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়া, মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলাল সেন এবং সুপ্রসিদ্ধ রেভাঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (পরে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব) হায়দরাবাদে আনয়ন করিলেন। স্কুল স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও নানা কাজে হস্তক্ষেপ করিলেন। তাঁহার বিনয়, নম্রতা ও সাধুতায় সিন্ধিরা সকলেই তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। উপরন্তু রাজকর্ম্মচারীদের নিকট আবেদন করিয়া জেলে যাইয়া কয়েদীদের নিকট ধর্ম্ম প্রচারের অনুমতি আনয়ন করিলেন। তিনি প্রতি সপ্তাহে জেলে যাইয়া কয়েদীদের লইয়া প্রার্থনা করিতেন। তাহার ফলে কয়েদীদের অনেকের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তাঁহার ব্যাকুল প্রার্থনায় কয়েদীদের অশ্রুবর্ষণ হইত। কোন কোন কয়েদী চিরজীবনের জন্য পাপ পথ পরিত্যাগ করিয়াছিল। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই প্রকারে কয়েদীদিগের মধ্যে কাজ করিয়াছিলেন। সাধু হীরানন্দের অকাল মৃত্যুতে সমাজের কাজের বিশেষ ক্ষতি হইল। কিন্তু নবল রাও ও তাঁহার ভ্রাতাদের সাধু ব্যবহারে, দেওয়ান প্রভুদাস, রায়বাহাদুর কোড়ামল, ডাক্তার পৃথমদাস প্রভৃতি বিশিষ্ট লোকেরা এই ব্রাহ্ম সমাজের কাজে যোগদান করিয়া সমাজকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন।

নবাই সন্ন্যাসী—নদিয়া জিলার চুয়াডাঙ্গার অন্তর্গত আন্দুল বেড়িয়া গ্রামের নিকটে নবদোয়া নামে একটী হ্রদ আছে। এই দোয়ায় নবাই সন্ন্যাসী নামে এক সাধু পুরুষ বাস করিতেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি এই দোয়ার জল মধ্যে থাকিয়া ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার দেহাবসানের পরে

লোকে এই জলাশয়কে পবিত্র জ্ঞান করিয়া প্রতি বৃহস্পতিবারে তাহার তীরে পূজা দিয়া থাকে।

নবীনকৃষ্ণ বসু—১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দের প্রথমভাগে 'চিত্তোৎকর্ষ' নাটক নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা বিদ্যাসাগরকর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিল।

নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—একজন সাহিত্যিক ও সংবাদ পত্রসেবী। ১৮২৪ খ্রীঃ অব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ঘোষপাড়া গ্রামে সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি প্রথমে হুগলী ও পরে কলিকাতায় শিক্ষা লাভ করেন। কলিকাতা থাকাকালীন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, আনন্দমোহন বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মহৎ ব্যক্তিগণের সহিত বিশেষ পরিচিত হন। এই সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের সাহচর্য্যে তাঁহার হৃদয়ে সাহিত্য সেবার আকাঙ্খা জাগরিত হয়। তিনি প্রথমে 'প্রভাকর' ও 'সাধুরঞ্জন' পত্রিকায় তাঁহার রচিত কয়েকটী কবিতা প্রকাশ করেন। মনস্বী অক্ষয়কুমার দত্তের পরে তিনি ছয় বৎসরকাল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল প্রসিদ্ধ 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নামক ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং পরে 'এডুকেশন গেজেটেরও' সম্পাদক হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদকতায় এডুকেশন গেজেট বেশ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 'প্রাকৃত-তত্ত্ব-বিবেক' ও 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামক দুইখানা পাঠ্যপুস্তকও তিনি রচনা করেন। 'প্রাকৃত তত্ত্ববিবেক' গ্রন্থখানি ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বি-এ পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি 'করসংক্রান্ত আইনের নজীর' নামে একখানা পুস্তক প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালার তদানীন্তন বাঙ্গালার ছোটলাটের বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। সে সময় তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করার প্রস্তাব হইয়াছিল কিন্তু তিনি সেই পদ গ্রহণ করেন নাই। তিনি কিছুকাল মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ম্যানেজারের কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী, তেজস্বী ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। নীলকরদিগের অত্যাচার কালে তিনি নানা ভাবে দেশের অনেক কাজ করিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময়ে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগকেও তিনি নানা ভাবে সাহায্য করিতেন। তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রায়বাহাদুর—আগ্রা প্রবাসী একজন খ্যাতনামা বাঙ্গালী চিকিৎসক ও উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী। ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি

জন্মগ্রহণ করেন। পাবনা জেলায় তাঁহার আদি নিবাস ছিল। ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রথমে নৈনিতাল ও পরে বুলন্দসহরের হাঁসপাতালের পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হইয়া তৎপ্রদেশে গমন করেন। ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে বুলন্দসহর হইতে বদলি হইয়া মথুরায় গমন করেন। সেখানে পাঁচ বৎসর কার্য্য করিয়া ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি আগ্রা মেডিকেল স্কুলের অস্ত্রচিকিৎসার অধ্যাপক (Lecturer on Surgery) নিযুক্ত হইয়া আগ্রা গমন করেন। এই কার্য্যে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা ও চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়া ক্রমে ক্রমে চিকিৎসা বিদ্যার অধ্যাপকের (Lecturer on Practice of Medicine) পদ লাভ করেন। তিনি অতিশয় সম্মানের সহিত আটাশ বৎসরকাল এই কার্য্য করিয়া ১৯০৩ খ্রীঃ অব্দে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি আগ্রার সমুদয় জনহিতকর কার্য্যে যোগদান এবং দীন দুঃখীগণের উপকার সাধনে চেষ্টা করিতে থাকেন। তৎপূর্ব্বে ১৮৭৮—১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হইয়াছিল তখন বিপন্ন নরনারীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া অক্লান্তভাবে তাহাদের সেবা করিয়াছিলেন। বহু বিপন্ন ও দরিদ্র নরনারীকে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা এমন কি ঔষধ ও পথ্যাদি পর্য্যন্ত প্রদান করিতেন। আগ্রা প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের নিকট হইতে কোন সময়ই পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার চিকিৎসার সুখ্যাতি বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। অন্যান্য প্রদেশের অনেক রাজা মহারাজাও তাঁহার চিকিৎসাধীন হইতেন। জয়পুরের মহারাজ ঢোলপুরের রাণা, ভূপালের বেগম এবং আভাগড়ের রাজা প্রমুখ অনেককেই তিনি চিকিৎসা করিয়াছিলেন। উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীগণও তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন এবং চিকিৎসা গুণে ও দরিদ্র সেবার জন্য সরকার কর্ত্তৃকও তিনি প্রশংসিত হইয়াছিলেন। আগ্রাতে যাঁহাদের চেষ্টায় ইউরোপীয় চিকিৎসা প্রণালী প্রসার লাভ করিয়াছিল, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। হিন্দী, উর্দ্দু ও ফার্সী ভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি "The Principle and Practice of Medicine" নামক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় একখানা বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া নানা ভাষায় প্রকাশ করেন। তিনি বহু বৎসর 'আগ্রা বঙ্গ সাহিত্য সমিতির' সভাপতি ছিলেন। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে (১৯১২ খ্রীঃ) তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি শিষ্টাচারী, অতিথিপরায়ণ, সৎস্বভাবাপন্ন ও

পরোপকারী ছিলেন। এই সকল গুণে তিনি ঐ অঞ্চলের সকলেরই বিশেষ প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্র দত্ত—একজন কবি, গ্রন্থকার ও উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী। ১২৪৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে কলিকাতার যোড়াবাগানের এক তন্তুবায় কুলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম দীননাথ দত্ত। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ গণেশচন্দ্র দত্ত, আদিনিবাস বারেন্দ্রভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে কলিকাতার গোবিন্দপুরে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন এবং ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে থাকেন। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ প্রস্তুতের জন্য ঐ স্থান গৃহীত হইলে, গণেশচন্দ্রের বংশধরেরা কলিকাতার বড়বাজার, নিমতলা, পাথুরিয়াঘাটা প্রভৃতি স্থানে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পিতামহ, দুর্গাচরণ দত্ত নিমতলা ত্যাগ করিয়া পরে যোড়াবাগানে যাইয়া বাস স্থাপন করিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্র প্রথমে কোন পাঠশালায় লেখাপড়া শিক্ষা করেন। তৎপরে গোপালচন্দ্র বিদ্যাভূষণের নিকট কিছুকাল সংস্কৃত পাঠ করিয়া ফ্রী চার্চ্চ ইনষ্টিটিউশনে (Free Church Institution) প্রবেশ করেন। সেইখানে বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি প্রতি বৎসর পুরস্কার লাভ করিতেন। অধ্যাপক ডাঃ ডফ, ইউয়ার্ট, লালবিহারী দে প্রভৃতি শিক্ষকগণ তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।

তিনি প্রথমে ইউয়ার্ট সাহেবের সাহায্যে সিবিল অডিটর (Civil Auditor) আফিসে মাসিক পনর টাকা বেতনে এক চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে এই আফিস একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের (Accountant General) আফিসের সঙ্গে মিলিত হইলে, তিনি শেষ পর্য্যন্ত এই আফিসের তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent) হইয়াছিলেন এবং তিনশত টাকা বেতন প্রাপ্ত হইতেন। সুনামের সহিত বত্রিশ বৎসরকাল চাকুরী করার পর ১২৯৭ বঙ্গাব্দে (১৮৯১ খ্রীঃ) তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

পাঠ্যাবস্থায়ই তাঁহার মধ্যে সাহিত্য সেবার ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং সেই সময় 'প্রভাকর' 'ভাস্কর সংবাদ' 'জ্ঞান রত্নাকর' প্রভৃতি পত্রিকায় বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১২৬৪ বঙ্গাব্দে তিনি 'কলিকাতা পত্রিকা' নামক একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন; কিন্তু অল্পকাল পরেই ইহা বন্ধ হইয়া যায়। তৎপরে তিনি ক্রমে অনেকগুলি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ১২৭৩ বঙ্গাব্দে তাঁহার 'খগোল বিবরণ' পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহা নর্ম্মাল স্কুলের পাঠ্য ছিল। ১২৭৬

বঙ্গাব্দে "ব্যবহারিক জ্যামিতি, ক্ষেত্র ব্যবহার, জরীপ ও সমস্থান প্রক্রিয়া" নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এই পুস্তক ও 'খগোল বিবরণ' নামক পুস্তকের দুইশত খণ্ড করিয়া ক্রয় করেন। ১২৭৯ বঙ্গাব্দে তিনি 'সঙ্গীত রত্নাকর' নামক বৃহৎ সঙ্গীত গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। তদানীন্তন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সাটক্লিফ (Sutcliff) সাহেব কর্ত্তৃক উহা প্রশংসিত হইয়াছিল। ১২৮০ বঙ্গাব্দে 'সাহিত্য মঞ্জরী' এবং ১২৮৩ বঙ্গাব্দে 'গীতসার সংগ্রহ' নামক তাঁহার রচিত পুস্তক দুইখানি প্রকাশিত হয়। ১২৮০ বঙ্গাব্দে তিনি নোটস্ অন প্রেক্টিক্যাল জিয়মেট্রি (Notes on Practical Geometry) ও নোটস্ অন সারভেইং (Notes on Surveying) এবং ১২৮২ বঙ্গাব্দে Hints to Ameen on Khusrah Survey in Bengal নামক পুস্তক তিনখানি বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদের জন্য তিনি স্কুল বুক সোসাইটি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন। ১২৮১ বঙ্গাব্দে তিনি ওট্রোণ্টো দুর্গ ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিয়া 'হেমলতা' নামক পাক্ষিক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তৎপরে তিনি 'নিধুবাবুর গীতাবলীর সংশোধিত ভূমিকা' 'নিত্য কর্ম্মপদ্ধতি' ও 'হারমোনিয়ম সূত্র' প্রভৃতি গ্রন্থও প্রকাশ করেন। ইহা ছাড়া তিনি বিস্তৃত উপক্রমণিকা, সংক্ষিপ্ত বিবরণ, মূল, শ্রীধর স্বামীর টীকা, অন্বয়, দুরূহ শব্দের অর্থ, মূলের বিস্তৃত ব্যাখ্যা, বাঙ্গালা পদ্যে ও ইংরেজী অনুবাদ, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, গীতামাহাত্ম্যের বঙ্গানুবাদ, হিন্দু যোগ শাস্ত্রের বিবরণ প্রভৃতি সম্বলিত 'শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা' গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থ প্রণয়নই তাঁহার জীবনের শেষ কার্য্য। তিনি প্রায় বাইশ বৎসর যাবৎ পরিশ্রম করিয়া 'সঙ্গীত সোপান' নামক সঙ্গীত বিষয়ে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহাতে তিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে বহু বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সোমপ্রকাশ, ধর্ম্মতত্ত্ব, রহস্যসন্দর্ভ প্রভৃতি সংবাদ পত্রেও নানা বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিতেন।

তিনি স্বজাতির সামাজিক উন্নতির জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন এবং এই উদ্দেশ্যে ১২৮১ বঙ্গাব্দে একবার মালদহ প্রভৃতি স্থানের বারেন্দ্র তন্তুবায়দিগকে একত্রিত করিয়াছিলেন।

পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের সময় ১২৭৮ বঙ্গাব্দে পাঁচটী শিশুপুত্র কন্যা রাখিয়া তাঁহার স্ত্রী কাদম্বিনী দাসী পরলোক গতা হন। তৎপর তিনি আর দারপরিগ্রহ করেন নাই। ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ৮ই পৌষ তাঁহার মৃত্যু হয়।

নবীনচন্দ্র দাস—একজন বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তা। ১২১৮ বঙ্গাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বলরাম দাস। তাঁহাদের আদি নিবাস সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত গোড্ডা মহকুমার অধীন কেড় নামক গ্রামে ছিল। নবীনচন্দ্র সেই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ঐ মহকুমারই অন্তর্গত লাহাটি নামক গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার রচিত বহু সংখ্যক পদ আছে। ১৩১২ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নবীনচন্দ্র দাস, কবি গুণাকর, এম, এ; বি, এল—তাঁহার জন্মস্থান চট্টগ্রাম। তিনি 'রঘুবংশ' 'কিরাতার্জ্জুনীয়' প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্য বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুবাদে মূলের প্রকৃতমর্ম্ম ও শব্দ সম্পদ অতি সুন্দররূপে রক্ষিত হইয়াছে।

নবীনচন্দ্র বড়দলৈ—আসামের প্রসিদ্ধ জননায়ক ও রাজনৈতিক নেতা। ১৮৭৫ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রায় বাহাদুর মাধবচন্দ্র বড়দলৈ আসাম সরকারের একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার ছিলেন। গৌহাটী ও কলিকাতায় নবীনচন্দ্রের শিক্ষা সমাপ্ত হয়। বি-এল উপাধি গ্রহণ করিয়া, তিনি গৌহাটীতে ওকালতি আরম্ভ করেন। তথা হইতে উকীল হইয়া তিনি কলিকাতায় আগমন করেন এবং কিছুকাল কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করেন। এই সময়েই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯১৫ সালে ডিব্রুগড়ে আসাম এসোসিয়েসনের যে বার্ষিক অধিবেশন হয়, নবীনচন্দ্র তাঁহার সভাপতি হইয়াছিলেন। এই সভায় তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতেই তাঁহার রাজনৈতিক মতামত সর্ব্ব প্রথম জানিতে পারা যায়। সেই সময় তিনি প্রগতিপন্থী উদারনৈতিক ছিলেন। ব্রহ্মদেশের "শান" জাতির অত্যাচার হইতে আসামকে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া, তিনি তখন ব্রিটিশের প্রশংসা করিয়াছিলেন। মিঃ ঘনশ্যাম বড়ুয়া (যিনি পরবর্ত্তীকালে আসামের প্রথম স্বায়ত্ত-শাসন মন্ত্রী হইয়াছিলেন) পদত্যাগ করিলে, তিনি আসাম এসোসিয়েশনের সম্পাদক নিযুক্ত হন। সেই সময় তিনি আসামের প্রত্যেক সভা সমিতি-তেই অগ্রণী ছিলেন। মণ্টেগু সাহেব তদন্ত করিবার জন্য যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন তিনি আসাম প্রদেশের কর্ত্তব্য বলার জন্য ডেপুটেশনের অন্যতম সদস্য হইয়া গিয়াছিলেন।

মণ্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার হইতে আসামকে বাদ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। তদানীন্তন আসাম গবর্ণর রেভাঃ বিটসন বেল সাহেব রিপোর্ট দিয়াছিলেন যে, আসাম সর্ব্বপ্রকারে পশ্চাৎপদ, অনুন্নত, অতএব

এই প্রদেশকে শাসন সংস্কারের গণ্ডী বহির্ভূত করিয়া রাখাই উচিত। এই মতবাদ খণ্ডন করিবার জন্য, ১৯১৮ সালে আসাম হইতে এক ডেপুটেশন লণ্ডনে প্রেরিত হইয়াছিল, নবীনচন্দ্র এই ডেপুটেশনের মুখপাত্র ছিলেন। এই কার্য্যে তিনি সাফল্য লাভও করিয়াছিলেন। ৺বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি তখন লণ্ডনে ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৯১৯ সালে অমৃতসহর কংগ্রেসে যোগদান করিবার পর, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার মত বদলাইয়া যায়। তিনি কংগ্রেসের সভায় যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে অপূর্ব্ব প্রেরণা জাগ্রত হয়। কংগ্রেস হইতে আসিয়া তিনি আসামের গণ আন্দোলনে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুসারে তিনি কাউন্সিল বর্জ্জন করেন। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিবার পর, তিনি ওকালতী ব্যবসায় বন্ধ রাখেন। তাঁহারই চেষ্টায় অসহযোগ আন্দোলন আসামের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই আন্দোলনের জন্য তিনি কারারুদ্ধ হন এবং অসহযোগ উপলক্ষে তিনিই আসামে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সময় কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন।

স্বরাজ্য দল গঠিত হইবার পর, তিনি আসাম কাউন্সিলে প্রবেশ করেন এবং স্বরাজ্য দলের নেতা নির্ব্বাচিত হন। কাউন্সিলে তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া সরকার পক্ষ পর্য্যন্ত বিব্রত হইতেন।

১৯২২ সালে আসামে অহিফেনের প্রচলন সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য কংগ্রেস হইতে এক কমিটি নিযুক্ত করা হয়। তিনি ঐ কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং সদস্যরূপে কমিটির যথেষ্ট কাজ করিয়া কংগ্রেসী মহলের ধন্যবাদ অর্জ্জন করেন।

১৯২৬ সালে গৌহাটীতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। কংগ্রেসকে সাফল্য মণ্ডিত করিবার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট কায়িক পরিশ্রম এবং নানা কারণে যথেষ্ট অর্থ দানও করিতে হইয়াছিল। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে কাউন্সিল বর্জ্জন প্রস্তাব গৃহীত হইলে, তিনি আসাম কাউন্সিল হইতে স্বরাজ্য দলের নেতা হিসাবে পদত্যাগ করেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইলে, তিনি পুনরায় কারাবরণ করেন। আসামের প্রত্যেক কংগ্রেসী আন্দোলনেই তিনি পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইতেন।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বা-

চনে তিনি আসাম উপত্যকার প্রতিনিধি পদে বিপুল ভোটাধিক্যে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। পরিষদে যাইয়া তিনি আসামের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে মুক্তকণ্ঠে মত প্রকাশ করিতেন। পরিষদে বাজেট আলোচনা সম্পর্কে আসামের অভাব অভিযোগের কথা উল্লেখ করিয়া অহিফেন প্রচলনের বিষয়ে অতি আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচনে তিনি কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া নির্ব্বাচিত হন। পরিষদের প্রথম অধিবেশনের প্রারম্ভে তিনি শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর অন্তরীণের প্রতিবাদ কল্পে পরিষদের কার্য্য স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিয়া যে বক্তৃতা করেন, ষ্টেটসম্যান পত্রিকাও ইহার প্রশংসা করিয়াছিল। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিবার জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। কিন্তু তাঁহার সেই আগ্রহ পুর্ণ হয় নাই।

আসামের বহু সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। তিনি কিছুদিন গৌহাটী লোকাল বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৪ সালে জোড়হাটে আসামের সর্ব্বপ্রথম কৃষক ও রায়ত সম্মিলন হয়। তিনি ইহার সভাপতি হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ১৯২৫ সালে শিবসাগরে অসমীয়া ছাত্র সম্মেলনেও তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার দৃঢ়তা, আদর্শনিষ্ঠা, বিচক্ষণতা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইতেন। ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ৩রা ফাল্গুন (১৯৩৬ খ্রীঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারী) তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল।

নবীনচন্দ্র ভাস্কর—মধ্যযুগে তিনি একজন বিখ্যাত প্রস্তর শিল্পী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। রাঢ় অঞ্চলে তাঁহার নির্ম্মিত অনেক পাথরের দেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

নবীনচন্দ্র মিত্র, ডাক্তার—লক্ষ্ণৌ প্রবাসী একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী চিকিৎসক। ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দের ২৭শে আগষ্ট (১২৪৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র) চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত নৈহাটী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রামনাথ মিত্র হুগলী আদালতের আইন ব্যবসায়ী ছিলেন।

নবীনচন্দ্র প্রথমে চুঁচুড়ার ফ্রি চার্চ্চ ইনষ্টিটিউটে (Free Church Institute) শিক্ষা লাভ করেন। উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ডাক্তার ম্যাগর ওফাইফ সাহেব তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতেই তিনি মনুষ্যোচিত সদ্‌গুণরাশির প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি ঐ বিদ্যালয় হইতেই জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতে মনস্থ করেন; কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলিয়া কলেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে কলেজে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করেন নাই। মেডিকেল কলেজে অনুমতি প্রাপ্ত না হওয়ায় এবং অভিভাবকগণের অনুরোধে তিনি শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিবার জন্য Teachers' Certificate পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু পর বৎসর তিনি অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে মেডিকেল কলেজে প্রবেশাধিকার লাভ করেন এবং উৎসাহের সহিত অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় রসায়ন শাস্ত্রে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং দুইটী প্রথম শ্রেণীর নিদর্শন পত্র, স্বর্ণপদক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটী বৃত্তি লাভ করেন। খ্যাতনামা বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার সমপাঠী ছিলেন। রসায়নই তাঁহার জীবনের প্রধান অধীতব্য বস্তু ছিল। পাঠ্যাবস্থায় তিনি কোনও কোনও সময় ভয়ানক অর্থাভাবে পতিত হইয়াছিলেন। তৎফলে একবার তিনি পুরস্কার প্রাপ্ত স্বর্ণপদকগুলির একটি বিক্রয় করিতে বাধ্য হন।

১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে তিনি প্রথমে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কালনার রাজচিকিৎসালয়ের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এই কার্য্যে অতিশয় যোগ্যতা ও নৈপুণ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহার অত্যল্পকাল পরে তিনি বর্দ্ধমানের মহারাজা মহাতাবচাঁদের সঙ্গে পশ্চিমোত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। কালনায় তিনি ছয় বৎসরকাল চাকরী করিয়াছিলেন। কালনায় থাকার কালে তিনি বঙ্গের খ্যাতনামা কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তথাকার প্রধান প্রধান ডাক্তার কবিরাজগণও তাঁহার পূর্ব্বে কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা করিয়া রোগ নিরাময় করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের পরামর্শেই কবিরাজ মহাশয় কলিকাতা আসিয়া বাস করিতেছিলেন। যখন Drainage Commission এবং "Opium and Hemp Drugs Commission" কালনায় উপস্থিত হয়। তখন তাঁহাকে এবিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সাক্ষ্য অতিশয় মূল্যবান বলিয়া কমিশনকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি লক্ষ্ণৌ Kings Hospital এর ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি সুনামের সহিত ঐ কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। এই সময়ের মধ্যে ১৮৮৬ খ্রীঃঅব্দে তিনি দুই বৎসরের

জন্য গোঁড়ায় বদলি হইয়াছিলেন। তিনি চল্লিশ বৎসরকাল লক্ষ্ণৌতে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার যশোরাশি এরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে, কোন দুরারোগ্য ব্যাধি হইলে জনসাধারণ সেখানের সিভিল সার্জ্জনকে না ডাকিয়া, তাঁহাকে ডাকিতেন। তিনি সেখানে জনসাধারণের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র হইয়াছিলেন। অনেক ইউরোপীয় ডাক্তার ও মুসলমান হাকীমগণ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তিনি যে সময় লক্ষ্ণৌতে গমন করেন, তখন সেখানে হাকিমী চিকিৎসারই অধিক প্রাধান্য ছিল। কারণ মুসলমানেরা এলোপ্যাথিক ঔষধে মদ্য মিশ্রিত থাকে বলিয়া, এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করাইতেন না। সেই জন্য লক্ষ্ণৌতে উহা ততটা প্রসার লাভ করিতে পারে নাই কিন্তু নবীনচন্দ্র সেখানে গমন করিবারপর তাঁহার চিকিৎসাগুণে, দক্ষতায় ও সৌজন্যে মুসলমানদের এই সংস্কার দূর হইয়াছিল এবং এলোপ্যাথিক চিকিৎসা বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। এমন কি স্বয়ং লক্ষ্ণৌর নবাব, উম্‌রা ও অন্যান্য প্রধান মুসলমানগণ আপনার ও পরিবারের চিকিৎসার জন্য নবীনচন্দ্রকে ডাকিতেন। নবাব ওয়াজীদ আলী খাঁ সাহেবের চিকিৎসক, দিল্লীর বাদশাহের বিখ্যাত ফয়জাবাদ নিবাসী হাকীমদ্বয় তাঁহার চিকিৎসাধীন হইয়াছিলেন। সিয়া সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরু এবং সিয়াধর্ম্মী অযোধ্যাধিপ গোপনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন। এণ্টনি ম্যাক ডোনাল্ডের শাসনকালে যখন প্লেগ ভীতি উপস্থিত হয় ও সরকারের প্রতি জনসাধারণ ভয়ানক অবিশ্বাসী হইয়া উঠে, তখন সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে অসংখ্য লোক সম্মিলিতভাবে ছোট লাটের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছিল। তাহাতে নবীনচন্দ্রের সম্বন্ধে এরূপ লিখা ছিল যে, তাঁহার প্রতি সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলেরই বিশেষ আস্থা আছে এবং তিনি যে ব্যাধিকে যথার্থ প্লেগ বলিয়া মত প্রকাশ করিবেন, তাহা জনসাধারণ অনাপত্তিতে গ্রহণ করিবে। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া কয়েকখানি উন্নত চরিত্রের উর্দ্দু উপন্যাস রচিত হইয়াছে এবং তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া পণ্ডিত রতননাথ তাঁহার উপন্যাসের প্রধান ব্যক্তিগণের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী ও ধর্ম্মে একেশ্বরবাদী ছিলেন কিন্তু কোন বিশেষ সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া কখনও নিজের পরিচয় দেন নাই।

নবীনচন্দ্র রায়, পণ্ডিত—একজন পঞ্জাব প্রবাসী খ্যাতনামা বাঙ্গালী শিক্ষাব্রতী ও জনহিতৈষী। অতি দীন অবস্থা

হইতে তিনি সমাজের উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সেই চাকরীর উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিয়া, নিরাশ্রয়ের ন্যায় তাঁহাকে অনেক স্থানে ভ্রমণ করিতে হয়। এমন কি পয়সার অভাবে অনেক সময়ে তাঁহাকে অনাহারে থাকিতে হইয়াছিল। এই দুরবস্থা হইতে তিনি স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায় বলে পঞ্জাবের অবৈতনিক বিচারপতি (Honorary Magistrate), জষ্টিস অব দি পীস ও ডেপুটি একাউন্টেন্ট জেনেরেলের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, পরীক্ষক ও ডেপুটি রেজিষ্ট্রার ছিলেন। ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে লাহোরে 'হিন্দু সভা' প্রতিষ্ঠিত হইলে, তিনি উহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি পঞ্জাব ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক এবং কালী বাড়ীরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পঞ্জাবের সর্ব্ববিধ উন্নতি কল্পে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় কয়েকজন বাঙ্গালীর চেষ্টায়ই পঞ্জাব শিক্ষা দীক্ষা ও নানা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে। তিনি পঞ্জাবে বিশিষ্ট নেতা ও জ্ঞানে অদ্বিতীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমান-ই-পঞ্জাব' সাহিত্য সভার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। তিনি হিন্দী সাহিত্য সমৃদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহারই কন্যা (বনলতা দেবীর মৃত্যুর পরে) অন্তঃপুর সম্পাদিকা হেমন্তকুমারী চৌধুরী পঞ্জাবে 'সুগৃহিনী' নাম্নী একখানি হিন্দী পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। নবীনচন্দ্র নিজেও কয়েক খানা হিন্দী পুস্তক লিখিয়াছেন। 'নবীন চন্দ্রোদয়' নামে তাঁহার রচিত একখানা হিন্দী ব্যাকরণও আছে। 'স্থিতিতত্ত্ব আউর গতিতত্ত্ব' (Elements of Statistic and Dynamics), 'জলস্থিতি জলগতি আউর বায়ুকাতত্ত্ব' (Elements of Hydraulics and Pneumatics) নামে দুইখানি বিজ্ঞান গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছেন। তিনি লাহোর ওরিএণ্টাল কলেজের অধ্যক্ষ (Principal) পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁহার বন্ধু সারদা বাবু উভয়ের চেষ্টাতেই স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী পঞ্জাবে গমন করেন। তাঁহারা এবং লাহোর ব্রাহ্ম সমাজ স্বামীজার প্রধান সহায়ক ছিলেন। পরে ব্রাহ্ম সমাজের সহিত স্বামীজার কোন কোন ব্যাপারে মতানৈক্য হওয়ায়, স্বামীজা 'আর্য্য সমাজ' নামে স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করেন। এইখানেই আর্য্য সমাজ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়। তিনি পঞ্জাবের সকল জনহিতকর কার্য্যেই ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্যও বিশেষ চেষ্টা করিতেন। 'নারী-

ধর্ম্ম' নামে একখানা গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার আর একটী বিশেষ কীর্ত্তি মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা। মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত খাণ্ডোয়া জিলায় তিনি বহু বিস্তৃত ভূমি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, চাকরীজীবী বাঙ্গালীর প্রতিভা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের-দিকে ফিরাইতে না পারিলে, এই জাতির সম্যক উন্নতি হইবে না। বিশেষতঃ অদূর ভবিষ্যতে তাঁহাদের চাকুরী দুর্লভ হইবে। এই সব চিন্তা করিয়াই তিনি খাণ্ডোয়া জিলায় জমি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, বহু বাঙ্গালী তথায় যাইয়া উপনিবেশন স্থাপন করিয়া বসতি করে এবং কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু তাঁহার আশা ফলবতী হয় নাই।

সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, তিনি মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত রতলামের মহারাজার মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। এই কার্য্যেও তিনি বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার সুব্যবস্থায় একদিকে যেমন রাজ্যের আয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি রাজ্যে শাসন সুশৃঙ্খলাও স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নবীনচন্দ্র সেন—প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি ও সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামে ১২৫৩ বঙ্গাব্দের ২৯শে মাঘ (১৮৪৬ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী) তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম গোপীমোহন রায় ও মাতার নাম রাজরাজেশ্বরী। গোপীমোহন রায় নয়াপাড়ার বিখ্যাত জমিদারবংশে সন্তান ছিলেন। তিনি প্রথমে চট্টগ্রামের পেস্কার পরে সেরিস্তাদার তৎপরে মুন্সেফ এবং অবশেষে উকীল হইয়াছিলেন। বৈষয়িক জীবনে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্র প্রথমে পাঠশালাতে শিক্ষা লাভ করেন এবং পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করিয়া চট্টগ্রামের উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তিনি মাতার আদুরে ছেলে ছিলেন এবং মাতার নিকট হইতে অত্যধিক প্রশ্রয় পাইয়া শৈশবেই অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিলেন। উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবেরজন্য বিদ্যালয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট শাসন করা হইত; কিন্তু তিনি শাসনেরও অতীত ছিলেন। এইজন্য বিদ্যালয়ে তিনি 'দুষ্টের শিরোমণি' (Wicked the great) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি চট্টগ্রামের উচ্চ বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা (Entrance) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা আসিয়া প্রেসিডেন্সী

কলেজে এফ-এ পড়িতে আরম্ভ করেন এবং উক্ত কলেজ হইতে ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে এফ-এ ও ১৮৬৮ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এক একটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে দেশের লোক অবাক হইত যে এমন দুষ্ট ছেলে কি করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। নবীনচন্দ্রের বংশের উপাধি রায়। ঢাকার নবাবকর্ত্তৃক তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ এই 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র তাঁহার একজন খুল্লতাত ভ্রাতার ভ্রান্তিতে এই সম্মানজনক উপাধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, 'রায়' সম্মানসূচক উপাধি নামের সঙ্গে আপনি ব্যবহার করিতে নাই। এই জন্য তিনি বিদ্যালয়ে 'রায়' উপাধির পরিবর্ত্তে সেন উপাধি লিখান এবং নিজের নামের সঙ্গে সেন ব্যবহার করিতে থাকেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ হুগলী জিলায় ত্রিবেণী নামক স্থানে বাস করিতেন।

এফ-এ পরীক্ষার একমাস পূর্ব্বে নবীনচন্দ্র বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা গোপীমোহন রায় অতিশয় পরোপকারী ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। এই জন্য প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও তিনি কিছুই সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। বি-এ পড়িবার সময় নবীনচন্দ্র পিতার নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। তিনি ছাত্র পড়াইয়া নিজের খরচ বহন করিতেন। এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতেন। তদুপরি বি-এ পরীক্ষার পূর্ব্বে ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন বৃহৎ সংসারের ভার তাঁহাকেই বহন করিতে হইয়াছিল। বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার কিছুকাল পরে প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। বাঙ্গালার নানা জিলায়, বিহার ও উড়িষ্যায় দীর্ঘকাল কার্য্য করিয়াছেন। তিনি যখন যে মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইতেন, সেইখানেই শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধান এবং নানাপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। এই সব কার্য্যের জন্য, তিনি প্রত্যেক স্থানেই বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

তিনি স্বভাব কবি ছিলেন। পঠদ্দশাতেই তিনি বিবিধ বিষয়ক কবিতা লিখিয়া অনেক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিতেন। তিনি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, সেই সময় প্যারীচরণ সরকার মহাশয় উক্ত কলেজে অধ্যাপনা করিতেন এবং তিনি এডুকেশন গেজেটের (Education Gazette) সম্পাদক ছিলেন। এই সূত্রে নবীনচন্দ্রের অনেক কবিতা এডুকেশন গেজেটে মুদ্রিত হয়। এবিষয়ে প্যারীচরণ তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন।

তিনি সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া প্রথমে যশোহরে গমন করেন। ঐ সময় যশোহরে শিশিরকুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষ মহাশয়গণ অমৃত-বাজার পত্রিকা কেবল মাত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেইখানে তাঁহাদের সহিত নবীনচন্দ্রের বিশেষ হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। যশোহরে এক বৎসর কার্য্য করিয়া তিনি মাগুরা বদলী হন এবং মাগুরা হইতে মহকুমার শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া তিনি ভবুয়া গমন করেন। ঐখানে ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার 'অবকাশ রঞ্জিনী' কাব্য প্রকাশিত হয়। তিনি সুকৌশলে আপনার জীবনের দুঃখের কাহিনী এই কাব্যে প্রকাশিত করেন এবং অবসর সময়ে রচিত বলিয়া এই কাব্যের এইরূপ নামকরণ করেন;

ভবুয়া হইতে তিনি জন্মভূমি চট্টগ্রামে আসেন। এখানে ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য প্রকাশিত হয়। এই কাব্য প্রকাশিত হইলে তিনি একজন প্রতিষ্ঠাবান লেখক বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত হন। তাঁহার সময়ে চট্টগ্রামে রোডসেসের নূতন ব্যবস্থা হয়। তিনি তাহাতে অনেক কিছু করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দের ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্তে চট্টগ্রামের বহুস্থান বিধ্বস্ত হয় এবং সমুদ্র প্লাবনে ও বিসূচিকা রোগে ৮০০০০ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেই সময় তিনি শাসক কর্ম্মচারীরূপে অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে বিপন্ন লোকদিগের যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম সরকারী বিদ্যালয়ের সম্পাদক (Secretary) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময় চট্টগ্রামে কলেজ ছিল না। তিনি ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির (Assistant Surgeon) মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া চট্টগ্রাম কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তখন উহা দ্বিতীয় শ্রেণীরকলেজ ছিল।

চট্টগ্রাম হইতে তিনি পুরীতে প্রেরিত হন। সেখানে কবি রঙ্গলালের সহিত তাঁহার পরিচয় ও বন্ধুতা স্থাপিত হয়। তাঁহার সময়ে পুরীর রাজা নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র সেসন আদালতে সরকার পক্ষে রাজার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা পরিচালনা করেন, বিচারে রাজা অপরাধী প্রতিপন্ন হইয়া দ্বীপান্তর দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি পুরীতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবের নানা প্রকার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি আরও অনেক স্থানে বদলী হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার রচিত 'রঙ্গমতী' কাব্য, ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে 'রৈবতক' কাব্য এবং ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে 'কুরুক্ষেত্র' প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত আলিপুরে থাকাকালীন ক্রমে তাঁহার 'চণ্ডী', 'গীতা', 'খ্রীষ্ট', 'অমিতাভ' ও 'প্রভাস' কাব্য প্রকাশিত

হয়। পরে তৃতীয়বার চট্টগ্রামে যাইয়া তিনি তাঁহার শেষ কাব্য 'ভানুমতী' রচনা করেন। তিনি যখন ফেণীতে বদলী হন, তখন ফেণীসহরের অবস্থা অতিশয় খারাপ ছিল। তিনি অনেকগুলি সরকারী আপিস আদালতের গৃহ নির্ম্মাণ, পুরাতন দীর্ঘিকা সংস্কার প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা ফেণী সহরের যথেষ্ট উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ থাকাকালীন অসুস্থ হন এবং সরকারী কার্য্য ত্যাগ করিয়া অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। ময়মনসিংহ হইতে চট্টগ্রামে আসিয়া তিনি চট্টগ্রামেরই নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১০ই মাঘ (১৯০৯ খ্রীঃ অব্দের ২৩শে জানুয়ারী) সেইখানে তিনি পরলোক করেন। তিনি 'আমার জীবন' নামে স্বীয় জীবন চরিত পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি তেজস্বী, স্বদেশ প্রেমিক ও পরোপকারী ছিলেন। পরোপকারের জন্য স্বদেশ প্রেমের জন্য এবং নিজের বিবেক অনুযায়ী কার্য্যের জন্য তিনি অনেকবার বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি মোট চৌদ্দখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। যতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে ততদিন তাঁহার নাম স্বর্ণ অক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে।

নবীন পণ্ডিত— একজন গ্রন্থকার। ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'সারাবলী' নামক একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকের বিষয়বস্তু মহাভারত, কেট্‌লী প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস, মার্শমানের ইতিহাস, ষ্টুয়াটের বাঙ্গালার ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

নয়চন্দ্র সূরী—একজন জৈন পণ্ডিত। তাঁহার গ্রন্থের নাম—হম্মীর মহাকাব্য।

নয়নপাল—সম্বৎ ৫২৬ (খ্রীঃ ৪৭০) অব্দে কনোজ রাজ্য অধিকার করেন। সেই সময় হইতে রাঠোরগণ কামধ্বজ উপ নামে আত্ম পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। নয়নপাল পদারৎ নামে একটি পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত পদারতের পুত্র পুঞ্জ।

নয়নশ্রী—একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত। সমন্তভদ্র রচিত 'চতুরঙ্গ সাধন টীকা' নামক একখানি বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থ তিনি তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডুতে তিনি অবস্থান করিতেন।

নয়নাদেবী—তিনি আসামের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের পুষ্য বংশীয় নরপতি স্থিতবর্ম্মার মহিষী ছিলেন। স্থিতবর্ম্মা ও পুষ্যবর্ম্মা দেখ।

নয়নানন্দ দাস—একজন বৈষ্ণব পদকর্ত্তা ও গ্রন্থকার। তাঁহার পূর্ব্ব নাম ধ্রুবানন্দ মিশ্র। তিনি মুর্শিদাবাদ জিলার কান্দী মহকুমার অধীন ভরত-

পুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বাণীনাথমিশ্র। তিনি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র ও মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। নীলাচলে গমনকালে গদাধর পণ্ডিত তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ গোপীনাথের সেবার ভার ধ্রুবানন্দের উপর অর্পণ করিয়া যান। গৌরাঙ্গের লীলা দর্শন মাত্রই তিনি তাহা পদ্যে বর্ণনা করিতে পারিতেন। তাঁহার অত্যাশ্চার্য্য কবিত্ব শক্তি দেখিয়া গৌরাঙ্গদেব ও গদাধর পণ্ডিত তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং গদাধর পণ্ডিত তাহার নাম নয়নানন্দ রাখেন। ১৫৮২ খ্রীঃ অব্দে খেতুরীতে নরোত্তম দাস কর্ত্তৃক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার মহোৎসবে তিনি গমন করিয়াছিলেন। তিনি বহু সংখ্যক পদ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার প্রকাশিত পঁচিশটি ও অপ্রকাশিত একাত্তরটি পদ পাওয়া গিয়াছে। 'প্রায়োভক্তি রসাম্বর' নামে তিনি একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা এখনও ভরতপুরে বাস করিতেছেন।

নয়নানন্দ শর্ম্মা—অমরকোষের একজন টীকাকার। গ্রন্থের নাম কৌমুদী।

নয়নারায়ণ—তিনি পঞ্জাবের অধিবাসী। তিনি সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সমসাময়িক বড় লোকেরা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবত ও হরিবংশ হইতে বীর কাহিনী সকল সংগ্রহ করিয়া ফার্সী ভাষায় 'গুলশান-ই-রাজ' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১৭২৬ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহের সময়ে তিনি পরলোক গমন করেন।

নয়পাল—তিনি বঙ্গের পালবংশীয় প্রথম বিগ্রহ পালের পুত্র। সম্ভবতঃ নয়পাল ১০২৫ খ্রীঃ অব্দে রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নয়পালের সময়ে জগদ্বিজয়ী চেদিরাজ কর্ণদেব বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নগর অধিকার করিতে না পারিয়া কতকগুলি বৌদ্ধ বিহার ও মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন। পরে নয়পালের সেনা জয়লাভ করিলে, অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মধ্যস্থতায় তাঁহাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। অধিকন্তু পরে কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীকে নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল বিবাহ করিয়াছিলেন। নয়পাল দেবের চতুর্দ্দশ রাজ্যাঙ্কে রাজমহিষী উদ্দাকার ব্যয়ে লিখিত একখানি 'পঞ্চরক্ষা' নামক গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা এক্ষণে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে আছে। সম্ভবত তিনি বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া ১০৪৫ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা চক্রপাণি দত্তের পিতা নারায়ণ,

মহারাজা নয়পালের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। জনার্দ্দন মন্দিরের প্রশস্তি রাজবৈদ্য সহদেবকর্ত্তৃক এবং গদাধর মন্দিরের প্রশস্তি বৈদ্য বজ্রপাণিকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। ইহাতে বুঝা যায় নয়পালের সময়ে বৈদ্য জাতির বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। নয়পালের সময়ে বিক্রমপুরবাসী অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নালন্দ বিহারের সঙ্ঘস্থবির ছিলেন। পরে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ তীব্বতে গমন করেন। নয়পালের উৎসাহে বৌদ্ধ তান্ত্রিক মত গৌড়ে যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল।

নয়বিজয় সূরী—হির বিজয়সূরীর শিষ্য কল্যাণ বিজয়, তৎশিষ্য লাভ বিজয়। এই লাভ বিজয় সূরীর শিষ্য নয় বিজয় সূরী। তাঁহার শিষ্য যশো-বিজয় গণি। তাঁহারা সকলেই প্রসিদ্ধ জৈন দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

নয়সেন দত্ত—প্রাচীন পুথী হইতে জানা যায় যে কাঁউসেন দত্তের পুত্র নয়সেন দত্ত পৃথিবীতে শিবের ব্রত প্রচ-লন করেন।

নর—(প্রথম) কাশ্মীরের একজন রাজা। তাঁহার অন্য নাম কিন্নর। তিনি কাশ্মীরপতি দ্বিতীয় বিভীষণের পুত্র। এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁহার স্ত্রীকে হরণ করিয়াছিল বলিয়া, সেই রাগে তিনি হাজার হাজার বৌদ্ধ বিহার পুড়াইয়া ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। তিনি বিতস্তা নদীর তীরে একটী সুন্দর নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই নগরে সুশ্রবা নামে এক নাগ বাস করিতেন, তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা চন্দ্রলেখাকে বিশাখ নামক এক ব্রাহ্মণ কুমার বিবাহ করেন। কিন্তু রাজা নর চন্দ্রলেখার রূপে মুগ্ধ হইয়া প্রথমে নানা কৌশলে তাঁহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ইহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া, তিনি সসৈন্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হন। বিশাখ তখন চন্দ্রলেখাকে সঙ্গে করিয়া স্বীয় শ্বশুর সুশ্রবার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুশ্রবা স্বীয় জামাতা বিশাখের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সসৈন্যে কিন্নর নগরী আক্রমণ করিয়া রাজা নরকে নিহত করেন। নরের অত্যা-চারে কিন্নর নগরী একেবারে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। তিনি ৯৯২—৯৫২ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ধ্বংশ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার পুত্র সিদ্ধ কাশ্মীরের রাজা হইয়াছিলেন।

নর—(দ্বিতীয়) কাশ্মীরের একজন রাজা। তিনি কাশ্মীরপতি বসুনন্দের পুত্র। ৪৮৯—৪২৯ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত ষাট বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র অক্ষ রাজা হইয়া-ছিলেন।

নর—(তৃতীয়) অতি পূর্ব্বকালে কাশ্মীর প্রদেশের অন্তর্গত দার্ব্বাভিসার প্রদেশে ভরদ্বাজবংশীয় নর নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার নরবাহন নামে এক পুত্র ছিল। নরবাহনের পুত্র ফুল্ল, ফুল্লের পুত্র স্বার্থবাহন। তাঁহারা কাশ্মীরের উদয়রাজবংশের আদি পুরুষ।

নরক—তিনি আসামের প্রাচীনকালের একজন রাজা। পুরাণাদিতে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা আছে। (এ সম্বন্ধে জীবনী-কোষ ভারতীয় পৌরাণিক অংশ দ্রষ্টব্য)। নরকাসুরের পত্নী মায়া বিদর্ভরাজের কন্যা ছিলেন। তাঁহার রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে (বর্ত্তমান গৌহাটি) ছিল। পশ্চিমে রংপুরের সীমান্তবর্ত্তী করতোয়া হইতে পূর্ব্বে ডিব্রুগড়ের অন্তঃর্গত ডিক্রাং নদী পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তিনি যে একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। নরকাসুরের মৃত্যুর পরে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগদত্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন।

নরচন্দ্র—একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত, ১৫১৯ শকের (১৫৯৭ খ্রীঃ) পূর্ব্বে" নরচন্দ্র জ্যোতিষ বা পদ্ধতি" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ভুবনদীপ নামক গ্রন্থও তাঁহার রচিত।

নরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—একজন তান্ত্রিক উপাসক ও শ্যামা সঙ্গীত রচয়িতা। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়না থানার অধীন জয়্‌কৃদহ বা জাম্‌দো নামক গ্রামে অনুমান ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। তিনি অনেকগুলি উচ্চাঙ্গের ভাবপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক শ্যামা সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন।

নরচন্দ্র রায়, কুমার—একজন শক্তি সঙ্গীত রচয়িতা। কৃষ্ণনগরের রাজবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত শ্যামা সঙ্গীতগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

নরদেব নাথ—তিনি নাথ পন্থী সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধ পুরুষ। হঠযোগ প্রদীপিকায় যে চৌদ্দজন সিদ্ধনাথের উল্লেখ আছে, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

নরনারায়ণ—তিনি কোচবিহারের অধিপতি বিশ্ব সিংহের অষ্টাদশ পুত্রের অন্যতম। পিতার মৃত্যুর পরে ১৫২৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অসাধারণ পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজ তাঁহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। এই সেনাপতি যেমন পরাক্রমশালী ছিলেন, তেমনি অতিশয় দ্রুত গতিতে পরদেশ আক্রমণ করিয়া, অধিকার করিতেন। এইজন্য তাঁহার চীলা রায়' নামে একটী উপনাম ছিল। নরনারায়ণ এই ভ্রাতার সাহায্যে আসাম কাছাড় কামরূপ, জয়ন্তিয়া, ডিমাপুর

শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে কালা পাহাড় বহু হিন্দু মন্দির নষ্ট করিয়াছিল। ভূপতি নরনারায়ণ সেই সকল দেব মন্দির পুন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গৌহাটীর কামাখ্যা দেবীর মন্দিরও কালা পাহাড়ের হস্ত হইতে রক্ষা পায় নাই। নরনারায়ণ ১৫৫০ খ্রীঃ অব্দে কামাখ্যা দেবীর বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। মন্দিরের অভ্যন্তরে মহারাজ নরনারায়ণ ও তদীয় ভ্রাতা সেনাপতি শুক্লধ্বজের প্রতিমূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। তাঁহার সময়ে কোচবিহার রাজ্যের সীমা বহু দুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি ভুটানের দেবরাজকে ও পূর্ব্ব আসামের শান জাতীয় আহম রাজকে পরাজিত করিয়া, কর প্রদান করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার এক লক্ষ পদাতিক, চারি সহস্র অশ্বারোহী, বহু রণ হস্তী ও এক সহস্র রণপোত সর্ব্বদা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিত। বঙ্গের মুসলমান শাসনকর্ত্তারা বারবার এই রাজ্য আক্রমণ করিয়া পরে সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

নরপতি নরনারায়ণ অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহারই সময়ে প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ তাঁহার 'প্রয়োগ রত্ন মালা' নামক বিখ্যাত সংস্কৃত ব্যাকরণ ও রাম সরস্বতী শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ করিয়া যশ লাভ করিয়াছিলেন। সুদীর্ঘ ৫৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫৮৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত করেন। পূর্ব্বভাগে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেব নারায়ণ ও পশ্চিমভাগে কোচবিহারে তাঁহার একমাত্র পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন।

নরপতি—(১) ধারানগরবাসী আম্রদেবের পুত্র নরপতি একজন শাকুনশাস্ত্রবিদ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'নরপতি জয়াচর্য্যা' নামে একখানা শাকুনতন্ত্র ১০৯৭ শকে (১১৭৫ খ্রীঃ) রচনা করেন। তিনি জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। নরপতি জয়াচর্য্যা গ্রন্থের উপরে নরহরি ভূধর ও রামনাথ টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

নরপতি—(২) নরপতি নামে এক জ্যোতিষী পণ্ডিত ১৩৯৭ শকে (১৪৭৫ খ্রীঃ) 'গণিতসার' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

নরপতি—(৩) 'শৃগাল শকুন' নামক গ্রন্থ নরপতি কৃত।

নরবর্ম্মা—(১) নরপতি চন্দ্রবর্ম্মা সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে বঙ্গদেশ হইতে বাহ্লীক দেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগের আধিপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতা নরবর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন। তিনি ৪০৫ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনিও

স্বীয় অগ্রজের ন্যায় অতিশয় বলশালী ছিলেন।

নরবর্ম্মা—(২) চিতোরের রাণা অশ্বপ্রসাদের পরে ৯৭৭ খ্রীঃ অব্দে নরবর্ম্মা সিংহাসনে আরোহণ করেন।

নরবাহন—(১) কাশ্মীরের একজন রাজা। নর (তৃতীয়) দেখ।

নরবাহন—(২) তিনি কাশ্মীরের অধিপতি ক্ষেমগুপ্তের ও তদীয় মহিষী দিদ্দার অতি বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন। এমন কি তিনি স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়াও রাণীর উপকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহারই বুদ্ধি কৌশলে ও শৌর্য্যে, মহিমা ও পাটল নামক সেনাপতিদ্বয়ের বিদ্রোহে মহারাণী দিদ্দা পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ বিশ্বাসের পাত্রকেও যখন রাণী অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন, তখন নরবাহন অভিমানে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

নরবাহন—(৩) একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'রসানন্দ কৌতুক'।

নরবাহন—(৪) চিতোরের একজন রাজা। খ্রীঃ নবম শতাব্দীর শেষ অংশে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

নরশঙ্কর—তিনি আসামের অন্তর্গত বিশ্বনাথ নামক স্থানের অদূরে প্রতাপগড় নামক নগরের রাজা ছিলেন। তাঁহার অপর নাম নাগাখ্য ছিল। তিনি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। প্রতাপগড়ে এখনও একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তৎপরে মিমং, গজং, শ্রীধর ও মৃগং নামে আরও চারিজন রাজা তথায় বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারা দুই শতাধিক বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

নরশনায়ক— দাক্ষিণাত্যের শুলুব রাজবংশের তিনি স্থাপন কর্ত্তা। তাঁহারই পুত্র বীর নরসিংহ ১৫০৫ খ্রীঃ অব্দে পিতার মৃত্যুর পরে রাজ্য লাভ করেন।

নরসিংহ—(১) একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত 'গ্রহদীপিকা' নামক জাতক এবং 'বর্ষফল' নামক গ্রন্থদ্বয় তাঁহার রচিত।

নরসিংহ—(২) তিনি একজন বাস্তু শাস্ত্রকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম নারসিংহ তন্ত্র।

নরসিহ—(৩) তিনি প্রথমে মণিপুরের বিখ্যাত শৌর্য্যশালী নরপতি গম্ভীর সিংহের বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। ১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দে গম্ভীর সিংহ পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র চন্দ্রকীর্ত্তি তৎকালে এক বৎসরের শিশু ছিলেন। ধর্ম্ম পরায়ণ সেনাপতি নরসিংহ সেই শিশু রাজাকেই সিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং অভিভাবক স্বরূপ রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন। ১৮৩৫ সালে গবর্ণমেণ্ট 'মনিপুর লেভী' নামক সৈন্যদল সম্পূর্ণভাবে মনিপুরপতির হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক মনিপুরে একজন পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্ত করেন। ১৮৪৪

খ্রীঃ অব্দে এক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার পত্নী ও বর্ত্তমান রাজার মাতা নবীন সিংহ নামক এক ব্যক্তির প্রণয় পাত্রী ছিলেন। রাণী, বিশ্বস্ত সেনাপতি নরসিংহকে হত্যা করিয়া স্বীয় প্রণয়ী নবীনসিংহকে তৎস্থানে স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন। এক-দিন সন্ধ্যাকালে সেনাপতি নরসিংহ দেবতা প্রণাম করিতেছিলেন। এমন সময়ে দুর্ম্মতি নবীনসিংহ তাঁহাকে আক্রমণ করে। সেনাপতির লোককর্ত্তৃক পাপীষ্ঠ ধৃত হইল। পরে বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। রাণী এই সংবাদ শ্রবণমাত্র স্বীয় বালক পুত্রসহ কাছাড়ে পলায়ন করিলেন। সেনাপতি রাজ-ভবনে গমনপূর্ব্বক রাণীর কার্য্য কলাপ শ্রবণ করিয়া, স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তৎপরে সুনিয়মে ও প্রবল বিক্রমে ছয় বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া ১৮৫০ সালে তিনি পরলোক গমন করিলেন। তদনন্তর তাঁহার ভ্রাতা দেবেন্দ্রসিংহ, সিংহাসনে আরোহণ করেন। এদিকে চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ সপ্তদশ বৎসর বয়ক্রমকালে স্বীয় বাহুবলে পৈত্রিক সিংহাসন অধিকার করিলেন। দেবেন্দ্রসিংহ মাত্র তিন মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ অতিশয় দক্ষতার সহিত পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে পর-লোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র সুরচন্দ্র সিংহ রাজা হন। তাঁহারই সময়ে মণিপুর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের ফলে টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতির প্রাণ দণ্ড হয়। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট মণিপুর সিংহা-সনে নরসিংহ মহারাজের প্রপৌত্র চূড়া-চাঁদ সিংহকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনিই মণিপুরের বর্ত্তমান রাজা।

নরসিংহ—(৪) মান্দ্রাজ প্রদেশান্তর্গত চন্দ্রগিরির অর্দ্ধ স্বাধীন শাসনকর্ত্তা শুলুব-বংশীয় নরসিংহ, বিজয়নগরের হরিহরের বংশধরকে পরাস্ত করিয়া ১৪৮৬ খ্রীঃ অব্দে বিজয় নগর রাজ্য অধিকার করেন। তাঁহার সময়ে বিজয় নগর রাজ্যের সীমা সমধিক বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি দক্ষিণের সমস্ত তামিল ভূভাগ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। তিনি যেমন রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তেমনি রাজ্যে সুশৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থাও স্থাপন করিয়া-ছিলেন; তাঁহার যশ চতুর্দ্দিকে এমনই পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল যে, সমস্ত বিজয় নগর রাজ্য তাঁহার নামে 'নরসিংহ রাজ্য' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

নরসিংহ কবিরাজ—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত। তিনি 'চরকতত্ত্ব প্রকাশ কৌস্তুভ' নামে চরক সংহিতার একখানা উৎকৃষ্ট টীকা, 'সিদ্ধান্ত চিন্তামণি' নামে নিদান গ্রন্থের একটী টীকা ও 'মধুমতী নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সকল গ্রন্থদ্বারা তিনি সুপরিচিত।

নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য—মগধের গুপ্তরাজ বংশীয় সম্রাট স্কন্দ গুপ্তের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং স্থির গুপ্তের (নামান্তর পুর গুপ্ত) পুত্র। তাঁহার সময়ে হুন জাতীয় তোরমাণ উত্তর পশ্চিম ভারতে এক প্রবল পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য, গুর্জ্জরাধিপতি ভটার্ক ও অন্যান্য সামন্ত রাজগণের সাহায্যে তোরমাণকে সিন্ধু-নদের পশ্চিমপারে দূর করিয়া দেন। কিন্তু তোরমাণের পুত্র মিহিরকুল পুনরায় পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। নরসিংহ গুপ্ত, যশোধর্ম্মদেব প্রমুখ সামন্ত রাজগণের সাহায্যে মিহিরকুলকে এক মহাযুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং মিহিরকুল বন্দী হন। (আনুঃ ৫২৮ খ্রীঃ)। নরসিংহ গুপ্তের পর দ্বিতীয় কুমার গুপ্ত অল্প কিছুদিন রাজত্ব করেন।

নরসিংহ দত্ত—খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী ও জননায়ক। ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দে হাওড়া নগরে তাঁহার জন্ম হয়। হাওড়া জিলা স্কুল হইতে ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেন। ক্রমে আইন পরীক্ষায় (B L) কৃতকার্য্য হইয়া প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। পরে হাওড়ায় থাকিয়া হুগলী জিলা আদালতে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। আইন ব্যবসায়ে তিনি অল্পকাল মধ্যেই বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। বহু বিশিষ্ট সম্পত্তিশালী ব্যক্তি এবং দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাঁহাকে স্থায়ীভাবে তাঁহাদের আইন সংক্রান্ত পরামর্শদাতা নিযুক্ত করেন। ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে তিনি হাওড়ার সরকারী উকীল (Public Prosecutor) নিযুক্ত হন। পরে তিনি নোটারি পাবলিক (Notary Public) নিযুক্ত হন। এই শেষোক্ত সম্মান অল্প কয়েকজন ভারতীয়ের ভাগ্যেই লাভ হইয়াছে।

কর্ম্মজীবনের সুদীর্ঘ দ্বাবিংশতি বৎসরকাল তিনি হাওড়া পুরতন্ত্রের (Municipality) একজন সদস্য ছিলেন। উহার মধ্যে ছয় বৎসরকাল উহার সহঃ সভাপতি (Vice-Chairman) হইয়াছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে হাওড়ায় পানীয় জলের কল স্থাপিত হয়। পুরতন্ত্রের সদস্যরূপে তিনি স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ, উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি বহু জনহিতকর কার্য্যে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। এই সকল বিবিধ জনসেবার পুরস্কারস্বরূপ ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টায় যে সকল জনহিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাদের মধ্যে রায়বাহাদুর চিন্তামণি দের

অর্থানুকূল্যে রামকৃষ্ণপুরের স্নানের ঘাট, রায়বাহাদুর মোহনলাল ক্ষেত্রীর অর্থ সাহায্যে শালকিয়ার স্নানের ঘাট, আই-আর বেলিলিয়স নামক হাওড়ার অধিবাসী একজন ইহুদী বণিকের সম্পত্তির অর্থে তন্নামীয় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ও দাতব্য ঔষধালয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। হাওড়ার টাউন হল প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে নির্ম্মিত হয়। এই সকল কারণে শাসনকর্ত্তৃপক্ষও তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন এবং জনসাধারণের মধ্যেও তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। শেষ জীবনে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকাল মৃত্যুতে, তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং ১৯১০ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে বেরিবেরী রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পরলোক গমনের পর গুণ মুগ্ধ হাওড়াবাসীগণ অর্থ সংগ্রহ করিয়া হাওড়া জিলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে তাঁহার নামে একটি বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। হাওড়া টাউন হলে তাঁহার তৈল চিত্র রক্ষিত আছে। হাওড়ার এককালীন শাসনকর্ত্তা ও নরসিংহবাবুর বিশেষ বন্ধু সার উইলিয়াম ডিউক (Sir William Duke) ঐ প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন।

নরসিংহ দাস—একজন পদকর্ত্তা ও গ্রন্থকার। তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন—'হংসদূত' 'দর্পণ চন্দ্রিকা' 'প্রেমদাবানল' ও 'পদ্মশৃঙ্গার'। 'হংসদূত' গ্রন্থখানি দাস গোস্বামী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থের ছন্দানুবাদ।

নরসিংহ দাস বা পাহাড়ী বাবা—এই মহাপুরুষ হিমালয়ের বরফাছন্ন প্রদেশের একটী গুহায় অবস্থান করিতেন। তিনি জটা শ্মশ্রুধারী ছিলেন, কৌপীন ও কতকগুলি ডুরি পরিধান করিতেন। সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করিতেন। এই সরল শিশু প্রকৃতি মহাপুরুষ, সকল বিষয়েই খুব সংযমী ছিলেন। আহারাদি সম্বন্ধে বলিতেন—সকল অবস্থায়ই সন্তুষ্ট থাকিবে। "কভি ঘি খানা, কভি মুঠিভর চানা, কভি চানাভি মানা"। দীর্ঘকাল হইল এই মহাপুরুষের তিরোধান হইয়াছে।

নরসিংহ দাসজী—একজন দাদুপন্থী ভক্ত। তাঁহার অনেক বাণী দাদুপন্থী ভক্তগণের বাণী সংগ্রহ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

নরসিংহ দেও বুন্দেলা, রাজা—তিনি বুন্দেল খণ্ডের রাজা মধুকর শাহের পুত্র। ১৫৯২ খ্রীঃ অব্দে পিতার মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজকুমার সলিমের (পরে দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীর) অধীনে অনেককাল কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি রাজকুমার সলিমের আদেশে, সম্রাট আকবরের বিশ্বস্ত মন্ত্রী আবুল ফজলকে হত্যা করিয়াছিলেন (১৬০২ খ্রীঃ)।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তিনি চারি হাজারী মসনবদার ছিলেন; মথুরা নগরে তিনি তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একটী দেব মন্দির নির্ম্মাণ করান। পরে সম্রাট আওরঙ্গজীব সেই মন্দির মসজিদে পরিণত করেন। ১৬২৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোকবাসী হন।

নরসিংহ দেব—(১)উড়িষ্যার অন্তর্গত খুর্দ্দার রাজা পুরুষোত্তমদেব ১৬৩০ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র নরসিংহ দেব রাজা হইয়াছিলেন। তিনি ১৬৫৫ সাল পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য এই সময়ে উড়িষ্যা মুঘল সম্রাটদের অধীনে ছিল। নরসিংহ দেবের পরে তাঁহার পুত্র ১৬৫৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত মাত্র এক বৎসর, তৎপরে বলভদ্র রাজা হইয়াছিলেন। এই বলভদ্র নরসিংহ দেবের ভ্রাতা, তিনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিয়া রাজা হইয়াছিলেন।

নরসিংহদেব—(২) তিনি মিথিলার অধিপতি হরসিংহ দেবের পুত্র। পিতার পিতার মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধীরমতী ও হারাদেবী নামে দুই মহিষী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে, তাঁহার বহু পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ধীরসিংহ মিথিলার রাজা হইয়া ছিলেন।

নরসিংহদেব গজপতি—উড়িষ্যাপতি প্রতাপ রুদ্রের রাজ্য বিধ্বস্ত হইলে দুইটী গজপতি নামধেয় রাজবংশের উদ্ভব হয়। উত্তর দিকের গজপতি বংশের রাজধানী খুর্দ্দা নগরে ছিল। দক্ষিণের গজপতিরা সম্ভবত বিজয় নগরের শুলুব বংশীয় ছিলেন। তিনি গোলকুণ্ডা কুতবসাহী বংশীয় মোহাম্মদ কুলী কুতব শাহের (১৫৮০-১৬১২খ্রী) সামন্ত নরপতি ছিলেন।

নরসিংহদেব—(প্রথম) তিনি উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নরপতি তৃতীয় অনঙ্গভীম দেবের মহিষী কস্তুরী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বাঙ্গালার নবাবেরা দিল্লীর অধীনতা ছিন্ন করিয়াছিলেন। ১২৪৩ খ্রীঃ অব্দে নরসিংহ বাঙ্গালার রাজধানী লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন। এই যুদ্ধে বহু মুসলমান নিহত হইয়াছিল। এই সময়ে রাঢ়ের অন্তর্গত সপ্তগ্রামের হিন্দু রাজারা তখনও স্বাধীন ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার পিতা অনঙ্গভীম দেব একবার বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। নরসিংহের আক্রমণকালে বাঙ্গালার নবাব ইজ্জউদ্দিন তুগ্রল প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও জয়লাভ করিতে পারিলেন না। নরসিংহের প্রবল আক্রমণে তিনি পরাজিত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করেন। বীরভূমের অন্তর্গত লখনার নামক স্থানের মুসলমান শাসনকর্ত্তা ফকির-উল-মুল্‌ক করিম উদ্দিন লঘ্রি, যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত

হইলেন। মুসলমানদের মধ্যে আত্ম কলহও এই পরাজয়ের অন্যতম কারণ। ইজ্জউদ্দিন তুগ্রলের এই বিপদ সময়ে, কমরউদ্দিন তৈমুর খাঁ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া, অধিকার করিলেন। দিল্লীর সম্রাট বুলবন মালিক ইক্‌তিয়ার উদ্দিন উজবেগকে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি একবার উড়িষ্যা আক্রমণ করেন (১২৩৭ খ্রীঃ)। প্রথম প্রথম তিনি জয়লাভ করিলেও শেষভাগে তিনি নরসিংহের সৈন্যকর্ত্তৃক এমন পরাজিত হইয়াছিলেন যে, আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাকে দিল্লীর সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। বোধ হয় ১২৫৫ খ্রীঃ অব্দে ইক্‌তিয়ার উদ্দিন শেষবার উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন, কারণ ১২৫৭ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। নরসিংহ কনার্কের সূর্য্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার ভগিনী চন্দ্রিকাকে হৈহয়বংশীয় পরমার্দ্দী বিবাহ করিয়াছিলেন। পরমার্দ্দী নরসিংহের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। পূর্ব্ব চালুক্যবংশীয় রাজরাজ নরসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। নরসিংহ ১২৬৪ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার মহিষী সীতাদেবীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথম ভানুদেব রাজা হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের মেদিনীপুর হাওড়া ও হুগলির বহুলাংশ তাঁহার রাজ্যান্তর্গত ছিল।

নরসিংহদেব—(দ্বিতীয়) ১ম নরসিংহের পুত্র ভানুদেব ১৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১২৭৯ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার চালুক্য বংশীয়া মহিষী জকল্লা দেবীর গর্ভজাত পুত্র দ্বিতীয় নরসিংহ রাজা হইয়াছিলেন, পিতার মৃত্যু-সময়ে তিনি অল্প বয়স্ক বালক ছিলেন। প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ বৈষ্ণব চুড়ামণি নরহরি তীর্থ তাঁহার অভিভাবক স্বরূপ বহু বৎসর রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ দ্বৈত বা মাধ্ব দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা আনন্দ তীর্থের শিষ্য ছিলেন। নরহরি তীর্থের পূর্ব্ব নাম রামশাস্ত্রী ছিল। দীক্ষার পরে তাহার নাম নরহরি তীর্থ হয়। নরহরি তীর্থ দেখ। নরসিংহ ১২৭৮—১৩০৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। বাঙ্গালার মুসলমান শাসনকর্ত্তা মঘিসউদ্দিন তুগ্রল, দিল্লীর সম্রাট গিয়াসউদ্দিন বুলবনের অধীনতা ছিন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। বুলবন, মঘিসউদ্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। মঘিসউদ্দিন উপায়ান্তর না দেখিয়া উড়িষ্যা বিজয় উপলক্ষ করিয়া বঙ্গদেশ ত্যাগ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, দিল্লীর সম্রাট বেশীদিন অপেক্ষা না করিয়াই বঙ্গদেশ ত্যাগ করিবেন, এবং তখন তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। কাজেও তাহাই হইল। ১২৮২ সালে মঘিসউদ্দিনের মৃত্যু হয়। ১২৯৬ সালে নরসিংহ উড়িষ্যা আক্র-

মণের প্রতিশোধ লইবার জন্য বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। এই আহবে নরপতি নরসিংহ জয়লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১৩০৬ খ্রীঃ অব্দে পরলোকগমন করিলে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ভানুদেব রাজা হইয়াছিলেন।

নরসিংহদেব—(তৃতীয়) উড়িষ্যার গঙ্গা-বংশীয় নরপতি দ্বিতীয় ভানুদেবের মহিষী লক্ষ্মী দেবীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ১৩২৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতা দ্বিতীয় ভানুদেবের মৃত্যুর পরে রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার কমলাদেবী, গঙ্গাম্বা ও কোম্মি দেবাম্বা নামে তিন মহিষী ছিল। কমলা দেবীর গর্ভে তৃতীয় ভানুদেব এবং কোম্মি দেবাম্বার গর্ভে সীতাদেবী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৩৫২ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র তৃতীয় ভানুদেব রাজা হইয়াছিলেন। এই সময়ে গঙ্গা-বংশীয়দের অতিশয় অবনতি হইয়াছিল।

নরসিংহদেব—(চতুর্থ) তিনি উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নরপতি তৃতীয় ভানুদেবের মহিষী হীরা দেবী হইতে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে উড়িষ্যার অতিশয় শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। ১৩৭৮ খ্রীঃ অব্দে ভানুদেবের মৃত্যুর পরে চতুর্থ নরসিংহ রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দুর্ব্বলতা দেখিয়া চতুর্দ্দিক হইতে রাজারা উড়িষ্যা আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে বঙ্গের মুসলমান শাসনকর্ত্তারাই প্রধান। ১৩৫৩ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালার নবাব সামস্‌উদ্দিন ইলিয়াস শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১৪২৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত চতুর্থ নরসিংহ উড়িষ্যার রাজা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। কখন তিনি কালকবলিত হন, তাহা জানা যায় নাই। মাদলা পঞ্জির মতে তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র চতুর্থ ভানুদেব রাজা হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি 'আকটা' 'আবটা' (পাগল) নামে সাধারণে পরিচিত ছিলেন।

নরসিংহ, দ্বিজ—একজন গ্রন্থকার। 'উদ্ধব সংবাদ' গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

নরসিংহ নাড়িয়াল—বঙ্গাধিপ বল্লাল সেনের অন্যতম সভাপণ্ডিত ভাস্কর বৈদান্তিক ছিলেন। তাঁহার পুত্র আরু ওঝা নাড়লী গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া নাড়িয়াল নামে খ্যাত হন। তাঁহারই বংশে নরসিংহ নাড়িয়াল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। দিনাজপুরে রাজা গণেশ তাঁহার গুণগ্রামে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে অমাত্য পদে বরণ করেন। তাঁহারই পরামর্শে রাজা গণেশ তদানীন্তন বঙ্গদেশের মুসলমান নবাব সামস্‌উদ্দিনকে নিহত করিয়া, সমস্ত বঙ্গদেশের স্বাধীন রাজা হন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে তিনি একজন অগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন। তাহা হইতেই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে কাপের

সৃষ্টি হয়। এই নরসিংহ নাড়িয়ালের পুত্র কুবের তর্কপঞ্চানন বা কুবেরাচার্য্য শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড়ের ব্রাহ্মণ নরপতি দিব্যসিংহের মন্ত্রী ছিলেন।

নরসিংহ বর্ম্মা—তিনি বল্লব বংশীয় একজন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি ৬৪০ খ্রীঃ অব্দে চালুক্য নরপতি বৃদ্ধ পুলকেশীকে (২য়) পরাস্ত করিয়া নিহত করেন।

নরসিংহ বাচস্পতি—ত্রিপুরা জিলার সদর মহকুমার অন্তর্গত চাপিতলা গ্রামের ভট্টাচার্য্য বংশে নরসিংহ বাচস্পতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ও তৎপুত্র হরিনারায়ণ তর্কবাগীশ প্রসিদ্ধ প্রাচীন নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন।

নরসিংহ ভট্ট—ধনুর্ব্বেদ চিন্তামণি নামক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

নরসিংহ মেহতা—গুজরাটের একজন খ্যাতনামা কবি। তাঁহাকে গুজরাটের আদি কবি বলিয়া অভিহিত করা হয়। তাঁহার জীবনের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া দুষ্কর। তাঁহার কার্য্য হইতে যে বিবরণটুকু পাওয়া যায় তাহা অতি সামান্য। কিন্তু ভাবের সম্পদে, ভাষার লালিত্যে ও শব্দের ব্যঞ্জনায় তিনি গুজরাটি সাহিত্যকে এক নূতনরূপ দান করিয়াছেন। তাঁহার নিপুণ হস্তে গুজরাটি ভাষা ও সাহিত্য এক নূতন শ্রী লাভ করিয়াছে।

তিনি বড় কাব্য রচনা করেন নাই। তাঁহার রচনা প্রধানতঃ পদাবলী। ভাষা ও ভাবের মাধুর্য্যে ঐ গুলি অতি অপরূপ। বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণব পদাবলীর মত তাঁহার পদাবলীর বিষয় বস্তুও শ্রীকৃষ্ণের জীবনলীলা।

তিনি খুব সম্ভব খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জুনাগড় অঞ্চলে এক নাগর ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পদাবলী বর্ত্তমান কালেও গুজরাটের পল্লীতে পল্লীতে বিশেষভাবে প্রচারিত। নরসিংহ মেহতা একাধারে কবি ও সাধক ছিলেন এবং সমসাময়িক গুজরাটের সামাজিক ইতিহাসের অনেক উপকরণ তাঁহার কবিতায় পাওয়া যায়।

নরসিংহ রায় জেনা—তিনি উড়িষ্যার রাজা গোবিন্দ বিদ্যাধরের পৌত্র ও চক্র প্রতাপের পুত্র। তিনি স্বীয় অত্যাচারী পিতাকে বধ করিয়া ১৫৫৭ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু সেনাপতি মুকুন্দ হরিশ্চন্দ্র এই পিতৃঘাতাকে বধ করিয়া, তাঁহার ভ্রাতা রঘুরাম জেনাকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। তিনি ১৫৫৭—১৫৫৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার সেনাপতি মুকুন্দ হরিশ্চন্দ্র রাজা হইয়াছিলেন।

নরসিংহ হয়শাল—তিনি ১১৪১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতা বৃত্তিদেবের মৃত্যুর পরে রাজা হইয়াছিলেন। এই সময়ে বিজ্জল নামে চালুক্য নরপতি তৈলপের

মন্ত্রী, বিদ্রোহী হইয়া চালুক্য রাজ্য অধিকার করেন। নরসিংহ চালুক্যপতির সামন্ত নরপতি ছিলেন। তিনি বিজ্জলের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। ১১৭৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র বীর বল্লাল রাজা হইয়াছিলেন।

নরসিংহার্জ্জুন—কয়ঙ্গলের অধিপতি (বর্ত্তমান কাঁকজোল সাঁওতাল পরগণার উত্তরাংশ ও পূর্ণিয়া জেলার দক্ষিণাংশ) নরসিংহার্জ্জুন বঙ্গের পালবংশীয় ভূপতি রামপালের অন্যতম সামন্ত নরপতি ছিলেন। কৈবর্ত্তরাজ ভীমের সহিত যুদ্ধে তিনি রামপালের অনুগমন করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ছিলেন।

নরসী মেহতা—একজন ভক্ত। তাঁহার অনেক বাণী দাদুপন্থী ভক্তগণের বাণী সংগ্রহ গ্রন্থে সংগৃহীত আছে।

নরহরি—(১) সম্রাট আকবরের রাজসভার একজন কবি। তাঁহার জন্ম ১৩০৫ ঈশাব্দে। তিনি ফতেপুর জেলার অশানি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। আকবরের রাজসভায় তিনি বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। আকবর রাজসভাতে বসিয়া প্রজাদের অভাব অভিযোগাদি শ্রবণ করিতেন। একদিন নরহরি রাজসভায় যাইতেছেন, এমন সময় একটী গাভী এক কসাইর নিকট হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পাল্কীর নিকট আশ্রয় লইল। কসাই গাভীটীকে নিতে আসিলে, তিনি গাভীর উপযুক্ত মূল্য দিয়া কসাইকে বিদায় করিলেন। তৎপর তিনি গাভীটীর কি ব্যবস্থা করিবেন, তাহা ভাবিতে ভাবিতে এক কবিতা রচনা করেন এবং তাহা একটী কাগজে লিখিয়া গাভীর গলায় বাঁধিয়া, দিয়া, তাহাকে রাজসভায় নিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে ছাড়িয়া দিলেন। গাভীটী এদিক সেদিক ঘুরিতে লাগিল। সম্রাট গাভীর গলায় কাগজ বাঁধা দেখিয়া, অমাত্যকে তাহা পাঠ করিতে বলিলেন। অমাত্য ইহা পড়িয়া রাজাকে শুনাইলেন। এই কবিতার অর্থ এইরূপ ছিল—যদি শত্রুও মুখে তৃণ রাখে, তবে বলবানেরা তাহাকে আর আঘাত করে না। আমরা তৃণ খাইয়া বাঁচিয়া থাকি, সর্ব্বদা নিরীহভাবে থাকি। আমরা প্রত্যহ অমৃতরূপ দুগ্ধ দান করি, নিজের বৎসের অংশ তোমাদেরে প্রদান করি, হিন্দুদেরে মধুর দুগ্ধ দিয়া তোমাদিগকে কটু দুগ্ধ দেই না। সকলকেই সমান ভাবে দুগ্ধ দিয়া থাকি। কবি নরহরি কহিতেছেন, 'হে সম্রাট শ্রবণ করুন, গাভী হাত যোড় করিয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছে, কি অপরাধে তোমরা আমাদিগকে বধ কর? আমরা আপনার চামড়া দিয়া তোমাদের উপকার করিয়া থাকি।'

কথিত আছে যে, এই ঘটনায় আকবর পরে আপনার রাজ্য মধ্যে

গোবধ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৬১০ খ্রীঃ অব্দে ১০৫ একশত পাঁচ বৎসর বয়েসে তিনি দেহত্যাগ করেন।

নরহরি—(২) তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম রাজনির্ঘণ্ট।

নরহরি—(৩) তিনি একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার। তিনি "নরপতি জয়চর্য্যা" নামক গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। উক্ত ব্যাখ্যাপ্লব টীকা ১৬৯৩ শকে (১৭৭১ খ্রীঃ) রচিত হয়।

নরহরি—(৪) বঙ্গের রাজা আদিশূর-কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত ভট্ট-নারায়ণেরবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ। নদীয়ার রাজবংশ তাঁহার বংশ হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে।

নরহরি—(৫) তিনি দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী। পরে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক কাশীতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাহার রচিত গ্রন্থের নাম 'বোধসার'। তিনি খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

নরহরি আচার্য্য—তিনি দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী এবং খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি যোগবাশিষ্ঠাদি শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া 'বোধসার' নামে একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পরে কাশীবাসী হইয়াছিলেন।

নরহরি চক্রবর্ত্তী—একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থকার। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী দেখ।

নরহরি তীর্থ—তিনি প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী মাধ্ব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আনন্দ তীর্থের শিষ্য ছিলেন। নরহরি একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। পূর্ব্বাশ্রমে তাঁহার নাম রামশাস্ত্রী অথবা শ্যাম শাস্ত্রী ছিল। স্বীয় গুরুর আদেশে দ্বিতীয় নরসিংহ দেবের (উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজা) রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। বহু বৎসর রাজ্য পরিচালন করিয়া গুরু দক্ষিণা স্বরূপ রাম বিগ্রহ লাভ করেন। এই বিগ্রহ তিনি স্বীয় গুরু আনন্দ তীর্থকে প্রদান করেন। আনন্দ তীর্থ ৮০ দিন এই বিগ্রহ অর্চ্চনা করিয়া স্বীয় অন্যতম শিষ্য পদ্মনাভকে প্রদান করেন। ছয় বৎসর পরে পদ্মনাভ ইহা নরহরি তীর্থকে অর্পণ করেন। তৎপরে নরহরি তীর্থ, আনন্দ তীর্থের অন্যতম শিষ্য মাধব তীর্থকে ইহ অর্পণ করেন। নরহরি তীর্থ গঞ্জাম জিলার শ্রীকূর্ম্মম নামক স্থানে যোগানন্দ নৃসিংহ দেবের মন্দির (১২৮১ খ্রীঃ ২৯ মার্চ্চের শনিবার) ১২০৩ শকাব্দের ১৫ই চৈত্র শনিবার উৎসর্গ করেন। ১৩২৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি মাধ্ব সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন এবং ১৩৩৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

নরহরি দাস, সরকার ঠাকুর—একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্ত্তা ও গ্রন্থকার। তিনি ১৪৭৮ খ্রীঃ অব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে বৈদ্যকুলে পদ্মদাস শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নারায়ণ দাস। নরহরির মুকুন্দদাস ও মাধবদাস নামে দুই জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মুকুন্দদাস তদানীন্তন গৌড়রাজের চিকিৎসক ছিলেন। বৈষ্ণবসমাজে কথিত আছে যে, নরহরি আজীবন অবিবাহিত ছিলেন। কিন্তু 'কুল পঞ্জিকা' গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, তিনি চৈতর বংশ সম্ভূত গরুড়ধ্বজ সেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চারি কন্যাও ছিল; কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি সকল শাস্ত্রেই পণ্ডিত ছিলেন। লোকানন্দ নামক একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বিচারে তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি চৈতন্য দেবের একজন মন্ত্রশিষ্য এবং অনুরক্ত নিত্যসহচর ছিলেন। নরহরি সর্ব্বদাই সখীভাবে আরাধ্য প্রভুর ধ্যান করিতেন এবং অনেক সময় সখীবেশেই বাহিরে চলা ফেরা করিতেন। বৈষ্ণব সমাজে তিনি রাধার প্রিয় সহচরী মধুমতী বলিয়া কথিত হইতেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম শ্রীখণ্ডে নিজ ভবনে গৌর নিতাই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং গৌরলীলার পদ রচনা করেন। 'ভক্তিচন্দ্রিকা পটোল' 'শ্রীকৃষ্ণ ভজনামৃত' 'ভক্তামৃতাষ্টক' 'নামামৃত সমুদ্র' ও 'গীত চন্দ্রোদয়' নামক কয়েকখানি উপাদেয় বৈষ্ণব গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'ভজনামৃত' নামে একখানি সিদ্ধান্তগ্রন্থও তিনি সংস্কৃত ভাষায় প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 'চৈতন্য মঙ্গল' গ্রন্থ প্রণেতা লোচন দাস তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তাঁহার আদেশেই লোচন দাস এই গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যও তাঁহার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁহার উপদেশাদি দ্বারাই শ্রীনিবাস আচার্য্য সাধন বিষয়ে অনেক অগ্রসর হইয়াছিলেন। নরহরি শ্রীখণ্ডের নিকটবর্ত্তী বড়ডাঙ্গার জঙ্গলে যাইয়া সাধন ভজন করিতেন। সেইস্থানে তাঁহার মৃত্যু তিথি উপলক্ষে প্রতি বৎসরই মেলা ও উৎসবাদি হয়। তিনি সুশ্রী ও সুগঠিত পুরুষ ছিলেন। ৯৪৭ বঙ্গাব্দের (১৫৪০ খ্রীঃ) অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

নরহরিদেব—নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ ও বর্দ্ধমানের অন্তর্গত রাজগঞ্জের প্রসিদ্ধ আখড়ার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নিম্বার্ক হইতে অধস্তন উনচত্বারিংশ শিষ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পঞ্জাবের সন্নিকটবর্ত্তী খাড়া নামক স্থান হইতে তিনি বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং বর্দ্ধমান জেলার

-অন্তর্গত রাজগঞ্জের নিকটবর্ত্তী বাঁকা নদীর তীরে একটী আখড়া স্থাপন করিয়া, বাস করিতে থাকেন। তাঁহার সঙ্গে একটী শ্রীশ্রী দামোদর জীউ বিগ্রহ ছিল। নরহরি এই বিগ্রহ উক্ত আখড়ায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাই রাজগঞ্জের বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ আখড়ার মূল ভিত্তি। তখন ঐ অঞ্চলে মুসলমান-দিগের অতিশয় প্রাধান্য ছিল। বর্দ্ধমানের তদানীন্তন মুসলমান সুবেদার একবার এই আখড়ায় শঙ্খধ্বনি করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু পরে নরহরির নানারূপ অলৌকিক কার্য্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি এই আখড়ার পূজা আরতিতে আর কোনরূপ বাধা প্রদান করেন নাই। সুখদেব গোস্বামী ও দয়ারাম গোস্বামী নামে তাঁহার দুইজন শিষ্য ছিলেন। নরহরি একশত এক বৎসর রাজগঞ্জের আখড়ায় অবস্থান করিয়া-ছিলেন। তৎপর শিষ্য সুখদেবকে উক্ত আখড়ার মহন্ত এবং তাঁহার উপর বিগ্রহের সেবা পূজাদির ভার অর্পণ করিয়া, তিনি অজ্ঞাত যাত্রা করিলেন। তাঁহার অন্যতম শিষ্য দয়ারাম গোস্বামী বর্দ্ধমান জেলারই উখড়া গ্রামে যাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্যদ্বারা প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেন এবং তথায় একটী আখড়া স্থাপন করিয়া, শ্রীশ্রীগোপাল বিগ্রহ ও শাল-গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই বর্ত্তমান উখড়া আখড়ার মূলভিত্তি। নরহরি দেব আজীবন নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী ছিলেন। নরহরি দেব হইতে রাজগঞ্জ আখড়ার বর্ত্তমান মহান্তগণ পর্য্যন্ত নামের তালিকা— ১। নরহরি দেব (আখড়ার প্রতিষ্ঠাতা), ২। সুখদেব গোস্বামী (প্রথম মহান্ত), ৩। উদ্ধব দেব, ৪। পুরুষোত্তম দেব, ৫। গোপাল দেব, ৬। লাড়লি শরণ দেব, ৭। নন্দ-কিশোর দেব, ৮। গিরিধারী শরণ দেব, ৯। মধুসূদন শরণ দেব, ১০। মনোহর শরণ দেব, (বর্ত্তমান মহান্ত)।

নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, মহারাজা বাহাদুর—কলিকাতার শোভাবাজারের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের সুযোগ্য বংশধর। তিনি মহা-রাজা নবকৃষ্ণের ঔরসজাত পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের সপ্তম পুত্র ছিলেন। ১৮২২ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে, (১২২৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন) তাঁহার জন্ম হয়। গৃহশিক্ষকের নিকট তাঁহার শিক্ষা-রম্ভ হয়। পরে তিনি হিন্দু কলেজেও শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৫৪ হইতে ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত সার ফ্রেডারিক হ্যালিডে (Sir Frederick Halliday) বাঙ্গালার ছোটলাট ছিলেন। দেশের শাসন কার্য্যে, অভিজাতবংশীয় যোগ্য যুবকদিগকে অধিকতর নিযুক্ত করি-বার জন্য, তিনি কতকগুলি বিশেষ পদ সৃষ্টি করেন। কুমার নরেন্দ্রকৃষ্ণ তরুণ বয়সেই ঐরূপ একটি পদে নিযুক্ত হন।

কয়েক বৎসর কাজ করিয়া তিনি পদ ত্যাগ করেন।

তাহার পর হইতে তিনি নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যে নিজের কর্ম্মশক্তি প্রয়োগ করেন। তিনি কলিকাতা পুরতন্ত্রের (Municipal Corporation) অন্যতম সভ্য; বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য (Fellow), মেয়ো হাঁসপাতালের পরিচালক সভার সদস্য; চব্বিশ পরগণা জিলাবোর্ডের সদস্য প্রভৃতি পদে মনোনীত থাকিয়া দীর্ঘকাল নানাভাবে দেশের ও দশের উপকার করেন। এসকল ভিন্ন তিনি অন্যতম অবৈতনিক বিচারপতি (Honorary Presidency Magistrate), বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার (Imperial Legislative Council) সদস্য; কয়েকবার বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার জমীদার সঙ্ঘের (British Indian Association) সভাপতি; কলিকাতার রাজকীয় পুস্তকাগারের (বর্ত্তমান Imperial Library) সহ সভাপতি প্রভৃতি সম্মানিত পদও অলঙ্কৃত করেন। কলিকাতাস্থিত "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার" তিনি প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন। এসকল ভিন্ন আরও বহু ক্ষুদ্র, বৃহৎ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন।

১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি "রাজা" এবং দুই বৎসর পরে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারত-সাম্রাজ্ঞী" (Empress of India) উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে "মহারাজা"; ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে কে-সি-এস্-আই (K. C. S. I.) এবং উহার চারি বৎসর পরে "মহারাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯০৩ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে (১৩০৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র) অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া বিচার বিভাগে উচ্চ পদ (জিলায় দায়রা বিচারপতি) লাভ করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্র গুপ্ত—গৌড়াধিপতি শশাঙ্কর অন্যনাম নরেন্দ্র গুপ্ত। শশাঙ্ক দেখ।

নরেন্দ্র দেব—তিনি কামরূপের অধিপতি ছিলেন। মৌখরীরাজ ভোগবর্ম্মার কন্যা বৎসদেবীকে নেপালের লিচ্ছবি বংশজাত শিবদেব বিবাহ করিয়াছিলেন। এই শিবদেবের পুত্র জয়দেব, কামরূপ-পতি নরেন্দ্র দেবের পৌত্রী ও হর্ষদেবের কন্যা রাজ্যমতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ সেন, রায় বাহাদুর—দেশহিতৈষী, সমাজসংস্কারক ও সংবাদ পত্র সেবী। ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী (১২৫০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন) কলিকাতার কলুটোলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হরিমোহন সেনের চতুর্থ পুত্র ও রামকমল সেনের পৌত্র। নরেন্দ্রনাথের চারি ভ্রাতাই জয়পুর রাজ-

সরকারে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন চাকরী গ্রহণ না করিয়া, আজীবন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিয়াছেন। হিন্দু কলেজে কিছুকাল শিক্ষা লাভ করিয়া তৎপরে তিনি কাপ্তেন পামারের নিকট গৃহেই শিক্ষা লাভ করেন। শৈশবকাল হইতেই তাঁহার সংবাদ পত্রে লিখিবার আকাঙ্ক্ষা দৃষ্ট হইয়াছিল। উনিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি আনলি (Anley) নামক এটর্ণীর আফিসে কার্য্য শিক্ষার জন্য প্রবিষ্ট হন। ঐ সময়ে কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' (Indian Field) নামক পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধাদি লিখিতেন এবং সেই সূত্রে তিনি ঐ পত্রিকার সহিত যুক্ত হন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্থিক সাহায্যে ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে ইণ্ডিয়ান মিরার নামক পাক্ষিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। মনোমোহন ঘোষ এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ নিয়মিতরূপে ইহাতে প্রবন্ধ লিখিতেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে মনোমোহন ঘোষ ইংলণ্ডে গমন করেন এবং নরেন্দ্রনাথ ইণ্ডিয়ান মিরারের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে এটর্ণী দলভুক্ত হন। সেই সময়ে নিজ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া ইণ্ডিয়ান মিরারের সম্পাদকতা করা তাঁহার পক্ষে অতিশয় কষ্টসাধ্য হইয়াছিল। সুতরাং সময় সঙ্কীর্ণতার দরুণ কিছুকালের জন্য তিনি ইণ্ডিয়ান মিরারের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করেন। সেই সময় পত্রিকাখানি সাপ্তাহিক হইয়াছিল। তৎপরে কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইণ্ডিয়ান মিরারকে দৈনিক পত্রিকায় পরিণত করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন নরেন্দ্রনাথ, কেশব সেনের সহিত একমত হইয়া, পুনরায় ইণ্ডিয়ান মিরারে যোগদান করিলেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তখন ইহার সম্পাদক ছিলেন; কিন্তু কিছুকাল পরেই নরেন্দ্রনাথ ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। পরে তিনি এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তিনি বিপুল সাহস প্রদর্শন করিতেন এবং রাজপুরুষদিগের ভয়ে,সত্য ঘটনা প্রকাশ করিতে কখনও ভীত হইতেন না। লর্ড ডাফরিণ যখন ভারতের বড়লাট (Governor General) ছিলেন, তখন ভারত সভা হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হইয়াছিল। আনন্দমোহন বসু, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ৩০।৩৫ জন সভ্য সেই অভিনন্দন পত্র লইয়া গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে গমন করিয়াছিলেন। সেইখানে

আনন্দমোহন বসু বড়লাটের সহিত সকলকে পরিচয় করাইয়া দিতে থাকেন। যখন নরেন্দ্রনাথের পরিচয় প্রদান করেন, অমনি লর্ড ডাফরিণ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইলেন এবং নরেন্দ্রনাথকে রূঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনাকে আফগানিস্থান সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ দিয়াছেন। তাঁহার নাম বলুন ?" তখন নরেন্দ্রনাথ তেজোভরে উত্তর করিলেন, ইহা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিনিধির রাজপ্রাসাদ এখানে আমি অপমানিত হইতে আসি নাই। কে আমাকে সংবাদ দিয়াছেন, তাহা বলিব না, তাহা বলা সম্পাদকীয় নীতিবিরুদ্ধ।" তাঁহার ভয়ানক তেজোময় উত্তর শুনিয়া লর্ড ডাফরিণ ক্রোধে অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন, উপস্থিত সকলেই মনে করিলেন বোধ হয় মারামারি হইবে। যখন ব্যাপার ঘোরতর আকার ধারণ করিবার উপক্রম হইল, তখন আনন্দমোহন বসু মহাশয় তাড়াতাড়ি অভিনন্দন পত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। অভিনন্দন পত্র পাঠ শেষ হইলে লর্ড ডাফরিণ তাহার উত্তর পাঠ করিলেন। এই অবসরে তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত হইল। তখন তিনি তাঁহার ত্রুটি বুঝিতে পারিলেন এবং নরেন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

১৮৯৭—১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য থাকিয়া দেশহিতৈষিতা ও তেজস্বিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সহিত সরকারের গোলযোগ হইলে, নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ আটাশজন প্রতিনিধি (Commissioner) পদত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে কেহ কেহ প্রতিনিধি পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু নরেন্দ্রনাথ সেই পদ আর গ্রহণ করেন নাই। তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের একজন প্রধান নেতা ছিলেন। ১৯০৫খ্রীঃ অব্দের ৭ই আগষ্ট টাউন হলের সভায় তিনি বয়কট (Boycott) প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং উহা গৃহীত হইয়াছিল। ১৯০৬খ্রীঃ অঃ ৭ই আগষ্ট গ্রিয়ার পার্কে বয়কটের বার্ষিক অধিবেশনে, তাঁহার সভাপতিত্বে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হইয়াছিল। ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে যাঁহারা বিলাতী লবণ ফেলিয়া দেওয়া এবং বিলাতী বস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়ার অপরাধে কারাদণ্ড ও শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ এক সভা হইয়াছিল। তিনি সভায় লাঞ্ছিতদের প্রত্যেককেই স্বহস্তে পদক (Medal) প্রদান করিয়াছিলেন।

তিনি যাহা ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন, তাহার সমর্থনে নির্ভীকভাবে চেষ্টা করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মও খ্রিসক্তি

তাঁহার প্রাণের বস্তু ছিল। বেঙ্গল থিয়োসফিকেল সোসাইটি তাঁহার নেতৃত্বাধীনেই পরিচালিত হইত। সমাজ সংস্কারের তিনি বিশেষ পক্ষপাতি ছিলেন। বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্য বিবাহ রহিত, সমুদ্র যাত্রা প্রভৃতি সংস্কার কার্য্য সাধনের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন। ১৮৭২—১৯০৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত পঁয়ত্রিশ বৎসরকাল তিনি নির্ভীকচিত্তে রাজনীতি চর্চ্চা করিয়াছেন। ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দের কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন। বহুকাল তিনি ভারত সভার সভাপতি ও রাজনীতিতে যাঁহারা উন্নতিশীল তাঁহাদের নেতা ছিলেন। পরে তিনি উন্নতিশীলদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি গীতা সভার সভাপতি ছিলেন। বিদেশে যাইয়া ভারতীয় যুবকগণ যাহাতে শিল্পাদি শিক্ষা করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ও অর্থ সাহায্যের জন্য কলিকাতায় একটি সমিতি আছে, তিনি ঐ সভারও সভাপতি ছিলেন। তিনি কলিকাতার সাহিত্য, সমাজ, নীতি ও ধর্ম্মসংস্কার, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি অনেকগুলি সভার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি বহু কার্য্যের সহিত সংযুক্ত ছিলেন, কিরূপে তিনি এত কার্য্য সম্পাদন করিতেন, তাহা ভাবিয়া লোকে বিস্মিত হইত। ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১১ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'সুলভ সমাচার' সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন। বাঙ্গালা সরকার এই পত্রিকার পঁচিশ হাজার খণ্ড ক্রয় করিতেন এবং এদেশের বিদ্যালয় ও অফিসাদিতে প্রেরণ করিতেন।

১৯১১ খ্রীঃ অব্দের ১লা জুলাই (১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১৬ই আষাঢ়) তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ (এটর্ণী) ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকা পরিচালনা করিতেন। ১৯১২ খ্রীঃ অব্দে সুলভ সমাচারের প্রকাশ বন্ধ হয়। নরেন্দ্রনাথ স্বীয় অধ্যবসায়, চিন্তাশীলতা, দেশানুরাগ, রাজভক্তি, পরোপকার, নির্ম্মল চরিত্র প্রভৃতি সদগুণের জন্য বঙ্গীয় সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রপ্রভা—তিনি রোহিতক দেশীয় নোন নামক এক বণিকের পত্নী ছিলেন। নোন কাশ্মীরের রাজা দ্বিতীয় প্রতাপাদিত্যের সময়ে (৬৩৭—৬৮৭ খ্রীঃ) প্রতাপপুর নগরে বাস করিত। রাজা প্রতাপাদিত্য বণিকপত্নীর রূপে মুগ্ধ হইলে, বণিক স্বীয় পত্নী নরেন্দ্রপ্রভাকে রাজকরে সমর্পণ করিয়াছিল। এই নরেন্দ্রপ্রভা হইতে রাজা প্রতাপাদিত্যের চন্দ্রাপীড়, তারাপীড় ও মুক্তাপীড় নামে তিন পুত্র জন্মে। রাজার মৃত্যুর পরে চন্দ্রাপীড় কাশ্মীরের অধীশ্বর হইয়া-

ছিলেন। রাজা ও রাণীর সদ্ব্যবহারে ও সৎকার্য্যে সকলেই তাঁহাদের এই গর্হিত আচরণের বিষয় ভুলিয়া গিয়াছিল।

নরেন্দ্র ভঞ্জ--তিনি উড়িষ্যার ভঞ্জ বংশীয় নরপতি পৃথ্বী ভঞ্জের তনয় ও দ্বিতীয় রণভঞ্জের পৌত্র। তিনি ভঞ্জ বংশীয় নরপতিদের এই শাখার শেষ নরপতি। কোট্ট ভঞ্জ দেখ।

নরেন্দ্র মাণিক্য--ত্রিপুরাধিপতি রামমাণিক্যের মৃত্যুর পরে, তাঁহার পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র রত্নমাণিক্য রাজা হইয়াছিলেন। এই বালক রাজাকে অপসারিত করিয়া তাঁহার পিতৃব্য নরেন্দ্র মাণিক্য সিংহাসন অধিকার করেন। (১৬৮২ খ্রীঃ)। কিন্তু নরেন্দ্র মাণিক্য অচিরে পরলোক গমন করিলে, রত্নমাণিক্য পুনঃ সিংহাসন অধিকার করেন।

নরেন্দ্রমোহন সাহা— একজন বিখ্যাত পাট ব্যবসায়ী। ১৮৭৫ সালের ২৬শে অক্টোবর ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত বিনানই গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাঙ্গালার ব্যবসায় ক্ষেত্রে তিনি একজন কৃতী পুরুষ ছিলেন। সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়া অল্প বয়সে সামান্য বেতনে হাওয়ার্থ কোম্পানীতে প্রবেশ করেন এবং সাধুতা, অধ্যবসায় ও অক্লান্ত কর্ম্মকুশলতায়, শীঘ্রই তিনি ঐ কোম্পানীর একজন অংশীদার হইয়াছিলেন। পাট সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহার অভিমত ও অভিজ্ঞতা, কেবল ভারতবাসী নহে, এদেশের এবং বিলাতের ইংরেজদেরও যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের দারুণ বেকার সমস্যা দেখিয়া তিনি সর্ব্বদাই ব্যথিত ছিলেন। এই সমস্যার যৎকিঞ্চিৎ সমাধান কল্পে তিনি বিভিন্ন নামে সাতটী পাট খরিদের কারবার নিজ মূলধনে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে চারিটি কারবারের লভ্যাংশ তিনি নিজে কখনও গ্রহণ করেন নাই। এই প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্ত মোকামে, প্রায় সাত শত বেকার লোকের অন্ন সংস্থান হইতেছে। তিনি যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, সেইরূপ নানা ক্ষেত্রে গোপনে তাহার সদ্ব্যবহারও করিয়া গিয়াছেন। নীরব দানেই তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন, দাতা হিসাবে খ্যাতি লাভের চেষ্টা করেন নাই। মাসিক আড়াইশত হইতে তিনশত টাকা তিনি দীর্ঘকাল যাবত দান করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি প্রায় বিশ হাজার টাকা নানা সৎকার্য্যে দান করিয়া গিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে না পারিলেও, তিনি নিজের চেষ্টায় ও অধ্যবসারের গুণে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীঃ অব্দের ১৩ই অক্টোবর (১৩৪২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন) এই শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী পরলোক গমন করিয়াছেন।

নরেন্দ্র সিংহ—জয়ন্তিয়ার রাজা। রাজেন্দ্র সিংহের মৃত্যুর পরে ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে নরেন্দ্র সিংহ, নামেমাত্র রাজা হন। প্রথমে ইংরেজ সরকার তাঁহার বৃত্তি দিতে অসম্মত হন। পরে শ্রীহট্টের কমিশনার তাঁহার দুরবস্থার কথা বিশেষভাবে জ্ঞাপন করিলে, তাঁহার মাসিক পাঁচ শত টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়। তিনি ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী নরসিংহ ও ছত্রসিংহ আর সেই বৃত্তি পান নাই।

নরেন্দ্রাদিত্য—(প্রথম) তিনি কাশ্মীরের অধিপতি গোকর্ণের পুত্র। খিঙ্খিল নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি ভূতেশ্বরের প্রতিষ্ঠা ও অক্ষয়িণীর স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ধার্ম্মিক রাজা ২৫১—২১৫ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র যুধিষ্ঠির রাজা হইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রাদিত্য—(দ্বিতীয়) তিনি কাশ্মীরের অধিপতি দ্বিতীয় যুধিষ্ঠিরের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম পদ্মাবতী। তিনি লক্ষ্মণ নামেও খ্যাত ছিলেন। নিজ নামানুসারে তিনি নরেন্দ্র স্বামী নামে এক শিব স্থাপন করিয়াছিলেন। পিতৃ মন্ত্রী বজ্রেন্দ্রের তনয় বজ্র ও কণককে সদ্ব্যবহারী দেখিয়া, মন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রাদিত্যের বিমলপ্রভা নামে এক মহিষী ছিলেন। মহাবাহু নরেন্দ্রাদিত্য ঘটনাবলীর ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য এক কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই প্রকার সুনিয়মে ১৮০—১৯৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তের বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া, তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রণাদিত্য কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

নরেশচন্দ্র, কুমার—একজন বিশিষ্ট শ্যামা সঙ্গীত রচয়িতা। নরচন্দ্র কুমার দেখ।

নরেশচন্দ্র চৌধুরী— নোয়াখালী জেলার একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী। ১৯০২ সালে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি এম-এ পাশ করিয়া নোয়াখালীর 'কুমার অরুণচন্দ্র হাই স্কুলে' শিক্ষকতার কার্য্যে নিযুক্ত হন। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার পরহিতব্রতের পরিচয় পাওয়া যায়। নোয়াখালী ছাত্র সংসদ প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। নোয়াখালীর বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। ১৯৩২ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে স্কুলের চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া, তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এই অপরাধে তাঁহার দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জেল হইতে বাহির হইবার পর হইতেই, তাঁহার যক্ষ্মারোগ দেখা দেয় এবং এই রোগেই তিনি ১৯৩৬ সালের ২০শে এপ্রিল চিতোর স্বাস্থ্যনিবাসে মাত্র ৩৪

বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন।

নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—একজন বিশিষ্ট শ্যামা সঙ্গীত রচয়িতা। নরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দেখ।

নরোত্তম কেরাণী—একজন বাঙ্গালী কবি। ১২০২ বঙ্গাব্দে ২৩শে জ্যৈষ্ঠ চট্টগ্রামে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তিনি ইহার বিষয় কবিতায় বর্ণনা করিয়াছিলেন। ১২১৫ বঙ্গাব্দের ২৪শে আষাঢ় তাঁহার মৃত্যু হয়।

নরোত্তম ঠাকুর—(১) একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্ত্তা ও গ্রন্থকার। রামপুর বোয়ালিয়া নগরের নিকটবর্ত্তী গড়েরহাট পরগণার অন্তর্গত খেতুরী নামক গ্রামে মজুমদার উপাধিধারী উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ রাজবংশে ১৪৫৩ শকের (১৫৩১ খ্রীঃ) মাঘ মাসে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত ও মাতার নাম রাণী নারায়ণী।

বাল্যকাল হইতেই নরোত্তম লেখা পড়ায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তিনি পাঠ্যাবস্থায়ই এক ব্রাহ্মণের নিকট যাইয়া প্রত্যহ গৌরাঙ্গ চরিত শ্রবণ করিতেন। তখন হইতেই ক্রমে তিনি গৌরাঙ্গের ভক্ত হইয়া পড়েন এবং অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে পিতামাতার অজ্ঞাতসারে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ এই সংবাদ জানিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বহু লোক প্রেরণ করেন; কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাকে পথিমধ্য হইতে ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। বৃন্দাবনে যাইয়া তিনি জীব গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন, জীব গোস্বামী তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া,আনন্দের সহিত তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। সেইখানেই লোকনাথ গোস্বামী নামক একজন পরম ভক্ত সাধুর নিকট নরোত্তম দীক্ষা গ্রহণ করেন। গুরুর আদেশে তিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি জীব গোস্বামীর নিকট সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া,বৈষ্ণব শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। জীব গোস্বামী তাঁহার পাণ্ডিত্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে 'ঠাকুর মহাশয়' উপাধি প্রদান করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ও কৃষ্ণানন্দ তাঁহার সতীর্থ ছিলেন। জীব গোস্বামী বৈষ্ণব গ্রন্থগুলি বঙ্গদেশে প্রচার করিবার জন্য ১৬৮৪ খ্রীঃ অব্দে শ্রীনিবাস আচার্য্য কৃষ্ণানন্দ ও নরোত্তমকে গ্রন্থসহ বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁহারা গ্রন্থরাজি সহ গোপালপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলে, সেখান হইতে রাত্রিতে বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরের অধীনস্থ দস্যুগণকর্ত্তৃক গ্রন্থগুলি অপহৃত হয়। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহারা অপহৃত গ্রন্থের কোনরূপ সন্ধান করিতে পারিলেন না। তৎপর নরোত্তম নিজ গ্রামে

গমন করেন। পিতা মাতা তাঁহার আগমনে বিশেষ আনন্দিত হইলেন কিন্তু নরোত্তম আর সংসারী হইলেন না। তাঁহার পিতামাতা বহু চেষ্ট করিয়াও তাঁহাকে আর সংসারে লিপ্ত করিতে পারিলেন না। তিনি কিছুকাল গ্রামে অবস্থান করিয়া নবদ্বীপে গমন করেন। সেই সময়ে চৈতন্যদেবের সহধর্ম্মিনী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী জীবিত ছিলেন। নরোত্তম নবদ্বীপ, নীলাচল, শান্তিপুর, সপ্তগ্রাম, খড়দহ প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের তীর্থস্থানগুলি ভ্রমণ করিয়া শ্রীখণ্ডেগমন করেন। পরে তিনি স্বগ্রামে খেতুরীতে গৌরাঙ্গ,বিষ্ণুপ্রিয়া,বল্লভীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধাকান্ত ও রাধা-রমণ এই ছয়টি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রচিত কীর্ত্তনগুলি 'গড়ানহাটি কীর্ত্তন' নামে অভিহিত হয়। তিনি একটি কীর্ত্তনের দলও সৃষ্টি করিয়া-ছিলেন। খেতুরী গ্রামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। এই উৎসবে শ্রীজীব গোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভু ও তদীয়া পত্নী জাহ্নবী দেবী, বীরভদ্র গোস্বামী, মাধব আচার্য্য প্রভৃতি এবং দেশের প্রসিদ্ধ ভক্তবৃন্দ সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি খেতুরী গ্রামের প্রান্তভাগে এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় সাধন ভজন করিতেন। ঐ স্থানকে 'ভজনস্থলি' বলা হইত। কালে তাঁহার খ্যাতি এত বিস্তৃত হইয়াছিল যে, অনেক ব্রাহ্মণও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত গ্রন্থ-গুলি তাঁহার রচিত। 'উপাসনা পটল' 'কুঞ্জবর্ণন' 'গুরুশিষ্য সংবাদ' 'চন্দ্রমণি' 'চমৎকার চন্দ্রিকা' 'প্রার্থনা' 'প্রেম-ভক্তি চন্দ্রিকা' 'প্রেমভক্তি চিন্তামণি' 'রসভক্ত চন্দ্রিকা' 'রাগমালা' 'রসসার' 'সিদ্ধভক্তি চন্দ্রিকা' 'স্মরণ মঙ্গল' 'সাধন ভক্তি চন্দ্রিকা' 'সাধ্য-প্রেম চন্দ্রিকা' ও 'সূর্য্যমণি'। এই গ্রন্থগুলি তিনি সরল বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বসাধারণের উপ-যোগী করিয়া রচনা করিয়াছেন। ১৫০৯ শকের কার্ত্তিক মাসে কৃষ্ণাপঞ্চমী (১৫৮৭ খ্রীঃ) তিথিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। রাজসাহী, মালদহ, বহরমপুর, রঙ্গপুর, পাবনা প্রভৃতি স্থানে তিনি বহু শিষ্য করিয়াছিলেন। মণিপুরের রাজারা তাঁহারই শিষ্য হইয়াছিলেন।

নরোত্তম ঠাকুর—(২) তিনি আসামের একজন বৈষ্ণব কবি।

নরো গণেশ—প্রকৃত নাম নারায়ণ গণেশ। এই বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ইন্দুরের সুপ্রসিদ্ধা মহারাণী অহল্যা বাঈ এর সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। অহল্যা বাঈ তাঁহাকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে পুনা দরবারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অহল্যা বাঈ দেখ।

নর্থব্রুক, লর্ড—তাঁহার সম্পূর্ণ নাম —Thomas George Baring, Earl

of Northbrook. তিনি ভারতবর্ষের বড়লাট ও রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। ১৮২৬ খ্রীঃ অব্দের ২২শে জানুয়ারী তাঁহার জন্ম হয়। তিনি প্রথম আরল নর্থব্রুকের পুত্র। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপন করিয়া নানা স্থানে কিছুদিন কাজ করেন। পরে ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্য হন। ১৮৫৯—১৮৬১ সাল পর্য্যন্ত তিনি ভারতের আণ্ডার সেক্রেটারী ছিলেন।

১৮৭২খ্রীঃ অব্দে লর্ড মেও, শেরআলী নামক একজন পাঠান সর্দ্দারের হস্তে, আণ্ডামান দ্বীপ পরিদর্শনকালে নিহত হন। তাহার পরে অস্থায়ী ভাবে সার জন ষ্ট্রেচী (Sir John Strachey) এবং মান্দ্রাজের লাট লর্ড নেপিয়ার(Nap hier) কিছুদিন বড়লাটের কাজ করেন। তৎপরে ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দের ৩রা মে লর্ড নর্থব্রুক রাজপদ গ্রহণ করেন। এই সময়ে সার জর্জ কেম্বল (Sir George Campbell 1871—1874) বাঙ্গালার শসানকর্ত্তা ছিলেন। লর্ড নর্থব্রুকের সময়ে বাঙ্গালা দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ইহার পূর্ব্বে ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে উড়িষ্যা দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল এবং বহু লোক ক্ষয় হইয়াছিল। লোকে তাহা ভুলিতে পারে নাই। ১৮৭৩ সালে অনাবৃষ্টি হওয়াতে ১৮৭৪ সালে বাঙ্গালা ও বিহারে ভয়ানক অন্নাভাব উপস্থিত হইল। কিন্তু রাজপ্রতিনিধি ও ছোটলাটের বিশেষ চেষ্টায় দুই কোটী মণ শস্য বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত হইল। প্রায় আটাইশ লক্ষ লোক সরকারী সাহায্য পাইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিল। রাজপ্রতিনিধিরা বরাবর গ্রীষ্মকালে শিমলা শৈলে যাপন করেন। কিন্তু দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে, এবার বড়লাট আর শিমলায় যান নাই। বাস্তবিক বড়লাট ও ছোটলাটের সহৃদয়তায় বাঙ্গালা, বিহারের দুর্ভিক্ষ উড়িষ্যার মত ভীষণ হইতে পারে নাই। বড়লাট দেশের শস্য অন্যত্র রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি রিলিফ কার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ শোন নদীর খাল খনন ও উত্তর বঙ্গের রেল লাইনের কার্য্য আরম্ভ করাইয়া দিলেন।

তাঁহার সময়ে বরদার গায়োকবার মলহর রাও,তথাকার ইংরেজ রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ারকে (Colonel Phayre), বিষ প্রয়োগে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এই অভিযোগে অভিযুক্ত হন। এই অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য, বড়লাট একটী কমটী নিযুক্ত করেন। তাহার মধ্যে কলিকাতা হাইকোটের প্রধান বিচারপতি কাউচ (Chief Justice Sir Richard Couch 1870—1875), বড়লাটের এজেণ্ট সার রিচার্ড জন মিড (Sir

Richard John Meade), পঞ্জাব চিফ কোর্টের বিচারপতি ফিলিপ সেণ্ডিস মেলভিল (Philip Sandys Melvill) এই তিনজন সাহেব এবং গোয়ালিয়রের মহারাজা জয়াজী রাও সিন্ধিয়া, জয়পুরের সয়াজী রাম সিংহ ও বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য রাজা দিনকর রাও, এই তিনজন ভারতীয় সভ্য ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সাহেবেরা মলহর রাওকে দুষী ও দেশীয় সভ্যেরা তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলেন। কিন্তু বড়লাট, ইংলণ্ডস্থ ভারত সভার মতানুযায়ী মলহর রাওকে দুষী অবধারণপূর্ব্বক রাজ্যচ্যুত করেন এবং তৎপদে সেই বংশেরই অল্প বয়স্ক সোয়াজী রাওকে অভিষিক্ত করেন। এই ভূপতি সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন।

১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে সুয়েজখাল খনিত হয়। সেই সময় হইতে ইংলণ্ড ও ভারতের বাণিজ্য অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। লর্ড নর্থব্রুকের সময়ে রক্ষণশীল মন্ত্রী ডিজরেলী ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি, বড়লাটকে মানচেষ্টার হইতে ভারতে প্রেরিত কাপড়ের উপর যে শতকরা পাঁচ টাকা আমদানী শুল্ক আছে তাহা তুলিয়া দিতে বলেন। এই শুল্ক পূর্ব্বে সাড়ে সাত টাকা ছিল। বড়লাট তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। তিনি মানচেষ্টারের উপকার হইবে বলিয়া, ভারতের ক্ষতি করিতে চাহিলেন না। এই সদাশয় বড়লাট সর্ব্বদা ভারতের যাহাতে সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি আয় কর তুলিয়া দেন। তিনি একজন অর্থশাস্ত্রবিদ্ বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বড়লাট লর্ড লরেন্স ও লর্ড মেও আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি ব্যয় সঙ্কুচ করিয়া সেই সমতা রক্ষা করিয়াছিলেন।

এই বড়লাটের সময়ে যুবরাজ এডওয়ার্ড (পরে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) ভারত ভ্রমণে আগমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে রাজা, প্রজা সকলে বিশেষ রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। যুবরাজ পরে বড়লাটকে লিখিয়াছিলেন যে—মহারাণীর এই বিশাল রাজ্যের অসংখ্য প্রজামণ্ডলীর মনে যেন দিন দিন ইংরেজ শাসনের সুফলের প্রতি আস্থা জন্মে। ইংলণ্ডের মহারাণী ও রাজপরিবারস্থ সকলের মনেই ভারতের সর্ব্বপ্রকারের কল্যাণ কামনা সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে, এই বিশ্বাসও যেন তাঁহাদের মনে জাগরিত হয়।

এই বড়লাটের সময়ের আর একটী ঘটনা আফগানিস্থানের ব্যাপার। ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে দোস্ত মোহাম্মদের মৃত্যুর পরে, তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে আফগানিস্থানের সিংহাসন লইয়া বিবাদ

সংঘটিত হয়। অবশেষে শেরআলী জয় লাভ করিয়া আফগানিস্থানের আমীর হন। তখনকার বড়লাট সার জন লরেন্স তাঁহাকে আমীর বলিয়া স্বীকার করেন। তৎপরে লর্ড মেও আম্বালা সহরে এক দরবার করিয়া আমীর শেরআলীকে সম্বর্দ্ধনা করেন। তৎকলে আমীরের সহিত ইংরেজ রাজের বন্ধুত্ব দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের মন্ত্রী সভার পরিবর্ত্তন হয়। লর্ড সেলিসবেরি সেক্রেটারী অব ষ্টেট হইলেন। তিনি সন্দেহ করিতেন যে আফগানিস্থানের আমীর শেরআলী গোপনে রাসিয়ার সহিত মিত্রতা করিতেছেন। এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া, লর্ড সেলিসবেরি, ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড নর্থব্রুককে, আফগানিস্থানের আমীর শেরআলীকে ভয় প্রদর্শন করিয়া, একজন ইংরেজ দূতকে আফগানিস্থানে রাখিতে বলেন। বড়লাট ইহা সমিচীন মনে না করিয়া কার্য্যকাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রস্থান করেন; তাঁহার স্থানে লর্ড লিটন বড়লাট হইয়া আসেন (১৮৭৬ সালে ১২ই এপ্রিল)। ইংলণ্ডে যাইয়াও তিনি নানা কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। নৌসমর বিভাগের তিনি প্রধান কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি একবার মিশরের রাজধানী কেয়েরো নগরে গমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি নানাবিধ সম্মানজনক উপাধি পাইয়াছিলেন। এই সদাশয় মহাত্মা ১৯০৪ সালের ১৫ই নভেম্বর পরলোক গমন করেন।

নর্ম্মাণ জন পেস্‌টন—(Justice John Paxton Norman) ইংলণ্ডের অন্তর্গত সুমার সেট শায়ারে, তিনি ১৮১০ খ্রীঃ অব্দের ২১শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জন নর্ম্মাণ (John Norman) একজন বেঙ্কার ছিলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে (Oxford university) তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৬২ সালে তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ভারতবর্ষে আগমনপূর্ব্বক, হাইকোর্টের বিচারক পদ লাভ করেন। এই পদে ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন। মধ্যে মধ্যে প্রধান বিচারপতিও (Chief Justice) হইয়াছিলেন। এই সময়ে ওহাবী আন্দোলন ভারতবর্ষে অতি গোপনে খুব চলিতেছিল। তাহাদের কয়েকজন দলপতি বিচারপতি নর্ম্মাণকর্ত্তৃক কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিল। সেই বিচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য আবদুল্লা নামক একজন পাঞ্জাবী মুসলমান, নর্ম্মাণ সাহেবকে হত্যা করে। তিনি তখন সিড়ি দিয়া টাউন হলের উপরে উঠিতে ছিলেন, (হাইকোর্ট তখন টাউন হলে বসিত; এমন সময়ে অতর্কিতে আবদুল্লা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া

ছুড়িকাদ্বারা আঘাত করে। পরদিন ২১শে সেপ্টেম্বর (১৮৭১ সাল) প্রাতঃকালে সেই আঘাতেই তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি ন্যায়বান, জনপ্রিয় বিচারপতি ছিলেন। ভারতবাসীর প্রতি তিনি অনুকুল ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাশাস্ত্র বিভাগের সভাপতি ছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি আইন সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তিকাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি অচিরেই অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার এই প্রকার শোচনীয় মৃত্যুতে এদেশীয় ও বিদেশীয় সকলেই অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিক জাগরূক রাখিবার জন্য, একটী স্মৃতি স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে।

নল—একজন পাক শাস্ত্রবেত্তা। তিনি পাক শাস্ত্র সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। দিল্লীর সম্রাট আকবর শাহের রাজস্ব মন্ত্রী টোডরমল্ল, বিদ্বন্মণ্ডলী নিয়োগ করিয়া নিজ নামে টোডরানন্দ নামক এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা বহু খণ্ডে বিভক্ত। তদন্তর্গত 'অয়ুর্ব্বেদ সৌখ্য' খণ্ডে নলের গ্রন্থের বিষয় উল্লেখ আছে। নলকৃত গ্রন্থের নাম—পাকদর্পণ।

নলিনীকান্ত সেন—একজন দেশহিতৈষী ও কবি। চট্টগ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি চট্টগ্রামেই লেখা পড়া শিক্ষা করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি কবিতা লিখিতেন। ১৮৯৫—১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে চট্টগ্রামে স্বদেশী কাপড়ের ভয়ানক আন্দোলন হয়। এই আন্দোলনের মূলে নলিনীকান্তের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ই বহুল পরিমাণে ছিল। সেই সময় হইতে মরণকাল পর্য্যন্ত তিনি দেশী পোষাক পরিচ্ছদ ও দেশী দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতেন। সে সময় চট্টগ্রামে কোন সাধারণ পুস্তকালয় ছিল না। ইহাতে তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল এবং এই অভাব দূরীকরণার্থে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮৯৬—১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার অপরিমিত চেষ্টার ফলে National School গৃহে 'অধ্যয়ন সম্মিলনীর' প্রতিষ্ঠা হয়।

১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি বি-এ পড়িবার জন্য কলিকাতা আগমন করেন। এখানে আসিয়াও তিনি দেশের ও জাতির কিরূপে উন্নতি হইতে পারে এই সব বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিতেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে দেশীয় শিল্পের উন্নতির করা বিশেষ প্রয়োজন। জাতি যদি বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টিত না হয়, তাহা হইলে

দেশ ও জাতির মঙ্গল হইবে না। জাতীয় শিল্পরক্ষিণী সমিতির বিষয়ে তিনি কবিবর রবীন্দ্রনাথের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে চট্টগ্রামবাসীরা শিক্ষা দীক্ষায় অনেকটা পশ্চাৎপদ ছিল। তিনি স্বদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের জন্য একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা করেন এবং তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টায় ও পরিশ্রমে কলিকাতা ইডেন হিন্দু হোষ্টেল হইতে 'আলো' নামে চট্টগ্রামের একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। তৎপরে তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চট্টগ্রামে ফিরিয়া যান। সেই সময় তাঁহার অভিভাবকগণ তাঁহাকে আইন অধ্যয়ন করিতে বলেন; কিন্তু আইন ব্যবসায় করিতে গেলে স্বদেশ সেবার অন্তরায় হইবে মনে করিয়া, তিনি আইন পড়িতে অস্বীকৃত হন। তিনি চট্টগ্রামেরই কোন একটী স্কুলে প্রথমে বিনা বেতনে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ইহাতে তাহার দুইটী উদ্দেশ্য ছিল। আজকাল ছাত্র ও শিক্ষকগণের মধ্যে তেমন ঘনিষ্ঠতা নাই, কেমন একটা সম্পর্কহীন-ভাব। তাঁহার নিকট ইহা ভাল লাগিত না, সেইজন্যই তিনি শিক্ষক হইয়া ছাত্রদের সঙ্গে সরলভাবে মেলামেশা করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। হিন্দু মুসলমান একভাব হইয়া স্বদেশের জন্য কার্য্য না করিলে, ভারতের উন্নতি সহজে হইবে না। ঐ স্কুলে মুসলমান ছাত্র অধিক ছিল, তিনি তাহাদের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিলে ভেদ জ্ঞান দূর হইবে, ইহাও তাঁহার আর একটি আশা ও উদ্দেশ্য ছিল। এই কার্য্যে তিনি পরে ছাত্রগণের অনেক সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। ছাত্রগণ তাঁহার অনুরক্ত হইয়া তাঁহার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। এই সব কার্য্যে চতুর্দ্দিক হইতে নানাভাবে তিনি প্রশংসিত হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি এত কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন যে, কাহারও সহিত আলাপ আলোচনা করিবার সময় পর্য্যন্ত পাইতেন না। অত্যধিক পরিশ্রম ও শরীরের প্রতি অযত্ন হেতু শীঘ্রই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং ক্রমে জ্বরও হইতে লাগিল। এই অসুস্থতা হইতে তিনি আর মুক্তি লাভ করিতে পারিলেন না। ১৯০১ খ্রীঃ অব্দের ২০শে জানুয়ারী (১৩০৮ বঙ্গাব্দের মাঘ) তিনি পরলোক গমন করেন।

নলিনীবালা বসু একজন বাঙ্গালী মহিলা কবি। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুলেখক ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্-এ, বি-এল মহাশয়ের কন্যা এবং সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের দৌহিত্রী ছিলেন। নলিনীবালা অনেকগুলি কবিতা রচনা করিয়া-

ছিলেন। ১৩০৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে মাত্র ষোল বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার রচিত কবিতাগুলি তাঁহার মাতুল ললিতচন্দ্র মিত্র এম্-এ মহাশয় 'নলিনীগাথা' নামে প্রকাশ করিয়াছেন।

নলিনীবিহারী সরকার—কলিকাতা-বাসী একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁহার পিতার নাম তারকচন্দ্র সরকার। ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে নৈহাটীতে তাঁহার জন্ম হয়। কলিকাতায় শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি পিতার সুবিখ্যাত 'কার-তারক কোম্পানী' নামক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন এবং নিজ মেধা ও অধ্যবসায় বলে ক্রমে কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীরূপে পরিচিত হন। দেশের নানারূপ জনহিতকর কার্য্যের সহিতও তাঁহার বিশেষ যোগ ছিল এবং পরোপকারিতার জন্য তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি কলিকাতা পুরতন্ত্র (Municipal Corporation), বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বন্দর-পরিচালক সংঘ (Port Trust), বাঙ্গালা দেশের শাসন পরিষদ (Legislative Council) প্রভৃতির সদস্য ছিলেন। একবার তিনি কলিকাতার সেরিফ (Sheriff)ও হইয়াছিলেন এবং কিছুকাল অবৈতনিক বিচারপতি (Honorary Presidency Magistrate) এবং আমদানী-কারক বণিক সঙ্ঘের (Import Trade Association) সভাপতিও ছিলেন। নানা সৎকার্য্যের জন্য তিনি কৈসর-ই-হিন্দ পদক এবং সি-আই-ই (C. I. E.) উপাধি প্রাপ্ত হন।

তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মাচার্য্য কেশবচন্দ্রের একজন অনুরাগী ভক্ত ছিলেন এবং ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন।

নলিনীমোহন গুপ্ত—জনসেবক, কর্ম্মী ও আসামের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদগণের অন্যতম। ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি অত্যন্ত সাহসী, স্বাধীনচেতা ও ক্রীড়াপ্রিয় ছিলেন। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি ক্রীড়া জগতে নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। তিনি ছাত্র সমাজ ও যুব সমাজের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। আসামের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান "ইণ্ডিয়া ক্লাব" তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শিলচরের 'আর্ল গ্রাউণ্ড" আসামের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ খেলার মাঠ। তাঁহার চেষ্টায়ই এই মাঠ প্রস্তুত হইয়াছিল। তাঁহার নেতৃত্বে "ইণ্ডিয়া ক্লাব" তিনবার আই-এফ-এ শীল্ড প্রতিযোগীতায় ও দুইবার "ডুরাণ্ড" কাপ প্রতিযোগীতায় যোগদান করিয়াছিল। তাঁহারই চেষ্টায় ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে একটা বিশেষ সংযোগ ঘটিয়াছিল। "ইণ্ডিয়া ক্লাবের" সকল প্রকার

কার্য্যে ইউরোপীয়েরা নিঃসঙ্কোচে যোগদান করিতেন। তাঁহার স্মৃতি কেবল ক্রীড়াতেই বিরাজিত ছিল না। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ জননায়ক, নিঃস্বার্থ কর্ম্মী এবং লোকসেবকও ছিলেন। শিলচর মিউনিসিপ্যালিটির তিনি বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তিনি নিজে বিপদেপতিত হইয়াও বিপদগ্রস্ত সাহায্য-প্রার্থীকে সাহায্য করিতে বিরত হইতেন না। ইং ১৯২৯ সালের আসামের বন্যায় তিনি নির্ভীক ও নিঃস্বার্থভাবে দুর্গতদের সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি মেসো-পটেমিয়ায় "ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স ফোর্স"এ যোগদান করিয়াছিলেন। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ (১৯৩৬ খ্রীঃ এপ্রিল) উনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি ইঞ্জিনিয়ারীং অফিসে হেডক্লার্ক ছিলেন।

নবরঙ্গোল্লন কামাভট্ট—তিনি একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। 'জাতক বৃত্তি' নামে একটী গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

নসর উল্লা—'মুসার সওয়াল' নামক গ্রন্থ তিনি বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করেন।

নসরৎ ইয়ার খাঁ—বাঙ্গালার নবাব সুজা উদ্দিনের সময়ে (১৭২৫ ১৭৩৯ খ্রীঃ) বিহার প্রদেশ বাঙ্গালা হইতে বিছিন্ন হইয়া যায়। সেই সময়ে নসরৎ খাঁ বিহারের শাসনকর্ত্তা হইয়া ছিলেন। তাঁহার পরে ফকির উদ্দোলা উক্ত পদ লাভ করিয়া ছিলেন।

নশরত শাহ—(১) একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা। তিনি ফতে খাঁর পুত্র ও ফিরোজ শাহ তোগলকের পৌত্র। ১৩৯৯ খ্রীঃ অব্দে তৈমুর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে সুলতান মামুদশাহ দিল্লীর সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন এবং নরশত শাহ উক্ত সিংহাসন অধিকার করিয়া এগার মাসকাল রাজত্ব করেন। ১৪০০ খ্রীঃ অব্দে জাফর খাঁর পুত্র একবাল খাঁ নশরত শাহকে পরাস্ত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন।

নশরত শাহ—(২) বাঙ্গালার একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা। তিনি নসিব শাহ নামেও পরিচিত। ১৫২৪ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৩০) তাঁহার পিতা আলা-উদ্দীন হোশেন শাহের মৃত্যুর পরে তিনি বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। আলাউদ্দীন ধর্ম্ম সংস্কারক মোহাম্মদের বংশসম্ভুত এবং আরবদেশ হইতে বাঙ্গালায় আগমন করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন হোশেন শাহ দেখ।

নশরত শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া স্বীয় অপর সপ্তদশ ভ্রাতার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার পিতা আলাউদ্দীন ও দিল্লীর সম্রাট সেকেন্দর বাদশাহের মধ্যে যে সন্ধি পত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, নশরত শাহ তাহা অমান্য করেন। তিনি ত্রিহুত আক্রমণ এবং তথাকার রাজাকে হত্যা

করিয়া স্বীয় জামাতা আলাউদ্দিনকে তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি হাজিপুর অভিমুখে যাত্রা করিয়া ঐ স্থান অধিকারপূর্ব্বক মুকদ্দম আলম নামক অপর এক জামাতার হস্তে উহার শাসনভার অর্পণ করেন। তদনন্তর গঙ্গা অতিক্রম করিয়া মুঙ্গের দুর্গ ও ঐ অঞ্চল অধিকার করেন এবং কুবত খাঁ নামক শ্রেষ্ঠ সৈনিকের হস্তে তাহার শাসনভার ন্যস্ত করেন। সম্রাট বাবর ১৫২৬ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৩৩) দিল্লীর তদানীন্তন লোদীবংশীয় সম্রাট ইব্রাহিমকে পরাস্ত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। সুলতান ইব্রাহিমের ভ্রাতা মামুদ লোদী অন্যান্য আফগান সর্দ্দারের সঙ্গে বঙ্গদেশের নবাব নশরত শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং নশরত শাহ তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন। মামুদ লোদীর সঙ্গে সুলতান ইব্রাহিমের এক কন্যাও আগমন করিয়াছিলেন। নশরত শাহ মহাসমারোহে তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা, আফগান সর্দ্দারগণকে আশ্রয় ও সাহায্য করার জন্য, সম্রাট বাবর নশরত শাহের উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং বঙ্গদেশ আক্রমণের জন্য একদল সৈন্যও প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু নশরত শাহ ইতিমধ্যে উপঢৌকন প্রভৃতি প্রেরণ করিয়া সম্রাটের ক্রোধ প্রশমিত করেন। ১৫২৯ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৩৬) সুলতান ইব্রাহিমের ভ্রাতা মামুদ পিতৃ-রাজ্য উদ্ধারের জন্য বাবরের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু বাবরের সৈন্যের নিকট তাঁহার সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল এবং মামুদও পরাজয়ে ভগ্নোৎসাহ হইয়া বঙ্গদেশে পলায়ন করেন। মুঘল সৈন্যেরা তাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। তখন নশরত শাহ বিপদাশঙ্কায় সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাবর তাঁহার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং এই সর্ত্তে উভয়ের মধ্যে সন্ধি হইল যে, আফগান সর্দ্দারগণ আর বিদ্রোহী হইবে না ও নশরত শাহ মামুদকে আর কোন সাহায্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু পর বৎসর বাবরের মৃত্যু হইলে, আফগানগণ পুনরায় মুঘলরাজ্য নানাদিক দিয়া অধিকার করিতে লাগিলেন। সম্রাট ইব্রাহিমের ভ্রাতা মামুদও এক-দল স্বদেশীয় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জোয়ানপুর অধিকার করিয়াছিলেন। নশরত শাহ সেই সময় বাবরের সহিত কৃত সন্ধি ভগ্ন করিয়া মামুদকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি সৈয়দবংশীয় হইলেও অতিশয় নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার নিষ্ঠুর ব্যবহারে ভৃত্য কর্ম্মচারী ও প্রজাগণ সকলেই বিদ্রোহী

হইয়াছিল। অবশেষে ১৫৩৮ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৪৫) এক দিবস গৌড়নগরে তাঁহার পিতার সমাধি মন্দিরে পিতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ গমন করিলে, এক ভৃত্য কর্ত্তৃক সেইস্থানেই নিহত হন। তিনি গৌড়নগরে কয়েকটি ইমারত নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মুসলমান সাধু হজরত মুকদুমের সাদউল্লাপুরের সমাধিমন্দিরও তিনিই নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ফিরোজ শাহ বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন; কিন্তু তিন মাস অতীত না হইতেই তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া, তদীয় পিতৃব্য মামুদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

নসরতী—তিনি দাক্ষিণাত্যের একজন বিখ্যাত কবি। বিজাপুরের নবাব আলী আদিল শাহের যুদ্ধ জয় সম্বন্ধে তিনি 'আলী নামা' নামক একখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ফারসী ভাষায় রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও গ্রন্থ ছিল। এই সমস্ত গ্রন্থই ১৫৬০ হইতে ১৫৭০-খ্রীঃ অব্দ মধ্যে রচিত হইয়াছিল।

নসর উদ্দিন—১৮৩১খ্রীঃ অব্দে ২৪ পরগণায় তিতুমীরের বিদ্রোহ হয়। তিতুমীরের ভাগিনেয় নসিরউদ্দিন তাঁহার প্রধান সেনাপতি হইয়া ছিল। পরে ধৃত হইয়া বহু অনুচরসহ ফাঁসি কাষ্ঠে জীবন বিসর্জ্জন করে। তিতুমীর দেখ।

নসর-উল্লা খাঁ—একজন প্রাচীন মুসলমান কবি। এই নামে দুইজন কবির উল্লেখ পাওয়া যায়। একজনের রচিত গ্রন্থের নাম 'জঙ্গনামা' অপরজনের রচিত গ্রন্থ 'মুসার ছওয়াল'। তাঁহাদের অন্য পরিচয় অজ্ঞাত।

নসিম উদ্দিন—একজন মুসলমান গ্রন্থকার। তিনি চব্বিশ পরগণা জিলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ 'শাহঠাকুরব' ১৩১০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

নহপান—সৌরাষ্ট্র দেশের একজন প্রাচীন ক্ষত্রপ। তাঁহার নামাঙ্কিত কয়েকটি খোদিত লিপি (inscriptions) পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার ঐ লিপিগুলিতে চারিটি বর্ষের নাম পাওয়া গিয়াছে (৪১, ৪২, ৪৫, ৪৬)। অনেকে অনুমান করেন যে ৪৬ শকাব্দে বা তাহার কিছুকাল পরে, নহপান অন্ধ্র-রাজ গৌতমী শাতকর্ণীকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া সৌরাষ্ট্র হইতে বিতাড়িত হন। কিন্তু এসকল বিষয়ে মতভেদ যথেষ্ট আছে। ক্ষত্রপ নহপান মথুরার মহা-ক্ষত্রপ শোডাসের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন বলিয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন। অন্ধ্র-রাজ গোতমীপুত্র শাতকর্ণীর একটি খোদিত লিপি হইতে জানা যায় তিনি খখরাতকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। নহপানও খখরাত বা খহরাত বংশোদ্ভব ছিলেন বলিয়া অনেক স্থলে কথিত হয়।

সেজন্য অনেকের মতে শাতকর্ণি হয় নহপান বা তদ্বংশীয়গণকে নির্ম্মূল করেন। এই নহপানই কাহারও কাহারও মতে শকাব্দের প্রতিষ্ঠাতা।

নহমত উল্লা—নারনৌল নামক স্থানের একজন সৈয়দ ও ধার্ম্মিক মুসলমান। কথিত আছে তিনি অলৌকিক কার্য্য করিতে পারিতেন। তাঁহার একটি বাজ পাখী ছিল। এই পাখীটি কয়েক বৎসর তাঁহার আহার সংগ্রহ করিয়াছিল। পরে তিনি বঙ্গদেশের আকবর নগরে (রাজমহল) আগমন করেন। তাৎকালিক বঙ্গের শাসনকর্ত্তা সম্রাট শাজাহানের পুত্র রাজকুমার সুজা ও অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। রাজমহলের পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত ফিরোজপুর নামক স্থানে ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৭৭) তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি একাধারে কবি ও সাধক ছিলেন।

নহমত খাঁ—একজন মুসলমান কবি। তাঁহার কবিজন সুলভ উপাধি আলি। দিল্লীর সম্রাট আলমগীর তাঁহাকে দানিশ মন্দ খাঁ উপাধি প্রদান করেন। তিনি সম্রাটের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন এবং প্রতিনিয়ত তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। অনেকগুলি গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সম্রাটের দাক্ষিণাত্য বিজয় সম্বন্ধে 'হুশন-ওয়া-ইস্ক' নামক যে বিদ্রূপাত্মক কাব্য লিখিয়াছেন তাহাই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাতে তিনি সম্রাটকেও বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। প্রাচ্য দেশীয় রন্ধন সম্বন্ধে 'খেয়ান নহমাত' নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থও তাঁহারই রচিত। ১৭০৮ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১২০) বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নহনিদত্ত—'বাল-বিবেক' নামক মুহূর্ত্ত বিবরণ বিষয়ক জ্যোতিষ গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

নহুর রাও—যখন মহম্মদঘোরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন মরুভূমির প্রতাপ স্বরূপ আত্মবলে বলীয়ান্ নির্ভীক তেজস্বী নহুর রাও মুন্দর রাজ্যের অধিপতি ছিলেন।

নাংবকলা গাভরু—তিনি পূর্ব্ব আসামের আহম নরপতি খাওমুংলুংএর তেজস্বিনী মহিষী। কোচবিহারের নরপতি নরনারায়ণ আসাম প্রদেশ জয় করিলে, আসামপতি সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। তদনুসারে কোচ নরপতি আসামপতির পুত্রকে তাঁহার নিকট প্রতিভূ রাখিতে বলিলেন। ইহাতে রাজ মহিষী ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় স্বামীকে বলিয়াছিলেন—'আমি আমার পুত্রকে কখনও কোচরাজের নিকট পাঠাব না। তোমার সাহস না থাকে, তোমার পোষাক ও অস্ত্র দাও আমি যাইয়া যুদ্ধ করিব।' আসামপতি তৎপরে তাহার ভ্রাতাকে কোচবিহার দরবারে প্রতিভূস্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন।

নাওনেহাল সিংহ—তিনি পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের পৌত্র ও খড়্গা সিংহের পুত্র। তিনি একবার সেনাপতি হইয়া, তাঁহার অধীনে হরি সিংহকে অন্যতম সরকারী সেনাপতি করিয়া, পেশোয়ার বিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পরে ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পুত্র খড়্গা সিংহ পঞ্জাবের অধিপতি হইলেন। নাওনেহাল সিংহ যুবরাজ হইলেন। তিনি কাশ্মীর প্রদেশের অন্তর্গত জাম্বুদেশ স্বীয় অধিকারে আনয়ন করেন। ১৮৪০ সালের ৫ই নবেম্বর খড়্গা সিংহ পরলোক গমন করেন। নাওনেহাল সিংহ এখন রাজা হইলেন। কিন্তু পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবার সময়েই নিহত হইলেন। অনেকের সন্দেহ জাম্বুর রাজারাই তাঁহার নিধনের কারণ। মাত্র বিংশতি বৎসর বয়সে তাঁহার পরমায়ু শেষ হইল। তিনি বীর্য্যবান্ ও সুদক্ষ শাসনকর্ত্তা হইবেন বলিয়া সকলে আশা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার মাতা মহারাণী চাঁদকুমারী সিংহাসন লাভ করিলেন।

নাগ—(১) কাশ্মীরের অধিপতি ক্ষেম গুপ্তের সমকালবর্ত্তী পর্ণোৎসের অন্তর্গত বদ্দিবাস গ্রামের অধিবাসী খস জাতীয় বানের পুত্র। নাগ তাহার অন্যান্য ভ্রাতাদের লইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তুঙ্গের সহিত মেষপালকরূপে কাশ্মীরে আসিয়াছিলেন এবং প্রথমে পত্রবাহকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তুঙ্গ, রাণী দিদ্দার প্রণয় পাত্র হইয়া প্রধান মন্ত্রী পদ প্রাপ্ত হইলে, নাগ প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতাই উচ্চ রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে এই হতভাগ্য স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তুঙ্গ ও তুঙ্গের পুত্র কন্দর্পকে হত্যা করিয়া কাশ্মীরপতি সংগ্রাম রাজের প্রিয়পাত্র হন। কন্দর্পের পত্নী ক্ষেমার প্রণয় পাত্র এই নীচাশয় সংগ্রামরাজকর্ত্তৃক কম্পন রাজ্যের আধিপত্যে নিযুক্ত হইয়াছিল।

নাগ—(২) নগরাধিকারী নাগ কাশ্মীরপতি হর্ষদেবের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। রাজার জ্ঞাতি উচ্চল বিদ্রোহী হইলে কৃতঘ্ন নাগ বহু সৈন্যসহ রাজপক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক উচ্চলের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। উচ্চল কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। এই পাপ কার্য্যের ফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই নগরেই তিনি শেষ জীবনে ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

নাগদেব—১৫৮৭ শকের (১৬৬৫ খ্রীঃ) পূর্ব্বে তিনি 'মুহুর্ত্তদীপক' নামক জ্যোতিষের এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

নাগনাথ—(১)একজন বিখ্যাত গণক ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী জ্ঞানরাজ

তাঁহারই পুত্র। তিনি খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। (জ্ঞানরাজ দেখ)। নাগনাথের পুত্র জ্ঞানরাজ, জ্ঞানরাজের পুত্র সূর্য্যদাস সূরী।

নাগনাথ—(২) ১৭১৯ শকের (১৭৯৭ খ্রীঃ) পূর্ব্বে 'পর্ব্ব প্রবোধ' নামে একখানা গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

নাগভট—(প্রথম) ভিল্লমালের নরপতি প্রথম নাগভট সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় এবং প্রতীহার কুলজাত। তিনি অতিশয় ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। ৭৫১ খ্রীঃ অব্দে তিনি সিন্ধুদেশের একটী আরব আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন।

নাগভট—(দ্বিতীয়) গুর্জ্জর প্রতীহার বংশীয়েরা বৎস নামক একজন নৃপতির সময়ে প্রথমতঃ সাম্রাজ্য লাভে অগ্রসর হন (৭৮৩খ্রীঃ)। এই বৎস নৃপতির পুত্র দ্বিতীয় নাগভট একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি বঙ্গের পালবংশীয় নরপতি ধর্ম্মপাল এবং রাষ্ট্রকূট নরপতি তৃতীয় গোবিন্দের সম সাময়িক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রাধান্যলাভের জন্য পরস্পর বিবাদ ছিল। নাগভট ধর্ম্মপালকে পরাস্ত করিয়াছিল কিন্তু রাষ্ট্রকূটপতি তৃতীয় গোবিন্দের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। নাগভটের পৌত্র ভোজরাজ কান্যকুব্জ নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। ভোজরাজ নানা দেশ জয় করিয়া এক বিরাট সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

নাগরক্ষিত—একজন বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্য। তিনি আচার্য্য জেতারী প্রণীত 'বালাবতারকর্ক' নামক ন্যায় গ্রন্থ, একজন তীব্বতীয় পণ্ডিতের সাহায্যে, তীব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।

নাগলতা—রঙ্গ নামক একজন ডোম জাতীয় গায়কের হংসী ও নাগলতা নাম্নী সুন্দরী ও সুগায়িকা কন্যাদ্বয়কে কাশ্মীরের কৌণ্ডিকবংশীয় নৃপতি চক্রবর্ম্মা রাজরাণী করিয়াছিলেন।

নাগশঙ্কর—আসামের বিশ্বনাথ নামক স্থানের অন্তর্গত প্রতাপগড়ে নাগশঙ্কর নামে একটী শিব মন্দির এখনও বর্ত্তমান আছে। ইহা নাগশঙ্কর নামক জনৈক ভূপতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ আসামের ভগদত্ত বংশীয় নরপতিগণ হীনবল হইলে, নাগশঙ্কর বংশীয় নরপতিগণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। কখনও স্বাধীন, কখনও সামন্ত নরপতিরূপে প্রায় চারিশত বৎসর তাঁহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন।

নাগসেন—(১) 'মিলিন্দ প্রশ্ন' নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ক পুস্তকে গ্রীক নরপতি মিলিন্দ (Menander) এবং নাগসেন নামক একজন বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্যের কথোপকথন লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু ঐ গ্রন্থোক্ত নাগসেন বাস্তবিক কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা তদ্বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। অনেকে মহাযান মতানুযায়ী নাগার্জ্জুন

ও নাগসেন একই ব্যক্তি বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সে মত আদৌ গ্রাহ্য নয়। কারণ মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে নাগসেনের যুক্তিতর্ক ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিচার প্রভৃতি হীনযান মতানুযায়ী।

নাগসেন—(২) পাটলী পুত্রের প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীতে রুদ্রদেব, মতিল, চন্দ্রবর্ম্মা, নাগসেন প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্ত রাজগণের রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন। এই নাগসেন কোন্ প্রদেশের রাজা ছিলেন, তাহা এখনও নির্ণিত হয় নাই।

নাগাদিত্য—শিলাদিত্যের বংশধর গোহের অধস্তন অষ্টম পুরুষ নাগাদিত্য ইদর রাজ্যের শেষ নরপতি। ভিলেরা বিদ্রোহী হইয়া নাগাদিত্যকে বধ করিলে, ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা তাঁহার তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র বাপ্পাকে লইয়া ভাণ্ডির দুর্গে উপস্থিত হন। যদুবংশীয় জনৈক ভিল তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। বাপ্পা দেখ।

নাগাদিত্য শিলাদিত্য— বল্লভী বংশীয় গুহাদিত্যের এক পুত্র খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে মধ্য ভারতবর্ষের ইদুর রাজ্যের স্থাপন করেন। ৬৪৬ খ্রীঃ অব্দের এক শীলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, এই সময়ে নাগাদিত্য শিলাদিত্য নামে এই বংশের এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহারই বংশে বাপ্পারাও জন্মগ্রহণ করেন।

নাগার্জ্জুন—(১) প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ও ধর্ম্মাচার্য্য। তিনি মধ্য-ভারতের অন্তর্গত বিদর্ভ (বর্ত্তমান বেরার) প্রদেশের এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে কুলপ্রথানুযায়ী ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, বৌদ্ধশাস্ত্রেও অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনেক গ্রন্থের টীকাও রচনা করেন। চীন পরিব্রাজক ইউয়ান চ্যাংএর মতে নাগার্জ্জুন অশ্বঘোষ, আর্য্যদেব ও কুমারলব্ধের (কুমার লাত) সমসাময়িক ছিলেন। কাশ্মীরের ইতিহাসকার কহ্লনের মতে তিনি হুষ্ক জুষ্ক ও কনিষ্ক এই তিনজন কুষণনৃপতির রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথের মতে নাগার্জ্জুন কনিষ্কের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। ভিক্ষু কুমারজীব কর্ত্তৃক অনূদিত চীন ভাষায় নাগার্জ্জুনের একটি জীবন চরিত আছে। মূল গ্রন্থের লেখকের নাম অজ্ঞাত। সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, নাগার্জ্জুন খ্রীঃ ২য় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

বিভিন্ন স্থলে নাগার্জ্জুনকে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য রাসায়নিক এবং ভৌতিক বিদ্যায় পারদর্শী বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু রাসায়নিক এবং বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্য নাগার্জ্জুন একই ব্যক্তি

কিনা তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ মতদ্বৈধ আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্য নাগার্জ্জুন 'মাধ্যমিক মতের প্রচারক। তিনি মাধ্যমিক কারিকা বা মাধ্যমিক সূত্র নামক গ্রন্থ রচনা দ্বারা ঐ মত বিশেষভাবে প্রচার করেন। সপ্তবিংশ অধ্যায়ে এবং চারি শতের অধিক কারিকাতে পুস্তক প্রণীত হইয়াছে।

খ্রীঃ প্রথম শতাব্দীর পর হইতে নানাভাবে সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও দর্শনের আলোচনার নবযুগ আরম্ভ হয়। সেই যুগপ্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে নাগার্জ্জুন একজন প্রধান ছিলেন। ন্যায় ও দর্শন আলোচনার তিনি কতকগুলি সম্পূর্ণ নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করেন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সেই সকলের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান। (১) নিজ রচিত মাধ্যমিক কারিকার 'অকুতোভয়' নামক টীকা। (২) যুক্তিযষ্টিকা। (৩) শূন্যতাসপ্ততি। (৪) প্রতীত্য সমুৎপাদ হৃদয়। (৫) মহাযান বিংশক। (৬) বিগ্রহ ব্যবর্ত্তনী (৭) দশভূমি বিভাষ শাস্ত্র। (৮) প্রজ্ঞা-পারমিতা সূত্র শাস্ত্র। (৯) এক শ্লোক। (১০) সুহৃল্লেখ। (১১) প্রমাণ বিহেতন। (১২) উপায় কৌশল্য-হৃদয়-শাস্ত্র। এই সকলের মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রশাস্ত্র পঞ্চবিংশতি সাহস্রিক প্রজ্ঞাপারমিতার টীকা। সুহৃল্লেখখানি অন্ধ্রবংশীয় কোনও (শাতবাহন) রাজাকে লিখিত পত্রের সমষ্টি। তিব্বতের ইতিহাস টেঙ্গুরে (Bstain hngur) ঐ রাজার নাম উদায়ী ভদ্র দেওয়া হইয়াছে। অকুতো-ভয়ের মূল পাওয়া যায় না। তিব্বতীয় অনুবাদ মাত্র আছে। একশ্লোকেরও চীনা অনুবাদ মাত্র পাওয়া যায়। এই সকল ভিন্ন প্রজ্ঞাদণ্ড ও ধর্ম্মসংগ্রহ নামক দুইখানি পুস্তকও নাগার্জ্জুনের রচিত বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। আচার্য্য সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের মতে নাগার্জ্জুন খ্রীঃ ৩য় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

নাগার্জ্জুন—(২) তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্ একজন নাগার্জ্জুনের পরিচয়ও পাওয়া যায়। তিনি খুব সম্ভব মায়া বা ভৌতিক বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। নাম সাদৃশ্যে অনেক স্থলেই উভয়ের বিবরণ অদ্ভুত ভাবে একীভূত হইয়াছে। এই তান্ত্রিক নাগার্জ্জুন, তিব্বতীয় বিবরণ মতে, কাঞ্চি প্রদেশের অন্তর্গত কহোর নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি পরে নালন্দাতে শিক্ষা লাভ করিয়া, তন্ত্রশাস্ত্রে সিদ্ধি লাভ করেন। তিনি তারা দেবীর উপাসক ছিলেন।

মাধ্যমিক মত প্রচারক নাগার্জ্জুন এবং তান্ত্রিক নাগার্জ্জুন উভয়েই শ্রীপর্ব্বতে বাস করিতেন বলিয়া নানা স্থানে উল্লেখ আছে। এবিষয়েও খুব সম্ভব নাম সাদৃশ্য হেতু স্থানের একত্ব সাধিত হইয়াছে। তান্ত্রিক নাগার্জ্জুন

খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমিত হয়।

নাগার্জ্জুন—(৩)একজন রসায়নাচার্য্য। তিনি খুব সম্ভব পূর্ব্বোক্ত দুইজন হইতে পৃথক ব্যক্তি ছিলেন। তান্ত্রিক নাগার্জ্জুন হইতে তিনি অভিন্ন হইলেও হইতে পারেন। কিন্তু মাধ্যমিক মতাবলম্বী নাগার্জ্জুন ও রসায়নাচার্য্য নাগার্জ্জুন এক ব্যক্তি নহেন। শেষোক্ত ব্যক্তি খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর লোক ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।

দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণানদীর তীরে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটি স্তূপ আবিষ্কৃত হয়। উহা নাগার্জ্জুন কোণ্ডা নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ উহা প্রথম নাগার্জ্জুনের স্মৃতি মণ্ডিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের কোনও কেন্দ্র ছিল।

রসায়নাচার্য্য নাগার্জ্জুনকে ভারতে রসায়নের জন্মদাতা বলা যাইতে পারে। অনেক স্থলেই তাঁহাকে তির্য্যক্‌পাতন প্রক্রিয়া (distillation) এবং ধাতুর জারণ ও মারণ প্রক্রিয়ার আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি রসরত্নাকর, আরোগ্য মঞ্জরী, রসেন্দ্র মঙ্গল, প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সুশ্রুতের টীকাকার ডল্বনাচার্য্যের মতে নাগার্জ্জুন প্রাচীন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা এবং সুশ্রুতের উত্তরভাগের রচয়িতা। রসেন্দ্র চিন্তামণি, রসেন্দ্রসার সংগ্রহ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় রাসায়নিক গ্রন্থে নাগার্জ্জুনের অনেক প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে। তিব্বতীয় কিম্বদন্তী হইতে জানা যায় যে,তিনি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিবার প্রক্রিয়া জানিতেন। পারদের আভ্যন্তরিক প্রয়োগও নাগার্জ্জুনকর্ত্তৃক প্রথম প্রচারিত হয়। কজ্জলী ও রসপর্পটিকার আবিষ্কর্ত্তাও নাগার্জ্জুন এই মতও অনেকে ধারণ করেন। বস্তুতঃ বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রথম আবিষ্কার করিয়া তিনি যে ভারতে রসায়ণ চর্চ্চার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিনীতে আছে নাগার্জ্জুন কাশ্মীরদেশীয় একজন মণ্ডলেশ্বর রাজা, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মুনি এবং শাক্যসিংহের নির্ব্বাণ লাভের দেড়শত বৎসর পরে জীবিত ছিলেন। এই নাগার্জ্জুনই সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা কিনা তাহা বলা কঠিন। নাগার্জ্জুন কৃত রসরত্নাকরে পাওয়া যায় শকাব্দ প্রবর্ত্তক শালিবাহনের সহিত তাঁহার কথোপকথন হইয়াছিল। বাণ ভট্টও নাগার্জ্জুনকে শালিবাহনের বন্ধু বলিয়াছেন।

নাগার্জ্জুন প্রচারিত শূন্যবাদ এইরূপ —শূন্যাঃ সর্ব্বধর্ম্ম : নিঃস্বভাবযোগেন। অর্থাৎ বস্তু সমূহের স্বকীয়ভাব নাই। কাজেই উহার বিভিন্নরূপ বা ধর্ম্ম শূন্য। তাপকে অগ্নির স্বভাব বলা যায় না। কারণ তাপ ও অগ্নি উভয়ই অন্য অনেক

কারণের উপর নির্ভর করে। যাহা অন্যের উপর নির্ভর করে না, তাহাই কেবল কোনও বস্তুর স্বভাব হইবার যোগ্য। তাপ অন্যের উপর নির্ভর করে, সুতরাং তাপ অগ্নির স্বভাব হইতে পারে না, এবং জগতে এমন কোনও বস্তু নাই যাহা অন্যের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং সর্ব্ববস্তুই নিঃস্বভাব

নাগার্জ্জুন—(৪)নাগার্জ্জুন নামে একজন চর্য্যাপদ রচয়িতার নামও পাওয়া যায়। তাঁহার পদাবলীর নাম নাগার্জ্জুন গীতিকা। এই নাগার্জ্জুন খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমিত হয়।

অল-বেরুণি তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী) একজন নাগার্জ্জুনের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি, অল্-বেরুনীর ভারত ভ্রমণের একশত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

নাগেশ—তুকেশ্বরের পৌত্র ও শিবের পুত্র নাগেশ ১৫৪১ শকে (১৬১৯ খ্রীঃ) 'গ্রহ প্রবোধ' নামে এক ক্ষুদ্র করণ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে গ্রহ লাঘবের মতানুযায়ী গ্রহস্ফুটী করণ আছে।

নাগেশ ভট্ট—খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহারাষ্ট্র দেশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম শিবভট্ট ও মাতার নাম সতী দেবী। তিনি ভট্টোজী দীক্ষিতের পৌত্র হরি দীক্ষিতের নিকট শিক্ষালাভ করেন। প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী শৃঙ্গবেরের রাজা রামদেবের সভায় তিনি প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। অলঙ্কার শাস্ত্রে কাব্য প্রকাশের উপর 'বৃহদুদ্দ্যোতাদাহরণ দীপিকা' নামে এক উৎকৃষ্ট টীকা রসগঙ্গাধরের উপর 'গুরুধর্ম্ম প্রকাশ' নামক টীকা, ব্যাকরণ শাস্ত্রে তৎপ্রণীত 'পরিভাষেন্দুশেখর' 'প্রদীপোদ্দ্যোত' 'বৈয়াকরণ ভূষণ' 'বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত মঞ্জুষা' প্রভৃতি, দর্শন শাস্ত্রে 'পদার্থ দীপিকা' (ন্যায় গ্রন্থ), সাংখ্যসূত্রবৃত্তি, যোগসূত্রবৃত্তি, ব্যাসসূত্রেন্দুশেখর, চণ্ডীর টীকা, বেদসূক্ত ভাষ্য, প্রভৃতি বহু গ্রন্থ তাঁহার রচিত। খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি পরলোকবাসী হন। তাঁহার পৌত্র মণিরাম ভট্টও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

নাগেশ্বর রাও—বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও দেশহিতব্রতী। ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে অন্ধ্র প্রদেশের অন্তর্গত কৃষ্ণা জিলার এক গণ্ড গ্রামে, এক ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম কাশীনাথনী নাগেশ্বর রাও পান্থলু। তাঁহার পিতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। বিত্তশালী ব্যক্তিদের গৃহে দেবার্চ্চনা করিয়া তিনি স্বচ্ছল ভাবেই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল যে নাগেশ্বর ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তিই গ্রহণ করেন। কিন্তু নাগেশ্বরের মাতার বিশেষ আগ্রহে, কিছু-

কাল গৃহে সংস্কৃত অধ্যয়নের পর, তিনি ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। যথা-কালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি মাদ্রাজে গমনপূর্ব্বক, তত্রস্থ খ্রীশ্চান কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। এই পঠদ্দশাতেই রেঙ্গল বেঙ্কটসুব্বা রাও নামক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া তিনি প্রথমে অর্থোপার্জ্জনের জন্য কলিকাতায় উপস্থিত হন। কিন্তু কলিকাতায় তাঁহার থাকিতে ইচ্ছা না হওয়ায়, তিনি প্রথমে নিজ গ্রামেই প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দুই বৎসর পরে পুনরায় অর্থোপার্জ্জনের জন্য বোম্বাই নগরীতে উপনীত হন। তথায় প্রথমে কিছুকাল তিনি একজন মারাঠী ব্যবসায়ীর অধীনে চাকুরী করেন। তাহার পর ঐ ব্যবসায় উঠিয়া গেলে তিনি নিজে নানাপ্রকার ব্যাধির ঔষধ বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। এই কারবারে বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়া তিনি অমৃতাঞ্জন নামক একটি বেদনা-নাশক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া, বিশেষ উৎসাহের সহিত বিক্রয় করিতে থাকেন। এই ঔষধের ব্যবসায়েই তিনি প্রভূত বিত্তের অধিকারী হন।

প্রধানতঃ ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিলেও জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার প্রথমাবধি বিশেষ উৎসাহ ছিল। কর্ম্ম জীবনের প্রায় প্রথম চৌদ্দ বৎসর, ব্যবসায়-বৃদ্ধির দিকেই সাধারণতঃ তাঁহার সকল চেষ্টা নিযুক্ত ছিল। ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি "অন্ধ্র-পত্রিকা" নামে একখানি সাপ্তাহিক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি নিজেই উহার সম্পাদক ছিলেন। বোম্বাই হইতে তেলেগু ভাষায় প্রথম প্রকাশিত এই পত্রিকার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ প্রথমে সন্দেহ দৃষ্টিপাত করেন। কিন্তু পরে তাঁহাদের অবিশ্বাস দূর হইয়া যায়।

১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে মহাসমরের সময়ে, তিনি মাদ্রাজ নগরে "অন্ধ্র-পত্রিকা"র একটি শাখা কার্য্যালয় স্থাপন করেন এবং কিছুকাল পরে উহাকে দৈনিকে পরিণত করেন। উহারও সম্পাদন-কাজ প্রধানতঃ তিনিই সম্পন্ন করিতেন। অল্পকাল মধ্যেই ঐ পত্রিকার প্রচার বিশেষ বৃদ্ধি পায়। কিছুকালের জন্য তিনি তেলেগু অংশের সহিত কয়েক পৃষ্ঠা ইংরেজিও মুদ্রিত করিতেন। পরে অনাবশ্যক বোধে উহা পরিত্যক্ত হয়।

রাজনীতিতে প্রথম জীবনে তিনি মধ্যপন্থী ছিলেন এবং ফিরোজ শাহ্ মেহতা, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে প্রভৃতির মতাবলম্বী ছিলেন। পরে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর অভ্যুদয়ের পর তিনি ক্রমে ক্রমে তাঁহার মতানুযায়ী হন এবং সাক্ষাৎ-

ভাবে জাতীয় মহাসমিতির সহিত যুক্ত হইয়া রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। দেশের সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দিলেন এবং নিজের সুচিন্তিত কর্ম্মপদ্ধতি অনুসারে দেশের ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি কখনও উগ্রপন্থী ছিলেন না, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে লবণ-আইন ভঙ্গ করিয়া এবং আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়া, দুইবার কারাবরণ করেন। ১৯৩৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি রাষ্ট্র-সমিতি (Congress) কর্ত্তৃক মনোনীত এবং যথাবিধানে নির্ব্বাচিত হইয়া বড়লাটের আইনসভার (Indian Legislative Assembly) সদস্য পদ অধিকার করেন। তাঁহার বিবিধ জনহিতকর কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ অন্ধ্র জনসাধারণ তাঁহাকে "দেশোদ্ধারক" উপাধি প্রদান করেন। ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দে অনুষ্ঠিত অন্ধ্র-প্রাদেশিক সম্মেলনের তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন। কিছুকাল তিনি নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি (*All India Congress Committee*) একজন সদস্য এবং অন্ধ্র প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত "অন্ধ্র-পত্রিকা" ভিন্ন তিনি "ভারতী" নামে তেলেগু ভাষায় একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করিতেন। এই পত্রিকাখানি তাঁহার জীবদ্দশায় সুদীর্ঘকাল চলিয়াছিল। তিনিই প্রথম অন্ধ্রদেশে মাসিক পত্রিকায় রঙিন চিত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন এবং ঐ প্রকার চিত্রের উৎকৃষ্ট মুদ্রণ প্রণালী শিখিবার জন্য তিনি এক ব্যক্তিকে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কাজ তেলেগু ভাষায় "বিশ্ব-কোষ" প্রকাশ। উহা প্রকাশ করিতে তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন এবং সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচারের জন্য উহার মূল্যও আশাতীত সুলভ করেন।

কৃষি কার্য্যের উন্নতি সাধনের জন্য তিনি একস্থানে বহু বিস্তৃত অনুর্ব্বর ভূমি ইজারা লইয়া প্রায় দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে উহাকে ফলপ্রসূ করিয়া তোলেন। এইভাবে তিনি বহু লক্ষ মুদ্রা নানা সৎকাজে দান করেন। তাঁহার দানের মধ্যে জাতি-ধর্ম্ম বিচার ছিল না। যে কোনও কাজ সাহায্যার্হ বলিয়া মনে করিতেন, সেইখানেই উদারভাবে অর্থ সাহায্য করিতেন।

সম্পূর্ণ অনাড়ম্বরভাবে সাধু জীবন যাপন করিয়া এই অসাধারণ কর্ম্মী ও দেশহিতব্রতী ১৯৩৮ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

নাচী— মুসলমান রাজত্বের সময়ে দাক্ষিণাত্যে নাচী নাম্নী এক স্ত্রী কবির আবির্ভাব হইয়াছিল।

নাজির—আগ্রার কবি শেখ আলী মোহাম্মদের কবিজন সুলভ নাম। তাঁহার কাব্য গ্রন্থে ফারসী, উর্দ্দু ও হিন্দী এই তিন ভাষারই কবিতা আছে। আগ্রার জনসাধারণ তাঁহার কবিতা অতিশয় পছন্দ করিত। ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই আগষ্ট সোমবার তিনি আগ্রা নগরে পরলোক গমন করেন। তাজগঞ্জ নামক স্থানে তাঁহার সমাধি আছে।

নাজির আহাম্মদ—তিনি বাঙ্গালার নবাব মুরশিদ কুলী খাঁর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। এই ব্যক্তি নবাবের নিষ্ঠুর আচরণের প্রধান সহায় ছিল। মুরশিদ কুলী খাঁ রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে অতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন। কোনও অঞ্চলের রাজস্ব বাকী পড়িলে নবাব নাজির আহাম্মদের হস্তে তাঁহাকে প্রদান করিতেন। নাজির আহাম্মদের শাস্তির প্রণালী এইরূপ ছিল। নিম্নশির করিয়া পা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখা, হস্তপদ বাঁধিয়া পদতলে প্রহার করা, গ্রীষ্মকালে রৌদ্রে বসাইয়া রাখা, শীতকালে নগ্নদেহে শীতল জলের ছিটা দেওয়া।

মুরশিদ কুলী খাঁর সময়ে নাজির আহাম্মদ ও মুরাদ, নবাবের অভিপ্রায় অনুসারে প্রজাপীড়ন করিত। নবাব সুজাউদ্দিন এই দুই ব্যক্তির সমুদয় কুকার্য্যের বিষয় অনুসন্ধান করিতে আদেশ দিলেন। অনুসন্ধানে তাঁহাদের দোষ প্রমাণিত হইল, নবাব তাঁহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। বলাবাহুল্য এই আদেশ অনতিবিলম্বে প্রতিপালিত হইয়াছিল।

নাজির খাঁ—শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরফের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ মিকায়েলের চারি পুত্রের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ ছিলেন। মিকায়েলের দ্বিতীয় পুত্র আব্বাস খাঁ (দরওয়া খাঁ) অতিশয় প্রতাপশালী ছিলেন। দিল্লীতে মুঘল দরবারে প্রভাব বিস্তার করিয়া এক ওমরাহ কন্যাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। দিল্লীর সম্রাট হইতে তিনি তরফে প্রচুর ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া স্বদেশ অভিমুখে রওয়ানা হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা নাজির খাঁ আব্বাস খাঁর উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া পথি মধ্যে (বর্ত্তমান বেজুরা নামক স্থানে) তাঁহাকে বধ করেন। তাঁহার সাধ্বী পত্নী পতি বিয়োগে মর্ম্মাহত হইয়া আর এদেশে অবস্থান না করিয়া দিল্লীতে পিতৃগৃহে চলিয়া যান। যে স্থানে তিনি স্বীয় স্বামী হইতে বিচ্যুত হন, সেই স্থান তদবধি বেজুরা নামে খ্যাত হইয়াছে। মিকায়েল খাঁ, নাজির খাঁর এই ব্যবহারে অতিশয় মর্ম্ম পীড়িত হইয়া তৃতীয় পুত্র মুসা খাঁকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। নাজির খাঁর খনিত একটী দীর্ঘিকা তরফের অন্তর্গত নরপতি গ্রামে এখনও বর্ত্তমান আছে।

নাজির বক্তিয়ার খাঁ—একজন গ্রন্থকার। বক্তিয়ার খাঁ নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে 'মিরাট আলম' অর্থাৎ 'জগদ্দর্পণ' নামক গ্রন্থই প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে সম্রাট আওরঙ্গজীবের রাজত্বের প্রথম দশ বৎসরের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে।

নাজির মোহাম্মদ—'মোনাই যাত্রা' পুস্তকের রচয়িতা। তাঁহার নিবাস রংপুর জিলার গোবিন্দগঞ্জ থানার অধীন চাষকপাড়া গ্রামে ছিল।

নাজির মোহাম্মদ সরকার—একজন মুসলমান গ্রন্থকার। তিনি বগুড়া জিলার অধিবাসী ছিলেন। ১১৮৬ বঙ্গাব্দে তাঁহার রচিত গ্রন্থ 'সোনাই যাত্রা' প্রকাশিত হয়।

নাড় বা নাঢ় পণ্ডিত—খ্রীঃ ১১শ শতকে বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রভাব ছিল। ঐ সময়ে অনেক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত বর্ত্তমান ছিলেন। নাঢ় পণ্ডিত তাঁহাদের অন্যতম। তিনি অতীশদীপঙ্করের সমসাময়িক ছিলেন। ভুটিয়ারা তাঁহাকে নারো বলিত এবং এখনও সিদ্ধপুরুষ বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। ওয়াডেন সাহেব ভুটিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে তাঁহার চেহারা দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় তিনি বর্ত্তমানকালের বাউলদিগের ন্যায় গোঁফ দাড়ি কামান ও লম্বা চুল রাখিতেন। তাঁহার স্ত্রীকে নাঢ়ী বলা হইত। তাঁহার পত্নী নাঢ়ীও একজন মহা বিদুষী ছিলেন। নাঢ়ীকে বৌদ্ধেরা জ্ঞানডাকিনী উপাধি প্রদান করেন। নাড় পণ্ডিত তাঁহার পত্নীসহ (শক্তি) হেরুক ও হেবজ্র প্রভৃতি যুগনদ্ধ মূর্ত্তির উপাসনা করিতেন। পূর্ব্বে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকদিগকে বঙ্গদেশে নাঢ়া নাঢ়ী বলা হইত; কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহারা ন্যাড়া নেড়ীর দল নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

নাথবরাহ—বরাহভূম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। প্রাচীনকালে শ্বেতবরাহ ও নাথবরাহ নামক দুইজন ক্ষত্রিয় রাজকুমার পশ্চিম প্রদেশ হইতে জঙ্গল মহলের অন্তর্গত (বর্ত্তমান মানভূম জেলার অধীন) পাতকুম রাজ্যে আগমন করিয়া পাতকুম রাজের অধীনে সৈনিকের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা উভয় ভ্রাতাই ক্ষত্রিয়োচিত তেজবীর্য্যশালী ছিলেন। পাতকুমের রাজা তাঁহাদের শৌর্য্যবীর্য্য দর্শনে তাঁহাদের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন। একবার তাঁহারা নিজেদের বীরত্ব প্রদর্শন করিতে যাইয়া পাতকুমরাজের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য শ্বেতবরাহ নিহত হন। তৎপর মহারাজ নাথবরাহকে স্বীয় রাজ্যের পূর্ব্বাংশ প্রদান করেন। নাথবরাহ ঐস্থানে রাজ্য স্থাপন করেন এবং তাঁহাদের উভয় ভ্রাতার নামানু-

সারে এই রাজ্যের নাম বরাহভুম হইল।

নাথমুনি—একজন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। দশম শতাব্দী হইতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রচার আরম্ভ হয়। সেই সময়ে তিনি উহার প্রধান আচার্য্য ছিলেন। বীর-নারায়ণপুরে এক সদ্‌ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম হয়। ঈশ্বরমুনি নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল। ঈশ্বরমুনি অতি অল্প বয়সেই লোকান্তরিত হন। এই ঈশ্বরমুনিরই পুত্র যামুনাচার্য্য। পুত্রের মৃত্যুর পরে নাথমুনি সন্ন্যাসী হন। তিনি মুনি তুল্য নির্ম্মল জীবন অতিবাহিত করিতেন। এইজন্য তাঁহার নাম নাথমুনি। যোগে সিদ্ধি লাভ করিয়া যোগেন্দ্র নামেও তিনি খ্যাত ছিলেন। স্বরচিত দুইখানা গ্রন্থে তিনি তাঁহার নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। অনুমান ৯০৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

নাদিরশাহ—পারস্যের সম্রাট। ১৬৮১ খ্রীঃঅব্দে, খোরাসান প্রদেশের আফসার তুর্কমান জাতীয় কির্কলু বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা মেষপালক ও মেষচর্ম্মের জামা টুপি প্রস্তুতকারী দর্জী ছিলেন। তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে একদল উজবেগ দস্যু তাঁহাদের গ্রাম আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার মাতাকে বন্দী করিয়া তাহার দেশে লইয়া যায়। অচিরেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হইল। তিনি কয়েক বৎসর পরে পলায়ন করিয়া খোরাসান প্রদেশে চলিয়া আসেন এবং তথায় একটী ক্ষুদ্র সহরের শাসনকর্ত্তার অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপরে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পরে তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। খোরাসান প্রদেশে একজন অত্যাচারী পাঠান শাসনকর্ত্তা ছিলেন। অচিরেই নাদিরের সহিত তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হয়। নাদির দস্যুদল সংগ্রহ করিয়া বলসঞ্চয় করিলেন। ক্রমে কিলাৎ-ই-নাদিরী দুর্গ ও খোরাসানের রাজধানী নিশাপুর অধিকার করিলেন। তাহার পরেই পারস্যের তদানীন্তন নির্ব্বাসিত সম্রাট শাহ তহমাস্পের সহিত যোগ দিয়া, আফগানদের হস্ত হইতে স্বদেশকে উদ্ধার করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে খিলজাই জাতীয় মাহমুদ পারস্যের শাহ হোসেনকে পরাস্ত করিয়া সিংহাসন, অধিকার করিয়াছিলেন। শাহ হোসেনের পুত্র মিরজা-তহমাস্প পলায়নপূর্ব্বক মান্দারাণ প্রদেশে চলিয়া গেলেন এবং সেই স্থানেরই রাজা বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। এদিকে সুন্নী আফগানেরা শিয়া পারস্যবাসীদের উপর অতিশয় নির্য্যাতন আরম্ভ করিল। তৎফলে বহু লোক দূরদেশে পলায়ন করিল। এবং অনেকে নিহত হইল। এই সময়ে মিরজা তহমাস্প নাদিরের বল-

বীর্য্যের কথা শুনিয়া তাঁহার সাহায্য-প্রার্থী হইলেন। নাদির তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। দুরন্ত আফগানদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া স্বদেশ হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন। নাদির আফগানদের কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ পূর্ণরূপেই প্রদান করিলেন। বহু আফগান নরনারী বালক বৃদ্ধ তরবারী মুখে সমর্পিত হইল। অবশেষে নাদির স্বদেশের শত্রুদিগকে বিতাড়িত করিয়া শাহ তহমাস্পকে পারস্যের সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন, ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

কৃতজ্ঞ শাহ অর্দ্ধেক পারস্য দেশ নাদিরকে প্রদানপূর্ব্বক, তাঁহাকে সুলতান উপাধি ও নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। নাদির শাহ এখন পারস্যের পশ্চিম প্রান্ত হইতে তুর্কিদিগকে বিতাড়িত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পারস্যের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া তুর্কিরা পশ্চিম প্রান্তের কোনও কোনও স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। নাদির শাহ তাঁহাদিগকে পারস্য সীমানার বাহিরে তাড়াইয়া দিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই তিনি হিরাট অধিকার করিবার জন্য তদভিমুখে অভিযান করিলেন। এই সময়ে শাহ তহমাস্প নিজের শক্তির প্রতি অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পারস্য-প্রান্তবর্ত্তী তুর্কিদিগকে আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হইয়া অর্জিত রাজ্যও হারাইলেন। ইহাতে পারস্যের লোকেরা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, নাদিরশাহকে তৎস্থানে স্থাপন করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু নাদিরশাহ ইহাতে সম্মত হইলেন না। শাহ তহমাস্প রাজ্যচ্যুত হইলেন কিন্তু তাঁহার আট মাসের শিশু পুত্র তৎস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নাদির শাহ তাঁহার অভিভাবক হইলেন। (১৭৩২ খ্রীঃ)। চারি বৎসর পরে শিশু আব্বাস শাহ পরলোক গমন করিলেন। তখন নাদির শাহ ১৭৩৬ খ্রীঃ অব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী পারস্যের সিংহাসনে স্বয়ং আরোহণ করেন।

তিনি রাজা হইয়াই হৃতরাজ্যগুলি পুনরুদ্ধার করিতে মনোযোগী হইলেন। তুরস্ক দেশ আক্রমণ করিয়া জর্জিয়া ও আর্ম্মানিয়া অধিকার করিলেন। রুশিয়ার সহিত সন্ধি করিয়া কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্ত্তী প্রদেশগুলি ফিরিয়া পাইলেন। আরবদিগকে পরাস্ত করিয়া পারস্য উপসাগরের দ্বীপগুলি অধিকার করিলেন। দেশের অভ্যন্তরস্থ দস্যুদিগকে কঠোর হস্তে নির্য্যাতন করিয়া, পরে স্বীয় সৈন্য দলে ভর্ত্তি করিলেন। কিন্তু খুব শাসনাধীনে রাখিলেন। এখন পূর্ব্বদিকে আফগানদিগকে দমন করিতে প্রয়াসী হইলেন। এক বৎসর অব-

রোধের পর ১৭৩৮ খ্রীঃ অব্দে কান্দাহার দুর্গ ভূমিসাৎ হইল। কান্দাহার জয় করিয়া এই অসাধারণ রাজনীতিবিদ পণ্ডিত, তদ্দেশবাসীদেরে কোনও প্রকার শাস্তি ত দিলেনই না, বরং প্রধান প্রধান সর্দ্দারদিগকে বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করিয়া, স্বীয় সৈন্য দলে গ্রহণ করিলেন। আর একটী বিষয়ে তিনি আরও বিশেষ বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি খুরাসানবাসী আবদালী জাতিকে কান্দাহারে এবং কান্দাহারের দুর্দ্দান্ত ঘিলজাই জাতিকে খুরাসানে বসতি করিতে বাধ্য করাইয়াছিলেন। এই সকল কার্য্য করিয়া তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণের পথ সুগম করিলেন।

এই সময়ে মোহাম্মদ শাহ দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। তাঁহার শক্তিও খুব প্রবল ছিল না। মালবদেশ মহারাট্টাদের করতলগত হইলে, মলহর রাও হোলকার সসৈন্যে আগ্রার দক্ষিণ অংশে উপস্থিত হইয়া, সমস্ত দোয়াব প্রদেশ লুণ্ঠন করিলেন। দিল্লীর মোহাম্মদ শাহ অন্য উপায় না দেখিয়া, অযোধ্যার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা সাদত আলীর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি আসিয়া মহারাট্টাদের তাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু তাহারা পর বৎসরই আবার মোগল রাজ্যে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। দিল্লীর সম্রাট উপায়ান্তর না দেখিয়া, হায়দরাবাদের নিজামের সাহায্য চাহিলেন। তিনি দেখিলেন, মুগল রাজ্য নষ্ট হইলে, মহারাট্টারাই ভারতবর্ষে প্রবল হইবে। তখন তাঁহার অবস্থাও শোচনীয় হইতে পারে। এই সকল বিবেচনা করিয়া তিনি দিল্লী গমন করিলেন। অতি কষ্টে ৩৪ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, তিনি মহারাট্টাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মহারাট্টারা তাঁহাকে চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া অবরুদ্ধ করিল। নিজাম ২২ দিন অবরুদ্ধ থাকিয়া মালবদেশ এবং নর্ম্মদা মহারাট্টাদের প্রদান করিয়া মুক্তি পাইলেন।

ভারতবর্ষের এই অবস্থার সময়ে ১৭৩৯ খ্রীঃ অব্দে নাদির শাহ পঞ্চনদ প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। পাঞ্জাব বিধ্বস্ত করিয়া তিনি দিল্লীর নিকট কারনালে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে মোহাম্মদ শাহ, নাদির শাহের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হন। অযোধ্যার নবাব সাদত আলীও, মোহাম্মদ শাহের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি নাদিরের হস্তে বন্দী হন। সাদত আলী পারস্যের অধিবাসী ও নাদির শাহের সহিত পূর্ব্ব হইতেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। এই কুতন্ত্রের জন্য সম্রাট মোহাম্মদ শাহকে অনেক বেশী ক্ষতি পুরণ দিতে হইল। মোহাম্মদ শাহ সন্ধির প্রস্তাব করিলে, নাদির শাহ সম্মত হইলেন। কথা হইল উপযুক্ত

ক্ষতি পুরণ পাইলে নাদির শাহ চলিয়া যাইবেন। কিন্তু সাদত আলী তাঁহাকে কিছুদিন অপেক্ষা করিলেই বেশী ক্ষতি পুরণ পাইবেন বলিয়া বলিলেন। মোহাম্মাদ শাহ বিলম্ব দেখিয়া একদিন পাত্র মিত্র সহ নাদির শাহের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। নাদির শাহ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। মোহাম্মদ শাহ, নাদির শাহ সহ দিল্লীতে প্রবেশ করিলেন। লুণ্ঠন প্রিয় পারসিক সৈন্য নাদির শাহের কঠোর শাসনে হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া রাখিল। পর দিন একজন কলহ প্রিয় পারসিক সৈনিক, কপোত ক্রয় ব্যপদেশে বিবাদের সুত্রপাত করিল। তাহার দুর্ব্যবহারে নাগরিকগণ উত্তেজিত হইয়া রাত্রিকালে পারসিকদিগকে আক্রমণ করিল। এদিকে নাদির শাহের অমূলক মৃত্যু সংবাদ প্রচার হওয়াতে নগরবাসীরা আরও উত্তেজিত হইল। নাদির শাহ স্বীয় সৈন্যদিগকে রাত্রিতে আত্মরক্ষা করিতে বলিয়া পর দিন প্রাতঃকালে নগরবাসীদিগকে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। পারসিক সৈনিকেরা তরবারি কোষোন্মুক্ত করিয়া বালবৃদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে হত্যা করিতে লাগিল। সুদৃশ্য প্রাসাদাবলী অগ্নি সংযোগ ভস্মীভূত করিল। প্রাতঃকাল হইতে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত নয় ঘণ্টাকাল এই পৈশাচিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। নাদির শাহ একটী মসজিদের উপর বসিয়া এই হত্যাকাণ্ড দর্শন করিতেছিলেন। অবশেষে প্রজার এই প্রকার শোচনীয় আর্ত্তনাদে ব্যথিত হইয়া, সম্রাট মোহাম্মদ শাহ, নাদির শাহের নিকট গমন পুর্ব্বক কম্পিত কলেবরে, অবনত মস্তকে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। ইহাতে নাদির শাহের ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হইল। তাঁহার আদেশে এই হত্যাকাণ্ড ও গৃহ দাহন বন্ধ হইল। সহরে শান্তি স্থাপিত হইল। নাদির শাহ রাজপ্রাসাদে গমনপূর্ব্বক মোহাম্মদ শাহকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন। নাদির শাহ পঞ্জাব ও আফগানিস্থান স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। জগত বিখ্যাত কোহিনুর ও ময়ুর সিংহাসন এবং দিল্লীর রাজকোষে সঞ্চিত বহু ধনরত্ন (অনুমান দেড়শত কোটী টাকা) লইয়া তিনি স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

নাদির শাহ একজন অসাধারণ ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন। যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী তাঁহার সমকক্ষ লোক তৎকালে সমস্ত পৃথিবীতে আর কেহ ছিলেন না। তাঁহাকে এসিয়ার নেপোলিয়ান বলা যাইতে পারে। তিনি তৎকালে প্রচলিত কামান বন্দুক যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিতেন। ইউরোপীয় দিকে তাঁহার সৈন্য শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিতেন। কিন্তু তাঁহার ইঙ্গিতে

সৈন্য পরিচালিত হইত। তাঁহার আদেশ অন্যথা করিবার উপায় ছিল না।

এই প্রকার শক্তিশালী লোকও মন্দমতি কর্ম্মচারীদের ষড়যন্ত্রের কবল হইতে রক্ষা পাইলেন না। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলী কুলী খাঁ এই চক্রান্তের অধিনায়ক হইলেন। ১৭৪৭ খ্রীঃ অব্দের ১০ই মে নাদির শাহ নিহত হইলেন। আলী কুলী খাঁ, নাদির শাহের ১৩ জন পুত্র ও পৌত্র হত্যা করিয়া রাজসিংহাসন নিষ্কণ্টক করিলেন। নাদির শাহের মৃতদেহ মাসেদ নগরে সমাহিত হইয়াছিল।

নানক—শিখ-ধর্ম্ম- প্রবর্ত্তক গুরু। ১৪৬৯ খ্রীঃ অব্দে (৮৭৬ বঙ্গাব্দ) পঞ্জাব প্রদেশের লাহোর নগরের পাঁচ ক্রোশ উত্তরে তালবণ্ডী (বর্ত্তমান নানকান) নামক স্থানে ক্ষত্রিয়বংশে গুরু নানকের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কালুবেদী ও মাতার নাম ত্রিপতা। বেদী তাঁহাদের উপাধি। প্রবাদ আছে যে, অযোদ্ধাপতি রামচন্দ্র হইতে এই বংশের উদ্ভব হইয়াছে এবং ঐই বংশের আদিপুরুষ কুলপত 'বেদ' পড়িয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বংশ সেই হইতে 'বেদী' নামে পরিচিত হয়।

আপন প্রতিভাবলে যাঁহারা পৃথিবীতে সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারই জন্ম ও জীবনের নানারূপ কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়। নানক সম্বন্ধেও এরূপ অনেক ঘটনা শুনা যায়। তাঁহার পিতা কালুবেদী দার পরিগ্রহের পর বহুদিন নিঃসন্তান ছিলেন। একদিন কোন এক সন্ন্যাসীর দর্শন পাইয়া কালুবেদী নানা প্রকারে তাঁহার তুষ্টিবিধান করেন এবং অপত্যাভাবে তাঁহাদের মনোকষ্টের কারণ সন্ন্যাসীর নিকট ব্যক্ত করিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার সেবা পরিচর্য্যায় তুষ্ট হইয়া কিঞ্চিৎ প্রসাদ তাঁহার স্ত্রীকে ভক্ষণ করিতে দিলেন। ইহার কিছুকাল পরে ক্রমে কালুবেদীর এক পুত্র নানক এবং এক কন্যা নানকীর জন্ম হয়। জন্মের পূর্ব্বেই সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, কালে নানক পৃথিবীর মধ্যে একজন বিখ্যাত লোক হইবে।

নানকের জন্মের পর কালুবেদী নামকরণের জন্য কুল পুরোহিতকে আহ্বান করিলে, তিনি আসিয়া শিশুর অপরূপ রূপ লাবণ্য ও অসাধারণ চিহ্ন সকল দর্শন করিয়া এবং জন্মতিথি নক্ষত্রাদি বিচার করিয়া কালুবেদীকে বলিলেন, 'এই শিশু আপনার কুল পবিত্র করিবে।' তৎপর কুলপুরোহিত নবজাত শিশুর নাম 'নানক নিরঙ্কারী' রাখিলেন। কেহ কেহ বলেন নানক মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমবার সন্তান প্রসবের সময় পঞ্জাবের রমণীগণ প্রায়ই আপন আপন পিতৃ-

গৃহে গমন করিয়া থাকেন এবং যে সকল সন্তানের মাতুলালয়ে জন্ম হয়, পঞ্জাব রমণীরা তাহাদিগকে আদর করিয়া নান্‌কী বলিয়া থাকে। অনেকে বলেন এই নান্‌কী হইতেই তাঁহার নাম নানক হইয়াছে। কথিত আছে যে, নানকের এক বৎসর বয়সের সময় তাঁহার মাতাপিতা দৈববাণী যোগে পুত্রের অলৌকিক জীবন অবগত হইয়াছিলেন এবং তদবধি তাঁহারা পুত্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। দৌলত খাঁ লোদীর জয়রাম নামক একজন হিন্দু কর্ম্মচারীর সহিত নানকের ভগিনী নানকীর বিবাহ হইয়াছিল।

শিশুকাল হইতেই সাধু মহাত্মার প্রতি নানকের অচলা ভক্তি ছিল, রাস্তা দিয়া কোন সন্ন্যাসী, বৈরাগী ও ফকির চলিয়া যাইতে দেখিলে তিনি তাঁহাদিগকে গৃহে ডাকিয়া আনিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত সেবা পরিচর্য্যা করিতেন। পাঁচ বৎসর বয়সের সময় নানক প্রথমে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে গোপাল পাঁধার (গুরু মহাশয়) নিকট শিক্ষা লাভ করেন। এইখানে কিছুকাল শিক্ষা লাভ করিয়া পরে তিনি বৈদ্যনাথ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। আজকালের ইংরেজী ভাষার ন্যায় সেই সময়ে ফারসী ও উর্দ্দু ভাষার অতিশয় সমাদর ছিল। নানকের পিতা কালু-বেদী তালবণ্ডী গ্রামের জমিদার রায় বুলারের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। রায় বুলার নানকের সুন্দর স্বভাব ও সুলক্ষণাদি দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এই জমিদারের অনুরোধে নানক কুতবুদ্দিন নামক এক মোল্লার নিকট ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। নানক অল্প দিবসের মধ্যেই স্বীয় অসাধারণ শক্তি দ্বারা সংস্কৃত, ফারসী ও গণিত বিদ্যাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষার বর্ণমালার প্রত্যেক বর্ণের এক একটি তত্ত্বজ্ঞান গর্ভ শ্লোক রচনা করিয়া তিনি শিক্ষকদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। শিক্ষকগণকেও তিনি ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক মূল্যবান্ কথা বলিতেন।

এক দিবস নানক নদীতে স্নান করিতে যাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, কয়েকজন ব্রাহ্মণ স্নান সমাপন করিয়া নদীতে তর্পন করিতেছেন। তখন তিনি অঞ্জলী ভরিয়া তীরস্থ ভূমিতে জল সেচন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই কার্য্য দর্শনে ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "তুমি ইহা কি করিতেছ" ? তদুত্তরে নানক বলিলেন, "আপনারা কি করিতেছেন, পূর্ব্বে আমায় বলুন, তৎপর আমি জল লইয়া কি করিতেছি বলিব"। তখন ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, "আমরা আমাদের স্বর্গগত পিতৃপুরুষের তৃপ্তির জন্য জলদান করিতেছি"। ইহার পর নানক বলিলেন, "তালবণ্ডীতে

আমার একটি শাকের ক্ষেত্র আছে, আমি তাহাতে জল দিতেছি”। তাহাতে ব্রাহ্মণগণ বলিলেন—“তাল-বণ্ডীতে তোমার শাকের ক্ষেত্র আছে, তথায় এজল কেমন করিয়া যাইবে ?” তদুত্তরে নানক বলিলেন যে,—“আমি এখানে জল সেচন করিলে সামান্ত দূর তালবণ্ডীতে যাইবে না, যদি জানেন, তাহা হইলে আপনারা এখানে জল সেচন করিলে, আপনাদের স্বর্গগত পিতৃপুরুষগণ পাইবেন, একথা কিরূপে বিশ্বাস করেন” ? ব্রাহ্মণগণ তাঁহার এই কথা শুনিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।

পুত্রের নয় বৎসর বয়সের সময় কালুবেদী তাঁহার উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করেন। প্রথমে নানক যজ্ঞো-পবীত ধারণ করিতে স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু পরে লোকাচার রক্ষা এবং মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজনের মনস্তুষ্টির জন্য তাহা গ্রহণ করিয়াছিলে। নানক উপবীত ধারণকালে পুরোহিত মহা-শয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—“মহা-শয় ! এই সূত্র ধারণ করিলে কি হয় ? যে ব্যক্তি কুকার্য্যে রত থাকে, এই সূত্র কি তাহাকে নরক হইতে রক্ষা করিতে পারিবে ? যদি দয়ারূপ কার্পাস, সন্তোষরূপ সূত্র, ইন্দ্রিয় দমনরূপ গ্রন্থি ও সত্যরূপ দণ্ডী ধারণ করা যায়, তাহা হইলে পাপীগণ পাপ মুক্ত হইতে পারে। যাহা মনুষ্যকৃত তাহা ক্ষণ-ভঙ্গুর, তাহা কখনও মানুষের চিরসঙ্গী হইতে পারে না ; সুতরাং মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণের উপবীত শ্মশানেই পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়, পরকালে তাহা তাঁহার সঙ্গে যাইয়া ধর্ম্মরাজের দ্বারে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারে না”। উপস্থিত সকলেই নানকের এই সব কথা ও অলৌকিক ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানকের ঈশ্বর ভক্তিও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি ক্রমে ক্রমে সংসারের প্রতি একে-বারে উদাসীন হইয়া পড়িলেন এবং অধিক সময়ই সাধু সন্ন্যাসীদিগের সহ-বাসে সময় অতিবাহিত করিতে ভাল বাসিতেন। কালুবেদী পুত্রের এইরূপ ভাব দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহাকে বিষয় কার্য্যে লিপ্ত করিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিতে লাগি-লেন। কিন্তু নানকের মন বিষয় সম্পত্তিতে মুগ্ধ হইত না।

ক্রমেই নানক ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হইতে লাগিলেন। তিনি সংসারের কাজ কর্ম্ম, মানুষের সহিত আলাপ আলোচনা এমন কি আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলেন, সর্ব্বদা একখানি বস্ত্রে আবৃত হইয়া ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন হইয়া থাকিতেন। তাঁহার পিতা সর্ব্বদা উপদেশাদির দ্বারা তাঁহাকে কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা

করিতেন। কিন্তু নানক পিতাকে নানাপ্রকার তত্ত্বপূর্ণ বাক্যে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন। অনেক সময় কালুবেদী পুত্রের এইসব তত্ত্বপূর্ণ কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া মনে করিতেন যে, নানক প্রলাপ বাক্য বলিতেছে। পিতামাতা, আত্মীয় বন্ধু সকলেই নানকের মস্তিষ্ক বিকৃতি হইয়াছে মনে করিয়া চিকিৎসক ডাকিবার জন্য কালু-দেবীকে পরামর্শ দিল। কালুবেদী নানকের রোগ নির্ণয়ের জন্য হরিদাস বৈদ্যকে ডাকিয়া আনিলেন। বৈদ্য রোগ পরীক্ষা করিবার জন্য নানকের নিকট গমন করিলে তাঁহার সহিত হরিদাসের যে কথাবার্ত্তা হয়, উহাতেই চিকিৎসক তাঁহার অলৌকিক ভাব ও কথায় মুগ্ধ হন। তিনি বুঝিতে পারেন যে, নানক ঈশ্বর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া-ছেন। অবশেষে তিনি নানকের পিতাকে ডাকিয়া বলিলেন 'তোমার পুত্র সামান্য ব্যক্তি নহেন, আমাদের ন্যায় সাংসারিক জীব তাঁহাকে রোগ মুক্ত করিতে পারিবে না।

এক সময়ে নানক পিতার অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে বিষয় কার্য্য করিতে সম্মত হন। একদিবস তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিশ টাকা এবং ভাই বালা নামক একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য সঙ্গে দিয়া (খারা সওদা) উৎকৃষ্ট ব্যবসায় করিতে প্রেরণ করেন। পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা বৃক্ষলতাদিপূর্ণ একটি নির্জ্জন স্থানে তপস্যায় নিরত একটি সাধু মণ্ডলী দেখিতে পাইলেন। নানক সন্ন্যাসী-গণের তপস্যাদি দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন, এবং সঙ্গীয় টাকা দ্বারা খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া সন্ন্যাসীদিগকে ভোজন করাইলেন। তৎপর নানক শূন্য হস্তে গৃহে প্রত্যাগত হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে যথেষ্ট প্রহার করিলেন।

ক্রমে নানক বিংশতি বৎসরে পদা-র্পণ করিলেন। একদিন গ্রামের প্রান্তে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন শুনিয়া সন্ন্যাসী দর্শনে তথায় গমন করিলেন। নানকের বৈরাগ্যের কথা সন্ন্যাসী পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। এখন তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার হস্তের অঙ্গুরী ও সঙ্গীয় জলপাত্রটি চাহিলেন। নানক তৎক্ষণাৎ স্বীয় অঙ্গুরী জলপাত্র সন্ন্যাসীকে প্রদান করিলেন। সন্ন্যাসী পুনরায় নানককে তাঁহার অঙ্গুরী ও জলপাত্র গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু নানক আর তাহা গ্রহণ করেন নাই। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নানককে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিলেন। নানক তাঁহার ভগিনী নানকীর নিকট সুলতানপুরে গমন করিলেন। নানকের ভগিনীপতি জয়রাম সুলতানপুরের নবাব দৌলত খাঁ লোদীর অধীনে প্রতিপত্তির সহিত

কর্ম্ম করিতেছিলেন। জয়রাম বিশেষ চেষ্টা করিয়া নানককে নবাবের দপ্তরে মুদিখানার কার্য্যাদক্ষের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু নানক পূর্ব্বের ন্যায় সন্ন্যাসী ফকির প্রভৃতি দেখিলে অর্থদান করিতেন। ইহাতে কেহ কেহ নবাবের নিকট নানকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। নবাব সন্দেহ পরবশ হইয়া একজন কর্ম্মচারীর দ্বারা মুদিখানার হিসাব পরীক্ষা করাইলেন কিন্তু হিসাবের কোনও গোলমাল না পাইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, নানকের বিরুদ্ধে এতদিন যে অভিযোগ করিতেছিল লোকে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। নানকের কথাও ভাবে নবাব তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন এবং তাঁহার প্রাপ্য টাকা ব্যতীত আরও তিন সহস্র টাকা তাঁহাকে পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিলেন। নানক গৃহে আসিয়া সমস্ত টাকা ভগিনীর নিকট প্রদান করিলেন। এই সময়ে নানক তাঁহার ভগ্নী নানকী জয়রামের বিশেষ চেষ্টায় পক্ষ কারান্ধবে গ্রামের চৌনীবংশীয় ক্ষত্রিয় মুলার সুলখনা নাম্নী সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেন। তৎপরে নানক জয়রামের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মুদিখানার নিকট বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া তথায় সস্ত্রীক বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে নানকের শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীদাস নামে দুইটী পুত্র হইয়াছিল। দ্বিতীয় পুত্রের জন্মকালে নানকের চিরপোষিত ধর্ম্মভাব অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। যুবতী পত্নী, শিশু সন্তান, আত্মীয় স্বজন সকলের মায়া কাটাইয়া নানক সপ্তবিংশতি বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। ভাই বালা ও মর্দ্দানা নামে দুই ব্যক্তি তাঁহার চিরানুচর হইয়াছিলেন। মর্দ্দানা অতি নীচ জাতীয় মুসলমান ডোম ছিলেন। কিন্তু নানকের গুণে মুগ্ধ হইয়া শিখ ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচারে তাঁহার সহচর হন। মর্দ্দনার চমৎকার সঙ্গীত শক্তি ছিল, তাঁহার গানে নানকের ভগবদ্ভক্তি উদ্বুদ্ধ হইত। নানক নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া কিছুকাল পর জন্মভূমি তালবণ্ডীতে গমন করেন। গ্রামের জমিদার রায় বুলারের বিশেষ অনুরোধে তিনি তাঁহার গৃহেই অবস্থান করেন। এই সময় নানকের পিতা কালুবেদী, মাতা ত্রিপতা, খুল্লতাত লালু এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন নানককে গৃহে থাকিয়া ভগবৎ চিন্তা করিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। জমিদার রায় বুলারও তাঁহাকে এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, এমন কি রায় বুলার তাঁহার জন্য গ্রামে পৃথক ভজনালয়, সন্ন্যাসী, ফকিরদিগের সেবার জন্য অতিথিশালা পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করাইয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু নানক কিছুতেই সম্মত

হইলেন না। তিনি বলিলেন, "ভগবান যখন যেখানে আদেশ করিবেন আমাকে সেইস্থানেই যাইতে হইবে। আমি ভগবানের আদেশ অবহেলা করিয়া চলিতে পারি না"। কিছুদিন তালবণ্ডীতে অবস্থান করিয়া নানক ভাই বালা ও মর্দ্দানাকে সঙ্গে লইয়া ১৫৫৩ সংবৎ ৯ই পৌষ সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন। গৃহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে নানক মাতার বিশেষ অনুরোধে একরাত্র মাতার নিকট অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং রায় বুলারকে জলকষ্ট নিবারণের জন্য গ্রামে একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। রায় বুলার গুরুর আদেশ পালন করিয়াছিলেন এবং নানকের নামেই তালবণ্ডীতে একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। শিখেরা এই জলাশয়কে অত্যন্ত পবিত্র জ্ঞান করেন।

নানক তালবণ্ডী হইতে যাত্রা করিয়া কিছুকাল বিপাশা নদীর তীরে আসিয়া গভীর ধ্যান ধারণায় নিরত থাকেন। নিকটস্থ পল্লীবাসীরা দলে দলে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া যাইতে লাগিল। ক্রোড়িয়া নামে তাঁহার এক ভক্ত বিপাশা নদীর তীরে এক নগর স্থাপন ও বাস ভবনাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। নানক সেই নগরের নাম "কর্ত্তারপুর" রাখিলেন এবং তদনন্তর নানকের পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয় কুটুম্বগণ এখানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ক্রোড়িয়া নানকের পরিবারের জন্য প্রচুর ভূসম্পত্তি প্রদান করিলেন। এই কর্ত্তারপুর এখন শিখদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। "সাহাজাদা" (নানকের বংশ) এখানে অদ্যাবধি অনেকে বাস করিতেছেন। শিখেরা তাঁহাদিগকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন।

কর্ত্তারপুরে আসিয়া নানকের পিতা কালুবেদী একবার তাঁহার পিতৃ শ্রাদ্ধের আয়োজন করিলেন। নানক ইহা দেখিয়া পিতাকে বলিলেন, "বৃথা কেন এই সমস্ত কার্য্য করিতেছেন, উহাতে কি মৃত দেহের কোন উপকার হয়? আপনার পিতার উদ্ধার হইয়াছে, আপনি আপনার মোহরূপ রজ্জু দিয়া কেন তাঁহাকে অনর্থক মায়ায় আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চান। আকাশে উড্ডীন ঘুড়ী সকল যেমন আকাশে উড়িয়াও সূত্র দ্বারা বালকের হস্তে আবদ্ধ থাকে, ভ্রান্ত জীবেরা সেইরূপ আপনাদের মুক্তাত্মা পরলোকবাসী পিতৃপুরুষদিগকে আপনাদের মোহরূপ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করে"।

নানক পরিজনসহ কিছুকাল কর্ত্তারপুরে বাস করিয়া ধর্ম্ম প্রচারার্থ সন্ন্যাসী বেশে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করেন।

তিনি সর্ব্বত্র হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে নিরাকার পরমেশ্বরের নাম প্রচার করিতেন। তিনি কোনও সময় হিন্দু সন্ন্যাসীদিগের কোনও সময় মুসলমান ফকিরদিগের পোষাক পরিধান করিতেন। আবার কোনও সময় উভয় জাতীয় সন্ন্যাসীদিগের মিশ্রিত পরিচ্ছদও পরিধান করিতেন। অনেক মুসলমান তাঁহাকে মুসলমান বলিয়াই জানিতেন। হিন্দু মুসলমান সকলেরই ধর্ম্মভাবে শৈথিল্যতা প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া তিনি অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন। তিনি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই পুনরায় ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিয়াছিলেন।

নানক একবার মক্কায় গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে এক দিবস তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া মক্কার মস্‌জিদের দিকে পা রাখিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। একজন মুসলমান ফকির নানকের এইরূপ আচরণ দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "ওরে কাফের! তুই যে ঈশ্বরের গৃহের দিকে পা রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছিস্? তোর হৃদয়ে কি ধর্ম্মভাব নাই?" ইহা শ্রবণ করিয়া নানক ফকিরকে বলেন, "তুমি অনুগ্রহ করিয়া এমন স্থানে আমার পা দুখানি রাখিয়া দাও, যে স্থানে ঈশ্বর নাই"। তাঁহার এই বাক্যে ফকির নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া নিরস্ত হইলেন।

মক্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নানক তালবণ্ডীতে আসিয়া উপস্থিত হন এবং এক রাত্র তালবণ্ডীতে যাপন করিয়া পুনরায় পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করিলেন। নানক যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ধরাতলে প্রকৃত ধর্ম্ম ও ভক্তি একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছিল। যাঁহারা উচ্চতম সাধক ছিলেন, তাঁহারাও কল্পিত ধর্ম্ম ও শাস্ত্রোল্লিখিত নির্জ্জীব বিধি সকলের অনুসরণ করিয়া বিপথগামী হইয়াছিলেন। নানক যখন হিমাচলে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সহিত এইরূপ অনেক যোগীমণ্ডলীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। নানক তাঁহাদের অনেককে ধর্ম্ম বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

নানক হিমাচল ও নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে কর্ত্তারপুরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং গৃহে থাকিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। হিন্দু শাস্ত্রে আছে সন্ন্যাসী না হইলে উচ্চতম ধর্ম্মসাধন করা যায় না। কিন্তু নানক সংসারে থাকিয়া পারিবারিক কর্ত্তব্য পালন করিয়া ভারতবর্ষে একটি অভিনব ধর্ম্মপথ প্রবর্ত্তিত করিলেন। কিছুকাল কর্ত্তারপুরে বাস ও ধর্ম্ম প্রচার করিয়া, তিনি পুনরায় ভ্রমণে বাহির হইয়া প্রথমে সিংহলে গমন করেন। সিংহলের রাজা শিবনাভ এবং বহু সিংহলবাসী তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন। অতঃপর তিনি আরও অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করিয়া বোগ্‌দাদে গমন করেন। এখানে মর্দ্দানার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। নানক মর্দ্দনার পুত্রগণকে তালবণ্ডী হইতে আনয়নপূর্ব্বক বোগদাদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তৎপরে নানক কর্ত্তারপুরে আসিয়া গৃহস্থের ন্যায় পিতামাতা স্ত্রী-পুত্রদিগের সহিত দিন যাপন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন কর্ত্তারপুরে অতিবাহিত করিয়া তিনি ভাই বালাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন। সেই সময় তিনি কুরুক্ষেত্র, মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল, কাশী, গয়া, জগন্নাথ গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তখন অনেক পণ্ডিত তাঁহার ধর্ম্ম বিচারে পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। নানকের অযোধ্যাতীর্থে গমনকালে পথে এক মুসলমান সাধুর সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। মুসলমান সাধু নানকের ধর্ম্মালাপে এবং সকল ধর্ম্মে গভীর জ্ঞান ও সমভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। নানক হিন্দু মুসলমান উভয় জাতীয় সাধুদিগের সহিতই সমভাবে মিশিতেন ও ধর্ম্মালোচনা করিতেন এবং উভয় সম্প্রদায়ে তীর্থস্থান পর্য্যটন করিতেন। তিনি বহু তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া পুনরায় কর্ত্তারপুরে গমন করেন। সেই সময় তিনি পিতৃআদেশে সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহস্থের ন্যায় সুন্দর বেশ পরিধান করিয়া সংসারে বাস করিতে লাগিলেন। তখন কর্ত্তারপুরে পূজা, পাঠ, ধর্ম্মচর্চ্চা, কীর্ত্তন ও সাধুসঙ্গ অবিরাম চলিতে লাগিল এবং চারিদিক হইতে দলে দলে লোক আসিয়া ধর্ম্মালোচনায় যোগদান করিতে লাগিল।

নানক পুনরায় ভ্রমণে বাহির হইলেন। এবার তিনি প্রথমে দিল্লীতে গমন করেন। বহরম খাঁ লোদী সেই সময়ে দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। সম্রাটের একজন ক্ষত্রিয় কর্ম্মচারী নানকের হিন্দু ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য সকল দেখিয়া তাঁহাকে হিংসা করিতে লাগিল এবং সম্রাটকে তাঁহার বিরুদ্ধে নানাভাবে উত্তেজিত করিল। তাঁহার পরামর্শে সম্রাট নানককে কারারুদ্ধ করিলেন। কিছুদিন পরে সম্রাট নানকের ধর্ম্মভাব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে মুক্তি দেন। নানক দিল্লীতে বহুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে বহরম খাঁর মৃত্যু হইলে বাবর দিল্লীর সম্রাট হন। তখন দিল্লীতে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। বাবর অনেক লোককে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখেন। সেই সঙ্গে নানক ও ভাই বালা পুনরায় বন্দী হইয়াছিলেন। কিন্তু বাবর অল্পদিন পরেই নানকের প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে

মুক্ত করেন এবং তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। নানক বাবরকে একমাত্র ঈশ্বরের চিন্তা করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া তথা হইতে সিন্ধুদেশে গমন করেন। সেইখানে তিনি বহু লোককে ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা সৎপথে আনয়ন করিয়াছিলেন। অনেক সাধু ভক্তের সঙ্গেও তাঁহার ধর্ম্মালাপ হইয়াছিল। সেখ ফরিদ নামে যে প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধুর বাণী গ্রন্থসাহেব মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তিনিও সিন্ধুদেশেরই অধিবাসী ছিলেন। নানক সিন্ধুদেশ পর্য্যটন শেষ করিয়া যখন পুনরায় কর্ত্তারপুরে বাস করিতে থাকেন তখন লহিনা নামে এক ব্যক্তি বিশেষভাবে নানকের প্রতি আকৃষ্ট হন। নানক এই লহিনাকেই শিখদিগের দ্বিতীয় গুরু পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নাম অঙ্গদ রাখিয়াছিলেন। নানকের ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিবার সময় বহু রাজা, জমিদার ও ধনী ব্যবসায়ী তাঁহার ভগবদ্ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং অনেক ভণ্ড প্রতারকের মধ্যে ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইয়াছিল।

৯৪৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে (১৫৩৯ খ্রীঃ) একাত্তর বৎসর বয়সে গুরু নানক কর্ত্তারপুরে যোগাবলম্বনে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শবদেহ লইয়া হিন্দু মুসলমান শিষ্যের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। হিন্দুরা হিন্দুরীতি অনুসারে তাঁহার দেহ দাহ করিতে ইচ্ছুক হন, কিন্তু মুসলমানগণ তাঁহাদের রীতি অনুসারে তাঁহার দেহ সমাহিত করিতে উদ্যত হন। এই কারণে উভয় সম্প্রদাদের লোক অস্ত্র ধারণে পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। এইরূপ কথিত হয় যে, সেই সময় একজন লোক মৃতদেহের আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিল যে, মৃতদেহ এখান হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। তখন মৃতদেহের আবরণ দ্বিখণ্ডিত করিয়া উভয়ে গ্রহণ করিল। হিন্দুগণ তাঁহাদের অংশ দাহ ও মুসলমানগণ তাঁহাদের অংশ সমাহিত করিলেন। গুরু নানক শিখদিগকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, শিষ্যেরা তাহা সংগ্রহ করিয়া "আদি গ্রন্থ" নামে এক পুস্তক সংকলন করেন। শিখেরা এই গ্রন্থকে অতিশয় ভক্তি করেন। আদিগ্রন্থ নানকের রচিত বহু প্রকার রাগ-রাগীণী সম্বলিত গান, জপজী, আশাকিবার, কীর্ত্তি সোহিলা, প্রাণ সাংলি, ভোগকী বাণী প্রভৃতি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে 'প্রাণ সাংলি' গ্রন্থে বহু বিষয়ের বিধি ও নিষেধ আছে অর্থাৎ ইহা ব্যবস্থা শাস্ত্র এবং 'ভোগকী বাণীতে' ভগবানের স্তোত্র ও কতকগুলি উপদেশ আছে।

নানা গণেশ পন্থ—একজন মহারাষ্ট্রা সেনাপতি। উদয়পুরের (মিবার) রাণা হাম্বিরের অকাল মৃত্যুর পরেই, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভীম সিংহ ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে মিবারের সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। এই সময়ে মাধাজী সিন্ধিয়ার প্রতিনিধি অম্বজী উদয়পুরে অবস্থান করিতেছিলেন। জলিম সিংহ রাণা ভীম সিংহের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি কৌশলে মহারাষ্ট্রারা মিবারের তেমন ক্ষতি করিতে পারিতেছিল না। অম্বজী কৌশলে জলিমসিংহকে বিতাড়িত করিলেন। তৎপরে স্বীয় সহকারী নানা গণেশ পন্থকে উদয়পুরে প্রধান সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। নানা গণেশ অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন বলিয়া শীঘ্রই পদচ্যুত হইলেন। অল্প পরেই তিনি আবার স্ব পদে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে মাধাজী সিন্ধিয়া পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দৌলত রাও সিন্ধিয়া বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করিলেন। অম্বজী রাণীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া স্বীয় স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু অন্যতম সেনাপতি লাকুবা, অম্বজীর বিরোধী ছিলেন। এই বিবাদ মিবারেও উপনীত হইল। লাকুবার পক্ষীয় কতকগুলি সৈন্য নানা গণেশ পন্থকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিল। কিছুকাল উভয় পক্ষে জয় পরাজয় চলিল। পরে অম্বজীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে গণেশ পন্থের পতন হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রাদের কলহের ফলে, রাণার দলবল প্রাধান্য লাভ করিয়া, নানা গণেশ পন্থ ও তাঁহার অনুচরগণকে বন্দী করিলেন। অচিরেই তাঁহারা আপন কুকর্ম্মের সমুচিত প্রতিফল পাইলেন।

নানা ফড়নবীস—প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় রাজনীতিক। ১৭৪১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার প্রকৃত নাম বালাজী জনার্দ্দন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। পাণিপথ যুদ্ধের পর হইতে (১৭৬১ খ্রীঃ) তিনি নিজের অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কূটনীতি ও অধ্যবসায়ের বলে, পরবর্ত্তী পেশোয়াদের একজন প্রধান কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ নানা ফড়নবীসের ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ অথচ নিস্বার্থপরায়ণ সচিব ঐ সময়ে পেশোয়াদের অধিক ছিল না। পেশোয়া মাধো রাও হইতে বাজীরাও পর্য্যন্ত (১৭৬১—১৮৫২খ্রীঃ) কয়েকজন মারাঠা ভূপতির রাজত্বকালে নানা ফড়নবীস অশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহার কূটনীতি ও রাজনীতি কৌশলে ইংরেজদেরও অনেক সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে হইয়াছিল।

পেশোয়া মাধো রাও (প্রথম) সিংহাসনে আরোহণ করিলে, তাঁহার পিতৃব্য রঘুনাথ রাও অভিভাবক মনো-

হন। রঘুনাথ বালাজী জনার্দ্দনকে উচ্চ রাজ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। প্রথম মাধো রাওএর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশোয়া হন। কিন্তু রঘুনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিয়া স্বয়ং রাজপদ অধিকার করেন। ইহাতে নানা ফড়নবীস অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। ইহার কিছুকাল পরে নারায়ণ রাওএর বিধবা মহিষী এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। তিনি মাধব রাও নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ হন। মাধব রাওএর নাবালক অবস্থায় তাঁহার মাতা (নারায়ণ রাওএর বিধবা পত্নী) গঙ্গাবাই নানা ফড়নবীস ও সখারাম বাপু নামে আর একজন সচিব মিলিত হইয়া শাসনপরিষদ গঠন করেন, এই সময়েই নানার ক্ষমতা খুব বৃদ্ধি পায় এবং রাজকার্য্যে সখারাম ও নানার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। এই সময়ে ইংরেজ দিগের সহিত পেশোয়ার এক সন্ধি হয় (১৭৭৬খ্রীঃ), সেই সন্ধির সকল সর্ত্ত, নানা শেষ পর্য্যন্ত মানিতে প্রস্তুত হইলেন না। ইংরেজ সন্দেহ করিলেন নানা গোপনে ফরাসীদের সহিত যোগ দিবার চেষ্টা করিতেছেন। এদিকে সখারাম ও রঘুনাথরাও এর পক্ষ লইয়া ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এই সকল গোলমালের ফলে প্রথম মারাঠা যুদ্ধ সংঘটিত হয় (১৭৭৯-৮২ খ্রীঃ)। সন্ধি স্থাপিত হইলে মাধোরাও পেশোয়া বলিয়া স্বীকৃত হইলেন এবং নানা তাঁহার মন্ত্রী হইলেন। তদবধি তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া ১৮০০খ্রীঃ পরলোক গমন করেন। (এতৎ সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণের জন্য রঘুনাথ রাও, মাধব রাও নারায়ণ ও বাজীরাও নামে দ্রষ্টব্য)।

নানাসাহেব— ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে সংঘটিত সিপাহী বিদ্রোহের প্রসিদ্ধ নেতা। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেব। তিনি শেষ মারাঠা নরপতি পেশোয়া বাজীরাওএর দত্তক পুত্র ছিলেন। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে বাজীরাও যুদ্ধে পরাজিত হন এবং বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তিভোগী হইয়া কানপুরের নিকটবর্ত্তী বিঠুর নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে বাজীরাও নানাসাহেবকে দত্তক গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে 'পেশোয়া' উপাধি ও বার্ষিক বৃত্তির বিধি সঙ্গত উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে ইংরেজ সরকারকে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষিত হইল না। ইংরেজ সরকার বলিলেন যে বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁহারা তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে বাজীরাওএর মৃত্যু হইলে নানাসাহেব প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকার অধিকারী হন। বাজীরাওএর

বহুসংখ্যক পরিবার ও দাসদাসী ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে, নানাসাহেবকেই তাঁহাদের সকলের ভরণপোষণের ব্যয় বহন করিতে হইত। এই জন্য তিনি বাজীরাওএর বৃত্তি পাইবার অধিকারী বলিয়া দাবী করেন। রামচন্দ্র পন্থ নামক একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী এই বিষয় লইয়া ইংরেজ সরকারের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে থাকেন। বিঠুরের ইংরেজ কমিশনার নানাসাহেবের আবেদন সমর্থন করেন। কিন্তু উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ ঐ আবেদন সমর্থন করিলেন না। বড়লাট লর্ড ডালহৌসী বলিলেন যে, বাজীরাও চল্লিশ বৎসরেরও অধিকাল বৃত্তি ভোগ করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার বিস্তৃত জাইগীর হইতেও প্রচুর আয় ছিল। সুতরাং তিনি মৃত্যুকালে যে বিপুল সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট।

এইভাবে নানাসাহেব, বাজীরাওকে প্রদত্ত বৃত্তি লাভে, বঞ্চিত হইলেন, কিন্তু বিঠুরের বিস্তৃত ভূসম্পত্তি তাহার অধিকারে রহিল। কিন্তু জাইগীর প্রদান করিবার সময়ে যে সকল ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহাদের কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া জাইগীরের অধিবাসীদিগকে ইংরেজদের দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসনের অধীন করা হইল।

ভারত সরকারের মীমাংসা তাঁহার আশা-বিরুদ্ধ হইলেও নানাসাহেব একেবারে সকল চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন না। উপযুক্ত কর্ম্মচারী মারফৎ তিনি ইংলণ্ডে বোর্ড অব-ডিরেক্টরের (Board of Directors) নিকট আর এক আবেদন প্রেরণ করিলেন। ঐ আবেদনে বহু পূর্ব্ব সংঘটিত ঐতিহাসিক তথ্যের অবতারণা করিয়া তিনি যথেষ্ট যুক্তি ও সারগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু ইহাতেও কোন ফল দর্শিল না। ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া নানাসাহেব ভবিষ্যতের আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহ ঘটিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের নানাস্থানে ভয়ঙ্কর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বিশেষতঃ অযোধ্যাতে অসন্তোষ ও উত্তেজনা অতিশয় অধিক হইয়াছিল। নানাসাহেব প্রথমে ঐ সকল উত্তেজনা ও অসন্তোষ হইতে দূরে ছিলেন। তিনি পরোক্ষভাবেও ইংরেজ বিরুদ্ধ কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দের প্রথমভাগে তিনি দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন পূর্ব্বক লক্ষ্ণৌ গমন করেন। তথায় সার হেনরী লরেন্স (Sir Henry Lawrence) অযোধ্যার কমিশনার ছিলেন। তিনি নানাসাহেবকে যথোচিত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করেন। নানাসাহেব ইংলণ্ডস্থিত কর্ত্তৃপক্ষের

নিকট নিজের দাবী জানাইবার জন্য দুইজন কর্ম্মচারী প্রেরণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে আজিম উল্লা খাঁ একজন ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে ব্যর্থকাম হইয়া ইয়োরোপের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ ক্রীমিয়ার যুদ্ধের সময়ে তুর্কীতে উপস্থিত ছিলেন। ইয়োরোপে ফরাসী রুশীরা প্রভৃতি অন্যান্য সমর কুশল জাতীর পরিচয় পাইয়া তিনি আশা করিতে লাগিলেন যে, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার প্রভুর প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ লইবেন। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কিছুকাল মধ্যেই নানাস্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। আজিম উল্লা সেই সুযোগ লইয়া নানাসাহেবকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। আজিম উল্লার উৎসাহ বাক্য সমর্থন করিবার লোকের অভাব ছিল না। এইভাবে ধীরে ধীরে নানাসাহেবের মনে দুষ্প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

নানাসাহেবের প্রতি ইংরেজদের সন্দেহের কোনও কারণ উপস্থিত হয় নাই। বরং তাঁহারা নানাসাহেবের উপর বিশেষ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন এবং আশা করিয়াছিলেন যে তাঁহারা নানাসাহেবের আশ্রয়ে থাকিয়া সিপাহীদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন। তাঁহার উপর কোনও কোনও ইংরেজ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহারা কানপুরের ধনাগারে সঞ্চিত সমুদয় অর্থ রক্ষা করিবার ভারও তাঁহাকে দিতে সমুৎসুক ছিলেন। প্রথমাবস্থায় অবশ্য নানাসাহেবের মনে সিপাহীদিগের সহিত যোগ দিবার কোনও ইচ্ছা ছিল না। বরঞ্চ তিনি কানপুরের ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ সেনাপতির অনুরোধে তত্রস্থ ইংরেজ মহিলা ও বালকবালিকাদিগকে বিঠুরে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করেন এবং কালেক্টার সাহেবের অনুরোধে কানপুরে অবস্থিত ইংরেজদের সাহায্যের জন্য, নিজ অনুচরগণসহ অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া কানপুরে উপস্থিত হইয়া, মে মাসে কানপুরের ধনাগার রক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে লক্ষ্ণৌ হইতে অতিরিক্ত কামান ও সৈন্য কানপুর রক্ষার জন্য আনীত হইল এবং ইংরেজ নরনারীরা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে থাকিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

এই সকল ঘটনায় কিন্তু ফল বিপরীত হইল। কানপুরে অবস্থিত সিপাহীগণ মনে করিল যে, ইংরেজেরা তাঁহাদিগকে সন্দেহ করিতেছেন এবং তাহাদিগকে জব্দ করিবার জন্য নানারূপ কৌশল ও ব্যবস্থা করিতেছেন। এই ধারণার ফলে অতি দ্রুত নানাস্থানে অমূলক জনরব প্রচারিত হইতে লাগিল এবং সিপাহীরা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া

উঠিল। ইয়োরোপীয়গণ, অবশ্যম্ভাবী বিপদ হইতে আত্মরক্ষার জন্য যতই আয়োজন করিতে লাগিলেন, সিপাহীরা ততই সন্দিগ্ধ হইতে লাগিল। সৌহার্দ্দ ও বিশ্বস্ততার স্থলে বিষম শত্রুতা ও ঘোরতর অবিশ্বাসের আবির্ভাব হইল। ইংরেজ সিপাহীকে আততায়ী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন; সিপাহীরাও ইংরেজের প্রতি কাজে আশঙ্কা ও শত্রুতার চিহ্ন দেখিতে লাগিল।

এই সময়ে কানপুর হইতে কিছু ইংরেজ সৈন্য অন্যত্র প্রেরিত হওয়ায় সিপাহীরা আরও উৎসাহিত হইয়া উঠিল এবং জুন মাসের প্রথমভাগেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। কানপুরের বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে বিরোধী লোকের অভাব ছিল না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এবং পূর্ব্বোক্ত আজিম উল্লাও নানাসাহেবকে নিজেদের পক্ষে আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন; ক্রমে নানাসাহেবেরও মতিভ্রংশ হইল এবং তিনি বিদ্রোহোন্মুখ সিপাহীদের স্তোক বাক্যে মুগ্ধ হইয়া, বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সম্মত হইলেন।

নানাসাহেবের সাহায্য লাভের সম্ভাবনায় সিপাহীরা অধিকতর উৎসাহান্বিত হইয়া উঠে এবং জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই কানপুরের সিপাহীরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কানপুরের নিকটবর্ত্তী নবাবগঞ্জ নামক স্থানে অস্ত্রাগার, ধনাগার ও বন্দীশালা অবস্থিত ছিল। নানাসাহেবের অনুচরেরা ঐ সকল রক্ষা করিতেছিল। কিন্তু বিদ্রোহী সিপাহীরা তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, তাহারা সিপাহীদের সহিত যোগ দিল। সামান্য যে কয়েকজন মাত্র বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দিতে অসম্মত হইয়া ধনাগারাদি রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হইল, তাহারা অচিরেই পরাভূত ও নিহত হইল। সিপাহীরা অস্ত্রশস্ত্র ও ধনরাশি হস্তগত করিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করে। তাহারা নানাসাহেবকে বিদ্রোহী দলভুক্ত হইতে অনুরোধ করায়, তিনি সহজেই তাহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তাঁহার দুষ্ট মন্ত্রণাদাতা আজিম উল্লা তাঁহাকে অন্যরূপ পরামর্শ দিলেন। তিনি নানাসাহেবকে বুঝাইলেন যে, দিল্লীতে গমন করিলে নানাসাহেব মুঘল বাদশাহের অধীন একজন সাধারণ ওমরাওএর মর্য্যাদা লাভ করিবেন মাত্র। কিন্তু কানপুরে থাকিয়া, ইংরেজদিগকে বিদূরিত করিতে পারিলে, তিনি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধীশ্বর হইয়া স্বাধীন নৃপতির অধিকার অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন। আজিম উল্লার এইরূপ প্ররোচনায়, নানাসাহেব দিল্লী যাইবার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া কানপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানেই

নিজ আধিপত্য সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সিপাহীরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিল।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই নানাসাহেবের নির্দ্দেশে, সিপাহীরা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে যে সকল ইংরেজ নরনারী অবস্থান করিতেছিলেন তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। ইংরাজরা যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবরুদ্ধ স্থানে থাকিয়া নিরন্তর বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা যে, কিরূপ কষ্টদায়ক তাহা সহজেই অনুমেয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া এইরূপ আক্রমণ ও প্রতিরোধ চলিল। ক্রমে শত্রুর অস্ত্রাঘাতে তাঁহাদের জন সংখ্যা বিশেষরূপে কমিতে লাগিল, খাদ্য ও পানীয়ের অতিশয় অভাব ঘটিতে লাগিল। আত্মরক্ষার উপকরণ হ্রাস পাইতে লাগিল। মহিলা ও বালকবালিকাদের কষ্টের অবধি রহিল না। নানারূপে দুঃখ যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তথাপি তাঁহারা অসীম ধৈর্য্য ও বীরত্ব সহকারে, সংখ্যাতীত আততায়ীর নিরন্তর আক্রমণ হইতে প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, এলাহাবাদ, প্রভৃতি স্থান হইতে সাহায্য পাইবার সমুদয় আশা বিনষ্ট হইল। তাঁহারা দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইলেন।

এই সময়ে, ২৫শে জুন তারিখে নানাসাহেবের পক্ষ হইতে প্রস্তাব আসিল যে, ইংরাজেরা যদি নিরাপদে এলাহাবাদ যাইতে ইচ্ছুক হন, তবে নানাসাহেব তাঁহাদিগকে সেই সুযোগ দিতে প্রস্তুত আছেন। অনন্যোপায় হইয়া তাঁহারা সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অতঃপর ২৭শে জুন প্রত্যুষে পূর্ব্ব ব্যবস্থামত তাঁহারা সকলে এলাহাবাদে গমন করিবার জন্য নদী তীরে সমবেত হইলেন। ঐ সময়ে তাঁতিয়া তোপী, আজিম উল্লা প্রভৃতি নানাসাহেবের কতিপয় পরামর্শদাতা, সৈন্য সামন্ত লইয়া নদীতটে উপনীত ছিলেন। ইংরেজেরা তাঁহাদের কোনওরূপ সন্দেহ করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা সকলে নৌকারোহণ করিবামাত্র, পূর্ব্ব ষড়যন্ত্র অনুযায়ী নৌকাসমূহের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। এই অপ্রত্যাশিত নৃশংস কার্য্যের ফল সহজেই অনুমেয়। ইংরেজদের অধিকাংশই ঐ গোলাবর্ষণে হতাহত হইলেন। কেহ বা অস্ত্রাঘাতে কেহ বা নদীজলে নিমগ্ন হইয়া জীবনলীলা সাঙ্গ করিলেন। নানাসাহেব খুব সম্ভব এই নিষ্ঠুর কার্য্যের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ছিলেন না। তাঁহার নিকট সংবাদ পৌঁছিলেই তিনি উহা বন্ধ করিয়া দেন। অতঃপর হতাবশিষ্ট একশত পঁচিশজনকে বন্দী করিয়া পুনরায় কানপুরে আনা হইল।

যাত্রীবাহী নৌকাগুলির মধ্যে এক-খানি নৌকা গোলাবর্ষণে নষ্ট হয় নাই। সেই নৌকাখানিতে ক্যাপ্টেন টমসন প্রমুখ কয়েকজন সেনানী ছিলেন। তাঁহারা প্রাণ রক্ষার জন্য কোনও উপায়ে স্রোতের অনুকূলে নৌকা ভাসাইয়া দিয়া পলায়ন করিতে লাগি-লেন। উত্তেজিত সিপাহীরা অবশ্য তাঁহাদিগের পশ্চাদনুসরণ করিতে নিরস্ত হয় নাই। কিন্তু নানা ভাগ্য বিপর্য্যয়ের মধ্যেও তাঁহারা অতি কষ্টে অযোধ্যার অন্তঃপাতী মোরারমৌ নামক স্থানের সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী রাজা দিগ্বিজয় সিংহের আশ্রয়ে আসিয়া উপনীত হইলেন। দিগ্বিজয় সিংহ তাঁহাদিগকে সাদরে আশ্রয় দিয়া কিছুকাল পরে যথাযোগ্য ব্যবস্থা সহকারে লক্ষ্ণৌতে সেনাপতি হ্যাবলকের নিকট প্রেরণ করিলেন।

যে সকল হতভাগ্য ইংরেজ কান-পুরে পুনরায় বন্দী হইয়াছিলেন, তাঁহা-দের মধ্যে অনেকে অল্পকাল মধ্যেই উন্মত্ত সিপাহীদের হস্তে নিহত হইলেন। অবশিষ্টগণকে বন্দী করিয়া রাখা হইল। এই সময়ে ফতেগড় নামক স্থান হইতে অনেক ইংরেজ নিরাপদে থাকিবার ও সাহায্য পাইবার ভ্রান্ত আশায়, কানপুরে আগমন করেন। কানপুরের অবস্থা তাঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। বলা বাহুল্য কানপুরে উপনীত হইবামাত্র তাঁহারাও বন্দী হইলেন।

১লা জুলাই তারিখে নানাসাহেব বিঠুরে যথাযোগ্য উৎসব সহকারে আপনাকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সময়ে আজম উল্লাই তাঁহার প্রধান মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। নানাসাহেব নিজেকে পেশোয়া বলিয়া প্রচার করিলেও, স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা লাভ করিলেন না। বিশেষত সেই সময়ে কানপুর ও তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে মুসলমানদিগের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। তাহাদের মত বিরুদ্ধ কোনও কাজ করা নানা-সাহেবের পক্ষে একরূপ অসম্ভব ছিল। তাঁহার সহযোগীগণ, তাঁহাকে পেশো-য়ার পদ প্রদানপূর্ব্বক নিজেদের ইচ্ছানু-যায়ী সকল কাজ করিতে লাগিল। নানাসাহেব ইচ্ছা করিলেও তাঁহাদের কোনও কাজে বাধা দিতে পারিতেন না।

কানপুরের পতন সংবাদ যখন যথা-সময়েই অন্যত্রস্থিত ইংরেজদের গোচরী-ভূত হইল, তাঁহারা তখন প্রতিশোধ লইতে কৃতসংকল্প হইলেন। তদুদ্দেশ্যে লক্ষ্ণৌ হইতে সেনাপতি হ্যাভেলক (Havelock) জুলাই মাসের প্রথম-ভাগেই কানপুর যাত্রা করেন। পথিমধ্যে রেণ্ড নামক অপর একজন সেনাপতিও সৈন্যদলসহ তাঁহার সহিত মিলিত হন। নানাসাহেবও চর-মুখে এই সংবাদ পাইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

জোয়ালা প্রসাদ ও টীকাসিংহ নামক অনুচরদ্বয় কানপুর হইতে যাত্রা করিয়া ফতেপুর নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করেন। ঐ স্থানেই প্রথম ইংরেজদের সহিত বিদ্রোহীদের এক সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং বিদ্রোহীরা পরাজিত হইয়া অনেক অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করে। অতঃপর কানপুর হইতে মাত্র কুড়ি মাইল দূরে আওঙ্গ নামক স্থানে পুনরায় এক সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং সেইবারেও পূর্ব্ব অবস্থার পুনরাবৃত্তি হয়।

এই পরাজয় সংবাদ বিঠুরে পৌঁছিলে সানুচর নানাসাহেব বিশেষ ভীত হইয়া কর্ত্তব্য নির্ণয়ে অবহিত হইলেন। অনেক বাক বিতণ্ডার পর স্থির হইল যে, নানাসাহেব স্বয়ং সমুদয় সৈন্য লইয়া অভ্যুদগমনপূর্ব্বক ইংরেজকে আক্রমণ করিবেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে কানপুরে বন্দী ইংরেজ নরনারী সম্বন্ধে কর্ত্তব্যও স্থির হইয়া গেল। নানাসাহেবের প্রধান পরামর্শদাতা আজিম উল্লা তাঁহাদিগকে হত্যা করাই স্থির করিলেন। নানাসাহেব ও তাঁহার পরিবারস্থ মহিলাগণ এবং সদাশয় বন্ধুরা এই নৃশংস কার্য্য অনুমোদন না করিলেও তাঁহারা বাধা দিতে পারিলেন না। ১৫ই জুলাই অপরাহ্নে অতি নিষ্ঠুরভাবে ঐ সকল নিরপরাধ নারী ও শিশুদিগের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল এবং তাঁহাদের মৃত ও অর্দ্ধমৃতদেহ সমূহ এক কূপে নিক্ষিপ্ত হইল।

পরদিন নানাসাহেব নিজ সৈন্য সহ আগমনোন্মুখ ইংরেজ সৈন্যকে আক্রমণ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। কানপুরের অনতিদূরে সেনাপতি হ্যাবেলকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল এবং তিনি পরাজিত হইয়া বিঠুরে ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন হ্যাবেলক সাহেব সসৈন্যে কানপুরে উপস্থিত হইয়া পুনরায় ইংরেজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন কিন্তু তিনি যে সকল হতভাগ্য ইংরেজদের বন্দীর জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিলেন, তাঁহারা সকলেই তৎপূর্ব্বে শত্রুর অস্ত্রাঘাতে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। নানাসাহেব পরাজিত হইয়া বিঠুরে উপস্থিত হইলে তাঁহার কুমন্ত্রণাদাতা সকলে অবস্থা সঙ্গীন বুঝিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। নানাসাহেবও আর বিঠুরে থাকিতে সাহস করিলেন না। তিনিও আত্মরক্ষার জন্য পরিবারবর্গ সহিত গঙ্গা পার হইয়া পলায়ন করিলেন। ইহার পর আর নানাসাহেবের কোনও বিশ্বাসযোগ্য সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বিদ্রোহের অবসানে নানাসাহেব সন্দেহে, ক্রমে বহু লোক ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ড লাভ করে। তাহাদের মধ্যে একজনও প্রকৃত নানাসাহেব কিনা তদ্বিষয়ে ইতিহাসকারগণের মনে ঘোরতর

সন্দেহ রহিয়াছে। নানাসাহেব পলায়নের পর তাঁহার বিঠুরের প্রাসাদ ও অন্যান্য সম্পত্তি ইংরেজ সৈন্য কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়।

নানী বাঈ—তিনি ভক্ত দাদুর জ্যেষ্ঠা কন্যা। পিতারই ন্যায় তিনি অতিশয় ভক্তিমতী ছিলেন। সারাজীবন সাধন মার্গে অবস্থান করিয়াই জীবন কাটাইয়াছিলেন। বিবাহ কখনও করেন নাই।

নান্যদেব—তিনি মিথিলার কর্ণাটক রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও বঙ্গের সেনবংশীয় নরপতি বিজয় সেনের সমসাময়িক। বার্লিনে প্রাচ্যবিদ্যানুশীল সমিতির গ্রন্থাগারে ১০৯৫ খ্রীঃ অব্দে নান্যদেবের সময়ে লিখিত একখানি গ্রন্থ রক্ষিত আছে। নান্যদেবের পুত্র গঙ্গাসিংহ দেব এবং পৌত্র নরসিংহ দেব। এই নান্যদেবকে বঙ্গের সেনবংশীয় নরপতি বিজয় সেন পরাস্ত করিয়াছিলেন।

নাপুজী— বুন্দির একজন প্রসিদ্ধ রাজপুত নরপতি। তিনি বুন্দিরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাও দেওয়ার পৌত্র ও বুন্দিরাজ সমর সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তোডার শোলাঙ্কি রাজের কন্যাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। একবার তিনি সপত্নীক শ্বশুরালয়ে গমন কালে একখানি সুন্দর মর্ম্মর প্রস্তর দেখিতে পাইয়া উহা লইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি স্বীয় শ্বশুরকে ঐ প্রস্তরটি লইবার বাসনা জ্ঞাপন করেন। ইহাতে শোলাঙ্কিরাজ তাঁহাকে নানাপ্রকার ভৎসনা করিয়া, তাঁহার রাজ্য হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন। নাপুজী স্বীয় শ্বশুরকর্ত্তৃক এইরূপভাবে অপমানিত হইয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন সুযোগ প্রাপ্ত না হইয়া অবশেষে স্বীয় স্ত্রীর উপর নানাপ্রকার উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। শোলাঙ্কিরাজ স্বীয় কন্যার প্রতি উৎপীড়নের সংবাদ জানিতে পারিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। শ্রাবণ মাসের তৃতীয় দিবস "কাজুলি দিবস" নামে অভিহিত। ইহা রাজপুতদিগের একটি পর্ব্ব দিবস। এই সুযোগে শোলাঙ্কিরাজ অতর্কিতে বুন্দিরাজ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় জামাতা নাপুজীকে নিহত করেন। সাধ্বী রাণী স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন। নাপুজীর তিন পুত্র ছিল। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র হামুজি ১৩৮৪ খ্রীঃ অব্দে বুন্দির সিংহাসনে আরোহণ করেন।

নাফা পীর—তিনি মুঙ্গের সহরে অবস্থান করিতেন এবং এই স্থানেই তাঁহার সমাধি আছে। বাঙ্গালার নবাব হোসেন শাহের (১৪৯১—১৫২৯ খ্রীঃ) অন্যতম

পুত্র রাজকুমার দানিয়েল ১৪৯৭ খ্রীঃ অব্দে, এই সমাধি ক্ষেত্রের উপরে একটী খিলান প্রস্তুত করাইয়া দেন।

নাভাজী—তাঁহার কৃত ভক্তমাল গ্রন্থে, তিনি অনেক সাধু ভক্তের জীবন ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। দাদু পন্থী ভক্তবাণী সংগ্রহ গ্রন্থে এক নাভাজীর বাণী সংগৃহীত হইয়াছে।

নাভাদেবী—বঙ্গের রত্ন অদ্বৈতাচার্য্যের জননী। অদ্বৈতাচার্য্য দেখ।

নামতীর্থ—তিনি কর্ম্মহীন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। রামানুজাচার্য্যের সঙ্গে বিচারে তিনি পরাস্ত হইয়া তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন।

নামদেব—(১) এই জ্যোতিষী পণ্ডিত রত্নদীপক গ্রন্থের প্রণেতা।

নামদেব—(২) ভক্ত সাধু বামদেব অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি সাংসারিক ছিলেন বটে, কিন্তু মন শ্রীহরিপাদপদ্ম সুধাপানে নিরত থাকিত। অনাসক্ত হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করা সাধু মহাত্মাদিগের উপদেশ। সেই উপদেশ তিনি বর্ণে বর্ণে পালন করিতেন। তাঁহার গৃহে একটী শ্রীবিগ্রহ ছিল। প্রতিদিন স্বয়ংই তাঁহার পূজা করিতেন। যে সকল মহাপুরুষ ভগবানে সম্পূর্ণ মনপ্রাণ অর্পণ করেন, তাঁহারা প্রায়ই সাংসারিক সুখে বঞ্চিত হন। বামদেবের ভাগ্যে এই মহাসত্যের অপলাপ হয় নাই। সন্তানের মধ্যে একটী কন্যা, সেটীও ভাগ্যদোষে বিধবা। বামদেব ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দানে কন্যাকে বিগ্রহের সেবা পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন। ভক্ত বৎসল ভগবান ভক্তি ও প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া বামদেব তনয়াকে কৃপা করিলেন। এক দিবস রজনীতে বামদেব দুহিতা নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময় এক দিব্য কান্তি পুরুষ তাঁহাকে বলিলেন, বৎসে! তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তাহাই পূর্ণ হইবে। দুহিতা একটী অপত্যের বর প্রার্থনা করিলেন। ভগবান প্রার্থনা পূর্ণ হইবে বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন। দুহিতার গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ হইলে, বামদেব লজ্জা ভয়ে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। অনাহারে শ্রীবিগ্রহ সমীপে রজনীতে পড়িয়া রহিলেন। তখন ভক্ত বৎসল ভগবান বলিলেন—তোমার কন্যা দুষ্টা নয়, তুমি কোন লজ্জা পাইবে না। আমার বরে তোমার কন্যার গর্ভ হইয়াছে। ইহাতে তোমার যশ খর্ব্ব হইবে না। যথা সময়ে দুহিতার একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। বামদেব দৌহিত্রের নাম রাখিলেন নামদেব। নামদেব আশৈশব হরি ভক্ত। লোক লোচনের অন্তরালে থাকিয়া ধর্ম্মবীর নামদেব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। প্রেমাবেশে পুলকিত হইয়া বিগ্রহ সমীপে নৃত্য গীত এবং গড়াগড়ি দিতেন। সময় সময় বিগ্রহ আলিঙ্গন

করিয়া শীতল হইতেন। এইরূপে ভক্ত প্রবর ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একদিন বৃদ্ধ বামদেবকে কার্য্য বশতঃ গ্রামান্তরে গমন করিতে হইল। বিগ্রহের পূজার ভার কাহার উপর অর্পণ করেন, এই জন্য বামদেব চিন্তিত হইলেন। অবশেষে নামদেবের উপর পূজার ভার অর্পণ করিয়া তিনি কার্য্য-স্থলে গমন করিলেন। নামদেব যথা সময় পূজার কার্য্য সমাধা করিলেন। অপরাহ্নে দুগ্ধ ভোগ দিতে হইবে। দুগ্ধ আনিয়া পবিত্র পাত্রে লইয়া শ্রীবিগ্রহ সমীপে উপস্থিত হইলেন। দুগ্ধ পাত্র শ্রীবিগ্রহ সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, হরি কৃপা করিয়া আপন হস্তে দুগ্ধ পান কর; নতুবা আমি শ্রীবদনে ধরি। কেন ঠাকুর আমার পানে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিতেছ? এবং দুধ খাইতেছ না, আমি এস্থানে থাকিলে বুঝি খাইবে না, তবে আমি বাহিরে যাই তুমি দুগ্ধ পান কর এই বলিয়া সরল প্রাণ বালক ঠাকুর গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে যখন দেখিলেন ঠাকুর দুগ্ধ পান করেন নাই। তখন নামদেব বড় কাতর হইয়া পড়িলেন, ভাবিলেন, আমার সহিত ঠাকুরের পরিচয় নাই, তাই বুঝি দুগ্ধ পান করিলেন না, অথবা দুগ্ধে অপবিত্র কিছু ছিল তাই হরির অগ্রাহ্য হইয়াছে। নামদেব পুনরায় দুগ্ধ আনিয়া পবিত্রভাবে শ্রীবিগ্রহের নিকট রাখিলেন। কিন্তু ঠাকুর দুগ্ধ পান করিতেছেন না দেখিয়া, অতি কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, হরি, দাদা দুগ্ধ দেন, তুমি আনন্দে পান কর আজ আমার কোন্ অপরাধে গ্রহণ করিতেছ না? আমি জানিলাম, আমি মহাপাপী, তুমি যদি আমার প্রদত্ত দুগ্ধ পান না কর, আমি গলায় ফাঁসি দিব, বিষপান করিয়া তোমার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব, কিংবা ছুরিকা দ্বারা এই পাপ জীবনের অবসান করিব। এই বলিয়া ছুরিকা লইয়া যেমন হৃদয়ে প্রবিষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি ভক্ত বৎসল ভগবান বাম হস্তে ভক্তের হস্ত ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে দুগ্ধ পান করিলেন। বামদেব গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, নামদেবকে সেবা পূজার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নামদেব দুগ্ধ প্রসাদ যাহা রাখিয়াছিলেন, মাতামহ নিকট উপস্থিত করিলেন। মাতামহ দুগ্ধ দেখিয়া বলিলেন—তুমি সমস্ত দুগ্ধ পান করিয়াছ এবং অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ আমার জন্য রাখিয়াছ। নামদেব বলিলেন—না দাদা আমি পান করি নাই। ঠাকুর প্রথমে আমার প্রদত্ত দুগ্ধ পান করেন নাই, পরে আমি প্রাণত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলে দয়াল ঠাকুর দয়া করিয়া নিজ হস্তে দুগ্ধ পান করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। বামদেব দৌহিত্রের কথা শুনিয়া চমৎ-

কৃত হইলেন এবং ঠাকুর কি প্রকারে পান করিয়াছেন, তাহা দেখিতে চাহিলেন। নামদেব পর দিবস দুগ্ধ লইয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। কৃতাঞ্জলী পুটে নিবেদিত দুগ্ধ ঠাকুরকে পান করিতে আহ্বান করিলেন। ঠাকুর দুগ্ধ পান কর, যদি অদ্যকার দুগ্ধ প্রত্যাখ্যান কর, তবে আমি গলায় ছুরিকা বসাইয়া এপ্রাণ পরিত্যাগ করিব। ঠাকুর অমনি ভক্তের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং মৃদু হাস্য করিয়া দুগ্ধ পান করিলেন। নামদেবের সৌরভ চারিদিকেই ব্যাপ্ত হইল। দেশের সম্রাটের তাহা কর্ণগোচর হইল। যবন সম্রাট নামদেব কিরূপ সাধু পুরুষ পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। নামদেব সকাশে লোক প্রেরিত হইল। নামদেব সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইলেন, সম্রাট তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা দেখিতে চাহিলেন। ভক্ত কখনই আপনার ক্ষমতা জানেন না। তিনি কি করিতে পারেন তাহা তিনি নিজেও অবগত নহেন। সুতরাং সম্রাটের ইচ্ছা অপূর্ণ রহিল। নামদেব কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। কিছুদিন অন্তে পুনরায় সম্রাট নামদেবকে বন্দীশালা হইতে দরবারে আনিলেন এবং পুনঃ পুনঃ কিছু অলৌকিক কার্য্য দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দৈবগতিকে সেইখানে একটি মৃত বৎস দেখা গেল। সম্রাট বলিলেন, তুমি হিন্দু সাধু, গাভীকে হিন্দু দেবতা জ্ঞান করিয়া থাকে। এই বৎসের মাতা ইহার বিরহে কান্দিয়া বেড়াইতেছে, ইহাকে প্রাণ দান কর। নামদেব শুনিবা মাত্র হাতে তুড়ি দিয়া বলিলেন বৎস উঠ, মাতার নিকটে গিয়া দুগ্ধ পান কর। এই কথা বলিবা মাত্র বাছুর উঠিল, এবং মাতার নিকটে যাইয়া দুগ্ধ পান করিতে আরম্ভ করিল। সম্রাট বিস্মিত হইয়া ইহা দেখিতে লাগিলেন। সম্রাট নামদেবকে বহু অর্থ সম্পত্তি গ্রহণ করিতে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু নামদেব কিছুই গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। এই সময়ে সম্রাট বহু মূল্য এক পালঙ্ক ও শয্যা উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়া নামদেবকে প্রদান করিলেন। নামদেব নিজেই ইহা বহন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন এবং কিছু দূর অগ্রসর হইয়া বহু মূল্য পালঙ্ক ও শয্যা এক নদীতে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সঙ্গেই সম্রাট প্রেরিত গুপ্তচর ছিল। তাহারা সম্রাট সকাশে আসিয়া সমস্ত নিবেদন করিল। সম্রাট পুনরায় নামদেবকে ডাকিলেন এবং কেন এইরূপ বহু মূল্য শয্যা নদীতে ফেলিয়া দিলেন জিজ্ঞাসা করিলেন। নামদেব বলিলেন প্রয়োজন থাকে তবে চল উঠাইয়া দিব। রাজা কৌতুক করিয়া সঙ্গে লোক দিলেন।

নামদেব সেই শয্যা ও পালঙ্ক শুষ্ক অবস্থায় জল হইতে উঠাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। একদা স্বগ্রামবাসী একজন বণিক এক যজ্ঞ করিলেন। সেই যজ্ঞে নামদেব যাহাতে কিছু সোনা দান গ্রহণ করেন, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিল। অবশেষে নামদেব একটি তুলসী পত্রের ওজনের সোনা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। নামদেব একটি তুলসী পত্রে কৃষ্ণ নাম লিখিয়া তুলা দণ্ডের একদিকে স্থাপন করিলেন এবং অপরদিকে বণিককে সোনা দিতে বলিলেন। বণিক দুই তিন রতি সোনা লাগিবে মনে করিয়া সেই পরিমাণে সোনা দিল, ইহাতে তুলা দণ্ডের তুলসী পত্রের দিক কম্পিতও হইল না। ক্রমে বণিকের ঘরের সমস্ত সোনা দেওয়া হইল, ইহাতেও তুলসী পত্রের দিক উত্তোলিত হইল না। ইহা দেখিয়া বণিক অবাক্ হইয়া রহিল। নামদেব নিষ্ঠা সহকারে একাদশী ব্রত করিতেন। একদিন একাদশী তিথিতে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অতিথি তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নামদেবের বাড়ীতে কখনও অতিথি বিমুখ হইতে পারিত না, অথচ একাদশী তিথিতে তিনি কি করিয়া ব্রাহ্মণকে অন্ন জল দান করিবেন। ক্রমে ব্রাহ্মণের সহিত বচসা হইতে লাগিল। অকস্মাৎ ব্রাহ্মণ পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। প্রতিবেশী সকলেই নামদেবকে তিরস্কার করিতে লাগিল। নামদেব প্রতিবেশীদিগকে বলিলেন, তোমরা চিতা প্রস্তুত কর, আমিও ব্রাহ্মণের সহিত দেহত্যাগ করিব। বৃদ্ধের মৃত দেহ চিতায় স্থাপিত হইলে নামদেব শবের সহিত চিতায় প্রবিষ্ট হইলেন। শ্মশান বন্ধুগণ অগ্নি জ্বালিয়া চিতায় সংযোগ করিতে প্রস্তুত, এই সময় শব মৃদুমন্দ হাসিয়া নামদেবকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। চারিদিকে গগন ভেদ করিয়া হরি ধ্বনি উত্থিত হইল। নামদেব ও বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে চিতা হইতে উঠিলেন। তৎপর দিবস বৃদ্ধকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া বিদায় করিলেন। নামদেব প্রতিদিন সায়ংকালে রঙ্গনাথের মন্দিরে আরতি দেখিবার জন্য গমন করিতেন। একদিন আরতি দেখিতে যাইয়া অত্যন্ত জনতা দেখিয়া পাদুকা কটি দেশে বন্ধন করিয়া মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দ্বার রক্ষক বিনামা সহ প্রবেশ করিতে দেখিয়া নামদেবকে এক ধাক্কা দিয়া মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিল। নামদেব মন্দিরের পশ্চাদ্দিকে যাইয়া নিবিষ্ট চিত্তে গান গাহিতে লাগিলেন। বিগ্রহ মন্দিরসহ ঘুরিয়া নামদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মন্দির সেইভাবেই ছিল পূর্ব্বস্থানে যায় নাই। একদা নাম-

দেবেরগৃহে অগ্নি লাগিয়াছে প্রতিবেশীরা আসিয়া তৈজস পত্র বাহির করিতে লাগিলেন। নামদেব বলিলেন, কি কর, যাঁহার ইচ্ছায় অগ্নি আমার গৃহ গ্রাস করিতেছে, তাঁহার সুখ হইবে বলিয়াই এরূপ হইতেছে। সকল বস্তুই গৃহেতে থাকিবে, কিছুই বাহির হইবে না, ইহা বলিয়া বাহিরের সমস্ত জিনিষ অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, অগ্নি অকস্মাৎ নির্ব্বাপিত হইল। তাঁহার ভক্তেরা নামদেব সম্বন্ধে এই প্রকার বহুবিধ আখ্যান বলিয়া থাকেন।

নামদেব—(৩) এই নামদেব উত্তর পশ্চিমের বুলন্দ সহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ছিপি জাতির (যাহারা কাপড়ে ছাপ দেয়) গুরু ছিলেন। তিনিই প্রথমে তাঁহাদিগকে কাপড়ে নানা প্রকারের সুন্দর নমুনার ছাপ দিবার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। ঐ পদ্ধতি ও ছাপের নানাবিধ নমুনার তিনিই উদ্ভাবয়িতা। তথাকার ছিপিরা তাঁহারই বংশীয় বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়া থাকে।

নাম দেব—(৪) এই ভক্ত নামদেব মারবার প্রদেশে তুলাধুনকর জাতির মধ্যে ১৪৪৩ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লীর সম্রাট সেকন্দর লোদীর রাজত্বকালে (১৪৮৮—১৫১৬ খ্রীঃ) তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর দলপতিদের দ্বারা বিশেষরূপে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। গৃহহীন হইয়া তিনি দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া কাল কাটাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ধুনকর জাতির মধ্যে তাঁহার বহু শিষ্য রহিয়াছে।

নায়ক—চতুর্ব্বেদ বিশারদ একজন বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। কাশ্মীরের শৌণ্ডিকবংশীয় নৃপতি শঙ্করবর্ম্মা ও তাঁহার মহিষী সুগন্ধা, শঙ্কর গৌরীশ ও সুগন্ধেশ নামে দুইটী শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন এবং এই বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণকে উভয় দেবালয়ের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন।

নারদ—(১) তিনি একজন বাস্তু শাস্ত্রোপদেশক গ্রন্থকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—নারদীয় তন্ত্র।

নারদ-(২)তিনি একজন জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রন্থকার। বরাহ তাঁহার বৃহৎ সংহিতায় নারদের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। বৃহৎ সংহিতার টীকাকার উৎপলভট্টও তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'নারদ সংহিতা'। ইহা কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে। 'ময়ুর চিত্রক নামে একখানা গ্রন্থ নারদ রচিত।

নারায়ণ—(১) তিনি কেশবকৃত 'কেশরী' নাম্নী পদ্ধতির উপর এক টীকা রচনা করিয়াছেন।

নারায়ণ—(২) ১৬৬০ শকে (১৭৩৮ খ্রীঃ) নারায়ণ নামক এক জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত 'হোরাসার সুধানিধি' নামক

একখানা গ্রন্থ এবং 'নরজাতক ব্যাখ্যা' নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচিত 'গণকপ্রিয়া' নামে (১৬৪১ শকে) প্রশ্ন গ্রন্থ, 'স্বর-সাগর' নামে শকুন গ্রন্থ এবং 'তাজক সুধানিধি' নামক তাজক গ্রন্থও খুব প্রসিদ্ধ। তিনি চিত্তপাবন ব্রাহ্মণ দাদা ভটের পুত্র। দাদা ভট দেখ।

নারায়ণ—(৩) 'অমৃতকুণ্ড' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ এক নারায়ণ প্রণীত।

নারায়ণ—(৪) রামের পুত্র নারায়ণ একজন জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি 'গ্রহণ লিখন ক্রম' নামে একখানা জ্যোতিষ গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

নারায়ণ—(৫) গোবিন্দের পুত্র নারায়ণ ১৫০৯ শকে (১৫৮৭ খ্রীঃ) 'তাতকণ্ডি' ও 'বীজগণিত' নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

নারায়ণ—(৬) 'পদ্মলীলা' বিলাসিনী নামক করণ গ্রন্থ নারায়ণ বিরচিত। নারায়ণকৃত প্রশ্নপ্রকাশ নামক জ্যোতিষ গ্রন্থও রহিয়াছে।

নারায়ণ—(৭) অনন্তের পুত্র নারায়ণ ১৪৯২ শকে (১৫৭০ খ্রীঃ) মুহূর্ত্তমার্ত্তণ্ড নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

নারায়ণ—(৮) নৃসিংহ পুত্র নারায়ণ ১২৭৮ শকে (১০৫৬ খ্রীঃ) গণিত কৌমুদী নামে ভাস্করকৃত লীলাবতীর এক টীকা রচনা করিয়াছেন।

নারায়ণ—(৯) মুকুন্দ দৈবজ্ঞ পুত্র নারায়ণ স্ফুট দর্পন নামে একখানা করণ গ্রন্থ ১৫২১ শকে (১৫৯৯ খ্রীঃ) রচনা করেন।

নারায়ণ—(১০) বৈদ্য গ্রন্থকার চক্রপাণি দত্তের পিতা নারায়ণ, বঙ্গের পাল-বংশীয় নরপতি নয়পাল (মৃত্যু অনুমান ১০৪৫ খ্রীঃ) দেবের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন।

নারায়ণ—(১১) তিনি এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গোন, পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রে বৃহস্পতির ন্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন। গোনের পুত্র নারায়ণ পুরাণ শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। এই পূত চরিত্র নারায়ণ প্রভাকরমত স্থাপনদ্বারা কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনিই ছন্দোগ পরিশিষ্টের 'পরিশিষ্ঠ প্রকাশ' নামক টীকা রচনা করেন। এই রাঢ়ের ব্রাহ্মণ বংশ ভূমিপতিও ছিলেন।

নারায়ণ—(১২) তিনি একজন বাস্তু-শাস্ত্রোপদেশক। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম নারায়ণীতন্ত্র। বড়ই দুঃখের বিষয় এই সকল বাস্তু বা শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। অনেক সময় অগ্নি বা কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হয়। রাজ বিপ্লবেও আমাদের দেশের অনেক গ্রন্থ নষ্ট হইয়াছে।

নারায়ণ—(১৩) তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তিনি শার্ঙ্গধরকৃত ত্রিশতী গ্রন্থের কৃতসিদ্ধান্ত চিকিৎসা

নামে এক টীকা রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এক নারায়ণ প্রণীত অন্ন-নির্ণয়, অপর এক নারায়ণ প্রণীত সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা, অন্যত্র এক নারায়ণ প্রণীত বৈষ্ণবৃন্দ (রসগ্রন্থ), গ্রন্থের পরিচয়ও আমরা পাইয়াছি। এই সমস্ত নারায়ণই একই ব্যক্তি, না ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ইহা বলা সম্ভব নহে।

নারায়ণ গণেশ চন্দবরকার, স্যার —জাতীয় জীবনের সকল বিভাগে উন্নতি, প্রগতি ও সংস্কার পরস্পর সাপেক্ষ। এই সকল উন্নতি যুগপৎ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আধুনিক ভারতে রাজা রামমোহন রায় তাঁহার জীবন দ্বারা তাহা প্রথম প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ে বাঙ্গালা দেশের অনেকে তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইয়া, নিজের ও জাতীয় জীবনের উন্নতি-সাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে আমরা আনন্দ মোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতিকে দেখিতে পাই। ভারতের অন্য প্রদেশে যেমন, বোম্বাই প্রদেশে সেইরূপ স্যার নারায়ণ গণেশ চন্দ্র বরকার প্রভৃতিকে দেখিতে পাই। তাঁহারাও নিজের ও সামাজিক জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সমকালেই হওয়া উচিত বলিয়া মনে করিতেন। কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা এই মতাবলম্বী নহেন। তাহার ফলে তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব সমাজের উপর কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না।

তিনি বোম্বাইয়ের একজন খ্যাতনামা বিচারপতি ও স্বদেশ হিতব্রতী। ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে বোম্বাই প্রদেশের স্বারস্বত ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার জন্ম হয়। এই বংশ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য বিখ্যাত। বোম্বাই এলফিনষ্টোন কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি আইন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে এল্ এল বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বোম্বাই হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। এই সময়ে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বোম্বাই গমন করিয়া-ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশ্বাস, ভক্তি, সরলতা ও স্বদেশ প্রেমিকতা দর্শন করিয়া, যুবক নারায়ণ একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন এবং অবসর সময়েই তাঁহার নিকট চলিয়া আসিতেন ও তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্মাদি নানা বিষয়ে উপদেশ শ্রবণ করিতেন। তখন হইতেই নারায়ণ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনু-রাগী হন এবং জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মবিধি অনুসারেই গার্হস্থ্য সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। প্রৌঢ় বয়সে তিনি উপবীতও পরিত্যাগ করিয়া-ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া তিনি সমাজ সংস্কার, নরনারীর শিক্ষাদান ও রাজনীতি সংস্কারে

আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এক দিকে হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন অপর দিকে বোম্বাইর "ইন্দু প্রকাশ" নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদকের কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়া স্বদেশ বাসীকে জ্ঞানে উন্নত, ধর্ম্মে সংস্কৃত সামাজিক কুসংস্কার নিবারণে নিরত ও রাজনীতি সংস্কারে উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন।

১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে যখন বোম্বাই নগরে ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময় কলিকাতা নগরে ৺সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺আনন্দ মোহন বসুর চেষ্টায় একটী জাতীয় কনফারেন্স আহুত হইয়াছিল। তিনি বোম্বাই হইতে আসিয়া এই কনফারেন্সে যোগদান করিয়াছিলেন। সেই বারই তিনি প্রথম কলিকাতা আগমন করেন। তাঁহার মধুর চরিত্রে ও বাগ্মীতায় কলিকাতা-বাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ১৯০০ সালে তিনি লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন কেবল রাজনীতির সংস্কারে এদেশের দুঃখ ঘুচিবে না, সেইজন্য তিনি ভারতীয় সমাজ সংস্কার সভা স্থাপন করিয়া স্বয়ং তাহার সম্পাদক হইয়াছিলেন এবং বহুকাল পর্য্যন্ত যেখানে কংগ্রেসের অধিবেশন হইত, সেইখানেই সমাজ সংস্কার সমিতির অধিবেশন করিয়া শত শত নরনারীকে সামাজিক কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতে বিশেষরূপে উৎসাহিত করিতেন। ভারত শাসন ব্যাপারে যে সকল অন্যায় ও অবিচার বর্ত্তমান ছিল, তাহা ইংলণ্ডের লোকদিগকে জানাইবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি-স্থানীয় লোককে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হইয়াছিল। বোম্বাই হইতে নারায়ণ চন্দবরকার প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। তিনি যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় ইংরেজ জাতির দৃষ্টি ভারতের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি ১৯০১ খ্রীঃ অব্দে বোম্বাই হাইকোর্টে বিচারপতির নিযুক্ত হন। দ্বাদশ বর্ষকাল ঐ পদে আসীন থাকিয়া ১৯১৩ খ্রীঃ অব্দে ঐ পদ পরিত্যাগ করেন। ১৯০৯ ও ১৯১২খ্রীঃ অব্দে তিনি দুইবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ লাভ করিয়াছিলেন। ১৯০৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি হাইকোর্টের জজের পদ ত্যাগ করিয়া, তিনি হোলকারের প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হোলকার তাঁহার মত অগ্রাহ্য করিয়া এক স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করায়, তিনি তাঁহার প্রধান মন্ত্রীত্ব করা পাপ মনে করিয়া, সেই পদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তথা হইতে চলিয়া আসেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় বাংলা দেশের বহু যুবককে বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখা হইলে, দেশময় তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। তখন

গবর্ণমেণ্ট নিরপরাধ ব্যক্তিদিগকে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে কিনা, তাহা বিবেচনা করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। তিনি কমিটির একজন সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং বিশেষ যত্নসহকারে প্রত্যেক আবদ্ধ ব্যক্তির লিখিত ও মৌখিক উক্তি পাঠও শ্রবণ করিয়া নিরপরাধ ব্যক্তিদিগকে মুক্তি দিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন।

১৯০১ সালে বোম্বাইয়ে যখন ভারত শাসন সংস্কার আইন অনুসারে ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তাহার সভাপতি পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের তিনি নেতা ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের তিনি সভ্য ছিলেন। তিনি গত কয়েক বৎসরকাল গ্রীষ্মকালে বাঙ্গালোরে গমন করিতেন। এই বৎসরও তিনি সুস্থ দেহে বোম্বাই হইতে বাঙ্গালোরে গমন করেন, কিন্তু সেইখানেই ১৩৩০ সালের ৩০শে বৈশাখ অকস্মাৎ তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নারায়ণ দত্ত—বঙ্গের সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী ছিলেন। একখানি তাম্র শাসনে তাঁহাকে মহাসন্ধিবিগ্রহিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

নারায়ণ দাস,—(১) তিনি রাজপুতনার অন্তর্গত বুন্দির রাজা। তাঁহার পিতামহ বীরসিংহ ১৪৬০ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পিতা রাও বান্দু সিংহাসন লাভ করেন। বান্দু অতিশয় পরোপকারী প্রজাবৎসল নরপতি ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমর সিংহ ও অমর সিংহ রাজ্য লোভে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, স্বীয় জ্যেষ্ঠ বান্দুকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। রাও বান্দু মনোদুঃখে এক পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইলেন। এই স্থানেই তিনি ১৪৯১ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার নারায়ণ দাস ও নির্ব্বুধ নামে দুই পুত্র ছিল। নারায়ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃ রাজ্য উদ্ধার করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। কতিপয় স্বজাতীয় যুবক তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, তাঁহারা অতিশয় উৎসাহের সহিত তাঁহার সহগামী হইতে ও বিশ্বস্ত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। তাঁহাদের সাহায্য পাইয়া, নারায়ণ দাস, তাঁহার পিতৃব্য দ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা নির্ভয়ে সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দিলেন। একদিন নারায়ণ দাস, কতিপয় বলিষ্ঠ যুবকের সহিত পিতৃব্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। প্রাসাদ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সঙ্গীদিগকে তথায় রাখিয়া একাকী অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পিতৃব্য দ্বয় অরক্ষিত অবস্থায় যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি তথায় উপস্থিত

হইলেন। তাঁহারা তাঁহার তেজো-ব্যঞ্জক মূর্ত্তি দর্শনে ভীত হইয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতেছিলেন। এমন সময়ে নারায়ণ দাস অসি প্রহারে সমর সিংহের মস্তক ভূপাতিত করিয়া, অমর সিংহকে শূল বিদ্ধ করিলেন। পরে তাঁহারও মস্তক দেহচ্যুত হইল। পরক্ষণেই তাঁহার সহচরেরা তাঁহার সহিত যোগ দিয়া রাজ্যাপহারীদের স্বপক্ষীয়দিগকে বিনাশ করিল। সমর সিংহ ও অমর সিংহ একাদশ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া ১৫০২ খ্রীঃ অব্দে নিহত হইয়াছিল।

তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্যের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। এই সময়ে চিতোর নগরী মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সংবাদ তাঁহার শ্রবণ গোচর হইল। তিনি স্বজাতিকে সাহায্য করিবার জন্য সসৈন্যে গোপনে চিতোরে উপস্থিত হইলেন। পাথরের দুর্ভেদ্য গিরিবর্ত্ম মধ্যে মোগলদিগকে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। রাত্রি প্রভাতে রাণা রায় মল্ল দেখিতে পাইলেন শত্রু সৈন্য পলায়ন করিয়াছে। বুন্দির রাও নারায়ণ দাস শত্রু সৈন্যকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়াছেন। রাণা রায় মল্ল দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। পুরমহিলারাও নানাবিধ উপচারে তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। রাণা রায় মল্ল এই উপকারী বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায় চিন্তনে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময়ে জানিতে পারিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রী কুমারী কেতু, বুন্দি রাজের প্রতি অনুরাগিণী। রাণা অতিশয় প্রীত হইয়া বুন্দিরাজের সহিত তাঁহার পরিণয় ব্যাপার সম্পন্ন করিলেন। রাও নারায়ণ দাস বত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৬৩৪ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার একমাত্র পুত্র সূর্য্য মল বুন্দির সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। নারায়ণ দাসের সময়ে বুন্দির রাজ্যসীমা বহুলাংশে বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

নারায়ণ দাস—(২) তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—চিকিৎসা-পরিভাষা।

নারায়ণ দাস—(৩)মুক্তাচরিত নামক একখানা সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি ১৬২৪ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

নারায়ণ দাস—(৪) তিনি দাদুপন্থী ভক্ত। দাদুর শিষ্য সুন্দর দাস (বড়), তৎশিষ্য নারায়ণদাস। সুন্দরদাস ১৬৮৯ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গত হন। তাঁহার আট বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৬৮১ সালে নারায়ণ দাস পরলোকবাসী হন। সুন্দর দাসের মৃত্যুর পরে নারায়ণ দাসের শিষ্য রামদাস ফতেহপুরের মঠের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তাঁহারা এক একজন দিক্‌পাল ছিলেন।

নারায়ণ দাস—(৫) একজন সহজিয়া মতাবলম্বী বৈষ্ণব। তিনি 'রসভাবান্ত' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। আবার দাস নারায়ণ নামে এক কবিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি 'সহজ উজ্জ্বল' নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

নারায়ণ দাস—(৬)ব্রহ্মদাস পুত্র কায়স্থ নারায়ণ দাস সিদ্ধ গোঁসাই, 'প্রশ্ন বৈষ্ণব বা অর্ণবপ্লব' গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

নারায়ণ দাস, কবিরাজ একজন বিখ্যাত চিকিৎসা শাস্ত্রবেত্তা। তাঁহার রচিত 'চিকিৎসা পরিভাষা' ও 'দ্রব্যগুণ রাজবল্লভ' দুইখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত 'সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী' নামে জয়দেবকৃত গীতগোবিন্দের একটী উৎকৃষ্ট টীকাও তিনি লিখিয়াছেন।

নারায়ণদাস ঠাকুর—আসামের একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভক্ত। প্রথমে তিনি খুব সম্ভব সৌর সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। পরে ভাস্কর নামক এক ব্যক্তির নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মের মহিমা শ্রবণ করিয়া, ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব নাম ভবানন্দ। আসামের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারক শঙ্করদেব তাঁহাকে পূর্ব্ব নামের পরিবর্ত্তে নারায়ণ নাম প্রদান করেন। তৎপরে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হন। কুচবিহারের নরপতি নরনারায়ণ ব্রাহ্মণদিগের প্ররোচনায় শঙ্কর দেবকে শাস্তি প্রদানে উদ্যত হন। কিন্তু তাঁহাকে না পাইয়া রাজানুচরেরা সসহচর দাসকে রাজসমীপে উপনীত করে। রাজা নরনারায়ণের আদেশ অমান্য করিয়া, তাঁহারা দুর্গা প্রতিমার সম্মুখে প্রণত হইতে অস্বীকার করায়, রাজা তাঁহাদিগকে কারাগারে বন্দী করেন। অতঃপর নদীয়ার প্রসিদ্ধ ভক্ত হরিদাসের ন্যায়, তাঁহাদের উপরও অকথ্য, অত্যাচার চলিল। কিন্তু কোনও উপায়ে ভক্তের মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে না পারিয়া রাজা তাঁহাদিগকে অবশেষে মুক্তি প্রদান করেন।

নারায়ণ দেব—(১) শ্রীহট্টের অন্তর্গত ভাটেরা নামক স্থানের প্রাচীনকালের চন্দ্রবংশীয় একজন রাজা।

নারায়ণ দেব—(২) তিনি পদ্ম পুরাণ পয়ারাদি ছন্দে রচনা করেন। বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জিলার পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তস্থ জোয়ানশাহী পরগণায় কায়স্থ বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি যাহা মুখে মুখে বলিতেন, তাঁহার ভ্রাতা বল্লভ তাহা লিখিয়া লইতেন। তাঁহার গ্রন্থ ঐ অঞ্চলে সমধিক আদৃত হইয়াছিল। তিনি বঙ্গের নবাব হোশেন শাহের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ পাঠে সেই অঞ্চলের প্রচলিত অনেক আচার ব্যবহারের বিষয় অবগত হওয়া যায়।

নারায়ণ দেব—(৩) একজন কবি। তিনি ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার অধীন বোর গ্রামে বাস

করিতেন। তাঁহার পিতার নাম নরসিংহ ও মাতার নাম রুক্মিণী। তিনি 'পদ্মপুরাণ', 'কালিকাপুরাণ' ও 'স্বপ্নাধ্যায়' পদ্যে রচনা করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত জানিতেন না। সুতরাং সংস্কৃত পদ্মপুরাণ পাঠ করিতে পারেন নাই। একমাত্র লোকপরম্পরায় শুনিয়া মহাদেব তনয়া মনসাদেবীর স্বপ্নাদেশে তাঁহারই পূজা ও মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য চাঁদসদাগরের উপাখ্যান অবলম্বনে বৃহৎ গ্রন্থ পদ্মপুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। এই পদ্মপুরাণ গ্রন্থের প্রাচীন অনুলিপিতে যদুনাথ পণ্ডিত, জানকীনাথ পণ্ডিত, দ্বিজবংশী দাস ও জগন্নাথ বিপ্র এই কয়েকজন কবিরও ভণিতা দৃষ্টি হয়। নারায়ণ দেব রচিত কালিকাপুরাণখানিও একটি বৃহৎ গ্রন্থ। ইহাতে কালিকাদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতেও বলরাম দাস ও জয়দেব দাসের ভণিতা দৃষ্ট হয়। তাঁহার রচিত স্বপ্নাধ্যায়খানি একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। অনুমান খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

নারায়ণ দেব—(১) চট্টগ্রামের একজন প্রাচীন বাঙ্গালী কবি। তিনি বিবিধ ছন্দে একখানি কালিকাপুরাণ প্রণয়ন করেন। তাঁহার জীবিতকাল অজ্ঞাত।

নারায়ণ দেব (দ্বিজ)—'সুকনারি' নামক একখানি গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া এক নারায়ণ দেবের কথা জানা যায়। "সুকবি নারায়ণী" শব্দই ক্রমে সুকনারি রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ অনেকের মত। তাঁহার রচনাপ্রণালী সম্পূর্ণ কামরূপীর কথার অনুযায়ী এবং তিনি দরঙ্গের রাজার আজ্ঞায় এই গ্রন্থ রচনা করেন।

নারায়ণ দৈবজ্ঞ—তিনি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ও 'সুধারস সারনী' নামক গ্রন্থের রচয়িতা অনন্ত দৈবজ্ঞের পুত্র। ১৪৯৩ শকে (১৫৭১ খ্রীঃ) তিনি 'মুহূর্ত্তমার্ত্তণ্ড' নামক মুহূর্ত্ত বিচার বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। 'মার্ত্তণ্ড বল্লভ' নামে ইহার এক টীকাও তিনি স্বয়ং রচনা করেন। নারায়ণের পুত্র গঙ্গাধরও একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গ্রহ লাঘবের উপর 'মনোরমা' নাম্নী টীকা রচনা করিয়াছিলেন। অনন্ত দৈবজ্ঞ ও গঙ্গাধর দৈবজ্ঞ দেখ।

নারায়ণ (দ্বিজ)—প্রাচীন বাঙ্গালী কবি। কুচবিহারের নৃপতি উপেন্দ্র নারায়ণের অনুজ খড়্গনারায়ণের আদেশে তিনি নারদীয় পুরাণ রচনা করেন (খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে)।

নারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন—একজন বৈয়াকরনিক ও টীকাকার। তিনি 'ব্যাকরণদীপিকা' নাম্নী একখানি টীকার পুঁথি রচনা করেন (অনু-১৫৩৩ শক)।

নারায়ণ পাল—তিনি বঙ্গের পালবংশীয় নরপতি প্রথম বিগ্রহ পালের

পুত্র। বিগ্রহ পাল হৈহয় বংশীয়া (চেদী বা কলচুরী) লজ্জাদেবীকে বিবাহ করেন। এই মহিষীই নারায়ণ পালের জননী। এই সময়ে গুর্জ্জর পতি ভোজদেব বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। বিগ্রহ পাল (১ম) ও তৎপুত্র নারায়ণ পাল যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন পালরাজগণ মগধ ও তীরভুক্তির (বর্ত্তমান তীরহুত বা ত্রিহুত) অধিকাংশ স্থান ভোজরাজকে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নারায়ণ পাল প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী রাজ্য শাসন করেন। এই সময়ে পাল সাম্রাজ্যের বহুস্থান পরহস্তগত হয়। নারায়ণপাল দেবের রাজত্বের প্রথম ভাগে মগধ তাঁহার অধিকারে ছিল। কারণ তাঁহার সপ্তম রাজ্যাঙ্কে ভাণ্ডদেব নামে এক ব্যক্তি গয়া নগরে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার সপ্তদশ রাজ্যাঙ্কে তিনি মুদ্গ গিরি হইতে (মুঙ্গের) ত্রিহুতের অন্তর্গত একটী গ্রাম মহাদেবের অর্চ্চনা ও পাশুপত আচার্য্য পরিষদের ব্যবহার্থে দান করিয়াছিলেন। সুদীর্ঘকাল রাজ্যভোগের পর তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার অপত্য রাজ্য পাল রাজা হইয়াছিলেন।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—একজন বৈয়াকরনিক। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—'সারাবলী ব্যাকরণ।'

নারায়ণ বর্ম্মা—(১) পালবংশীয় নৃপতি ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের মহাসামন্ত পদে আসীন ছিলেন। তিনি শুভস্থলিতে 'বুদ্ধ নারায়ণ ভট্টারক' নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

নারায়ণ বর্ম্মা—(২) তিনি প্রাগ জ্যোতিষপুরের পুষ্যবংশীয় নরপতি মহেন্দ্র বর্ম্মার পরে, রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম রেবতী ছিল। তাঁহার পরে মহাভূত বর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন। পুষ্যবর্ম্মা দেখ।

নারায়ণ বল্লভ শ্রীচন্দ্র পাল—তিনি গন্ধর্ব্ব রাজার পুত্র। তিনিই নারায়ণ দুর্গ স্থাপন করেন। কর্ণগড়, বলরামপুর ও নারায়ণ গড়ের রাজারা খয়রা রাজার সামন্ত নরপতি ছিলেন। এই তিন রাজ্য মিলিত হইয়া, খয়রা রাজ্যের বিনাশ সাধন করেন। খয়রা জাতিরা দস্যু বৃত্তি দ্বারাই সাধারণতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তিনি তাঁহাদের দলপতি বিনায়ককে কৌশলে হস্তগত করিয়া, এই জাতিকে সৈন্য শ্রেণীতে ও কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করান। তিনি ভিন্ন স্থান হইতে লোক আনয়নপূর্ব্বক স্বদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ১২৯৬ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৩১৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র দেবীবল্লভ শ্রীচন্দনপাল রাজা হন।

নারায়ণ ভট্ট—(১) তিনি একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। 'চমৎকার চিন্তামণি জাতক' তাঁহারই রচিত।

নারায়ণ ভট্ট—(২) তিনি সামুদ্রিক অমরসিংহ বিরচিত 'জাতক তন্ত্রসার বা কর্ম্ম প্রকাশ' গ্রন্থের 'কর্ম্ম প্রকাশিকা সুধানিধি' নামক টীকা রচনা করিয়াছেন।

নারায়ণ ভট্ট—(৩) তিনি একজন শুদ্ধাদ্বৈতবাদী এবং খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রামেশ্বর ভট্ট। নারায়ণের রচিত বৃত্তরত্নাকরের টীকা অতি প্রসিদ্ধ। তাঁহার পৌত্র নারায়ণ ভট্ট একজন বিখ্যাত লোক। সম্ভবতঃ এই নারায়ণ ভট্টই বল্লভাচার্য্যের গুরু ছিলেন।

নারায়ণ ভট্ট—(৪) শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করিবার জন্য অনেককে তথায় প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে লোকনাথ গোস্বামী অল্প বয়সেই বৃন্দাবন প্রবাসী হইয়াছিলেন। তিনি রূপ, সনাতন ও নারায়ণ ভট্টের সহায়তায় বহু লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করিয়া তাঁহাদের নামাকরণ করিয়াছিলেন। ১৫৫৩ খ্রীঃ অব্দে নারায়ণ ভট্ট সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, তাঁহার 'ব্রজভাববিলাস' নামক গ্রন্থে লোকনাথ গোস্বামী কর্তৃক আবিষ্কৃত ৩৩৩টী বনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাভূষণ—একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও উপন্যাস লেখক। হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী পোল গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য। সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি 'নবোধন', 'কথাকুঞ্জ' প্রভৃতি বহু উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্রের অভিধান 'চিন্তামণির' মূলসহ বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।

নারায়ণ রাও পেশুয়া—বালাজি রাও পেশুয়ার তৃতীয় পুত্র। ১৭৭০ খ্রীঃ অব্দে তিনি তাঁহার ভ্রাতার পরিত্যক্ত পুণার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতৃব্য রঘুনাথ রাও তাঁহাকে নিহত করেন। নারায়ণ রাও নিহত হইলে তাঁহার শিশুপুত্র শিবাজী মধুরাও সিংহাসনে আরোহণ করেন। রঘুনাথ সিংহাসন লাভে অকৃতকার্য্য হইয়া, সুরাটে ইংরেজ কোম্পানীর আশ্রয়ে আগমন করেন।

নারায়ণ, রাজ—একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। 'নারায়ণ বিলাস' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

নারায়ণ স্বামী—রামানন্দী সম্প্রদায়ের একজন আচার্য্য। ১১৮৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে (১৭৮০ খ্রীঃ) অযোধ্যা নগরের চারি ক্রোশ উত্তরে চুপিয়া নামক গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্ব নাম ঘনশ্যাম এবং তাঁহার

পিতার নাম হরিপ্রসাদ। তাঁহাদের তিন সহোদরের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ। ঘনশ্যামের দশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতামাতা পরলোক গমন করেন। তখন হইতে তিনি সংসারের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়েন এবং বার বৎসর বয়সের সময় সংসার ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসী বেশে তীর্থ ভ্রমণে বহি-র্গত হন ও ভারতের বহু তীর্থ ভ্রমণ করেন। বিবিধ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া তিনি শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান লাভ করিয়া-ছিলেন। উনিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি কাঠিয়াগড় প্রদেশে গমন করেন এবং পরে জুনাগড়ের নিকট শ্রীলোজ গ্রামে যাইয়া 'রামানন্দী সম্প্রদায়ের' প্রতিষ্ঠাতা রামানন্দ স্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি নানা গুণে রামানন্দ স্বামীর অতিশয় প্রিয় শিষ্য হইয়া-ছিলেন। গুরুই তাঁহাকে ঘনশ্যাম নামের পরিবর্ত্তে নারায়ণস্বামী নাম প্রদান করেন। রামানন্দ স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি রামানন্দী সম্প্রদায়ের আচার্য্য পদে অভিষিক্ত হন। ১৮০৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি আহম্মদাবাদে স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচা-রার্থ গমন করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৮১১ খ্রীঃ অব্দে ভাউনগর রাজ্যের গড়হড়া নামক স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বহুলোককে শিষ্য করিয়াছিলেন। তাহার ধর্ম্মোপদেশে পাষণ্ডেরও চিত্ত বিগলিত হইত। গড়হড়া গ্রামে তিনি "দাদা-কাছরের দরবার" নামে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি দেহ রক্ষা করেন। শিষ্যগণ তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ তাঁহার শ্মশানের উপর একটি বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করান। মৃত্যু সময়ে তাঁহার পাঁচ লক্ষ শিষ্য ছিল।

নারায়ণাচার্য্য—(১) তিনি আশ্বলায়ন সূত্রাদির বৃত্তি রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

নারায়ণাশ্রম আচার্য্য— একজন অদ্বৈতবাদী। তিনি আচার্য্য নৃসিংহা-শ্রমের শিষ্য। ষোড়শ শতাব্দীতে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি স্বীয় গুরুর কৃত 'অদ্বৈতদীপিকা' ও 'ভেদধিক্কার' নামক গ্রন্থদ্বয়ের উপর 'অদ্বৈতদীপিকা বিবরণ' ও 'ভেদধিক্কার সৎক্রিয়া' নামক টীকা প্রণয়ন করেন। ভেদধিক্কার সৎক্রিয়ার উপরে শুদ্ধানন্দ স্বামীর জনৈক শিষ্য 'ভেদধিক্কার সৎক্রিয়ো-জ্জলা' নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। নারায়ণাশ্রম দ্বৈতবাদ খণ্ডন ও অদ্বৈত-বাদ সুদৃঢ় করিবার জন্যই স্বীয় টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

নারায়ণী—বিদুষী মহিলা। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণে ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁহার স্বামীর নাম রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার। (রাম-মাণিক্য বিদ্যালঙ্কার দেখ)।

নারোপা—একজন প্রাচীন বৌদ্ধ চর্য্যাপদ রচয়িতা ও সিদ্ধাচার্য্য।

নারোশঙ্কর—বুন্দেল খণ্ডের মহারাজা ছত্রপাল, বাজীরাও পেশওয়াকে ঝান্সী প্রদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। বাজী-রাও পেশওয়ে নারোশঙ্কর নামক এক মহারাষ্ট্রা সর্দ্দারকে এই প্রদেশের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনিই ঝান্সীর প্রথম শাসন কর্ত্তা। তাঁহার পরে রঘুনাথ রাও ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ছত্র-পাল দেখ।

নার্ম্মদ—তিনি একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সূর্য্য সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। রঙ্গনাথ সূর্য্য সিদ্ধান্তের টীকায় নার্ম্মদের শ্লোক উদ্ধার করিয়া-ছেন। তিনি ১৩০০ শকে (১৩৭৮খ্রীঃ) বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পুত্র পদ্মনাভ ও পৌত্র দামোদর প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। পদ্মনাভ ও দামোদর দেখ।

নালক—একজন বৌদ্ধ আচার্য্য। যুবরাজ সিদ্ধার্থের জন্ম হইলে তিনি সংবাদ পাইয়া শিশু সিদ্ধার্থকে দর্শন করিবার জন্য, শুদ্ধোধনের আলয়ে উপ-নীত হন। 'সুত্তনিপাত' নামক বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থে এই বিষয়ে একটি সুমধুর গাথা আছে।

নাসির—দিল্লীর শাহ খাঁরিকের পুত্র উর্দ্দু কবি শাহ নাসিরউদ্দিনের কবিজন সুলভ উপাধি। সাধারণতঃ তিনি মিঞা কাল্লু নামেই পরিচিত। জীবনের শেষভাগে তিনি হায়দরাবাদের মহা-রাজা চণ্ডুলালের অধীনে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ স্থানেই ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় শিষ্য মহারাজ সিংহ তাঁহার কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন।

নাসির আলী মোল্লা—শাজাহানা-বাদের একজন কবি। তাঁহার কবিজন সুলভ উপাধি আলি। শিরহিন্দ নামক নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। ১৬৯৭ খ্রীঃ অব্দে দিল্লী নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার রচিত একখানা দেওয়ান ও একখানা মসনবী রহিয়াছে।

নাসিরউদ্দিন—(নসরত শাহ) তিনি বাংলার প্রসিদ্ধ নবাব হোশেন শাহের পুত্র এবং ১৫১৯-১৫৩২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তিনি বাংলা দেশের নানাস্থানে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। তন্মধ্যে পাবনা জিলার অন্তর্গত তাড়াশ থানার অধীন নওগাঁও নামক স্থানের মস্‌জিদটী অন্যতম। তিনিই ত্রিপুরা রাজ্য আক্র-মণ করিয়াছিলেন।

নাসিরউদ্দিন—একজন প্রাচীন মুসল-মান বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা।

নাসিরউদ্দিন কুবাচা অথবা কভাহ —সিন্ধুদেশের শাসনকর্ত্তা। খলিফা আবদুল মালেকের পুত্র ওয়ালিদের রাজত্বকালে যখন হজ্জাজ বিন ইউসফ বোসরার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, সেই সময়ে সিন্ধুদেশে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার হয়। ৭০৬ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৮৭) হজ্জাজ, মামুদ হোশেনকে একদল সৈন্যসহ মেকরাণ (বেলুচিস্থানের দক্ষিণাংশ) অধিকার করিতে প্রেরণ করেন। তিনি সেই দেশ অধিকার করিয়া তৎপ্রদেশবাসী অনেক বেলুচিকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। হজ্জাজ তৎপরে বুদমিন নামক এক ব্যক্তিকে দেবল (সিন্ধুনদ তীরবর্ত্তী বর্ত্তমান তাত্তা) অধিকার করিতে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি প্রথম উদ্যমেই নিহত হন। হজ্জাজ ইহাতে নিরাশ না হইয়া ৭১২ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৩) আপন আত্মীয় অকিল তাকাফির পুত্র ইমাদ-উদ্দিন মোহাম্মদ বিন কাশিমকে সেই প্রদেশ অধিকার করিতে ছয় হাজার সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। তিনি দেব-লের অধিপতি দাহিরকে নিহত করিয়া, সেই প্রদেশ অধিকার করেন। মোহা-ম্মদ বিন কাশিমের মৃত্যুর পরে আন-সারী বংশীয় লোকেরা সিন্ধুদেশে রাজত্ব করেন। তাঁহাদের পরে সুমারাবংশীয় জমিদারেরা প্রায় পাঁচশত বৎসর এই প্রদেশে রাজত্ব করেন। তৎপরে ১৩৩৬ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৭৩৭) সুমানা-বংশীয় জাম উপাধিধারী কোনও সর্দ্দার তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া সিন্ধুদেশে আধিপত্য স্থাপন করেন। এই বংশেরই রাজত্বকালে ভারতের মুসলমান সম্রাটেরা মাঝে মাঝে সিন্ধুদেশ অধিকার করিয়া মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিতেন। এই সকল শাসনকর্ত্তা-দিগের মধ্যে নাসিরউদ্দিন কুবাচাই প্রথমে সিন্ধুদেশের স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করেন এবং নিজ নামে খোতবা ও মুদ্রা মুদ্রিত করেন। তিনি দিল্লীর সম্রাট কুতবউদ্দিন আইবাকের কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি প্রথমে সাহাবউদ্দিন মোহাম্মদ ঘোরীর ক্রীতদাস ছিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক ১২০৩ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৬০০) মুলতানের অন্তর্গত উচ্ছার শাসনকর্ত্তা পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১২১০ অব্দে (হিঃ ৬০৭) কুতবউদ্দীনের মৃত্যুর পরে তিনি সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন এবং দিল্লীর অধীনতা অবলম্বন করেন। সিন্ধু ব্যতীত মুলতান, কোহরাণ ও সুরসতি প্রদেশও তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। গজনীর অধিপতি তাজউদ্দীন ইলদুজ দুইবার তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া পরা-জিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ১২২৫ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৬২২) দিল্লীর সম্রাট শামসউদ্দিন আলতমাস তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। নাসিরউদ্দিন উপায়ান্তর না দেখিয়া পরিবার ধনরত্ন

ও সহচরগণ সমভিব্যাহারে নিকটবর্ত্তী কোনও দ্বীপে গমনার্থ একটী অর্ণবপোতে আরোহণ করেন। কিন্তু ঝটিকাঘাতে পোত জলমগ্ন হওয়ায়, সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। নাসিরউদ্দিন ২২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে সিন্ধুদেশ কখনও দিল্লীর অধীন কখনও স্বাধীন থাকিত। নিম্নে রাজপুত সুমানাবংশীয় রাজাদের নাম দেওয়া গেল। তাঁহাদের উপাধি জাম ছিল। ১। জাম আফ্রা ১৩৩৬—১৩৩৯ খ্রীঃ (হিঃ ৭৪০)। ২। জাম চোবান, জাম আফ্রার ভ্রাতা ১৩৩৯—১৩৫৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ১৪ বৎসর। ৩। জাম বাণী, জাম আফ্রার পুত্র ১৩৫৩—১৩৬৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ১৫ বৎসর। ৪। জাম তিম্মাজি, জাম আফ্রার পুত্র, ১৩৬৭—১৩৮০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ১৩ বৎসর। ৫। জাম সালাহউদ্দীন, তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৩৮০—১৩৯১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ১১ বৎসর। ৬। জাম নিজামউদ্দীন, জাম সালাহউদ্দীনের পুত্র। ১৩৯১—১৩৯৩ খ্রীঃ অব্দ। ৭। জাম আলিশার, জাম নিজামউদ্দীনের পুত্র। ১৩৯৩—১৪০৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত। ৮। জাম গিয়াণ, জাম তিম্মাজির পুত্র। সিংহাসনারোহণের দ্বিতীয় দিনে তাঁহার মৃত্যু হয়। ৯। জাম ফতে খাঁ, ইস্কন্দর খাঁর পুত্র। ১৪০৯—১৪২৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত। ১০। জাম তোলগক, জাম ফতে খাঁর ভ্রাতা। তিনি গুজরাট জয় করেন। ২৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার আত্মীয় জাম মোবারক সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিন দিন পরেই সিংহাসনচ্যুত হন। ১১। জাম সেকেন্দর, ফতে খাঁর পুত্র। দেড় বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৪৫২ খ্রীঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১২। জাম সঞ্জর, সিন্ধুদেশের পূর্ব্বরাজবংশীয়। ১৪৫২—১৪৬০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত। ১৩। জাম নিজামউদ্দীন সাধারণতঃ জামনন্দু নামে পরিচিত। মুলতানের অধিপতি হাসনলঙ্গার সমসাময়িক। ১৪৬০—১৪৮৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৩০ বৎসর রাজত্ব করেন। ১৪। জাম ফিরোজ, নিজামউদ্দীনের পুত্র। প্রায় ৩৩ বৎসর রাজত্ব করেন। ১৫২০ খ্রীঃ অব্দে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা শাহবেগ আর্গান সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। ১৪৮৯—১৫২০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত। ১৫। শাহবেগ আর্গান, ১৫২০—১৫২৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত। ১৬। শাহ হোশেন আর্গান, ১৫২৩—১৫৫৪ খ্রীঃ অব্দ। ১৭। মামুদ (বক্করের অধিবাসী) ১৫৫৪—১৫৭২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎকালে সম্রাট আকবর তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। পাঠান রাজত্বের সময়ে তাহাদের স্বাধীনতা কিছুমাত্র ব্যাহত হয় নাই।

নাসিরউদ্দিন খিলিজি সুলতান—মালবের অধিপতি। ১৫০০ খ্রীঃ অব্দের ২৫ শে অক্টোবর (হিঃ ৯০৬, দ্বিতীয় রবির ২৭ শে) তাঁহার পিতা গিয়াস-উদ্দীন খিলিজি পরলোক গমন করেন। পিতার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ১৫১১ খ্রীঃ অব্দের (হিঃ ৯১৭) তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি স্বীয় তৃতীয় পুত্র মামুদকে উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষনা করিয়াছিলেন।

নাসিরউদ্দিন গুম্মুখি কাজী—তিনি একজন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনাও করিতেন না, এবং সহজে কিছু গ্রহণও করিতেন না। তিনি সমাধি ক্ষেত্রে নির্ম্মিত একটী ইষ্টকালয়ে বাস করিতেন। তাঁহার শিষ্যেরাও তাঁহারই মত সর্ব্বত্যাগী ও নির্লোভী ছিলেন। অনাহার জনিত দুর্ব্বলতায় দণ্ডায়মান থাকিতে অসমর্থ হইবার আশঙ্কায়, তাহার শিষ্যেরা লৌহ শৃঙ্খলে স্বীয় দেহ কোনও স্তম্ভের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতেন। জোনপুরে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'মুনশারিয়া-ই-সার্ফ।'

নাসিরউদ্দিন বগরা খাঁ, সুলতান—বাঙ্গালার একজন শাসনকর্ত্তা। দিল্লীর সম্রাট গিয়াসউদ্দীন বলবন তদানীন্তন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা তোগরল খাঁ বিদ্রোহী হইলে, তাঁহাকে নিহত করিয়া, স্বীয় দ্বিতীয় পুত্র নাসিরউদ্দিনকে বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। গিয়াসউদ্দীন পুত্রকে রাজ্যশাসন বিষয়ে কতকগুলি সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। নাসিরউদ্দিন পিতার উপদেশ অনুযায়ী অতিশয় সুনামের সহিত বঙ্গদেশ শাসন করিতে লাগিলেন, কিছুকাল পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুলতান মোহাম্মদ, মুলতানের সন্নিকট মুঘলদিগের সহিত এক যুদ্ধে, নিহত হন। সম্রাট গিয়াসউদ্দীন প্রিয় পুত্র মোহাম্মদের মৃত্যুতে অতিশয় শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং নাসিরউদ্দিনকে দিল্লীতে আসিবার জন্য আদেশ করিলেন। পিতার আদেশ অনুযায়ী নাসিরউদ্দিন দিল্লীতে গমন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই সময় সম্রাট গিয়াসউদ্দীন, পুত্র নাসিরউদ্দিনকে বলিলেন,—"আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শোকে অতিশয় মুহ্যমান, পীড়িত ও বৈষয়িক কার্য্যে একেবারে অক্ষম হইয়াছি। আমি শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইব। মোহাম্মদের এক পুত্র খুসরু বর্ত্তমান, ঐ পুত্রই সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী; কিন্তু সে এখনও বালক এবং সাম্রাজ্য পরিচালনা করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। তুমি আমার নিকট অবস্থান কর এবং আমার মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ

করিয়া, সুশৃঙ্খলার সহিত রাজ্য পরিচালনা করিও”। নাসিরউদ্দিন পিতার ইচ্ছায় সম্মত হইয়া, তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে সম্রাট গিয়াসউদ্দীন কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। তদ্দৃষ্টে নাসিরউদ্দিন বঙ্গদেশে পুনরাগমন করিতে সঙ্কল্প করিলেন, এবং এক দিবস মৃগয়াচ্ছলে পিতাকে না বলিয়া, বঙ্গদেশে চলিয়া আসেন। তাঁহার এই কার্য্যে সম্রাট অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন এবং মোহাম্মদের পুত্র খুসরুকেই তাঁহার সমস্ত রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। তৎপরে ১২৮৩ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৬৮৫) সম্রাট পরলোক গমন করিলে রাজকর্ম্মচারীগণ মোহাম্মদের পুত্র খুসরুকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া, নাসিরউদ্দিনের পুত্র অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক কায়কোবাদকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কায়কোবাদ অল্পকালের মধ্যেই অতিশয় দুরাচারী হইয়া উঠিলেন এবং সমস্ত সময় প্রমোদ গৃহে সুরা ও নারীতে মত্ত থাকিতেন। তখন মন্ত্রী নিজামউদ্দীনের হস্তে প্রধানতঃ রাজ্যের শাসন ভার অর্পিত ছিল। নিজামউদ্দীন অযোগ্য ও কায়কোবাদের কুপরামর্শদাতা ছিলেন। নাসিরউদ্দিন পুত্রের রাজ্য প্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়া, যতদূর না সুখী হইলেন, কিন্তু তাঁহার দুষ্কার্য্যের কথা শুনিয়া ততোধিক মর্ম্মাহত হইলেন। নাসিরউদ্দিন পুত্রকে উপদেশপূর্ণ পত্র প্রেরণ করিয়া মিত্ররূপী শত্রু নিজামউদ্দীনকে বিনাশ করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তাঁহার এই উপদেশপূর্ণ পত্রেও কোন ফল হইল না দেখিয়া, নাসিরউদ্দিন দিল্লী অধিকার করিয়া স্বয়ং রাজকার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য, পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। অপরদিকে পুত্র কায়কোবাদও মন্ত্রীর পরামর্শে পিতার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া, বহু সৈন্যসহ বঙ্গদেশের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন; নাসিরউদ্দিন যুদ্ধে পুত্রকে দমন করা অসম্ভব মনে করিয়া, পুত্রের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কায়কোবাদ মন্ত্রীর প্ররোচনায় সন্ধি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তৎপর তিন দিন পর্য্যন্ত উভয় পক্ষ হইতে পত্র বিনিময় হইল। চতুর্থ দিনে নাসিরউদ্দিন স্বীয় পত্রে নিম্ন লিখিত কথা কয়টি লিখিয়া পাঠাইলেন। “হে প্রিয় পুত্র! আমি তোমার দর্শনাভিলাষী, তোমাকে না দেখিয়া আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না। আমার হৃদয় অনল দগ্ধ, আমি কিরূপে তোমার দর্শন লাভ করিব, তাহা বল; যদি অন্ধ নয়ন দ্বয়ে পুনরায় দৃষ্টি শক্তি প্রদান কর, তবে তদ্দ্বারা তোমার অনিষ্ট সাধিত হইবে না। জনৈক পার্শি কবি বলিয়াছেন, স্বর্গ পরম সুখকর, কিন্তু

সুহৃদ সম্মিলন তদোধিক সুখকর।” কায়কোবাদ পিতার এই পত্র পাঠ করিয়া, অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন এবং একাকী পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু দুষ্ট মন্ত্রী ইহাতে বাঁধা প্রদান করিয়া বলিলেন যে, “তাঁহার জনক হইলেও তদপেক্ষা হীন পদস্থ নৃপতির সহিত ভারত সম্রাট নিজে যাইয়া সাক্ষাৎ করিলে তাঁহার মর্য্যাদার হানি হইবে”। অবশেষে এই ব্যবস্থা হইল যে, অযোধ্যার সমতলক্ষেত্রে সম্রাট কতকগুলি মণ্ডপ প্রস্তুত করাইবেন এবং নাসীরউদ্দীন তথায় উপস্থিত হইয়া, সিংহাসনোপবিষ্ট সম্রাটকে অভিবাদন করিবেন এবং সম্রাট পিতাকে দর্শন করিয়া, সিংহাসন হইতে অবতরণ করিবেন না। নাসিরউদ্দিন এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, পুত্রের শিবিরে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন। তখন কায়কোবাদ অস্থির হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে পিতার চরণে পতিত হইলেন। নাসিরউদ্দিন পুত্রকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন এবং উভয় উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গনে বহুক্ষণ আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তৎপর নাসিরউদ্দিন পুত্রের হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইতে গেলেন, কিন্তু পুত্র তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া, পিতাকে সিংহাসনে বসাইলেন এবং তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বয়ং পিতার পাদদেশে অন্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন। এই সময়ে কয়েকদিন ধরিয়া ক্রমাগত আনন্দোৎসব চলিয়াছিল। তৎপরে উভয়ের মধ্যে সন্ধি হইল। নাসিরউদ্দিন এই সর্ত্তে বঙ্গদেশ ও উহার অধীনস্থ সমস্ত ভূভাগ স্বতন্ত্র নৃপতিরূপে নিজ অধিকারে রাখিতে অনুমতি পাইলেন ~~যে~~, দিল্লীর রাজকার্য্যে তিনি আর হস্তক্ষেপ করিবেন না। প্রত্যাবর্ত্তনকালে নাসিরউদ্দিন পুত্রকে রাজ্য শাসন বিষয়ে বহু সদুপদেশ প্রদান করিলেন এবং বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীর নিকট অতিশয় সাবধানে চলিতে ও তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে বলিলেন। অতঃপর স্নেহভরে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া তিনি বঙ্গদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহার পর বৎসরই ১২৮৩ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৬৮৮) কায়কোবাদ ঘাতক হস্তে নিহত হন এবং ফিরোজ নামক খিলিজিবংশীয় একজন সেনাপতি দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। ফিরোজের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত নাসিরউদ্দিন বিনা প্রতিবন্ধকতায় বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন। ফিরোজের পরে আলাউদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্রাট আলাউদ্দীন যেমন নিষ্ঠুর তেমন পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহার ভয়ে নাসিরউদ্দিন ইচ্ছাপূর্ব্বক রাজছত্র ও অন্যান্য রাজচিহ্ন পরিত্যাগ করিলেন। তিনি

আপনাকে দিল্লীর অধীন নরপতি প্রকাশ করাতে লক্ষ্মণাবতী ও বঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশ অধীন সর্দ্দারের জমিদারীরূপে সম্ভোগ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি পুনরায় রাজচিহ্ন ধারণ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত এবং লক্ষ্মণাবতী ভূভাগের শাসনকর্ত্তৃ-পদে পুনর্নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি তেত্তাল্লিশ বৎসরকাল বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। ১৩২০ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৭২৫) তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি বঙ্গদেশে বিধিবিহিত প্রথম মুসলমান রাজা। কারণ তাঁহার পিতা সম্রাট গিয়াসউদ্দীন তাঁহাকে বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার পুত্র সম্রাট কায়কোবাদও তাঁহাকে বঙ্গের স্বাধীন নরপতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

নাসিরউদ্দিন মামুদ—নাসিরউদ্দিন মামুদ ওয়াদি, চিরাগ দিল্লী (দিল্লীর প্রদীপ) প্রভৃতি নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি একজন সাধক এবং শেখ নিজামউদ্দীন আওলিয়ার শিষ্য ছিলেন। স্বীয় গুরুর মৃত্যুর পরে তিনি উক্ত সম্মানিত পদ লাভ করেন। ১৩৫৬ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর (হিঃ ৭৫৭, ১৮ই রমজান) শুক্রবার তিনি দেহত্যাগ করেন এবং ফিরোজ-শাহ বারবক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি সমাধির অভ্যন্তরে দিল্লী নগরে সমাহিত হন। 'খয়েরউল মজালিস' গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

নাসিরউদ্দিন মোহাম্মদ—তিনি দিল্লীর সম্রাট শামসউদ্দিন ইলতিমাসের অন্যতম পুত্র। তাঁহার অন্যতম ভ্রাতাময়জউদ্দিন বহরাম ১২৩৯—১২৪১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া, ষড়যন্ত্রের ফলে, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁহার মৃত ভ্রাতা রুকণউদ্দিনের পুত্র আলাউদ্দিন মসায়ুদকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। তিনি অতিশয় অযোগ্য ছিলেন বলিয়া, রাজ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। রাজ্যের আমীরেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া, কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং ইলতিমাসের অন্যতম পুত্র নাসির-উদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপন করেন।

নাসিরউদ্দিন শাহের মন্ত্রী ছিলেন উলুগ খাঁ বা গিয়াসউদ্দিন বলবন। এই গিয়াসউদ্দিন প্রথমে ক্রীতদাস ছিলেন। ক্রমে ক্রমে প্রধান অমাত্য শ্রেণীতে উন্নীত হন। সম্রাট ইলতিমাস তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া স্বীয় কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন (গিয়াস-উদ্দিন বলবন দেখ)। নাসিরউদ্দিন, এই গিয়াসউদ্দিনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শ্বশুর মন্ত্রী হইয়া রাজ্যের শৃঙ্খলা বিধানে মনোযোগী হইলেন। এই সময়ে বহু ক্রীতদাস আমীর শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন

এবং তাঁহারা অতিশয় ধনীও ছিলেন। নাসিরউদ্দিন শাহ, তাপসের ন্যায় সরল জীবনযাপন করিতেন, কোন রকম বিলাসিতা তাঁহার ছিল না। নির্জনে থাকিতেই তিনি ভালবাসিতেন। রাজ কার্য্যে কোন রকম উৎসাহ বা অনুরাগ ছিল না। এই জন্যই প্রধান মন্ত্রী অল্পদিন মধ্যেই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। এই বিচক্ষণ মন্ত্রী উৎসাহী দৃঢ়চিত্ত ও রাজনীতিবিশারদ ছিলেন। নাসিরউদ্দিন শাহ অতি শুভক্ষণেই তাঁহাকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার রাজত্বকালে যেরূপ পুনঃ পুনঃ মুঘলের উৎপাত ও অন্তর্ব্বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে গিয়াস-উদ্দিনের ন্যায় একজন দৃঢ়চিত্ত, রাজ-নীতিবিশারদ রাজপুরুষ মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত না থাকিলে, কর্ম্মোৎসাহহীন নাসিরউদ্দিন শাহের মস্তক হইতে রাজ মুকুট ভূপাতিত হইত।

নাসিরউদ্দিনের রাজত্বের প্রথমভাগে প্রবলবেগে মুঘলেরা ভারতবর্ষ আক্র-মণ করেন। সেই আক্রমণের ফলে সিন্ধু নদের পশ্চিমভাগস্থ সমুদয় ভূভাগ সম্রাটের হস্তচ্যুত হয়। গিয়াসউদ্দিন সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার জন্য সমস্ত প্রদেশটী একজন শাসনকর্ত্তার অধীন করেন। সম্রাটকে সসৈন্যে পঞ্জাবে প্রেরণ করেন। গোক্কুর জাতি প্রায়ই মুঘল আক্রমণ সময়ে মুঘলদের সহিত যোগ দিত। এই জন্য নাসির-উদ্দিন শাহ প্রথমেই তাহাদিগকে কঠোর হস্তে শাসন করেন। পরে তিনি পঞ্জাবের জায়গীরদারদিগকে নিয়মিত সময়ে কর ও সৈন্য দিতে বাধ্য করেন।

পঞ্জাবে শান্তি স্থাপিত হইলে সম্রাট রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হইলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া সামন্ত হিন্দু নরপতিগণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে প্রয়াসী হইলেন। দিল্লী হইতে বুন্দেল খণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত হিন্দু রাজাদিগকে প্রথমে বশীভূত করিয়া মেওয়ারের পার্ব্বত্য অধিবাসীদিগকে স্বীয় শাসনে আনয়ন করিলেন। মারবার ও চান্দেরী দুর্গের অধিপতিগণ বশ্যতা স্বীকার করিলেন। মালবদেশের বিদ্রোহও অনতি বিলম্বে প্রশমিত হইল। যদিও ইতিমধ্যে পঞ্জাব প্রদেশে মুঘলেরা বার বার আক্রমণ করিয়া-ছিল। কিন্তু পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা শের খাঁ তাঁহাদিগকে প্রতিবারেই পরাস্ত করিয়াছিলেন। যদিও অধিকাংশ রণ স্থলেই নাসিরউদ্দিন শাহ সৈন্যদের সঙ্গে ছিলেন। তথাপি মন্ত্রী গিয়াস-উদ্দিনকেই ইহার সাফল্যের জন্য প্রশংসা করিতে হয়। নাসিরউদ্দিন শাহ মন্ত্রীর এই প্রকার প্রাধান্য লাভে মনঃক্ষুন্ন

হইয়াছিলেন। এইজন্য তিনি ইমামউদ্দিন নামক একজন কৌশলী আমীরের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিনকে অপসারিত করেন। ইমামউদ্দিনের তেমন যোগ্যতা ছিল না। ফলে রাজ্যমধ্যে অবিলম্বে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্খী কতিপয় প্রাদেশিক শাসনকর্তা সম্মিলিত হইয়া, ইমামউদ্দিনকে অপসারিত করিবার জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করিলেন। তিনি তাঁহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ইমামউদ্দিন পদচ্যুত হইলেন এবং গিয়াসউদ্দিন পুনঃ স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইমামউদ্দিন বিদ্রোহী হইলেন কিন্তু সহজেই তাঁহার বিষদন্ত ভগ্ন হইল। তাঁহার সঙ্গে সন্তর নামক স্থানের হিন্দু রাজা ও সিন্ধু দেশের মুসলমান শাসনকর্তাও যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারাও পরাজিত ও বশীভূত হইয়াছিলেন। তৎপরে কারা মাণিকপুরের শাসনকর্তা বিদ্রোহী হন। বলবন তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করিতেই তিনি বশীভূত হইলেন। ইহার পরেই মেওয়ারের পার্ব্বত্য জাতিরা বিদ্রোহী হয়। বলবন স্বয়ং তাহাদেরে দমন করিবার জন্য গমন করেন। তাহারা তুমুল যুদ্ধের পর অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। এই যুদ্ধের পরেই সুলতান নাসিরউদ্দিন মোহাম্মদ শাহ বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া ১১৬৬ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে নাসির উদ্দিন শাহ তাপসের ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। তিনি স্বীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ স্বহস্তে কুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্ম গ্রন্থ লিখিয়া বিক্রয় করিতেন। তাঁহার আহার সামগ্রীও সাধারণ ছিল। তাঁহার মহিষী স্বহস্তে খাদ্য প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার কোন দাসদাসী ছিল না। একদা আহার্য্য প্রস্তুত করিবার সময়ে মহিষীর হস্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়। সেজন্য তিনি একটী দাসীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। তদুত্তরে সুলতান বলিয়াছিলেন যে, রাজকোষের অর্থ তাঁহার নহে—প্রজাদের। তিনি সেই অর্থের রক্ষক মাত্র। সুতরাং নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করিবার অধিকার তাঁহার নাই। তাঁহার একটী মাত্র মহিষী ছিল। তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি যেমন বিদ্বান্ তেমনি বিদ্যুৎসাহীও ছিলেন। তাঁহার ধন ভাণ্ডার সাহিত্য সেবীদের সাহায্যার্থ সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। তাঁহার রাজসভা বিদ্বান্ লোকে পূর্ণ থাকিত। মিনহাজ-ই-সিরাজী নামক একজন বিদ্বান ব্যক্তি তাঁহার দরবারে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সম্রাটের আদেশে তিনি 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' নামক একখানা

সর্ব্বজন প্রশংসনীয় গ্রন্থ রচনা করেন। নাসিরউদ্দিনের কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় তিনি স্বীয় শ্বশুরকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু ইবন বতুতা লিখিয়াছেন যে, বলবন, নাসিরউদ্দিনকে হত্যা করিয়াছিলেন।

নাসিরউদ্দিন, সিপা-হী-সালার, সৈয়দ—একজন দরবেশ। তিনি শ্রীহট্টের বিখ্যাত দরবেশ শাহ জালাল এমনির অনুগত শিষ্যদিগের একজন ছিলেন। তিনি শাহ জালালের সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার আদেশে তিনি বহু সৈন্য ও দ্বাদশজন আওলিয়া সহ তরফ বিজয়ে গমন করেন। সেই সময়ে আরাক নারায়ণ নামে ত্রিপুরাধিপতির একজন সামন্ত নরপতি রাজপুর নামক স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক তৎপ্রদেশ শাসন করিতেন। আরাক নারায়ণ নাসির উদ্দীনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। তাঁহার রাজধানী বিপক্ষের হস্তগত হয়। প্রকৃতপক্ষে নাসিরউদ্দীনই তরফের প্রথম মুসলমান শাসনকর্ত্তা। দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ তাঁহার কৃতকার্য্যতায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে তরফের শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত করেন (১৩১৫—১৩৮৮ খ্রীঃ)। নাসিরউদ্দীনের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র সিরাজউদ্দিন তরফের শাসনকর্ত্তা হন।

নাসিরউদ্দিন, সুলতান—বাঙ্গালার একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা। তিনি দিল্লীর সম্রাট ইল্‌তিমিসের পুত্র। তদানীন্তন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা গিয়াসউদ্দীন নানা কারণে সম্রাট আলতামাসের বিরাগভাজন হন। সম্রাট আল্‌তামাস ১২২৭ খ্রীঃঅব্দে (হিঃ ৬২৪) স্বীয় পুত্র নাসিরউদ্দিনকে বহু সংখ্যক সৈন্যসহ বঙ্গদেশ জয় করিতে প্রেরণ করেন। তিনি গিয়াসউদ্দীনকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করেন। গিয়াসউদ্দীনের মৃত্যুর পর নাসিরউদ্দিন পিতার নামে বাঙ্গালা ও বিহার অধিকার করেন। তিনি গিয়াসউদ্দীনের পরিবারবর্গকে ও লক্ষণাবতীতে প্রাপ্ত ধনরত্নাদি দিল্লীতে প্রেরণ করেন। সম্রাট আল্‌তামাস নাসিরউদ্দিনকে বাঙ্গালা ও বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া রক্তবর্ণ ছত্র ও অন্যান্য রাজচিহ্ন ধারণ করিবার আদেশ প্রদান করেন। তিনি প্রায় চারি বৎসর সুনামের সহিত রাজ্য শাসন করিয়া ১২৩০ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৬২৬) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত দেহ দিল্লীর কুতুবমিনারের দেড় ক্রোশ পশ্চিমে সমাহিত হয়। এখন এই সমাধি সুলতান গাজির দরগাহ নামে খ্যাত। তাঁহার মৃত্যুর পর খিলিজি সর্দ্দারগণ বিদ্রোহী হইয়া বাঙ্গালার শাসন কার্য্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করেন। সম্রাট ইলতিমিস এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সসৈন্যে

বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিয়া বিদ্রোহী-দিগকে পরাস্ত করেন এবং মালিক আলাউদ্দীন নামক এক ব্যক্তিকে বাঙ্গালা ও বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন।

নাসিরউদ্দিন হায়দর—১৮২৭ খ্রীঃ অব্দের ৩০ শে অক্টোবর তাঁহার পিতা গাজিউদ্দীন হায়দরের মৃত্যুর পরে তিনি লক্ষ্ণৌর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সুলেমান ঝা নাসিরউদ্দীন হায়দর উপাধি গ্রহণ করেন। ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দের ৭ ই জুলাই (হিঃ ১২৫৩, দ্বিতীয় রবির তরা) পরিবারস্থ লোক কর্ত্তৃক বিষ প্রয়োগে তিনি নিহত হন। তাঁহার পিতৃব্য নাসিরউদ্দৌল্লা, আবু মুজাফর ময়জউদ্দীন মোহাম্মদ আলিশাহ উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন।

নাসির উদ্দৌল্লা—হায়দরাবাদের নিজাম। তাঁহার পিতা সেকেন্দর ঝা ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দের ২৩ শে মে পরলোক গমন করিলে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র আফজল উদ্দৌল্লা সিংহাসনে আরোহণ করেন।

নাসির খাঁ—সিন্ধু হায়দরাবাদের একজন শাসনকর্ত্তা। ১৮৪২খ্রীঃ অব্দে তাঁহার ভ্রাতা মির নুরমোহাম্মদ খাঁর মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া তিনি কলিকাতায় আনীত হন। এবং ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই এপ্রিল কলিকাতারই তিনি পরলোক গমন করেন।

নাসির খাঁ, সৈয়দ—শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরফের ৯ আনির জমিদার সৈয়দ ফতা খাঁর পুত্র। নাসিরের পুত্র মোহাম্মদ বাশির ও মোহাম্মদ আসির। বাশির অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আসির সমস্ত সম্পত্তির মালিক হন। আসির যেমন বিদ্বান্, তেমনি দয়ালু ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই প্রাপ্ত হইয়াছেন। আসিরের পুত্র মোহাম্মদ নাজির ও মোহাম্মদ হাজির। তন্মধ্যে নাজিরের মোহাম্মদ বাতির ও মোহাম্মদ নাতির নামে দুই পুত্র জন্মে।

নাসির জঙ্গ—১৭৪৮ খ্রীঃ অব্দে হায়দরাবাদের নিজাম চিন কুলিজ খাঁ ১০৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে, তাঁহার পুত্র চতুষ্টয় গাজীউদ্দিন, নাসির জঙ্গ, সলাবত জঙ্গ ও নিজাম আলী এবং দৌহিত্র মজাফর জঙ্গের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। পরে নাসির জঙ্গ সিংহাসন লাভ করিলেন। কিন্তু মুজাফর জঙ্গ ফরাসী সৈন্যের সাহায্যে নাসির জঙ্গকে ১৭৫১ খ্রীঃ অব্দে যুদ্ধে

পরাস্ত ও নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন। বোরহানপুরে পিতার সমাধির নিকটেই নাসির জঙ্গের সমাধি রহিয়াছে।

নাসির মোহাম্মদ দেওয়ান—একজন মুসলমান জমিদার। ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত সরাইল পরগণা, পূর্ব্বে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী এবং ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন ছিল। মুঘল সম্রাটগণ এই পরগণা অধিকার করিতে প্রয়াসী হইয়াও ত্রিপুরাধিপতিগণের পরাক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে মুঘল সম্রাটের সহায়তায় শ্রীহট্টের মুসলমান শাসনকর্ত্তা বলে ও কৌশলে সরাইলের অন্তর্গত সতরখণ্ডল পরগণা অধিকার করিয়া, ত্রিপুরার সীমাভ্যন্তরে মুসলমান প্রাধান্য স্থাপন করেন। ক্রমে ১০০৬—১০৩২ বঙ্গাব্দের মধ্যে সমস্ত সরাইল পরগণা মুঘল সম্রাটের কবলিত হইল। কিন্তু সম্রাট ইহা অধিকার করিয়াও স্বয়ং বা প্রতিনিধির দ্বারা শাসনের ব্যবস্থা না করিয়া, ইশা খাঁ মছনদ আলীর বংশধর দেওয়ান মজলিস গাজি নামক এক ব্যক্তিকে এই পরগণার জমিদারী স্বত্ব প্রদান করেন। এই মজলিস গাজিরই প্রপৌত্র নাসির মোহাম্মদ। তাঁহার পিতা মজলিস গাজির পৌত্র দেওয়ান নুর মোহাম্মদ অতিশয় সরল ও নম্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। মুঘলদিগের অধিকারের সময়ে তিতাস নদীর পূর্ব্বদিগস্থ সমতল ভূমি সরাইল পরগণার অন্তর্ভূত ছিল না। পরে নাসির মোহাম্মদ ঐ অংশ তদানীন্তন ত্রিপুরাধিপতি দ্বিতীয় ধর্ম্ম মাণিক্য কর্ত্তৃক দান প্রাপ্ত হইয়া সরাইলের অন্তর্ভূত করেন। এই বিষয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে। একদা নাসির মোহাম্মদ ত্রিপুরা পাহাড়ে শিকার করিতে যাইয়া মৃগ ভ্রমে ত্রিপুরার এক রাজকুমারকে নিহত করেন। তৎপর কুমারের সঙ্গীগণ অনুসন্ধানে কুমারের হত্যাকারী নাসির মোহাম্মদকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহাকে বধ করিবার জন্য আক্রমণ করিল। নাসির মোহাম্মদ পলায়নপূর্ব্বক নিজ জীবন রক্ষা করিলেন এবং পিতা নুর মোহাম্মদের নিকট যাইয়া সমস্ত বিষয় বলিলেন। পিতা ইহা শুনিয়া ভয়ে পুত্রকে শৃঙ্খলিত করিয়া মহারাজ সমীপে নিয়া উপস্থিত করিলেন। তখন নাসির মোহাম্মদ মহারাজ কর্ত্তৃক কুমারের মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া, অকপটে সত্য ঘটনা মহারাজ সমীপে বর্ণনা করিলেন। তাঁহার সত্যভাষণে মহারাজের ক্রোধের উপশম হইল এবং তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া মুক্তি প্রদান করিলেন। কিন্তু ইহার পর নাসির মোহাম্মদ আর এই নিষ্ঠুর পিতার নিকট যাইতে সম্মত হইলেন না। তিনি সবিনয়ে মহারাজের নিকট একটু

আশ্রয় স্থান প্রার্থনা করিলেন। তখন মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য নাসির মোহাম্মদকে পূর্ব্ব উল্লিখিত তিতাসের পূর্ব্ব দিকস্থ সমতল ভূমি হরসপুর মহাল দান করিয়াছিলেন।

নাসির মোহাম্মদ ঐ স্থান প্রাপ্ত হইয়া, তথায় বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রবাদ আছে যে, বাড়ী নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ খুঁটির জন্য ত্রিপুরা পাহাড় হইতে বড় বড় গাছ নামাইয়া আনিবার সময় পরিশ্রান্ত হইয়া বলিয়াছিল—

"রাজারে পাইল ভূতে
ঠুনি বহাইয়া মারে
মুরমামুদের পুতে।"

নাসির মোহাম্মদ যে স্থানে বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নামানুসারে নাছিরাবাদ হইয়াছিল। বর্ত্তমানে উহা নিদারাবাদ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সেখানে এখন কোন মনুষ্যের বসতি নাই, প্রাচীন অট্টালিকা ও মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

দেওয়ান মজলিস গাজীর সময় হইতে সরাইলের রাজস্ব নবাবের শ্রীহট্টস্থিত কাছারীতে দেওয়া হইত। কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজীবের সময়ে দক্ষিণদিকে মগ ও পর্ত্তুগীজ অত্যাচার বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষার জন্য 'নাউরা' (সমরতরি) বিভাগ স্থাপিত হয়। খিজিরপুর (বর্ত্তমান নারায়ণগঞ্জের উত্তরাংশ) নামক স্থানে এই বিভাগের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১১২টি মহালের রাজস্ব মোট ৮৪৩৪৫২৲ দ্বারা এই বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। এই ১১২টি মহালকে 'উমলে নাউরা' বলা হইত। সরাইল সতর খণ্ডল পরগণাটিও তখন চাকলে শ্রীহট্ট হইতে খারিজ করিয়া ঢাকা নেয়ামতের নিজামত সেরেস্তাভুক্ত করা হয় এবং সরাইলের জমিদারের প্রতি আদেশ হইল যে, তাঁহার জমিদারীর খালিসা মহালের রাজস্ব ঢাকা নেজামত সেরেস্তায় প্রদান করিবেন এবং জয়াগীর অংশের রাজস্ব দ্বারা নবাবের আদেশ অনুযায়ী চল্লিশখানা কোস (সমরতরি) যুদ্ধাদির সময় সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিবেন। নাসির মোহাম্মদের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ দেওয়ান নজর মোহাম্মদের সময় পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থাই চলিয়াছিল। তৎপরে নজর মোহাম্মদের দুই পুত্র দেওয়ান নজমদ্দিন আলী ও বক্স আলীর মধ্যে জমীদারী দুই অংশে বিভক্ত হয়। জ্যেষ্ঠ নজমদ্দিন ॥৵০ আনা ও কনিষ্ঠ বক্স আলী ৷৶০ আনা প্রাপ্ত হন। রাজস্বের কোসাও ঐ হিসাবে ॥৵০ আনা অংশে ২৩ খানা ও ।৶০ আনা অংশে ১৭ খানা বিভক্ত হয়। এই কোসা বিভাগানুযায়ী

উভয় অংশ ২৩ কোসা ও ১৭ কোসা নামে অভিহিত হইত। তাঁহাদের পরে এই জমিদারী তাঁহাদের পুত্র কন্যাদের মধ্যে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়াছিল।

ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে পূর্ব্ব ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয় এবং সরাইল পরগণাকে ত্রিপুরা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত করা হয়। ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইহা ময়মনসিংহের অন্তর্ভুক্তই ছিল। নজমদ্দিনের পুত্র দেওয়ান জাফর আলী, জাফর আলীর পুত্র দেওয়ান নবাব আলী, নবাব আলীর পুত্র দেওয়ান নাগর আলী জমিদারীর ।/১২ গণ্ডা অংশ প্রাপ্ত হন। ঐ সময় রাজস্ব অনাদায় হেতু তাঁহার ।/১২ গণ্ডা অংশ নিলাম হইয়া যায় এবং কাশিমবাজার নিবাসী ময়মনসিংহ কালেক্টরীর তৎকালীন দেওয়ান জগবন্ধু রায় তাহা অতি অল্প মূল্যে ক্রয় করেন। ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে বক্সআলীর উত্তরাধিকারী দেওয়ান আবুল হাকিম সাহেবও রাজস্ব দিতে সমর্থ না হওয়ায়, তাঁহার ।৶০ আনা অংশ (১৭ কোসার জমিদারী) নিলাম হয়। জগবন্ধু রায়ের পুত্র নৃসিংহ প্রসাদ রায় তাহা ক্রয় করেন। তখন হইতে দেওয়ান বংশের প্রকৃত বংশধরগণ সরাইলের জমিদারী হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। তৎপর নজমদ্দিন আলীর জামাতার বংশধরগণের নিকট মাত্র ৶৮ গণ্ডা অংশ অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ৶৮ গণ্ডা অংশ জামাতার বংশধরগণেরও হস্তচ্যুত হইয়া যায়। এই ৶৮ গণ্ডা হইতে ১৭ গণ্ডা গৌতম পাড়া নিবাসী রায় বাহাদুর মোহিনীমোহন বর্দ্ধন প্রভৃতির হস্তগত হয় এবং অবশিষ্ট ৵১১ গণ্ডা নৃসিংহ রায়ের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ আশুতোষ রায় নাবালক থাকা কালীন, কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজার তাঁহার পক্ষে ক্রয় করেন। এইভাবে সমস্ত সরাইল জমিদারীই দেওয়ান বংশের হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। এখন জগবন্ধু রায়ের বংশধরগণ খারিজা তালুক, নিষ্কর, দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ব্যতীত ৮৶৩ গণ্ডা অংশের এবং রায় মোহিনীমোহন বর্দ্ধন বাহাদুরের উত্তরাধিকারীগণ ১৭ গণ্ডার মালিক হইয়াছেন। জগবন্ধু রায়েরই বংশধর রাজা কমলারঞ্জন রায় বর্ত্তমানে সরাইলের জমিদারীর মালিক।

নাসির শাহ—'কক্কোলী' নামে একখানা আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

নাসির সেখ—আকবরাবাদের একজন মুসলমান সাধক। তিনি অলৌকিক কার্য্য করিতে পারিতেন, সেজন্য লোকে তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করিত। সম্রাট শাহ-জাহানও তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য করিতেন। ১৬৪৭ খ্রীঃ অব্দের

৭ই জুন (হিঃ ১০৫৭, প্রথম জুমাদার ১৩ই) তিনি পরলোক গমন করেন এবং আগ্রানগরে সমাহিত হন।

নাহর—তিনি একজন মোরান নামক পার্ব্বত্য জাতির সর্দ্দার। আসাম প্রদেশের আহম নরপতি লক্ষ্মী সিংহের রাজত্বকালে তিনি বিদ্রোহী হন (১৭৮০ খ্রীঃ অব্দে)। তাঁহার পুত্র রমাকান্ত রাজা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আহম নরপতি লক্ষ্মী সিংহ নাহর, রামাকান্ত; তাঁহার মন্ত্রী রাঘব ও অন্যান্য মোয়া মারিয়া প্রধানকে পরাজিত ও নিহত করেন। লক্ষ্মী সিংহ দেখ।

নাহার খাঁ—(১) একজন বিখ্যাত মোগল সেনাপতি। দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজীব শিখ গুরু গোবিন্দ সিংহকে দমন করিবার জন্য সেনাপতি নাহার খাঁকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। গোবিন্দ সিংহ অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া তাঁহাকে পরাস্ত ও নিহত করেন। গুরু গোবিন্দ সিংহ দেখ।

নাহার খাঁ—(২) দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহের অন্যতম সেনাপতি। ১৭২৩ খ্রীঃ অব্দে যোধপুরের রাণা অজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া তিনি সদলে নিহত হইয়াছিলেন।

নিকোলো ডি কণ্টি— একজন ইতালী দেশীয় পর্য্যটক। তিনি ১৪১৯—১৪৪৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে এদেশ সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়। তিনি এদেশের সমৃদ্ধির যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এখনকার অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

নিখিলনাথ রায়—একজন সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। ২৪ পরগণা জিলার অন্তঃর্গত ইচ্ছামতী নদী তীরস্থ পুঁড়া গ্রামে নিখিল নাথ রায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম জানকি নাথ রায়। জাতি কায়স্থ। ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ রামভদ্র রায় যশোহরের ফৌজ-দার নূরউল্লা খাঁর দেওয়ান ছিলেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দির শেষ ভাগে শোভা সিংহের বিদ্রোহ দমনে সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর আদেশে নূরউল্লা খাঁ যশোহরে আসেন। রাম ভদ্র রায়ের পূর্ব্ব নিবাস বরিশাল জিলায় ছিল। কার্য্যোপলক্ষে তিনি পুঁড়ায় আপনার বাস স্থাপন করেন। ইহার সময়ে বসন্ত রায় ও প্রতাপাদিত্য স্থাপিত যশোহর বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হওয়ায়, তিনি তাহার সংস্কার করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার বংশীয়েরা যশোহর সমাজে সামাজিক মর্য্যাদায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আসিতে-ছেন। রামভদ্র আমিরাবাদ পরগণার জমিদারী লাভ করেন। পুঁড়া উক্ত পরগণার অন্তঃর্গত। ইঁহার বংশধরগণ

অদ্যাপি আমিরাবাদ পরগণার জমিদার। নিখিল নাথের প্রপিতামহ হরিদেব রায় মহিষাদল রাজ বাটীর দেওয়ান ও পিতামহ গোবিন্দ দেব রায় ঐ রাজ বাটীর অন্যতম কর্ম্মচারী ছিলেন। পিতা জানকী নাথ রায় একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তিনি চিকিৎসক হইয়াও কবিতা, গান ও কীর্ত্তন রচনায় পটু ছিলেন। ইহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ চন্দ্রনাথ রায় ও কনিষ্ঠ নিখিল নাথ রায়।

নিখিল নাথ দুই বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। বাল্যকালে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়ে যথারীতি অধ্যয়ন করিয়া ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে বহরম পুরে তাঁহার মাতৃষ্বসার নিকট গিয়া খাগড়া মিশনারি স্কুলে প্রবেশ করেন। বাল্যকাল হইতেই নিখিল নাথের কবিতা রচনায় ও ইতিহাস পাঠে বিশেষ মনোযোগ ছিল। এই সময়ে তিনি "রাজপুত কুসুম" নামে একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক রচনা করেন। ১২৯১ বঙ্গাব্দে "রাজপুত কুসুম" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বহরম পুরের ডাঃ রামদাস সেনের তৃতীয় কন্যার সহিত নিখিল নাথের বিবাহ হয়।

খাগড়া মিশনারী স্কুলে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া, তিনি বহরমপুরে কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন ও তথাহইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ হইতে এফ্, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি "অশ্রুহার" নামে একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক রচনা করেন এবং তৎকালীন বিবিধ পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধাদি লিখিতেন। বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিখিলনাথ "মুর্শিদাবাদের ইতিহাস" রচনায় মনোযোগী হন। ইতিহাস রচনায় ব্যাপৃত থাকায় তিনি সংস্কৃতের এম্, এ, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৩০৪ সালে তিনি 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' রচনা সমাপ্ত করিয়া ১৩০৯ সালে তাহা প্রকাশ করেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিখিলনাথ ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে মে মাসে বহরমপুর জজ আদালতে ওকালতি আরম্ভ করেন। পরে ১৯০২ খ্রীঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা আসিয়া হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। চারি খণ্ডে "মুর্শিদাবাদের ইতিহাস" সম্পূর্ণ হয়। জনসাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ ছাত্রগণের মধ্যে ঐতিহাসিক আলোচনার জন্য ইনি "ঐতিহাসিক চিত্র" নামে একখানা মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি বহু হস্তলিখিত পুঁথি ও মুর্শিদাবাদের নিজামত দপ্তর

অনুসন্ধান করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী জাতির ভাবধারা ও হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞান বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস সঙ্কলনে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস', 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী', 'সোনার বাঙ্গালা' 'জগৎ শেঠ', 'প্রতাপাদিত্য' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁহার গবেষণার পরিচায়ক। 'ঐতিহাসিক চিত্র' ব্যতীত 'পল্লীবাণী' নামক একখানি মাসিক পত্রিকাও তিনি দুই বৎসরকাল সম্পাদন করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের ওকালতী ছাড়িয়া দিয়া নিখিলনাথ মহারাজ স্যার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অধীন বর্দ্ধমান জিলার এথোরায় নায়েব পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ১৮ই কার্ত্তিক (১৯৩২ খ্রীঃ অব্দের নভেম্বর) তিনি পরলোক গমন করেন।

নিগমানন্দ পরমহংস— বাঙ্গালী সন্ন্যাসী ও দেশহিতব্রতী। আসাম-বঙ্গ সারস্বত মঠের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুতবপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম হয়। যৌবনের প্রথমভাগেই সাংসারিক জীবনে তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া তিনি বহু তীর্থস্থান ও দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে পর্য্যটন করেন। পরে নির্জ্জন ধ্যান ও তপস্যাদ্বারা তন্ত্র, যোগ, জ্ঞান ও প্রেমের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। অতঃপর তিনি সাংসারিক লোকের মধ্যে তাঁহার সাধনলব্ধ বাণী প্রচার করিবার জন্য আসামের এক নির্জ্জন স্থানে 'সারস্বত মঠ' প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানে উহার অনেকগুলি শাখা মঠ ও সারস্বত সঙ্ঘ নামে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। দেশ সেবার উপযোগী আদর্শ গৃহী ও আদর্শ ত্যাগী কর্ম্মীর সৃষ্টি করিবার জন্যই তাঁহার বিশেষ চেষ্টা হয়। ব্রহ্মচর্য্য সংযম ও তপস্যার উপরই যাহাতে ছাত্র জীবন গঠিত হয়, ইহাই তাঁহার বিশেষ প্রয়াস ছিল। এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, তিনি 'ব্রহ্মচর্য্য সাধন', 'যোগীগুরু', 'তান্ত্রিকগুরু', 'জ্ঞানীগুরু', 'প্রেমিকগুরু' প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তকও রচনা করেন। নিজ জন্মভূমি কুতবপুর গ্রামে তিনি একটি ইংরেজি বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় ও রোগী-নিবাস স্থাপন করেন। এই সকল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্য্য সুপরিচালিত করিবার জন্য তিনি একটি ন্যাস-সঙ্ঘ (Board of Trustees) গঠন করিয়া গিয়াছেন। ১৩৪২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতা নগরে তাঁহার তিরোধান হয়।

নিগ্রোধ—রাজর্ষি অশোকের ভ্রাতা সুমনের (সুসীম) পুত্র। অশোক স্বীয় ভ্রাতা সুমনকে বধ করিলে পর, তাহার

গর্ভবতী স্ত্রী পলায়নপূর্ব্বক রাজধানীর উপকণ্ঠে এক চণ্ডাল পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তথায় একটী পুত্র সন্তান সেই দিনই প্রসব করেন। তিনি সেই পল্লীতে চণ্ডালপতির আশ্রয়ে সাত বৎসর অতিবাহিত করেন। কথিত আছে নিগ্রোধ অল্প বয়সেই ভিক্ষু ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। একদা পথ বিচরণকালে তিনি অশোকের দৃষ্টিপথে পতিত হন। অশোক তাঁহাকে সমীপে আনয়নপূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। নিগ্রোধ বৌদ্ধধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হন। ক্রমে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন।

নিচুল—একজন বৈয়াকরণিক পণ্ডিত। তিনি প্রসিদ্ধ কালিদাসের বন্ধু ছিলেন। কালিদাস 'নানার্থশব্দরত্নম্' নামে একখানা অভিধান রচনা করেন। নিচুল 'তরলা' নামে তাহার এক উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

নিজাম আলি খাঁ—হায়দরাবাদের নিজাম। তিনি বিখ্যাত নিজাম-উল-মুল্ক আসফ খাঁর পুত্র। ১৭৬২ খ্রীঃ অব্দের ২৭শে জুন (হিঃ ১১৭৫, ৪ঠা জিল হিজ্জা) তিনি স্বীয় ভ্রাতা সলাবত জঙ্গকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া বন্দী করেন এবং স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মহারাষ্ট্রাদিগকে স্বীয় রাজ্যের অনেক অংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং অবশিষ্টাংশের জন্যও তাহাদিগকে কর দিতে হইত। ১৮০২ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই আগষ্ট তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র নবাব সেকেন্দর শাহ হায়দরাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

নিজাম আহাম্মদ—তিনি 'রাহত-উল-কুলুব' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। শেখ ফরিদউদ্দিন শক্করগঞ্জ নামক এক সাধু মুলতান সহরে বাস করিতেন। পণ্ডন নামক স্থানে তাঁহার সমাধি আছে। নিজাম তাঁহার গ্রন্থে উক্ত সাধুর উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন।

নিজামউদ্দিন—তিনি দিল্লীর সম্রাট আকবরশাহের একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। তাহার পিতা মুকিম হুরই বাবরশাহের সঙ্গে এদেশে আসিয়াছিলেন। বাবরের মৃত্যুর পরে মুকিম কিছুদিন মিরজা আস্করীর মন্ত্রী ছিলেন। সম্রাট আকবরশাহের সময়ে বৃদ্ধাবস্থায়ও তিনি দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। মুকিমের পুত্র নিজামউদ্দিন পিতার ন্যায়ই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ ন্যায়পরায়ণ অতি অল্প লোকের কথাই শুনা যায়। শাসন কার্য্যে তিনি খুব অভিজ্ঞ ছিলেন। আকবর শাহের রাজত্বের ঊনবিংশ বর্ষে ইতিমদ খাঁ গুজরাটের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। সেই সময়ে নিজামউদ্দিন তাঁহার বক্সী হইয়াছিলেন। তিনি

গুজরাটে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তিনি কয়েকবার সমরাঙ্গনেও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি কখনও সুযশ লাভ করিতে পারেন নাই। ১৫৯০ খ্রীঃ অব্দে তিনি সম্রাটের আদেশে রাজধানীতে আগমন করেন। এবং পাতশাহের পঞ্চত্রিশ জন্মদিনের উৎসবে তিনি উচ্চ উপাধি লাভ করেন। একবার তিনি পাত শাহের সঙ্গে মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে জ্বরে আক্রান্ত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দে রাভীনদী তীরে তিনি পরলোক গমন করেন। লাহোর নগরে স্বীয় উদ্যানে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

তিনি একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম তবকাৎ-ই-আকবরশাহী। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকেরা একই গ্রন্থে এসিয়াখণ্ডের সমস্ত মুসলমান ভূভাগেরই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেন। তিনি সেই ধারা পরিবর্জ্জন করিয়া কেবল ভারতীয় মুসলমান রাজ্যের বিবরণই স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী অনেকে তাঁহার এই প্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থ হইতেই অনেকে উপকরণও সংগ্রহ করিয়াছেন। নিজামউদ্দিন লিখিয়াছেন তাঁহার গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী উনত্রিশখানি গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থখানি বাস্তবিক একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এই এক গ্রন্থই তাঁহাকে অমর করিয়াছে।

নিজামউদ্দিন—দিল্লীর সম্রাট কৈকুবাদের দুষ্ট মন্ত্রী। তিনি কুপরামর্শ দিয়া সম্রাটকে পিতৃদ্রোহী করিয়াছিলেন। পরে আমীরগণ বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করেন। কৈকুবাদ দেখ।

নিজামউদ্দীন আউলিয়া—(১) একজন মুসলমান সাধু। সুলতান উল মুশায়েফ নামেও তিনি পরিচিত। তিনি শেখ ফরিদউদ্দীন শিকারগঞ্জের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। ১২৩৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি বদায়ুনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩২৫ খ্রীঃ অব্দের ৩রা এপ্রিল বুধবার তিনি দিল্লী নগরে পরলোক গমন করেন এবং গিয়াসপুর নামক স্থানে সমাহিত হন। এখনও শত সহস্র লোক এই সাধুর সমাধি দর্শন করিতে আগমন করিয়া থাকেন।

নিজামউদ্দীনআওলিয়া—(২) ময়মনসিংহ জিলার সদর ষ্টেসন হইতে ১৫মাইল পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত বোকাই নগর নামক স্থানে উক্ত সাধুর সমাধি আছে। কেহ কেহ বলেন ইহা সমাধি নহে, ইহা একটী স্মৃতি চিহ্ন মাত্র। যাহা হউক মহাত্মার স্মরণার্থ প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে এখানে এক মেলা বসিয়া থাকে। কথিত আছে এই

মহাত্মার প্রভাবে স্থানীয় বহু মেচ ও কোচ ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এই নামে একাধিক দরবেশের নাম পাওয়া যায়।

নিজাম উদ্দীন আহাম্মদ—একজন মুসলমান কবি ও গ্রন্থকার। তিনি মোহাম্মদ শলাহের পুত্র। 'কেরামত উল-আউলিয়া' গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

নিজাম উদ্দিন আহাম্মদ খোজা—তাঁহার পিতা খোজা মোহাম্মদ মোকিম হিরাটের অন্তর্গত বাবরের অধীনস্থ একটী ক্ষুদ্র স্থানের একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। পরে তিনি বাবরের দেওয়ান পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। বাবরের মৃত্যুর পরে মির্জা মোহাম্মদ আসকারী গুজরাটের শাসনকর্ত্তা হইলে, খোজা মোকিম তাঁহার মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। আকবরের রাজত্বকালে নিজামউদ্দিন গুজরাটের বকসির পদে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া ১৫৯৪ খ্রীঃ অব্দের ২৮শে অক্টোবর রাবি নদীর তীরে তিনি পরলোক গমন করেন এবং লাহোর নগরে সমাহিত হন। 'তবকতে আকবরী' (অন্যনাম তোয়ারিখ নিজামী) নামক ভারতের ইতিহাস তাঁহারই রচিত। ১৫৯৩ খ্রীঃ অব্দে এই গ্রন্থ সম্রাট আকবরের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছিল।

নিজামউদ্দৌলা—তিনি বাঙ্গালার নবাব মীর জাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি পিতার মৃত্যুর পরে ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৭৬৬ খ্রীঃ শকের ৮ই মে পরলোক গমন করেন। তিনি বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকার উপর রাজস্ব পাইতেন। তাঁহার সময়েই, লর্ড ক্লাইব দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নামে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন।

নিজাম উল-মুল্ক বাহরী—তিনি বিজয় নগরের এক ব্রাহ্মণের পুত্র। সুলতান আহম্মদ শাহ বামনী তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনেন এবং ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তিনি রাজপুত্র সুলতান মোহাম্মদের সঙ্গে একই শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করেন এবং অচিরেই ফারসী ও আরবীতে বিলক্ষণ জ্ঞান লাভ করেন। সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করিলে, তিনি টেলিঙ্গানার শাসনকর্ত্তৃপদ প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় মোহাম্মদ পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় সুলতান মামুদের তিনি মন্ত্রী হন। নিজাম উল মুল্ক বাহরীর মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র আহাম্মদ নিজাম শাহ বাহরী আহাম্মদ নগরে নিজাম শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

নিজাম-উল-মুল্ক মামুদ—তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ আলী জুনাদি।

তিনি দিল্লীর সম্রাট ইলতিমিসের (আলতমাস) মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। ১২৩৮ খ্রীঃ সুলতানা রেজিয়ার রাজত্বকালে তিনি পরলোক গমন করেন।

নিজাম-উল-মুল্ক মোহাম্মদ—তিনি সৈয়দ আলী জুনাদির অন্যতম পুত্র এবং দিল্লীর সম্রাট ইলতিমিসের (আলতমাস) অন্যতম সেনাপতি ছিলেন।

নিজাম খাঁ—তিনি প্রসিদ্ধ শেরখাঁ শূরের সহোদর ভ্রাতা। শের খাঁর পিতা হোসেন খাঁ শূর উভয় ভ্রাতাকে সম্পত্তিচ্যুত করিয়াছিলেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পরে উভয় ভ্রাতা পৈত্রিক জায়গীর অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মোহাম্মদ শাহ আদীম দিল্লীর সম্রাট হইয়াছিলেন।

নিজাম শকা—তিনি প্রথমে একজন ভিস্তিওয়ালা ছিলেন। দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুন শাহ, শের খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক গঙ্গাপার হইয়া আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হন। এমন সময়ে নিজাম শকা সম্রাটকে রক্ষা না করিলে, তিনি জল মগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। সম্রাট আগ্রানগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজামকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করেন। নিজাম আমীর শ্রেণীতে স্থান লাভ করেন এবং অর্দ্ধদিনের জন্য সম্রাটের সহিত একাসনে বসিবার সম্মানও লাভ করিয়াছিলেন।

নিজাম শাহ বামনী—হুমায়ুন শাহের পুত্র। হুমায়ুন শাহ একজন নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। ১৪৬১ খ্রীঃ অব্দে আট বৎসর বয়সে নিজাম শাহ বামনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার মাতা অভিভাবিকাস্বরূপ রাজ কার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। মন্ত্রী মোহাম্মদ গোয়ানা ও খাজা জাহানের কৃতিত্বে, অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার পিতৃকৃত দুর্ণাম দূরীভূত হইয়াছিল। ১৪৬৩ খ্রীঃ অব্দে ২৯শে জুলাই বিবাহ রাত্রিতেই তিনি হঠাৎ পরলোক গমন করেন। তৎপর তাঁহার ভ্রাতা বামনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। আলাউদ্দিন হুশেন গঙ্গো বামনী দেখ।

নিজাম শেখ—একজন মুসলমান গ্রন্থকার। তাঁহার রচিত 'ফতোয়া আলম গিরি' একখানা বিখ্যাত গ্রন্থ। ইহা দিল্লীর সম্রাট আলমগীরের আদেশে রচিত হয়। সম্রাট আলমগীরের কন্যা জেবুন্-নিসা এই গ্রন্থ ফারসীতে অনুবাদ করেন।

নিতাই দাস—একজন বিখ্যাত কবি। নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী দেখ।

নিত্যকৃষ্ণ বসু, এম-এ—একজন কবি ও সাহিত্যিক। তিনি কোন্নগর স্কুলে শিক্ষকতার কার্য্য করিতেন। তাঁহার রচিত বহু ছোট ছোট কবিতা আছে। তিনি 'সাহিত্য সেবকের ডায়েরী' নামে সাহিত্যের সমালোচনা বিষয়ক

একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার কবিতাগুলিও সুরচিত। 'সাহিত্য সেবকের ডায়েরী'তে তিনি সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক বিভিন্ন মন্তব্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার এই 'ডায়েরী' খানি ১৩১০—১৩১১ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত ক্রমাগত দুই বৎসর সাহিত্য পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ২৯শে আষাঢ় বিসূচিকা রোগে তিনি পরলোক গমন করেন।

নিত্য নাথ—(১) হঠ প্রদীপিকা মতে একজন হঠযোগী সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তিনি নাথ পন্থী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

নিত্যনাথ—(২) তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম বন্ধ্যাবলী।

নিত্যনাথ সিদ্ধ— তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—রসরত্নাকর।

নিত্য বোধাচার্য্য—তাঁহার অন্য নাম সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি। তিনি খ্রীঃ অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজাদের আশ্রয়ে ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম সংক্ষেপ শারীরক। ইহা শারীরক ভাষ্যের বার্ত্তিক স্থানীয়।

নিত্যানন্দ—(১) তিনি ১৬৩৯ খ্রীঃ অব্দে (১৫৬১ শকে) কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী ইন্দ্রপ্রস্থে থাকিয়া, 'সিদ্ধান্ত রাজ' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি সায়ন গণনার পক্ষপাতী ছিলেন এবং উহাই যে মুখ্য গণনা তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি চন্দ্রস্থান গণনার নিমিত্ত 'পাক্ষিক সংস্কার' নামক একটী নূতন সংস্কার উদ্ভাবন করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি গৌড় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম দেবদত্ত ছিল।

নিত্যানন্দ—(২) একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। 'ইষ্টকাল শোধন' নামক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

নিত্যানন্দ—(৩)'নিষেক বিচার' নামক গ্রন্থের প্রণেতা।

নিত্যানন্দ—(৪) প্রসিদ্ধ 'অদ্ভুত রামায়ণে'র রচয়িতা। তিনি শিক্ষিত ছিলেন না। কেবলমাত্র দৈববলে সমগ্র রামায়ণ রচনা রূপ অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া 'অদ্ভুতাচার্য্য' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অদ্ভুতাচার্য্য দেখ।

নিত্যানন্দ—(৫) ষটকর্ম্ম ব্যাখ্যান চিন্তামণি নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

নিত্যানন্দ ঘোষ—একজন কবি। তিনি মহাভারত পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ কাশীরাম দাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি ছিলেন। নিত্যানন্দের মহাভারতের সহিত কাশীরাম দাসের মহাভারতের অনেক স্থলে অবিকল মিল দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

নিত্যানন্দ দাস—(১)প্রাচীন বাঙ্গালী পদকর্ত্তা। সুবিখ্যাত 'প্রেম বিলাস' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত। নিত্যানন্দ তাঁহার গুরু প্রদত্ত নাম, প্রকৃত নাম বলরাম দাস। বলরাম দেখ।

নিত্যানন্দ দাস—(২) একজন গ্রন্থকার। 'রসকল্পসার' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

নিত্যানন্দদাস বৈরাগী নিতাইদাস—একজন কবি সঙ্গীত ও প্রণয় সঙ্গীত রচয়িতা। ১১৫৮ বঙ্গাব্দে (১৭৫১ খ্রীঃ অব্দ) চন্দননগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম জীবনে গৃহে গৃহে গান করিয়া ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন তিনি অতিশয় সুকণ্ঠী গায়ক ছিলেন। পরে সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করিয়া, একটী কবির দল গঠন করেন। এই কবির দল করিয়া তিনি যথেষ্ট অর্থ ও যশ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কবির দল 'নিতে বৈরাগীর' দল নামে অভিহিত হইত। নিত্যানন্দের কয়েকজন প্রতিদ্বন্দ্বীও ছিল। তন্মধ্যে ভবানী বেণে প্রসিদ্ধ। উভয় দলে ভয়ানক আড়াআড়ি চলিত। ভাটপাড়ার ঠাকুর মহাশয়েরা তাঁহাকে নিত্যানন্দ প্রভু বলিয়া অভিহিত করিতেন। নিত্যানন্দ ভদ্রাভদ্র সকলকেই সমভাবে প্রীত করিতে পারিতেন। নিত্যানন্দ ব্যতীতও নবাই ঠাকুর ও গৌর কবিরাজ নামক দুই ব্যক্তি তাঁহার দলের জন্য গান রচনা করিয়া দিতেন। ১২২৮ বঙ্গাব্দে (১৮২১ খ্রীঃ) সত্তর বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

নিত্যানন্দ দ্বিজ— শীতলা মঙ্গল নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত। এই গ্রন্থে শীতলার জন্ম, শীতলার পূজা, বন্দনা প্রভৃতি পদ্যে রচিত হইয়াছে।

নিত্যানন্দ প্রভু—সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভক্ত ও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান সহচর। ৮৮০ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (১৪৭৩ খ্রীঃ অব্দ) বীরভূম জিলার একচক্রা নগরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত ও মাতার নাম পদ্মাবতী। শৈশবকাল হইতেই তিনি ধীর প্রকৃতি ও ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি গৃহত্যাগী হইয়া মাধবেন্দ্রপুরী নামক এক সন্ন্যাসীর সহিত তীর্থ পর্য্যটনে গমন করেন এবং বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত পাণ্ডারপুর তীর্থে লক্ষ্মীপতি পুরী নামক জনৈক সাধু পুরুষের নিকট দীক্ষিত হন। ক্রমে তিনি-একজন অবধূতরূপে পরিগণিত হইলেন। ইহার বিশ বৎসর পরে শ্রীচৈতন্যের হরিনাম তাঁহার শ্রুতিগোচর হইলে, হরিনামে আকৃষ্ট হইয়া তিনি নবদ্বীপে যাইয়া শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হইলেন। তখন হইতে তিনি শ্রীচৈতন্যের সহচর হইলেন এবং তাঁহার

ভক্তি ও প্রেমে সকলেই মুগ্ধ হইল। তৎপর শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে ও হরিদাসকে নবদ্বীপবাসীগণের মধ্যে হরিনাম (বৈষ্ণব মত) প্রচারার্থ নিযুক্ত করেন। সেই সময় নবদ্বীপে জগাই ও মাধাই নামে সদাচারভ্রষ্ট দুই ব্রাহ্মণ ছিল। তাঁহারা অতিশয় মদ্যপায়ী ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত ছিল এবং বৈষ্ণবদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিত। নিত্যানন্দ এই বিধর্ম্মীদ্বয়কে পাপাচার হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধর্ম্ম পথে আনয়ন করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু তাহারা তাঁহার উপদেশ বাক্য শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইত এবং কোন কোন সময় তাঁহার উপর আঘাত করিবারও চেষ্টা করিত। একদা নিত্যানন্দ ধর্ম্মপ্রচার করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে এই পাষণ্ডদ্বয় তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া আক্রমণ করিল, মাধাই একটী কলসীর কাণাদ্বারা নিত্যানন্দের মস্তকে আঘাত করিল। তাঁহার আঘাত স্থান হইতে রুধির পাত হইতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য এই সংবাদ জানিয়া সঙ্গীগণ-সহ তথায় উপস্থিত হইয়া, এই ঘটনা দৃষ্টে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন, "ইহারা মূর্খ, না বুঝিয়া এরূপ কার্য্য করিয়াছে। ইহা-দিগকে ক্ষমা কর।" তৎপর উভয়ে ইহাদিগকে ক্ষমা করিয়া কুল প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্যের ও নিত্যানন্দের ধর্ম্মভাব ও ক্ষমাগুণ দর্শনে তাহাদের পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইল। অতঃপর তাঁহারা কুকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরম ভক্ত বৈষ্ণব হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথে গমনকালে, নিত্যানন্দ তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন; জগন্নাথক্ষেত্রে কিছুদিন বাস করিবার পর, শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে ধর্ম্ম প্রচারার্থ নীলাচল হইতে গৌড়মণ্ডলে প্রেরণ করেন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকালে দেশের সহস্র সহস্র লোক বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিকগণ নিত্যানন্দের শিষ্য হইল। ক্রমে সমগ্র বণিক সমাজই বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুরাগী হইল। প্রবাদ আছে যে, গোবর্দ্ধন নামক তাঁহার এক ভক্তের বিশেষ অনুরোধে নিত্যানন্দ সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া, গৃহীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি নবদ্বীপে যাইয়া পুত্র শোকে মুহ্যমানা শ্রীচৈতন্যের জননী শচীদেবীকে সান্ত্বনা প্রদান করেন এবং তাঁহার নিকট পুত্রবৎ অব-স্থান করিয়া নবদ্বীপে হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণব-গণ পরম উৎসাহে তাঁহার সঙ্গে যোগ-দান করিয়া পুনরায় নবদ্বীপে হরিনামের স্রোত প্রবাহিত করিল। অতঃপর আসক্তিশূন্য বৈষ্ণবদিগের আদর্শ প্রদর্শন করিবার জন্য, তিনি বিবাহ করেন।

নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী শালীগ্রামের সূর্য্য-দাস নামক এক পণ্ডিতের বসুধা ও জাহ্নবী নাম্নী দুই কন্যাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর তিনি সস্ত্রীক খড়দহে বাস করিতেন। জাহ্নবী দেবীর গর্ভে তাঁহার বীরভদ্র নামে এক পুত্র ও গঙ্গা নামে এক কন্যা জন্মে। চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের কিছুদিন পরেই নিত্যানন্দের মৃত্যু হয়। নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবীর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপর বিশেষ আধিপত্য ছিল। তিনি ১৫৮২ খ্রীঃ অব্দে খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। খড়দহের গোস্বামী-গণ বীরভদ্রের বংশধর এবং বলাগড়ের গোস্বামীগণ গঙ্গাদেবীর বংশের প্রতি-নিধি। নিত্যানন্দ জ্ঞানের অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। তিনি তাঁহার প্রধান সঙ্গিগণসহ ব্রজের রাখাল বেশ ধারণ করিয়া, রাঢ়ের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেন।

নিত্যানন্দ বৈদ্য—'লীলার বার মাস' রচয়িতা। চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত আনোয়ারা গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। তাঁহার পিতার নাম গোকুলচন্দ্র।

নিত্যানন্দ (মিশ্র) চক্রবর্ত্তী, কবি —মেদিনীপুর জিলার কাশীজোড়া পরগণার অন্তর্গত খয়রা কানাইচক গ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বংশে তিনি জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাশীজোড়াধিপতি রাজা রাজনারায়ণের সময়ে (১৭৫৬-১৭৭০ খ্রীঃ অব্দে) জীবিত ছিলেন। তিনি উক্ত কাশীজোড়াধিপতি রাজ নারায়ণের সভাসদ ছিলেন। রাজ সভায় তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল এবং রাজা তাঁহাকে অনেক ভূসম্পত্তি দান করিয়া ছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ভবানী মিশ্র তাঁহার প্রপিতামহ ছিলেন। ভবানী মিশ্রের পুত্র মনোহর মিশ্র, মনোহর মিশ্রের পুত্র চিরঞ্জীব মিশ্র, চিরঞ্জীব মিশ্রের পুত্র রাধাকান্ত মিশ্র, এই রাধাকান্ত মিশ্রই নিত্যানন্দ মিশ্রের পিতা ছিলেন। তিনি শীতলা মঙ্গল, ইন্দ্র পূজা, সীতা পূজা, পাণ্ডব পূজা, বিরাট পূজা, লক্ষ্মীমঙ্গল, কালু রায়ের গীত প্রভৃতি পুস্তক রচনা করিয়া ছিলেন। তাঁহার কোন কোন পুঁথি আবার তালপত্রে উৎকলাক্ষরে লিখিত দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে এদেশে ইংরেজী ভাষার প্রচলন ছিল না। তিনি নিজ দক্ষতা-নুসারে বঙ্গ ভাষায় গ্রাম্য ভাষাদি প্রয়োগ দ্বারা, তাঁহার রচিত পুস্তক গুলি তৎকালোচিত রুচিকর করিয়া রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বাংলা ভাষা পরিমার্জ্জিত হয় নাই; বিভিন্ন ভাষার শব্দ প্রচলিত ছিল। ফার্সী, হিন্দী, উর্দ্দু, প্রভৃতি ভাষায় অনেক শব্দ বহুলপরিমাণে বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রচলিত ছিল। এই জন্য তাহার রচিত গ্রন্থা-দিতে অনেক ফার্সী, হিন্দী ও উর্দ্দু কথা

পাওয়া যায়। অধিকন্তু ঐ সময়ের অনেক পূর্ব্ব হইতে মেদিনীপুর অঞ্চলে উড়িয়া ভাষার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। এই জন্য তাহার গ্রন্থ মধ্যে উড়িয়া শব্দ ও দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ স্থলে গ্রাম্য ভাষার ব্যবহার করা হইয়াছে। উহা গ্রাম্য দোষে অপকৃষ্ট না হইয়া উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ঐ অঞ্চলে পাঁচালিকারেরা এখনও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ তাঁহার নামে মস্তক অবনত করিয়া থাকেন।

নিদার ভীম—পঞ্জাবের সমতল প্রদেশে মুলতান এবং লাহোরে তুর্কিস্থানের মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। পঞ্জাবের শাহীবংশীয় আনন্দ-পালের বংশধর ত্রিলোচনপাল, নিদার ভীম প্রভৃতি ভারতীয় বীরগণ গজনীর সুলতাম মামুদকে বাধা দিতে বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। সকলেই মামুদের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। সুতরাং মামুদ পঞ্জাব স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

নিধিপতি—বাৎস্যগোত্রীয় একজন ব্রাহ্মণ স্মৃতিশাস্ত্রকার। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ আনন্দ ও অপর চারিজন ব্রাহ্মণ ত্রিপুরার অধিপতি আদিধর্ম্ম ফা'র আমন্ত্রণে মিথিলা হইতে ত্রিপুরায় গমন করেন। (আদি ধর্ম্ম ফা দেখ)। নিধিপতি শ্রীহট্ট জিলার পঞ্চখণ্ড পরগণায় ইটা নামক গ্রাম পত্তন করেন। অল্পকাল মধ্যেই তিনি প্রবল প্রতাপ-শালী হইয়া উঠেন এবং একটী ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। নিধিপতির পুত্র ভূধর ও পৌত্র কন্দর্প। পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহারা ত্রিপুরাধিপতির সামন্ত নরপতি ছিলেন। কন্দর্পের পুত্র বৃহস্পতি, তৎপুত্র লক্ষ্মীনাথ, তৎপুত্র দেব-চন্দ্র, তাঁহার পুত্র ভাস্কর, পুষ্কর ও প্রভাকর এই তিনজন। ভাস্করের পুত্র কেশব, তৎপুত্র কামদেব, কাম-দেব হইতে মহাদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'মহাদেবী বড়কাপন' নামক স্থানে গমনপূর্ব্বক বাস করেন। তথা-কার শিকদারেরা তাঁহারই বংশধর।

নিধিরাম কবিরত্ন—একজন প্রতিষ্ঠা-বান কবি। তিনি চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত পটিয়া থানার অধীন চক্রশালা নামক গ্রামে লগ্নাচার্য্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম দুর্লভ আচার্য্য ও মাতার নাম লক্ষ্মী দেবী। নিধিরাম 'কালিকা মঙ্গল' নামক কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান অবলম্বনে কালী-মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে ইহা রচিত হয়। সুতরাং বিদ্যাসুন্দরের অপর দুই কবি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ও রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র এবং নিধিরাম এই তিনজন কবি সম-সাময়িক ছিলেন। নিধিরাম, ভারতচন্দ্র

ও রামপ্রসাদের ন্যায় বিদ্যাসুন্দরের ঘটনাস্থল বর্দ্ধমানের পরিবর্ত্তে বররুচি কৃত সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণে উজ্জয়িনী নগরে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া এই গ্রন্থে বিদ্যাসুন্দরের পিতামাতা, বাসস্থান প্রভৃতি বিষয়েও প্রভেদ দৃষ্ট হয়। যদিও তাঁহার গ্রন্থ ভারতচন্দ্রের গ্রন্থের সমতুল নহে, তথাপি ইহাতে তৎকালোচিত সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয়।

নিধিরাম মিশ্র— একজন কবি। কবিচন্দ্র মিশ্র নামেও তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম হৃদয় মিশ্র এবং চণ্ডিকাব্য রচয়িতা মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। নিধিরাম 'গঙ্গার বন্দনা' 'গুরুদক্ষিণা' 'সত্যনারায়ণ কথা' প্রভৃতি কবিতা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি অনুমান খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য বা শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। কবিচন্দ্র মিশ্র দেখ।

নিধিরাম সাহা—একজন কবি সঙ্গীত রচয়িতা। তিনি বর্দ্ধমানের অন্তর্গত জামড়া গ্রামে বাস করিতেন এবং জাতিতে শুঁড়ী ছিলেন। দাশরথি রায় যখন প্রথমাবস্থায় কবি গান গাহিয়া বেড়াইতেন, তখন নিধিরাম তাঁহার প্রতিযোগীরূপে গান করিতেন।

নিধুবাবু—রামনিধি গুপ্ত দেখ।

নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত রায়বাহাদুর—(১) বরিশালের একজন নেতা, প্রবীণ দার্শনিক পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও আইন ব্যবসায়ী। তিনি এক সময়ে ৺অশ্বিনী কুমার দত্ত মহাশয়ের সহকর্ম্মীরূপে জন নায়কের বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৯০৬ সালে প্রসিদ্ধ বরিশাল কনফারেন্সে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনে তাঁহার বক্তৃতা বরিশালের সাফল্যের অন্যতম হেতু। বরিশালের শাখা সাহিত্য পরিষদের তিনি সভাপতি ছিলেন। দার্শনিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনায় তিনি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি "ভারত সুহৃদ" নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। প্রাক্তন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে, ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের সভাপতিরূপে, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানরূপে তিনি জনসেবা করিয়াছেন। বার্দ্ধক্যে তিনি বরিশালের ধর্ম্মগুরু আচার্য্য জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি অনুরক্ত হইয়া, ধর্ম্মালোচনা করতঃ আচার্য্য জগদীশের একখানা জীবন চরিত লিখিয়াছিলেন। বরিশালের সরকারী বেসরকারী জনসভায় তিনি একজন অন্যতম অপরিহার্য্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ১০ই চৈত্র বৃহস্পতিবার (১৯৩৮ খ্রীঃ ২৪শে মার্চ্চ) পরলোক গমন করেন।

নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত—(২) বাঙ্গালী রাজনৈতিক ও দেশহিতব্রতী। তাঁহার নিবাস ঢাকা জিলায় ছিল। প্রথম জীবনে তিনি সরকারী চাকুরী করিতেন। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া তিনি চাকুরী পরিত্যাগ করেন। প্রায় তেইশ বৎসর তিনি চাকুরী করিয়াছিলেন। আর সামান্য কয়েক বৎসর পরেই অবসর গ্রহণ করিয়া বৃত্তি (pension) লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু দেশ সেবার আগ্রহ তাঁহাকে আর দাসত্বে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া তিনি তিনবার কারারুদ্ধ হন। বক্তৃতা ও প্রচার অপেক্ষা গঠনমূলক কার্য্যেই তিনি অধিক শক্তি ও সময় নিয়োগ করেন। ছোটনাগপুর প্রদেশের পুরুলিয়া তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। সেইখানে নানারূপ জনহিতকর কার্য্যের তিনি সূচনা করেন।

পরিণত বয়সে বারংবার কারারুদ্ধ হওয়ায় তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ১৩৪২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে একষট্টি বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(১) ভাগলপুর প্রবাসী একজন স্বনামধন্য বাঙ্গালী। ১২৫৪ বঙ্গাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শৈশবে তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা অতিশয় অসচ্ছল ছিল। তাঁহার পিতার মাত্র দশ টাকা মাসিক আয় ছিল। পাঠ্যাবস্থায় রাত্রিতে পড়িবার আলোর অভাবে তিনি রাস্তার আলোতে বসিয়া পাঠ শিক্ষা করিতেন। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সরকারী বৃত্তি ও অপরের সাহায্যে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্-এ ও বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপর তিনি শিক্ষা বিভাগের কার্য্যে লিপ্ত হইয়া প্রধান শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। কিছুকাল এই কার্য্য করিবার পর তাঁহার মনে হইল যে, ক্ষমতা প্রিয়তা তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি প্রধান শিক্ষকের কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু আইন ব্যবসায়ও মনঃপূত না হওয়ায়, কয়েক বৎসর পর উহা ত্যাগ করেন। তিনি ভাগলপুর পুরতন্ত্রের (Municipality) ভাইস চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান এবং জিলা বোর্ডের (District Board) চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সকল পদে সমাসীন থাকিয়া, তিনি বিশেষ দক্ষতা ও ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, সুরাপান নিবারণী সভা প্রভৃতি সভাসমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি কয়েকখানি উত্তম ইংরেজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(২) তিনি বৈদ্যবাটীর জমিদার ছিলেন। তিনি ১৭।১৮ বৎসর বয়সেই পৈত্রিক ব্যবসায়ে (বিদেশী জাহাজে মাল বোঝাই ও মাল খালাস) নিযুক্ত হইয়া অতি নিপুণতার সহিত উহার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি যেমন কর্ম্মী তেমন দানশীলও ছিলেন। বৈদ্যবাটী স্কুল নির্ম্মাণের জন্য তিনি পচিশ হাজার টাকা দান করেন। তাঁহার আর কীর্ত্তি বৈদ্যবাটী কো-অপারেটিভ সোসাইটী স্থাপন। ইহা দ্বারা বহু গরীব লোক উপকৃত হইয়াছে। নিজ গ্রামের রাস্তাও তিনি নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কয়েকটী গরীব ছাত্রকে তিনি গৃহে স্থান দিয়া ভরণ পোষণ করিতেন। প্রতি বৎসর পূজার সময় দশ হাজার গরীবকে বস্ত্র দান করিতেন। উত্তর বঙ্গের বন্যাপীড়িত স্থানে ২১০০ বস্ত্র দান করেন। বৈদ্যবাটীর প্রাণস্বরূপ এই মহাত্মা ১৩৩৫ সালে পরলোক গমন করেন।

নিবেদিতা, ভগিনী— স্বনামখ্যাতা ভারত হিতৈষিণী মহিলা। তাঁহার প্রকৃত নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল। (Margaret Elizabeth Noble) ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা (Rev. S. R. Noble) একজন পর-হিতব্রতী ধর্ম্মযাজক ছিলেন। পিতার নিকট হইতেই শ্রীমতী নোব্‌ল পরোপ-কার চিকির্ষা লাভ করেন। বাল্যকালেই পিতৃভবনে ইংলণ্ড প্রবাসী অনেক বিশিষ্ট ভারতবাসীর সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ লাভ করেন এবং তৎফলে ক্রমে ক্রমে তাঁহার মনে ভারতবর্ষের প্রতি একটী আকর্ষণ জন্মিতে থাকে।

তৎকাল প্রচলিত ইংরেজ বালিকা-দের উপযোগী শিক্ষা লাভ করিয়া, তিনি লণ্ডন নগরে শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করেন। এই সময়েই তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ লাভ করেন (স্বামী বিবেকানন্দ দ্রষ্টব্য) এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। ইংলণ্ডে থাকিতেই কিছুকাল হিন্দু শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া তিনি ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে, স্বামিজীর অনুরোধে, জনহিতকর কার্য্যে নিজেকে নিয়োগ করিবার জন্য স্বামিজীর সহিত ভারতে আসিয়া উপস্থিত হন।

ভারতে আসিয়া প্রথমে কিছুকাল তিনি বেলুড় মঠে অবস্থান করেন। তৎপরে স্বামিজীর সহিত দীর্ঘকাল উত্তর পশ্চিম ভারতের নানা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানে এবং তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণ করেন। এই সাহচর্য্যের ফলে স্বামিজীর প্রতি শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পায় এবং স্বামিজীর নিকট হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শনাদি সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করিয়া

তিনি উত্তরোত্তর ভারতের ধর্ম্ম, দর্শন সভ্যতার বিশেষ অনুরাগিণী হইতে থাকেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি স্বামিজীর নিকট হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করেন এবং তদবধি তিনি গুরুদত্ত 'নিবেদিতা' নামে পরিচিতা হইলেন।

ইহার কিছুকাল পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন কলিকাতায় ভীষণ মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি রোগীর সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অনেক নির্ভীক ব্যক্তি এই কাজে তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি একটী উচ্চ শ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করেন; কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ না হওয়ায়, তিনি স্বামিজীর সহিত অর্থ সংগ্রহের আশায় ইংলণ্ডে গমন করেন। তথা হইতে তিনি আমেরিকাতেও গমন করিয়া ভারতের সভ্যতা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন। আমেরিকা হইতে তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং সেখান হইতেও যথেষ্ট অর্থ লাভ করিয়া স্বামিজীর সহিত ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

স্বামিজীর মৃত্যুর পর নিবেদিতা সম্পূর্ণভাবে জনহিতকর কার্য্যে নিজেকে নিয়োগ করেন। এই সকল কার্য্য সম্যকরূপে সম্পন্ন করিবার সুযোগ লাভ করিবার জন্য তিনি বাগবাজারে অতি রক্ষণশীল পল্লীতে একটি ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিতে থাকেন। প্রথম প্রথম পল্লীবাসীরা তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে থাকেন। পরে নিবেদিতার আচার ব্যবহারে, তাঁহাদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর হইয়া যায় এবং তাহারা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। সেই পল্লীতে নিবেদিতা বালিকাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহার নিষ্ঠা ও সুপরিচালনার গুণে বিদ্যালয়টি অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ উন্নতি লাভ করে। ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতেও ঐ বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সাহায্য লাভ হইত। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি সমুদয় শক্তি দিয়া বিদ্যালয়টির উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন।

১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে বরিশালে বন্যা হইলে তিনি সেবাদলের সহিত তথায় গমন করেন এবং অশেষ শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিয়া বন্যাপীড়িতদের দুঃখকষ্টের লাঘব করিবার চেষ্টা করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেন।

নিবেদিতার ন্যায়, ভারতের সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবতী পাশ্চাত্য মহিলা অধিক নাই। ভারতের সমুদয় বস্তুর প্রতিই তাঁহার এক গভীর ভালবাসা ছিল। ঐরূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি ও আকর্ষণের জন্যই তিনি সকল

পরিচিত লোকেরই পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী হইতে ভারত ও ভারতীয় সকল বস্তুর প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯১১ খ্রীঃ অব্দের ১৩ই অক্টোবর (১৩১৮ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন) এই মহীয়সী মহিলা দার্জিলিং সহরে দেহত্যাগ করেন।

নিমা—কবিরের মাতা। অনেকে বলেন কবীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাল্যকালে মুসলমান জোলা তাঁহাকে পাইয়া প্রতিপালন করেন। কিন্তু ইহা সত্য নহে, তাঁহার পিতার নাম নিরু, মাতার নাম নিমা, তাঁহারা মুসলমান ছিলেন।

নিমাইচরণ মল্লিক— কলিকাতার একজন ধার্ম্মিক ও দানশীল ধনবান্ ব্যক্তি। ১৭৩৬ খ্রীঃ অব্দে বড়বাজারের বিখ্যাত দানশীল মল্লিক বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের বংশের উপাধি পূর্ব্বে দে ছিল। মুঘলদিগের নিকট হইতে তাঁহারা 'মল্লিক' উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার পিতার নাম নয়নচন্দ্র মল্লিক। তিনি দয়া দাক্ষিণ্য ও নানা প্রকার সৎকার্য্যাদির দ্বারা দেশের ও দশের বহু উপকার করিয়াছিলেন। পিতার এই সকল গুণ নিমাইচরণের মধ্যে অনেক বর্ত্তিয়া ছিল। তিনি ইংরেজী, বাঙ্গালা ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। পিতার নিকট তিনি প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। তিনি বল্লভপুরে একটি মন্দির স্থাপন ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৌরচরণ মল্লিকের সহিত একত্রে কাঁচড়াপাড়ায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জীউর মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং ঐ সকলের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সুপ্রীম কোর্টে বহু অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া যান। চৈতন্য মঙ্গল গীত, পুরাণ পাঠ ও তুলট প্রভৃতি আরও অনেক ধর্ম্ম কার্য্যে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও গোস্বামীগণকে মুক্তা, স্বর্ণহার প্রভৃতি বহু মূল্যাবান্ দ্রব্য এবং বহু দরিদ্রকে অন্ন দান করিতেন। দুর্গা পূজার সময় তিনি কলিকাতার ছোট আদালতের অনেক দেওয়ানী আসামীকে অর্থ দ্বারা অব্যাহতি প্রদান করাইতেন। পাথুরিয়া ঘাটার গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিকের ভগ্নীকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৮০৭ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে একাত্তর বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন কোটী টাকার উপর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন।

নিমাইচরণ মিত্র—একজন সঙ্গীত রচয়িতা। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের একজন বন্ধু ছিলেন। তাঁহার রচিত ব্রহ্ম-সঙ্গীতগুলি এককালে ব্রাহ্ম সমাজে গীত হইত।

নিমচাঁদ শিরোমণি—তিনি একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন।

তিনি অসাধারণ শ্রুতিধর পণ্ডিত বলিয়াও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান কলিকাতার উত্তরবর্ত্তী কাঞ্চন পল্লী (বর্ত্তমান কাঁচড়া পাড়া) তিনি খ্রীঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজে ১৮২৪ খ্রীঃ অব্দে ন্যায়ের অধ্যাপক ছিলেন।

নিমাইচাঁদ শীল—একজন কবি ও গ্রন্থকার। ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে চুঁচুড়ায় বিখ্যাত শীল বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হুগলী কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ঐ সময় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলী কলেজে তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। 'যামিনী যাপন কামিনী গোপন', 'চন্দ্রাবতী', 'ধ্রুব-চরিত্র', 'এরাই আবার বড় লোক', 'তীর্থ-মহিমা' ও 'সুবর্ণ বণিক' এই গ্রন্থগুলি নিমাইচাঁদ প্রণীত। 'যামিনী যাপন কামিনী গোপন' একটী ছোট কবিতা পুস্তক। রেণল্ড প্রণীত Love of the Harem নামক গ্রন্থ অবলম্বনে 'চন্দ্রাবতী' এবং শ্রীমদ্ভাগবতের আখ্যায়িকা অবলম্বনে 'ধ্রুবচরিত্র' রচিত। 'তীর্থ মহিমা' নামক নাটকে তারকেশ্বরের মোহান্ত মাধব গিরি ও এলোকেশী ঘটিত ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। এরাই আবার বড় লোক প্রহসন। 'সুবর্ণ বণিক' গ্রন্থ সুবর্ণ বণিক জাতিকে বৈশ্য অবধারণ করিবার উদ্দেশ্যে রচিত। ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নিমানন্দ দাস—একজন প্রাচীন বাঙ্গালা পদাবলী রচয়িতা। তিনি বৈষ্ণবদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবিগণের পরবর্ত্তী। তিনি খুব সম্ভব রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃত সমুদ্র' অবলম্বন করিয়া 'পদ রস-সার' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহাতে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণের বহুতর উৎকৃষ্ট অজ্ঞাত পূর্ব্ব পদাবলী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন অনেক অপ্রাপ্ত পূর্ব্ব কবির নামও পাওয়া গিয়াছে। তিনি উক্ত গ্রন্থ খুব সম্ভব বৃন্দাবনে বাসকালে রচনা করেন। উহাতে তাঁহার স্বরচিত দেড়শতের উপর পদ পাওয়া গিয়াছে। অনেক পদ আবার শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ। নানা বিষয়েই তিনি পদ রচনা করেন। অনেকগুলি গোবিন্দদাস জ্ঞানদাসের পদের সহিত তুলিত হইতে পারে। কিন্তু তিনি অধিকাংশ পদই খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করেন।

নিমি—একজন খুব প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। বাগ্‌ভটের 'অষ্টাঙ্গ হৃদয়', চরক নিমি, সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিগণের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

নিমিনাথ তীর্থঙ্কর—তিনি একবিংশতিতম জৈন তীর্থঙ্কর। মিথিলায় তাঁহার জন্ম হয় এবং পার্শ্বনাথ শৈলে তিনি নির্ব্বাণ লাভ করেন।

নিম্বার্ক—রাজপুতানার এক গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার সম্প্রদায়ের নাম সনকাদি। তাঁহাদের দর্শন তত্ত্ব দ্বৈতাদ্বৈত। প্রাচীন উপাসনা—শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ব্রহ্মতা জ্ঞান ও ধ্যান। নবীন উপাসনা—যুগলস্বরূপ রাধাকৃষ্ণের ধ্যান ও সেবা। নিষ্ঠা অনন্যতা।

নিম্বার্ক, আচার্য্য—একজন খ্যাতনামা বৈষ্ণব আচার্য্য। নিয়মানন্দ বা নিম্বাদিত্য তাঁহার অপর নাম। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ। তিনি খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি নিমাৎ নামক বৈষ্ণব শাখার প্রবর্ত্তক। তিনি বৃন্দাবনস্থ ধ্রুবপর্ব্বতে সিদ্ধিলাভ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁহার মতোপজীবী। তিনি ব্রহ্মসূত্রের উপর 'বেদান্ত পারিজাত সৌরভ' নামে একটী উৎকৃষ্ট ভাষ্য রচনা করেন। ইহাতে বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজের ভেদাভেদ বাদ সম্যকরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

নিয়ামৎ খাঁ—শায়েস্তা খাঁর পরে, নবাব ইব্রাহিম খাঁ ১৬৯৬ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৭১২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। তাঁহার সময়েই বাঙ্গালা দেশে শোভাসিংহ ও রহিম খাঁর বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। রাজমহল হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ তাঁহাদের অধীন হইয়াছিল। সেই সময়ে নিয়ামৎ খাঁ বাঙ্গালার নবাব ইব্রাহিম খাঁর অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার জায়গীর হুগলী জিলায় ছিল। রহিম খাঁ, তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। নিয়ামৎ খাঁ প্রথমে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তেহভার খাঁকে প্রেরণ করেন। তেহভার খাঁ রহিম খাঁর সৈন্য হস্তে নিহত হইলে, নিয়ামৎ খাঁ স্বয়ং যুদ্ধ করিতে যাইয়া নিহত হন এবং রহিম খাঁ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করিলেন।

নিরাজদী পণ্ডিত—তিনি শিবাজীর একজন বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। এই ব্রাহ্মণ যুবকের পিতা দাদাজী কুণ্ডদেবের অধীনে কর্ম্মচারী ছিলেন।

নিরঞ্জন—তিনি একজন হঠযোগ সম্প্রদায়ী যোগী।

নিরঞ্জন গিরি—তিনি একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। 'গ্রহফল' নামক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

নির্জ্জিত বর্ম্মা—কাশ্মীরের একজন রাজা। তিনি কাশ্মীরের অধিপতি অবন্তী বর্ম্মার ভ্রাতা শূরবর্ম্মার পৌত্র ও সুখবর্ম্মার পুত্র। গোপাল বর্ম্মার মৃত্যুর পরে তদীয় মাতা সুগন্ধাদেবী কিছু কাল রাজ্য শাসন করিয়া, পরে নির্জ্জিত বর্ম্মাকে সিংহাসন প্রদান করেন। রাণী সুগন্ধার আত্মীয়া গগ্গাদেবী নির্জ্জিত বর্ম্মার জননী ছিলেন। এই বিশ্বাসে সুগন্ধাদেবী মনে করিয়াছিলেন নির্জ্জিত বর্ম্মা তাঁহারই কথানুসারে

রাজ্য পালন করিবেন। এইদিকে মন্ত্রী দিগের মধ্যে দুই দল হইয়া এক দল নির্জ্জিত বর্ম্মার পুত্র পার্থকে রাজা করিলেন। পিতা পুত্রে সিংহাসন লইয়া কিছুকাল বিবাদ চলিল, পরে নির্জ্জিত বর্ম্মাই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু তিনি বেশীদিন রাজ্য ভোগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার কাল পূর্ণ হওয়াতে তিনি অপর শিশুপুত্র চক্র বর্ম্মাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরলোক গমন করেন।

নির্ম্মল দাস—তিনি একজন দাদুপন্থী শ্রেষ্ঠ ভক্ত। দাদুর অন্যতম শিষ্য সুন্দর দাস; তিনি সুন্দর দাসের অন্যতম শিষ্য। তিনি খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

নির্ম্মলানন্দ স্বামী—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ শিষ্য ও লীলাসহচর। তিনি কলিকাতা বাগবাজারের বসু পাড়া লেনে, বিখ্যাত দত্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম দেবনাথ দত্ত। নির্ম্মলানন্দ স্বামীর পূর্ব্ব নাম ছিল তুলসীচরণ দত্ত। লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ ছিল। মাত্র আঠার বৎসর বয়সে, বাগবাজার বলরাম বসুর মন্দিরে তিনি সর্ব্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে দর্শন করিয়া, তাঁহার সংস্পর্শে আসেন এবং ঐ ঘটনার পর হইতে তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যাতায়াত করিতে থাকেন। তাঁহার অন্যান্য গুরুভাইদের সহিত মিলিত হইয়া, কাশীপুরের বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনেক সেবা করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির পরে, কয়েকজন গুরুভাইয়ের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তিনি কাশীপুরেই এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ও তাঁহার অন্যতম গুরুভাই প্রাণপাত পরিশ্রমে এই সংগঠন কার্য্য পরিচালনা করেন। পরে বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রথম যে কার্য্য-পরিষদ স্বামী বিবেকানন্দের তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়। তিনি উহার প্রথম সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন। ইং ১৯০৩ সালে স্বামী অভেদানন্দজীকে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার কার্য্যের সাহায্য করিবার জন্য, তিনি আমেরিকা গমন করেন এবং ১৯০৬ সালে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেখানে প্রচারকালে তিনি বেশ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। ইং ১৯০৬ হইতে ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত ভারতের নানা তীর্থে পর্য্যটন করিয়া হিমালয় প্রদেশে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হন। ইং ১৯০৯ সালে মহীশূর রাজ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপিত হইলে, স্বামী ব্রহ্মানন্দকর্ত্তৃক আহূত হইয়া, তিনি নবস্থাপিত আশ্রমের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তদবধি দীর্ঘ ঊনত্রিশ বৎসর যাবৎ তিনি অক্লান্ত পরি-

শ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবধারা দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে প্রচারে নিরত হন। তিনি যেমন সরল, উদার ও অমায়িক ছিলেন, তেমনি দৃঢ়চেতা, তেজস্বী ও সৎসাহসী ছিলেন। ইং ১৯২৯ সালে যখন কলিকাতায় বিবেকানন্দ মিশন ও রামকৃষ্ণ সারদা মঠ স্থাপিত হয়, তখন তিনি এই প্রতিষ্ঠানে সভ্য ও ভক্তগণকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া উহার সভাপতি পদ গ্রহণ করেন এবং শেষ জীবন পর্য্যন্ত ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে তাঁহার অগণিত সন্ন্যাসী ও গৃহীশিষ্য রহিয়াছে। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ১৩ই বৈশাখ (১৯৩৯ খ্রীঃ) দক্ষিণ ভারতের ওটাপলম্ আশ্রমে তিনি দেহরক্ষা করেন।

নির্ম্মাই—নির্ম্মাই ও হর্ম্মাই নামে ত্রিপুরার রাজবংশে অপূর্ব্ব রূপবতী দুই রাজকুমারী ছিলেন। তাঁহারা যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলে মহারাজ তাঁহাদিগকে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু তাঁহারা বিবাহ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে নির্ব্বাসিত করেন। তাঁহারা বহু অরণ্যাদি অতিক্রম করিয়া অবশেষে বর্ত্তমান শ্রীহট্টের অন্তর্গত বালিশিরার এক অনুচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গে ১৪৫৪ খ্রীঃ অব্দে এক শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করেন।

নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়—একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সমাজ সংস্কারক। ১২৫৯ বঙ্গাব্দের ৭ই শ্রাবণ (১৮৫২ খ্রীঃ, জুলাই) ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত পশ্চিমপাড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। কাশীকান্ত ঢাকার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ছিলেন। নিশিকান্ত পিতার পঞ্চম পুত্র।

তিনি প্রথমে গ্রামের বাড়ীতে থাকিয়া, বাঙ্গালা লেখাপড়া কিছু শিক্ষা করেন। তৎপরে ঢাকায় পিতার নিকট চলিয়া যান এবং সেখানে তাঁহার মধ্যমাগ্রজ নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে ইংরেজী পড়াইতেন। ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে তিনি ঢাকার পোগোস্ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং পড়াতে ভাল ফল প্রদর্শন করিতে থাকেন। এইদিকে তাঁহার পিতা কোন কারণে ইংরেজী শিক্ষার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া, নিশিকান্ত ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শীতলাকান্তের ইংরেজী শিক্ষা বন্ধ করিয়া দেন এবং সংস্কৃত শিক্ষার জন্য উভয়কে গ্রামে এক চতুষ্পাঠিতে প্রেরণ করেন। বৎসরাধিককাল তাহারা সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন। নিশিকান্তের মধ্যমাগ্রজ নবকান্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের ইংরেজী শিক্ষা বন্ধ হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি পিতাকে অনেক অনুরোধ উপরোধ করিয়া, তাঁহাদিগকে পুনরায় ইংরেজী শিক্ষার

জন্য ঢাকায় আনয়ন করাইলেন। নিশি-কান্ত এইবার একটী মাইনর স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করেন এবং এক বৎসর পরে মাইনর পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি লাভ করেন। তৎপরে তিনি পুনরায় পোগোস্ স্কুলে প্রবেশ করেন। তিনি মেধাবী, নির্ম্মল চরিত্র ও পাঠে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন এবং প্রত্যেক পরীক্ষায়ই উচ্চস্থান ও ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। তাঁহার শিক্ষকগণ তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া, তাঁহার প্রতি খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। সেই সময় তিনি প্রসিদ্ধ বক্তা কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন। ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

তৎপরে তিনি কলিকাতা আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে তাহার মন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। এফ-এ পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে, তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত যাইতে মনস্থ করেন। তাঁহার পৈতৃক বিত্তসম্পত্তি যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাকান্তের সহিত বিষয় সম্পত্তি নিয়া অন্যান্য ভ্রাতাদের গোল-যোগ ছিল। নিশিকান্ত নিজ অংশ প্রাপ্তির আশায় নালিশ করিতে উদ্যত হইলে, শ্যামাকান্ত তাঁহাকে আপোষে কয়েক হাজার টাকা প্রদান করেন। এই টাকা সম্বল করিয়া ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে একুশ বৎসর বয়সে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। ইউরোপে যাইয়া তিনি প্রথমে এডিনবরায় চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু পরে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হওয়ায় তিনি এডিনবরা ত্যাগ করিয়া জর্ম্মান দেশে গমন করেন এবং সেইস্থানের অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত লাইপজিগ্ (Leipzig) বিশ্ববিদ্যালয়ে জর্ম্মান, সংস্কৃত, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতে থাকেন। তিন বৎসরকাল তিনি এখানে অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তিনি লাইপজিগ্ নগরে রামায়ণ, Chronology of the Hindus (পুরাণোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব ও যুগ মন্বন্তরাদি), Buddhism and Christianity (বৌদ্ধ ও খ্রীষ্ট ধর্ম্ম) ইত্যাদি বিষয়ে অনেক বক্তৃতা করেন। শেষোক্ত বক্তৃতায় খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অনেক উপদেশ ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে, এই কথা বলায় লাইপজিগে ভয়ানক আন্দোলনের সৃষ্টি হয় এবং গোঁড়া খ্রীষ্টানগণ তাঁহার উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হন। এমন কি তিনি সেখানে এসম্বন্ধে দ্বিতীয়বার বক্তৃতা করিবার স্থান পান নাই। ঐসকল বক্তৃতা, জর্ম্মাণ ভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎ-পত্তি ও পাণ্ডিত্য সেই সময়কার

পত্রিকাদিতে বিশেষ প্রশংসিত হইত, এই সব কারণে তাঁহার যশোরাশি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। তাঁহার গুণরাশির কথা অবগত হইয়া রুশ সরকার তাঁহাকে আগ্রহের সহিত সেণ্ট্ পিটার্স্‌বর্গ (St. Petersburgh) বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা সমূহের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। তথায় তিনি খুব সুনামের সহিত কাজ করিতেছিলেন, এমন কি রুশ যুবরাজও কোন কোন সময় তাঁহার সহিত ভারতের ধর্ম্ম ও সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিতেন। কিন্তু রুশ রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ, তিনি রাজদ্রোহী দলে (Nihilist Party) যোগদান করিতে পারেন, এরূপ সন্দেহ করায়, দুই বৎসর কার্য্য করিবার পর তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করেন।

সেণ্ট্ পিটার্স্‌বর্গ ত্যাগের পর তিনি সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত জুরিক (Zurich) বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়া 'Doctor of Philosophy' উপাধির পরীক্ষা প্রদান করেন এবং প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া Ph. D. উপাধি প্রাপ্ত হন। য়ুরোপের পণ্ডিতগণ তাঁহাকে একজন প্রাজ্ঞ ভট্ট বলিয়া স্বীকার ও সমাদর করিতেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসী ইউরোপে অধ্যাপনা করেন নাই এবং Ph. D. উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও উপাধি প্রদানকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা সমিতির অধ্যক্ষ তাঁহার এই কৃতিত্বের জন্য উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ইউরোপে দশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেই সময় দেশের লোক বিপুলভাবে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল। এমন কি রাজপুরুষেরা স্থানে স্থানে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল।

দেশে আসিয়া তিনি অধিকাংশ সময়ই হায়দরাবাদ, মজফরপুর ও মহীশূর কলেজাদির অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। জর্ম্মান ও ইংরেজী ভাষায় লিখিত তাঁহার পুস্তক ও বক্তৃতাদি এদেশের পণ্ডিত মণ্ডলীতে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। লণ্ডনের Trubner Co. কর্ত্তৃক প্রকাশিত Ph. D. পরীক্ষার জন্য তাঁহার রচিত Thesis —'The Jatras or the popular Dramas of Bengal' এবং জুরিক হইতে প্রকাশিত জর্ম্মান গ্রন্থ 'The Indische Essays' ইউরোপে যথেষ্ঠ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

তিনি সমাজ সংস্কার ও নারী জাতির উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। ইউরোপ গমনের পূর্ব্বেই ১৮৭৩খ্রীঃ অব্দে তিনি বিশেষ চেষ্টা উদ্যোগ করিয়া ঢাকাতে 'বাল্য-বিবাহ-নিবারণী সভা'

স্থাপন করেন। এই সভা হইতে 'মহাপাপ বাল্য-বিবাহ' নামে একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। তাঁহার মধ্যমাগ্রজ নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় উক্ত সভা ও পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। নিশিকান্ত সে সময়ে উক্ত পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া এবং নানা স্থানে বক্তৃতা করিয়া ঢাকা জেলায় বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অবলা বান্ধব' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তাঁহার রচিত নারী জাতির হীনাবস্থা বিষয়ক একটী ও বাল্যবিবাহ বিষয়ক একটী প্রাণস্পর্শী গান পূর্ব্ব বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে খুব উৎসাহে গীত হইত। তিনি অতিশয় সঙ্গীত প্রিয় ও সুগায়ক ছিলেন। ইউরোপে থাকাকালীন তিনি ইংরেজী, ফরাসী ও ইটালীয়ান সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন।

তিনি অনুমান তের বৎসর বয়সের সময় পিতার আদেশে বিক্রমপুরের বেজগাঁও নিবাসী রূপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুন্সীর তৃতীয় কন্যা হেমন্তকুমারী দেবীকে বিবাহ করেন।

হায়দরাবাদে সুদীর্ঘ প্রবাসের পর তিনি মাতৃভূমিতে আগমন করিবার জন্য খুব উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু ভগবান তাঁহার সে আশা পূর্ণ করেন নাই। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে ১৩ই ফাল্গুন (১৯১০ খ্রীঃ, ২৫শে ফেব্রুয়ারী) হায়দরাবাদের চন্দরঘাট সহরে তিনি অতি সামান্য অসুখে অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার জীবিতকালেই তাঁহার একমাত্র পুত্র অরুণকান্তের অতি অল্প বয়সে মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি উদার, সরল প্রকৃতি, আমোদ প্রিয় ও রসিক লোক ছিলেন। শোকে দুঃখে তিনি কখনও কাতর হইতেন না।

নিশিকান্ত বসু—স্বদেশী যুগের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী, বিখ্যাত সমাজ সেবী ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রবীন আচার্য্য। ১২৮০ বঙ্গাব্দে (১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দ) বরিশাল জেলার অন্তর্গত হবিবপুর গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে গ্রাম্য বিদ্যালয়েই তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। গ্রামের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তিনি ঢাকায় চলিয়া যান এবং নিজে অনেক চেষ্টা করিয়া ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করেন। তৎপরে যথা সময়ে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বরিশালে গমন করেন এবং তথায় চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে থাকেন। কিছুকালের মধ্যেই তিনি চিকিৎসাগুণে ও অমায়িক ব্যবহারে জনপ্রিয় হইয়া উঠেন। কিন্তু সেই সময় বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ হইলে তিনি অশ্বিনী কুমার দত্তের সহকর্ম্মীরূপে ঐ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন এবং নির্ভীক

কার্য্যের জন্য তিনি কর্তৃপক্ষ দ্বারা লাঞ্ছিত হন। বরিশালে স্বদেশী আন্দোলন প্রচারের জন্য 'স্বদেশী বান্ধব সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। সমিতির পক্ষ হইতে স্বদেশী বক্তৃতার দ্বারা তিনি বরিশালবাসিগণকে উদ্বুদ্ধ করিতেন। যে কয়েক জন ব্যক্তির অক্লান্ত চেষ্টায় ও ত্যাগে বরিশাল স্বদেশী আন্দোলনের প্রসিদ্ধ স্থানে পরিগণিত হইয়াছিল, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। তৎপরে তিনি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্ম সমাজের কর্ম্মীর সহিত মিলিত হইয়া অনুন্নত জাতির উন্নতিকল্পে 'উন্নতি বিধায়িনী সমিতি' নামে একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং বাঙ্গালা প্রদেশের জিলায় জিলায় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অনুন্নত শ্রেণীর লোকদিগকে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি ঢাকায় বিধবা আশ্রম প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম এবং প্রথম সংগঠনকারী ছিলেন।

১৯১৫ খ্রীঃ ডাঃ দ্বিজেন্দ্র নাথ মৈত্র কর্তৃক কলিকাতায় বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী স্থাপিত হইলে, তিনি ইহার প্রধান কর্ম্মীরূপে যোগদান করেন এবং ১৯৩৯ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত চব্বিশ বৎসর কাল সহকারী সম্পাদক রূপে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। তাহার চেষ্টায় ও পরিশ্রমে এই প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষার প্রচার আরম্ভ করেন। বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর মহিলা শিল্প ভবন তাঁহারই চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পল্লীগ্রামে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ১১ই শ্রাবণ (১৯৩৯ খ্রীঃ ২৭ শে জুলাই) ৬৬ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি সুবক্তা, অমায়িক, নির্ভীক ও দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন এবং আজীবন দেশের ও দশের উপকার করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

নিশিকান্ত সেন—প্রবাসী বাঙ্গালী কৃতিপুরুষ। ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে (১২৭৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন) ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত আকিয়াদল গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার কার্য্যস্থল পূর্ণীয়া জিলা স্কুল হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ক্রমে ক্রমে আইন পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়া পুর্ণিয়াতেই আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই কার্য্যে তিনি অল্পকাল মধ্যেই বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সুদীর্ঘকাল তিনি পুর্ণিয়ার প্রধান ব্যবহারজীবী বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

স্থানীয় সকল প্রকার জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

সকল সংকার্য্যেই তিনি অগ্রবর্ত্তী হইয়া নিজের সমুদয় শক্তি জনসাধারণের উপকারে নিয়োগ করিতেন। প্রায় কুড়ি বৎসর তিনি পূর্ণিয়া পুরতন্ত্রের (Municipality) ও জিলা বোর্ডের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া নিজের অসাধারণ কর্ম্ম কুশলতার পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার বহুগুণের পরিচয় পাইয়া কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে রায়বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। ১৯৩০ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে (১৩৩৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ) তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

নিশ্চল দাসজী—দাদুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত ভক্ত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত নিশ্চল দাসজী দীর্ঘকাল কাশীতে শিক্ষা দান ও পাণ্ডিত্যের জন্য সকলের মান্য ছিলেন। তাঁহার রচিত 'বিচার সাগর' ও 'বৃত্তি প্রভাকর' গ্রন্থদ্বয় অত্যন্ত সমাদৃত ও প্রামাণ্য হিন্দী গ্রন্থ। হিন্দীতে গ্রন্থ রচনা করার জন্য তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে। তাঁহার রচিত গ্রন্থদ্বয় সর্ব্বজন মান্য প্রামাণিক গ্রন্থ, হিন্দী ভাষার সুন্দর অলঙ্কার স্বরূপ। ব্রহ্মরূপ অহিব্রহ্মবিৎ, তাকিবাণীবেদ। ভাষা অথবা সংস্কৃত করতঃ ভেদভ্রমচ্ছেদ॥ সে ব্রহ্মবিৎ, তাঁর বাণী সংস্কৃতই হওক বা যে ভাষারই হওক তাহাই বেদ এবং তাহা মর্ম্মভেদ ও ভ্রম ছেদ করে।

নীতিপাল—আসামের সদিয়া নামক স্থানে অবস্থিত ছুটিয়া রাজার জামাতা। তিনি একজন সামান্য ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়া, পরে রাজ সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার অত্যাচারে ছুটিয়া রাজ্য ধ্বংশ হয়। নীতিপাল সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য নহে।

নীরদবন্ধু ভট্টাচার্য্য, ডাক্তার—একজন নিঃস্বার্থ পরোপকারব্রতী খ্যাতনামা চিকিৎসক। ত্রিপুরা জিলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার অন্তর্গত বিটঘর গ্রামে ১২৯৬ বঙ্গাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ ব্যবসায়ী ও দাতা শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, মেধাবী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। প্রথমে তিনি কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল হইতে ডিপ্লোমা লাভ করেন এবং পরে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এম বি উপাধি গ্রহণ করেন। এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি 'বেক্টোক্লিনিকেল লেবোরেটরী' নামে কলিকাতায় একটি ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। বাঙ্গালার অর্থহীন জনগণের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে তাঁহার বহু চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে কিছুকাল মধ্যেই বাংলার স্বাস্থ্য সমিতি (Bengal Health Association) নামক প্রতি-

ষ্টানটি গঠিত হইয়াছিল এবং তিনি নিজে উহার কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া অক্লান্তভাবে ম্যালেরিয়া, কলেরা ও কালাজ্বরের প্রতিরোধকল্পে চেষ্টা করিতেন। ১৯২৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতায় দুইটি চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করিয়া দরিদ্র কালাজ্বরের রোগীদিগকে বিনা মূল্যে ইন্‌জেকশন দিতেন। কীটতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য তিনি ইউরোপ গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি লণ্ডন রস ইনষ্টিটিউশনে গবেষণা করেন এবং প্যারিসের পাস্তুর ইনষ্টিটিউটেও কাজ করেন। তাঁহার গবেষণার ফল ইউরোপের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত ও প্রশংসিত হইয়াছিল। আড়াই বৎসরকাল ইউরোপে অবস্থান করিয়া তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু দেশে আসিয়া তিনি আর তাঁহার প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া যাইতে পারেন নাই, প্রত্যাবর্ত্তনের কিছুকাল পরেই টাইফয়েড রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ১৬ই ফাল্গুন (১৯২৮ খ্রীঃ, ২৮শে ফেব্রুয়ারী) তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র উনচল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। তিনি অবিবাহিত ছিলেন।

নীলকণ্ঠ—(১) বিদর্ভ দেশে ধর্ম্মপুর নামক স্থানে গর্গ গোত্রীয় সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত অনন্ত দৈবজ্ঞ বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র জ্যোতিষী নীলকণ্ঠ ১৫০০ শকে (১৫৮৭ খ্রীঃ) 'সংজ্ঞা', 'বর্ষ' ও 'প্রশ্নতন্ত্র' নামক তিন ভাগে বিভক্ত তাজিক গ্রন্থ রচনা করেন। ফল ব্যবসায়ীর নিকট নীলকণ্ঠি তাজিক বহু সমাদরের বস্তু। নীলকণ্ঠ দিল্লীর সম্রাট আকবর বাদশাহের সভার প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। নীলকণ্ঠের ভ্রাতা রাম দৈবজ্ঞ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। নীলকণ্ঠের পুত্র গোবিন্দ দৈবজ্ঞও জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। টোডরানন্দ তাঁহারই রচিত।

নীলকণ্ঠ—(২) তিনি একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত। 'অবিরোধ প্রকাশ' নামক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত। এই গ্রন্থের রাম চন্দ্র কৃত মিতভাষিণী নামে এক টীকা আছে।

নীলকণ্ঠ— (৩) গ্রহ কৌতুকের টীকাকার এক নীলকণ্ঠ ছিলেন। গণেশ কৃত গ্রহলাঘবের তিনি এক টীকা রচনা করেন।

নীলকণ্ঠ—(৪) এই নীলকণ্ঠ জৈমিনী সূত্রের সুবোধিনী নাম্নী টীকা রচনা করিয়াছেন।

নীলকণ্ঠ—(৫) একনীলকণ্ঠ ১৫০৯ শকে (১৫৮৭ খ্রীঃ) তিথিরত্নমালা নামে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।

নীলকণ্ঠ—(৬) দৈবজ্ঞ বল্লভ নামক প্রশ্ন বিষয়ক গ্রন্থ নীলকণ্ঠ-বিরচিত।

নীলকণ্ঠ—(৭) তাঁহার জন্মস্থান দাক্ষিণাত্য। তাঁহার পিতার নাম রঙ্গনাথ দেশিক ও মাতার নাম লক্ষ্মী দেবী। তিনি দেবী ভাগবতের উপর একখানা উৎকৃষ্ট টীকা লিখিয়াছেন। সপ্তসতীর উপর শক্তি বিমর্ষিনী নামক টীকাও অতি উৎকৃষ্ট। তিনি শাক্ত বৈদান্তী ছিলেন। তিনি ১৬শ খ্রীঃ শকে বর্ত্তমান ছিলেন।

নীলকণ্ঠ কেরল—তাঁহার জন্মস্থান দাক্ষিণাত্যের কেরল প্রদেশের অন্তর্গত কুণ্ড গ্রামে। (বর্ত্তমান ত্রিকুণ্ডিয়ুর) তিনি পরমেশ্বর তনয় দামোদরের শিষ্য ছিলেন। ১৪২২ শকে (১৫০০ খ্রীঃ) তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। নীলকণ্ঠের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্কর, আর্য্যভট প্রণীত আর্য্য সিদ্ধান্তের টীকা রচনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পরলোকগত হন। পরে তাঁহার অগ্রজ নীলকণ্ঠ ইহা সম্পন্ন করেন।

নীলকণ্ঠ দীক্ষিত—তাঁহার জন্ম স্থান দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কাঞ্চী নগর। তিনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় আপস্তম্ভ শাখা ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—নীলকণ্ঠ চম্পূ ও চিত্র মীমাংসা দোষ ধিক্কার। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অপ্পয় দীক্ষিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পিতামহ ছিলেন। তিনি খ্রীঃ সপ্তদশ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন।

নীলকণ্ঠ নায়ক—তিনি শিবাজী ছত্রপতির সময়ে বিজাপুরের নবাবের অধীনে পুরন্দর দুর্গের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার স্বভাব অতিশয় ক্রুধপরায়ণ ছিল। কথিত আছে তাঁহার স্ত্রী কোন কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে তোপের মুখে স্থাপন করিয়া বধ করেন। দাদাজী কুণ্ডদেবের সমকালেই তিনিও পরলোক গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পীলো তাঁহার সম্পত্তির অধিকারী হন। এই পীলোকে পরাস্ত করিয়া শিবাজী পুরন্দর দুর্গ অধিকার করেন।

নীলকণ্ঠ মজুমদার এম-এ—শিক্ষাব্রতী, গ্রন্থকার ও সংবাদ পত্রের লেখক। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পাথরা গ্রামে ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতি ছাত্র ছিলেন এবং রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। 'গীতারহস্য' নামক একখানি গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। অনেক সংবাদ পত্রিকায়ও তাঁহার বহু প্রবন্ধাদি বাহির হইত। এতদ্ব্যতীত বহু স্কুল ও কলেজ পাঠ্য পুস্তকের তিনি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ১৯০১ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়— একজন ভক্ত সাধক, সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ও যাত্রা-

ওয়ালা। ১২৬৮ বঙ্গাব্দে (১৮৬১ খ্রীঃ) বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ধরণী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি পিতার নিকটেই বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে তিনি অধিকাংশ সময় রামায়ণ মহাভারত পাঠে ক্ষেপণ করিতেন। শৈশব হইতেই সঙ্গীতের প্রতিও তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার বার বৎসর বয়সের সময় গ্রামের জমিদার ব্রজনাথ বর্ম্মণ তাঁহাকে খাইতে দিতেন ও শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিতেন। ইহার দুই বৎসর পর নীলকণ্ঠের পিতা উন্মাদ হওয়ায়, তাঁহাদের আর্থিক ক্লেশ উপস্থিত হয়। তখন তিনি রামমোহন পাঁড়ের নিকট নাগরী লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের জন্য কলিকাতা মাড়োয়ারীদিগের দোকানে খাতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তরুণ বয়সেই তিনি সঙ্গীতে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অনেক ধনী ভদ্রলোকের নিকট হইতে তিনি গান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ পাইতেন। তখন হইতে গানের প্রতি তাঁহার অনুরাগ আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তৎপর তিনি কলিকাতা হইতে নিজ গ্রামে চলিয়া আসেন। তাঁহাদের গ্রামের নিকটবর্ত্তী জামুই গ্রামে গোপাল রায়ের একটি যাত্রার দল ছিল। গোপাল রায় তৎকালে ঐ অঞ্চলের একজন বড় ওস্তাদ ছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার নিকট গান শিক্ষা করিয়া, কৃষ্ণ যাত্রার দলে প্রবেশ করেন। প্রথমাবস্থায় তিনি এক দলে গান করিয়া আট দিনে চারি আনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে তিনি কয়েকটি দলে গান করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। অবশেষে তিনি গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার দলে ষোল টাকা বেতনে প্রবেশ করেন। অধিকারী মহাশয় সঙ্গীতে তাঁহার পারদর্শিতা দেখিয়া তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। অধিকারী মহাশয়ের নিকট থাকিয়া তিনি সঙ্গীতে বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করেন। ক্রমে তাঁহার যশোরাশি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। সেই সময় তিনি সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তিও প্রকাশিত হইতে লাগিল। তৎপরে উনিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি স্বয়ং দল গঠন করেন। সর্ব্বসমেত একুশজন লোক তাঁহার দলে ছিল এবং প্রত্যেকের বেতন দৈনিক ছয় পয়সা ছিল। নিজে যাত্রার দল করিয়া বহু টাকা উপার্জ্জন করিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন এবং নিজ গৃহে শালগ্রাম বিগ্রহাদি স্থাপন ও অন্যান্য সৎকার্য্যে অর্থাদি ব্যয় করিতে লাগিলেন। তিনি সাধক পুরুষ ছিলেন। দেশের ধর্ম্মপিপাসু লোক যে সকল কথা যে ভাবে চিন্তা করিতেন, তিনি

তাহাই তাঁহার সুললিত ছন্দে রচনা করিয়া প্রকাশ করিতেন। তিনি সরল ভাবে সরল ভাষায় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সাধারণ সত্যগুলি প্রকাশ করিতেন। তাঁহার পদাবলীতে যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতি থাকায় দেশবাসীর নিকট আরও প্রিয় ছিল। তাঁহার রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানগুলির রসভাব প্রশংসনীয়, ভাষা উচ্চাঙ্গের এবং সাধারণের ভাবোপযোগী ছিল। এই জন্য তিনি বঙ্গীয় পল্লীর নরনারীর নিকট অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। শেষ বয়সে তিনি কখন কখন গান করিতে করিতে ভগবৎপ্রেমে উন্মত্তবৎ দিন রাত্রি বিভোর হইয়া থাকিতেন। তাঁহার রচিত গান এখনও বঙ্গের অনেক পল্লীতে প্রচলিত আছে এবং অনেক বৈষ্ণবের ভিক্ষার সম্বল হইয়াছে। তদানীন্তন ইউরোপীয় সভ্যতায় যখন এদেশীয় সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল এবং হিন্দু জীবনের পবিত্রতা নষ্ট হইতেছিল, তখন তিনি তাহার বিরুদ্ধে অনেক বিদ্রূপাত্মক গান রচনা করেন। তাঁহার ঐ সকল গান পল্লীতে গীত হইত এবং সমাজের ভাঙ্গন অনেকটা প্রশমিত হইয়াছিল। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'গীতরত্ন' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপাসক ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে আপন পুত্র রামকমল মুখোপাধ্যায়কে যাত্রার দলে প্রবেশ করান। তিনিও সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। একবার নীলকণ্ঠ পুত্রের সহিত চাইবাসা জেলার মধ্যে সাইলকুপা রাজধানীতে গমন করেন। ঐ স্থানের কবিগণ তাঁহাদের দেশের প্রাচীন কবি উপেন্দ্র ভঞ্জের বর্ণিত কতটুকু পয়ার আনিয়া তাঁহাকে দেখাইলেন। তাহাতে আকার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ যুক্তাক্ষর বা চন্দ্রবিন্দুও ছিল না। উহা দেখাইয়া কবিগণ বলিলেন, বাঙ্গালা দেশে এরূপ বর্ণনা আছে কি না? মুখোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন, "বঙ্গভূমিতে কি ধন আছে তাহা আমি অবগত নহি, তবে এরূপ বর্ণনা আমি করিয়া দিতে পারি।" তৎপরে কবিগণের অনুরোধে তিনি নিম্ন লিখিত পদটি রচনা করিলেন।

একতালা—

তপন তনয় ভব হর হর বব বম্ বম্
রজতবরণ হর রজতবরণ মম
তম হর হর কমল নয়ন
শশধরধর হর নব জলধর হলধর
সম ভব সব বলধর
জগজন জর হর জগ জয় কর খগ নগ
জগ যত সব তব কর
অজর অমর পর যত যত রয়
ভব অবয়ব সব সম নয়
অনল ধরহ হর গরল ধরহ মম তম
(অন্ত) যত সব সকল হরহ
ভব ভয় হর হর রব মম ভয় পদ রতন

কহত তব অধম তনয়।

এই গান রচনা করিয়া তিনি ঐ প্রদেশের উচ্চ সম্মানজনক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৩২০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে তিনি দেহত্যাগ করেন। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসরকাল বঙ্গবাসী তাঁহার ভাবপূর্ণ অমৃতময়ী গানে কৃতার্থ হইয়াছিল। শেষ বয়সে তিনি হেতমপুরের মহারাজা রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের নিকট অবস্থান করিতেন।

নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী—তিনি ন্যায়শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ অন্নংভট্ট বিরচিত তর্কসংগ্রহের উপর 'তর্কসংগ্রহ দীপিকা প্রকাশ' নামক এক উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 'তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতি' টীকাও তাঁহার রচিত।

নীলকণ্ঠ সূরী—তাঁহার পিতার নাম গোবিন্দ সূরী। নীলকণ্ঠ মহাভারতের উপর 'ভারতভাবদীপ' নামে এক টীকা রচনা করিয়াছেন। তিনি খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

নীলকণ্ঠ হালদার—একজন কবি সঙ্গীত রচয়িতা। তিনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পীলা নামক গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যল্প অনুপ্রাস যোজনা করিয়া অশ্লীল শব্দে ও ভাবে 'লহর' নামক দীর্ঘ ছন্দে গান রচনা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। দাশরথি রায় পীলা গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে বাসকালে তাঁহার রচনায় বিদ্বেষ পরায়ণ হইয়া, সর্ব্বপ্রথম কবি গান রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অনুমান ১২৬৬ বঙ্গাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

নীলকমল—একজন উচ্চাঙ্গের শ্যামা সঙ্গীত রচয়িতা।

নীলকমল দাস—(১) তিনি একজন সাহিত্যিক ও সংবাদপত্রসেবী ছিলেন। তিনি 'ভৃঙ্গদূত' ও 'সংবাদ লস্কর' নামক দুইখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'ভৃঙ্গদূত' পত্রিকাখানি ১৮৪০—১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে মাত্র এক বৎসরকাল প্রকাশিত হইয়াছিল। 'সংবাদ লস্কর' পত্রিকাখানি ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

নীলকমল দাস—(২) একজন গ্রন্থকার। 'বৌদ্ধ রঞ্জিকা' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত। ইহা পালি ভাষায় লিখিত 'যাহুত্তাং' নামক বৃহৎ গ্রন্থের পয়ারাদি নানা ছন্দে বঙ্গানুবাদ। এই গ্রন্থে বুদ্ধদেবের জীবনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। তিনি এই গ্রন্থ চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজা ধরমবক্স খাঁর পত্নী কালিন্দী রাণীর সাহায্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

নীলকমল মিত্র—এলাহাবাদ প্রবাসী একজন খ্যাতনামা বাঙ্গালী ব্যবসায়ী। তাঁহার ব্যবসায় ঐ অঞ্চলের প্রায় সকল প্রধান প্রধান সহরেই বিস্তৃত ছিল। ঐ প্রদেশে যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা

বিস্তার এবং স্কুল কলেজের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা প্রদেশের মিওর সেণ্ট্রাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইলে, তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই কার্য্যের জন্য এক হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁহার বন্ধু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে 'দি রিফ্লেক্টার' (The Reflector) নামে একখানি ইংরেজী সংবাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ প্রদেশে স্থানীয় অধিবাসীদিগের ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশের ইহাই প্রথম চেষ্টা। এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কের মধ্যস্থলে জনসাধারণের সান্ধ্য ভ্রমণ ও বিশ্রামের জন্য তিনি প্রস্তরের একটী বেদী প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন।

নীলকমল মুস্তৌফী—তিনি ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে ফারসী হইতে একখানা বৃহৎ বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করেন। ইহাতে ২৮০০ শত ফারসী শব্দের বাঙ্গালা অর্থ সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনি নদীয়া জেলার জজের সেরেস্তাদার ছিলেন।

নীলকমল লাহিড়ী—একজনগ্রন্থকার। রংপুরের নলডাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ লাহিড়ী জমিদার বংশে ১২৩৫ বঙ্গাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অর্থশালী হইয়াও শাস্ত্র চর্চ্চা ও পাণ্ডিত্যে আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। নিম্ন লিখিত গ্রন্থগুলি তিনি প্রণয়ন করেন। (১) কাল্যার্চ্চন চন্দ্রিকা। (২) কৃষিতত্ত্ব। (৩) শক্তি ভক্তিরস কণিকা। (৪) শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি। (৫) প্রতিষ্ঠা লহরী। (৬) যাত্রা পদ্ধতি। ১৩০৩ বঙ্গাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

নীলধ্বজ—পালবংশের অবসানের পর নীলধ্বজ কামরূপের রাজা হইয়াছিলেন। তিনি অতি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। প্রথম জীবনে এক ব্রাহ্মণের গো-রক্ষক ছিলেন। এই বালক যৌবন প্রাপ্ত হইলে প্রতিপালক ব্রাহ্মণের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, পালবংশীয় শেষ নরপতিকে বিতাড়িত করিয়া কামরূপ রাজ্য অধিকার করেন। অনুমান খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া, পশ্চিমে গোসানী মারী নামক স্থানে কমতাপুর নামক নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে প্রায় সমুদয় কামরূপ রাজ্য তাঁহার করপ্রদ হইয়াছিল। কেবল পূর্ব্ব উত্তরাংশে বিদর্ভ অঞ্চলে ছুটিয়ারাজ রত্নধ্বজ পাল রাজত্ব করিতে ছিলেন।

নীলধ্বজের মৃত্যুর পরে চক্রধ্বজ রাজা হইয়াছিলেন। কথিত আছে

তিনি হস্তিনাপুর হইতে ভগদত্তের কবচ আনয়ণপূর্ব্বক কমতাপুরে স্থাপন করেন। বর্ত্তমান কমতেশ্বরী মন্দিরও তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহার পরলোক গমনের পর তাঁহার পুত্র নীলাম্বর রাজা হইয়াছিলেন।

নীলপন্থ সোমদেব—তিনি ছত্রপতি শিবাজীর একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন। দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজীবের আমন্ত্রণে যখন শিবাজী দিল্লীতে গমন করেন, তখন রাজ্যে সম্পূর্ণভার তাহার মাতা জিজাবাঈ, মন্ত্রী মোরো পিঙ্গলে, সেনাপতি নীলপন্থ সোমদেব এবং অন্নজী দত্ত মহাশয়ের উপর অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। যখন শিবাজী মুঘল দরবার হইতে কৌশলে পলায়ন করিয়া আবার স্বদেশে আসিলেন, তখন তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। একে একে মুঘল অধিকৃত সমুদয় স্থান তাঁহাদের হস্তগত হইতে লাগিল। ১৬৭০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে নীলপন্থ সোমদেব প্রভৃতির বীরত্বে শিবাজীর রাজ্যে মুঘল চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছিল।

নীলমণি ঠাকুর, চক্রবর্ত্তী—একজন কবি সঙ্গীত রচয়িতা। তিনি কলিকাতার হেদুয়া পার্কের নিকট বাস করিতেন। তিনি একটি কবির দল গঠন করিয়াছিলেন। তিনি ছাড়া কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য, হরুঠাকুর প্রভৃতিও তাঁহার দলের জন্ম গান রচনা করিতেন: ভোলা ময়রা রামবসু প্রভৃতি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। অনুমান ১২২১ বঙ্গাব্দে সত্তর বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করিলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপ্রসাদ তাঁহার কবির দলের অধিপতি হন।

নীলমণি দাস—(১) তিনি চৌত্রিশ অক্ষরে 'কালিকা স্তুতি' রচনা করিয়াছেন।

নীলমণি দাস দেওয়ান—(২) ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী। ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দে (১২৪৪ বঙ্গাব্দে) ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত জিনোদপুর গ্রামে প্রসিদ্ধ দাসবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তদানীন্তন স্কুলে সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রথমে ত্রিপুরা কালেক্টারীতে নাজীর পদে নিযুক্ত হন এবং ক্রমে প্রধান কেরাণী, সেরেস্তাদার ও পরে সাব রেজিষ্ট্রার হন। উক্ত কার্য্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করেন। ঐ সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। তখন চাকলে রোশনাবাদের ম্যানেজার ক্যাম্পবেল সাহেব, কুমিল্লার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নীলমণি দাসকে মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করিবার জন্য মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যকে অনুরোধ করেন। তদনুযায়ী ১২৮৩ ত্রিপুরাব্দে (১৮৭৩ খ্রীঃ) মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য নীলমণি দাসকে স্বীয় রাজ্যের মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। তিনি মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব্ব

অনুপযুক্ত মন্ত্রী দীনবন্ধু অবনতি প্রাপ্ত হইয়া আগড়তলার সদর ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। নীলমণি দাস কার্য্য-ভার গ্রহণ করিয়া ইংরেজ সরকারের অনুকরণে রাজ্যে আবকারী বিভাগ, ষ্টাম্প সৃষ্টি, দলীল রেজিষ্টারীর নিয়ম প্রবর্ত্তন, সকল প্রকার আইনের সংশো-ধন, তমাদি আইন প্রবর্ত্তন ও বিভাগ স্থাপন করিয়া রাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করেন। সেই সময় কুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা চাকলে রোশনাবাদের অংশ দাবী করিয়া মহারাজ বীরচন্দ্র মাণি-ক্যের বিরুদ্ধে এক দেওয়ানী মোকর্দ্দমা আনয়ন করেন। তখন তিনি এই মোকর্দ্দমা পরিচালনায় বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। (নবদ্বীপচন্দ্র দেব-বর্ম্মা দেখ)। ১২৮৬ ত্রিপুরাব্দের কার্ত্তিক মাসে (১৮৭৬ খ্রীঃ) তিনিই সর্ব্বপ্রথম ত্রিপুরা রাজ্যে ফাঁসী দ্বারা এক নর-হন্তাকে দণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্যে ফাঁসীর দ্বারা প্রাণ দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না। তাঁহার সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে উকিলদিগের পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি অতিশয় কর্ম্মঠ তেজস্বী ও কার্য্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি তাঁহার অধস্তন দুইজন সুচতুর বুদ্ধিমান কর্ম্মচারীর নিকট হইতে রাজ্য পরিচালনা বিষয়ে পরা-মর্শ গ্রহণ করিতেন। ১২৮৬ ত্রিপুরাব্দে তিনি চাকলে রোশানাবাদ পরিদর্শনে গমন করিলে তাঁহার পূর্ব্ব শত্রু দীনবন্ধু এক বিরুদ্ধ দল গঠন করেন। তাঁহাদের পরামর্শে মহারাজ বীরচন্দ্র তাঁহাকে মন্ত্রী পদ হইতে অপসারিত করেন। পরে তিনি যখন ঢাকায় অসুস্থ ছিলেন, সেই সময় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য তাঁহাকে পুনরায় মন্ত্রী পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই (১৮৭৯ খ্রীঃ) তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায়, মন্ত্রী পদ আর গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার বংশের অনেকেই উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া সম্মানিত পদে নিযুক্ত আছেন।

নীলমণি দে—একজন সম্ভ্রান্ত রাজ-কর্ম্মচারী ও সংবাদ পত্রাদির লেখক। তিনি উত্তর কলিকাতার টালাস্থ ভরদ্বাজ গোত্রীয় বিখ্যাত কায়স্থ দে বংশে জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মধুসূদন দে। তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত পাউনান গ্রামে ছিল। নীলমণি দের পিতামহ পঞ্চানন দে ভুষণার নিমক মহালের দারোগা ছিলেন। এই কার্য্যে তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন এবং নানারূপ সৎকার্য্যাদির দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মধুসূদন দে কলিকাতার কোন এক সওদাগরের অফিসে কার্য্য করিতেন, সেই উপলক্ষে তাঁহাকে স্থায়ী-ভাবে কলিকাতায় বাস করিতে হইত। তিনিই টালার দে বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

নীলমণি শৈশবে শাঁখারী টোলায় প্রসিদ্ধ ধনকুবের 'তমুমগের' গৃহে থাকিয়া জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে (General Assemblage Institution) শিক্ষা লাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি অতিশয় মেধাবী, সুচতুর ও পাঠে মনোযোগী ছিলেন। তিনি প্রত্যেক পরীক্ষায় ভাল ফল প্রদর্শন করিতেন। এই সব কারণে উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডাক্তার ওগিল্‌ভি তাঁহাকে জুনিয়ার বলিয়া ডাকিতেন এবং উচ্চ শ্রেণীতে ইংরেজী সাহিত্য শিক্ষাদানকালে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া উচ্চ শ্রেণীতে লইয়া যাইতেন। উপরের শ্রেণীর ছাত্রগণ কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলে, তিনি তাঁহাদ্বারা ঐপ্রশ্নের উত্তর দান করাইয়া, 'জুনিয়র' দ্বারা সিনিয়র ছাত্রগণকে লজ্জা প্রদান করিতেন। ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, তিনি উক্ত কলেজে প্রবিষ্ট হন। সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি স্যার লরেন্স পীল, কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিয়া, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইংরেজী রচনার জন্য একটি পদক পুরস্কার ঘোষণা করেন। তিনিই রচনা প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উক্ত পদক লাভ করেন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তিনি বাঙ্গালা সরকারের প্রধান দপ্তরে একটী কার্য্য গ্রহণ করেন। এই কার্য্যে তিনি বিশেষ দক্ষতা প্রদান করায় রাজপুরুষগণকর্তৃক ইনেস্পেক্টার জেনারেল অফ রেজিষ্ট্রেশন অফিসের প্রধান সহকারীর পদে উন্নীত হন। তৎপরে কিছুকাল রেভিনিউ বোর্ডে কার্য্য করিয়া, ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে চাকরী ত্যাগ করিয়া অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। 'ইণ্ডিয়ান ফিল্‌ড' (Indian Field) 'কলিকাতা রিভিও' (Calcutta Review) 'বেঙ্গলী' (Bengali) 'অমৃতবাজার' (Amrita Bazar) প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার অনেক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। তিনি 'বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা' ও বিজ্ঞান সমাজের সদস্য ও কাশীপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন। নিমতলার বিখ্যাত কিশোরীচাঁদ মিত্রের কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার সাত পুত্র সকলেই কৃতবিদ্য। ষষ্ঠ পুত্র চারুচন্দ্র তাঁহার জীবদ্দশায় অকালে পরলোক গমন করেন।

নীলমণি ধর—তাঁহার জন্মস্থান বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কাটোয়া। তিনি পাঁচ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। মাতা শিশু পুত্র ও কন্যাদিগকে লইয়া কলিকাতায় ভ্রাতার আশ্রয়ে আসিলেন। ভ্রাতার অবস্থাও ভাল ছিল না। নীল-

মণি অতিকষ্টে পড়াশুনা করিয়া এফ, এ পর্য্যন্ত পাশ করিয়াই কোন্নগরে একটী স্কুলে শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। এই ভাবেই তিনি বি, এ, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া অতি উচ্চ স্থান অধিকার করেন। তৎপরে তিনি হেয়ার স্কুলের শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। এই সময়ে বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব অতিশয় প্রবল ছিল। সেই প্রভাব হইতে তিনি মুক্ত ছিলেন না।

তিনি অতিশয় মিতব্যয়ী ছিলেন। কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া সার্পেণ্টাইন লেনে একটী বাড়ী ক্রয় করেন। এই সময়ে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তৎপরে তিনি ওকালতি পাশ করিয়া প্রথমে গয়া তৎপরে মেদিনীপুরে ওকালতী করেন। এস্থানে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পরে সুস্থ হইয়া তাঁহার কোনও বন্ধুর সাহায্যে আগ্রা কলেজে আইনের অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। এই স্থানেই তিনি জীবনের অবশিষ্টকাল প্রায় চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত করেন। তিনি যেমন বিদ্বান্ তেমনি চরিত্রবান্ সাধু পুরুষ ছিলেন। সমাজ সংস্কার, মদ্যপান নিবারণ প্রভৃতি কাজে অতিশয় উৎসাহী ছিলেন। বাঙ্গালার বাহিরে থাকিয়া তিনি বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার গৃহে কখনও আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার আতিথেয়তা ও সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। এই অক্লান্ত কর্ম্মী ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে পরলোক গমন করেন।

নীলমণি পাটনী—কবি সঙ্গীত ও বৈষ্ণব সঙ্গীত রচয়িতা। তাঁহার একটি কবির দল ছিল। গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সঙ্গীত রচয়িতাগণও তাঁহার দলের জন্য গান রচনা করিয়া দিতেন। চন্দননগরে তাঁহার বাসস্থান ছিল।

নীলমণি পাল—তিনি কাশ্মীররাজ হর্ষ প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ 'রত্নাবলী' নামক সংস্কৃত নাটক বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

নীলমণি বরাট—একজন গ্রন্থকার। তিনি বর্দ্ধমান জেলার ত্রিবেনীর অধিবাসী ছিলেন। 'তীর্থ কৈবল্য' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

নীলমণি বসাক—একজন গ্রন্থকার। তিনি 'নবনারী' 'বত্রিশ সিংহাসন' 'আরব্য উপন্যাস' ও 'পারস্য উপন্যাস' নামক গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার নবনারী নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী, খনা, অহল্যাবাঈ, রাণী ভবানী প্রভৃতি প্রসিদ্ধা বিদূষী মহিলার জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। বত্রিশ সিংহাসন, আরব্য উপন্যাস ওপারস্য উপন্যাস তিনখানি বাঙ্গালায় অনুবাদ গ্রন্থ।

তিনি বর্দ্ধমানের কালেক্টারের সহকারীর কার্য্য করিতেন।

নীলমণি মিত্র—(১) ইংরেজ অধিকারের প্রথম যুগের একজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী। ইংরেজ কোম্পানীর অধীনে কাজ করিয়া তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে নবাব সিরাজ-উদ্দৌল্লা কর্ত্তৃক কলিকাতা নগরী লুণ্ঠিত হইবার পর নবাবের নিকট হইতে ঐ ক্ষতি পূরণের জন্য যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহা যথাযোগ্য বন্টনের জন্য একটি তদন্ত সমিতি (Commission) গঠিত হয়। নীলমণি মিত্র মহাশয় ঐ সমিতির একজন সদস্য হইয়াছিলেন। কলিকাতার দর্জ্জিপাড়া অঞ্চলে একটি রাস্তা তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে।

নীলমণি মিত্র—(২)তিনি বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ কাশীশ্বর মিত্রের (যাহার নামে কাশীমিত্রের শ্মশান ঘাট বর্ত্তমান) বংশীয় সুখময় মিত্রের তৃতীয় পুত্র। ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে ডায়মণ্ড হারবারের অন্তর্গত বরদা গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়। জ্ঞাতিদের সহিত কলহে সুখময় মিত্র সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শ্বশুরালয়বাসী হইয়াছিলেন। কার্য্য ব্যপদেশে তিনি কলিকাতার উপকণ্ঠে ভবানীপুরে বাস করিতেন। নীলমণি বাবুর বাল্য শিক্ষা এই বরদা গ্রামেই প্রথম আরম্ভ হয়। পাঠশালায় অধ্যয়নকালে পাটীগণিত ও শুভঙ্করীতে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। ইং ১৮৪০ সালে মাত্র ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে, তিনি কলিকাতায় পিতার নিকট শিক্ষালাভার্থ আগমন করেন। এই সময়ে ইংরেজি শিক্ষা মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার পিতা তাঁহাকে লণ্ডন মিশনারী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ইং ১৮৪২ সালে শ্যামবাজার নিবাসী ভৈরবচন্দ্র সরকার মহাশয়ের কন্যা পদ্মাবতীর সহিত তাঁহার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিবাহের পরে তিনি শ্বশুরালয়ে থাকিয়া ডাফ সাহেবের কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। এখানে তিনি প্রতি বৎসর দুই তিন শ্রেণী অতিক্রম করিয়া শীঘ্রই উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। কলেজে স্মিথ সাহেব নামে অঙ্ক শাস্ত্রের এক অধ্যাপক ছিলেন। তিনি নীলমণিকে খুব ভালবাসিতেন। নীলমণি যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন, তখন প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের অঙ্ক শাস্ত্রের এক প্রতিযোগী পরীক্ষা হয়। স্মিথ সাহেবের বিশেষ অনুরোধে তিনি সেই পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়া একটী বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। ইং ১৮৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ডাফ কলেজের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

অধ্যয়ন অন্তে তিনি নানা স্থানে

কর্ম্মের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হস্তাক্ষর ভাল ছিল না বলিয়া, কোথাও সফলকাম হইলেন না। অবশেষে ডাফ সাহেবের বিশেষ চেষ্টায় ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে তিনি রুড়কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হইলেন এবং যথানিয়মে কলেজের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া তিনি মাসিক চল্লিশ টাকা বৃত্তি লাভ করিলেন। পর বৎসর হায়দরাবাদ প্রবাসী মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় কলেজে ভর্ত্তি হন। নীলমণি বাবুই রুড়কি কলেজের প্রথম বাঙ্গালী ছাত্র। কলেজের অধ্যক্ষ সাহেব তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন। কিন্তু সার্ভে বিভাগের সাহেব তাঁহাকে শুধু ভালবাসিতেন না এমন নহে, তাঁহাকে ভাল করিয়া সেই বিষয় শিক্ষাও দিতেন না। কিন্তু নীলমণি বাবুর সরল ব্যবহারে ছাত্র মণ্ডলী তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত এবং অনেক বিষয় তাঁহার নিকট জানিয়া শিক্ষা করিত। তিনিও সার্ভে সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁহাদের নিকট হইতে শিক্ষা করিতেন। ১৮৫২ সালের বাৎসরিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পারিতোষিক পাইলেন। তখন সকলের দৃষ্টি তাঁহার দিকে পড়িল। তৃতীয় বৎসরে কমিটী পরীক্ষা দিবার নিয়ম ছিল। এই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলেই মাসিক একশত টাকা বেতনে সাব এসিষ্ট্যাণ্ট সিবিল ইনজিনিয়ারের পদ পাওয়া যাইত। পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার পিতার পীড়ার সংবাদ পাইলেন। তখন তিনি অধ্যক্ষ সাহেবকে তাঁহার পরীক্ষা পূর্ব্বেই লইতে অনুরোধ করিলেন। অধ্যক্ষ সম্মত হইয়া পূর্ব্বেই তাঁহার পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। পরীক্ষা দিয়াই পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইলেন। পিতার সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না। বলা বাহুল্য পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া কতকগুলি মূল্যবান বই পারিতোষিক পাইলেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রথমে কিছুদিন গাঙ্গেয় কেনেল বিভাগে কার্য্য করেন। তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী বিভাগের সহকারী আর্কিটেক্টের (Architect) পদ গ্রহণ করেন।

১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি সহকারী ইন্‌জিনিয়ারের পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে সেণ্ট পল্‌স গির্জ্জার (St. Paul's Cathedral) আনুমানিক ব্যয় স্থির করিবার ভার তাঁহার উপর পতিত হইল। তিনি তাঁহার মন্তব্য পাঠাইবার সময় লিখিয়াছিলেন, গির্জ্জার কোন কোন স্থান এমন বিদীর্ণ হইয়াছে যে, ইহা সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া নূতন প্রস্তুত না করিলে, প্রবল ঝড়ে ভূপতিত হইবার সম্ভাবনা আছে। উপরস্থিত সাহেব কর্ম্মচারীরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ইহার কিছুকাল পরে

প্রবল ঝড়ে গির্জ্জার চূড়া ও ছাতের কিয়দংশ পতিত হইয়া একটী লোকের জীবন নষ্ট হইল। গবর্ণমেণ্ট ইহার কারণ প্রদর্শন করিতে বলিলে, উপরস্থ কর্ম্মচারীরা নীলমণি বাবুর উপর দোষ ন্যস্ত করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি চিফ ইন্‌জিনিয়ারকে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য প্রদর্শন করিলেন। সুতরাং অভিযোগ এখানেই সমাধি লাভ করিল। ইহার পরেই তাঁহাকে অন্যত্র বদলী করিবার চেষ্টা হয়। তিনি ইহা জানিতে পারিয়া কর্ম্মত্যাগ পত্র প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহাকে স্বপদে রাখিবার জন্য বিশেষ যত্ন করা হইয়াছিল। তিনি ইহাতে সম্মত হইলেন না। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। তিনি কলিকাতার পাইকপাড়ার রাজাদের বাড়ী, বাগান প্রভৃতি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদ ও এমারেল্ড বাউয়ার নামক উদ্যান বাটী, শ্যামবাজার কীর্ত্তি মিত্রের বাড়ী, বাগবাজারের নন্দলাল বসুর বাড়ী প্রভৃতি, বহু বড় লোকের বাড়ী, বিনা পারিশ্রমিকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বাড়ী, বিদ্যাসাগর কলেজের বাড়ী প্রভৃতি, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান কলেজের বাড়ী, শুধু বিনা পরিশ্রমিকে করেন নাই তদুপরি কলেজের জন্য এক হাজার টাকা চাঁদাও দিয়াছিলেন। এই সমস্ত কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াও তিনি বহু জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিবার সময় করিয়া লইয়াছিলেন।

তিনি কাশীপুর পুরতন্ত্রের সহকারী সভাপতি, দমদম পুরতন্ত্রের সভাপতি, কলিকাতা পুরতন্ত্রের কর্ম্ম সচিব, দমদম ও শিয়ালদহের অবৈতনিক বিচারক (Honorary Magistrate), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য (Fellow), স্থপতি বিদ্যা বিভাগের সভ্য (Member of the Faculty of Engineering), বিজ্ঞান সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কার্য্যকরী সভার সভ্য, ইন্‌জিনিয়ারিং সমিতির সভাপতি ও হিন্দু হোষ্টেল কমিটীর ন্যাস রক্ষক ছিলেন। তিনি এই সমস্ত অনুষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে উহাদের উন্নতি হইতে পারে সতত তিনি এই চিন্তা করিতেন। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী কার্য্যপ্রণালীর সম্পূর্ণ বিবরণ এস্থানে দেওয়া সম্ভবপর নহে।

১৮৯০ সালে কলিকাতা পুরতন্ত্রের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হেরিসন সাহেব, আইন করিয়া নগরবাসীদের বাড়ী ভাড়া অত্যাধিক বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বন্ধু ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বানার্জ্জী, আনন্দমোহন বসু, প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া, করদাতা সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের পক্ষ হইতে প্রতি-

বাদ আরম্ভ হইলে, হেরিসন সাহেব নীলমণি বাবুর পরামর্শানুযায়ী কর স্থাপনে সম্মত হন। তাঁহার বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পরে শ্যামবাজার মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউসন নামক স্কুলটী খরিদ করিয়া, ইহার নাম শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুল প্রদানপূর্ব্বক বন্ধুর স্মৃতি রক্ষা করিয়াছিলেন!

তিনি অনাড়ম্বর সাদাসিদা লোক ছিলেন। স্বীয় বিদ্যায় অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াও, তাহা প্রদর্শনেচ্ছা তাঁহার আদবেই ছিল না। পূর্ব্বে ইংলিস মেল কলিকাতা হইতে জাহাজে বিলাত যাইত। জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্ব দিন তাহার কলকব্জা ঠিক আছে কি না, কিছুদূর চালাইয়া পরীক্ষা করা হইত। একবার এইরূপ পরীক্ষার সময় জাহাজ আর চলিল না। বহু চেষ্টা করিয়াও বড় বড় সাহেবরা তাহা চালাইতে পারিল না। এমন সময় এক সাহেব আসিয়া নীলমণি বাবুকে তাহা দেখাইবার জন্য লইয়া গেল। তিনি অনেকক্ষণ ইহা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন। পরে এক স্থানে বড় হাতুড়ী দিয়া আঘাত করিতে বলিলেন। ঐ স্থানে খুব জোরে আঘাত করিতেই জাহাজ চলিতে লাগিল। সকলের আনন্দের সীমা রহিল না।

তাঁহার আত্মসম্মান বোধ যে কত প্রবল ছিল, তাহার পরিচয় আমরা চাকুরী পরিত্যাগের সময়ই পাইয়াছি। এখানে আর একটীর উল্লেখ করিতেছি। একবার দমদম কেণ্টনমেণ্ট ম্যাজি-ষ্ট্রেট আদেশ করেন যে প্রত্যেক অবৈতনিক বিচারককে শনিবার দেড় ঘটিকা পর্য্যন্ত বিচারাদি করিতে হইবে। এই আদেশ পাইয়াই, তিনি কর্ম্মত্যাগ পত্র প্রেরণ করিলেন। তখনই ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করিলেন।

বর্ত্তমানে মধুপুরে অনেক বাঙ্গালী স্থায়ী গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। এই বিষয়েও তিনিই প্রথম পথ প্রদর্শক! ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বাঙ্গালীদের ঐসকল স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করা যে অত্যন্ত আবশ্যক, ইহা উপলব্ধি করিয়া, তিনি তথায় কতকগুলি বাটী নির্ম্মাণ করেন। তৎ-পরে তাঁহার মতানুসরণ করিয়া অনেকে তথায় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই অক্লান্ত কর্ম্মী স্বাবলম্বী পুরুষ ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দের ২রা আগষ্ট প্রাণত্যাগ করেন।

নীলমুণি—তিনি একজন প্রবীন ঐতিহাসিক পণ্ডিত। কহ্লন তাঁহার প্রসিদ্ধ রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি নীলমুণির গ্রন্থ দেখিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহা আর পাওয়া যায় না।

নীলমেল্ নড়প্পান—তিনি তিরুমঙ্গই আলোয়ারের অন্যতম শিষ্য। তিরুমঙ্গই আলোয়ার দেখ।

নীলরতন রায়—একজন সঙ্গীত ও যাত্রার পালা রচয়িতা। ১২৩৫ বঙ্গাব্দে পাবনা জেলার সাহাজাদপুর থানার অধীন পোতাজিয়া গ্রামে বারেন্দ্র কায়স্থবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পদ্মলোচন রায়। তিনি সাধারণরূপ শিক্ষিত ছিলেন। নিজ গ্রামে তিনি স্কুল ও দেবালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

নীলরত্ন হালদার—সাহিত্যিক,সংবাদ পত্রসেবী ও নানা ভাষাবিদ্ পণ্ডিত। তিনি কলিকাতার চোরবাগান অঞ্চলের অধিবাসী ও জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাঙ্গালা, সংস্কৃত ব্যতীত তিনি ইংরেজী, আরবী, ফারসী, উর্দ্দু, লাটিন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন 'কবিতা রত্নাকর' 'পার্ব্বতী - গীতরত্ন' 'শ্রুতি-গীতরত্ন' 'সর্ব্বামোদ - তরঙ্গিণী' 'বহু-দর্শন', 'দম্পতিশিক্ষা', প্রভৃতি বহু গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। ১৮২৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার সম্পাদকতায় 'বঙ্গদূত' নামক একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। ষোল বৎসর কাল উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত দম্পতি-শিক্ষা গ্রন্থে পতি-পত্নীর শাস্ত্রীয় কর্ত্তব্য বর্ণিত হইয়াছে। বহু-দর্শন গ্রন্থখানি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজি আরবী ও ফারসী এই কয় ভাষায় রচিত। শ্রুতিগীতরত্ন, পার্ব্বতি-গীতরত্ন এবং সর্ব্বামোদ-তরঙ্গিণী পুস্তকে সংস্কৃত ভাষায় রচিত গান আছে। তাঁহার কবিতা রত্নাকর গ্রন্থখানি পাদরী মার্শমান সাহেব ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরে তিনি তৎকালে বাঙ্গালীদের প্রাপ্য সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানজনক রেভিনিউ বোর্ডের দেওয়ানের পদ লাভ করিয়াছিলেন।

নীলরাজ—তিনি আমুক্ত দেশের অধি-পতি ছিলেন। দিগ্বিজয়ী সমুদ্র গুপ্ত তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

নীলাচল দাস—একজন গ্রন্থকার। 'দ্বাদশ পাট নির্ণয়' নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ তিনি গদ্যে ও পদ্যে রচনা করিয়াছিলেন।

নীলাম্বর—তিনি আসামের অন্তর্গত কমতাপুরের নরপতি নীলধ্বজের পৌত্র ও চক্রধ্বজের পুত্র। তাঁহার মন্ত্রী শশিপাত্রের তনয়কে মন্দ চরিত্রের জন্য তিনি হত্যা করেন। মন্ত্রী তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য, তীর্থ যাত্রার ছল করিয়া বঙ্গের নবাব হোশেন শাহের শরণাপন্ন হন। হোশেন শাহ আসাম বিজয়ের এই উৎকৃষ্ট সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি সৈন্য পাঠাইয়া রাজধানী অবরোধ করেন এবং কয়েক বৎসর অবরোধের পর কৌশল ক্রমে রাজধানী অধিকার করিতে সমর্থ হন। নীলাম্বর বন্দী হইলেন। তাহার পর তাঁহার বিষয় আর কিছু জানা যায় না।

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর মাতামহ। তাঁহারই কন্তা শচীদেবী শ্রীচৈতন্তের মাতা।

নীলাম্বর দাস—একজন গ্রন্থকার। তিনি শ্যামাদাস আচার্য্যের বংশোদ্ভূত। 'সংগৃহীত সুধাসার' নামক একখানি গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে কবিরাজ গোস্বামী কৃত 'চৈতন্ত চরিতামৃত' হইতে সাধন ও তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধীয় শ্লোক সমূহ সংগৃহীত হইয়াছে।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়—(১) একজন তান্ত্রিক সিদ্ধ মহাপুরুষ। অনুমান ১২১২ বঙ্গাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মবারকপুর (মতান্তরে আলিপুর) গ্রামে শ্যামা পূজার দিন রাত্রিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মধ্যে বৈরাগ্যভাব দৃষ্ট হইয়াছিল।

পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তাঁহাকে লেখাপড়া শিক্ষার্থ গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু তিনি পাঠে বিশেষ অমনোযোগী এবং সংসারেও অনাসক্ত ছিলেন। তখন হইতেই তিনি কেবল দেব বিগ্রহাদির পূজা অর্চ্চনাতে আসক্ত ছিলেন। তিনি দৈনিক স্বহস্তে কালী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পূজা করিতেন এবং সন্ধ্যাকালে বিসর্জ্জন করিয়া ফেলিতেন। পাঠে অমনোযোগী হইলেও, তাঁহার মেধা শক্তি অতিশয় প্রখর ছিল এবং এই মেধা শক্তির বলেই তিনি শাস্ত্র শিক্ষা ও পাণ্ডিত্য লাভের অধিকারী হইয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যথা সময়ে তাঁহার উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন হয়। তৎপরে প্রথমে তিনি গ্রাম্য টোলে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া, পরে দেবীপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হরচন্দ্র ন্যায়বাগীশের নিকট ন্যায় ও সাংখ্য অধ্যয়ন করেন। ঐ সময় তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক বৈরাগ্যভাব অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে এবং সমস্ত কাজ পরিত্যাগ করিয়া সাধন ভজনেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। সাধনে সিদ্ধি লাভ করিয়াও, তিনি গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসী হন নাই। কিন্তু সংসারের মোহ তাঁহাকে কখনও আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের বিশেষ অনুরোধেও তিনি বিবাহ করেন নাই। তিনি প্রায় পাঁচশত শক্তি বিষয়ক ও অন্যান্য বিবিধ বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একটি উচ্চভাবপূর্ণ ও সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

তারা কোন অপরাধে, এ সুদীর্ঘ মেয়াদে,
সংসার গারদে থাকি বল্।
মশিল ছয় দূত, তশিল করে কত,
দারাসুত বেঁধে চরণে শৃঙ্খল॥
দিয়ে মায়া বেড়ী পদে, ফেলেছ বিপদে,
সম্পদে হারালেম মোক্ষফল;
এবার হলো না সাধনা, ওমা শবাসনা,
সংসার বাসনা বড়ই প্রবল॥
প্রাতঃকালে উঠি, কতই যে মা খাটি,

ছুটাছুটি করি, ভূমণ্ডল ;
হয়ে অর্থ অভিলাষী, সদানন্দে ভাসি,
কালি, সর্ব্বনাশি, কত আন ছল্॥
আনি ভূমণ্ডলে, কতই দুঃখ দিলে,
নীলাম্বরের জ্বলে দুঃখানল ;
আর বাঁচিতে সাধ নাই, (তারা গো)
বাসনা সদাই,
ফণী ধরে খাই হলাহল ॥

তাঁহার এরূপ উচ্চভাবোদ্দীপক সঙ্গীতে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। এখনও বাঙ্গালার বহু পল্লীতে তাঁহার রচিত অনেক সঙ্গীত আবেগভরে লোকে গাহিয়া থাকে। অনেক সময় নানা প্রকারে তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। শেষ বয়সে তিনি পুণ্যতীর্থ বারাণসী যাত্রা করেন। নৌকাতেই পথিমধ্যে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ১২৭৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পাটনায় (হুগলী জেলার অন্তর্গত) নশ্বর দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেন মবারকপুর গ্রামে তাঁহার স্থাপিত 'পঞ্চমুণ্ডী' আসন এখনও বর্ত্তমান আছে এবং তাঁহার অনুষ্ঠিত শ্যামা পূজা অদ্যাবধি নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তির আয় হইতে যথাবিধানে সমাধা হইতেছে।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, এম এ, সি আই ই—(২) কাশ্মীর রাজ্যের একজন উচ্চতম বাঙ্গালী কর্ম্মচারী। ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কুলিয়ারাণ ঘাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পণ্ডিত দেবনাথ মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র। ছাত্রাবস্থায় তিনি অতিশয় মেধাবী ছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে ২৩ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে সংস্কৃত শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া এম্-এ এবং ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপর কিছুকাল কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করেন। তৎপরে লাহোর চীফ কোর্টে যোগদান করেন। তাঁহার কর্ম্মনৈপুণ্যে সন্তুষ্ট হইয়া কাশ্মীরের মহারাজা রণবীর সিং তাঁহাকে স্বরাজ্যে উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি কাশ্মীর রাজ্যের প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। তিনি কাশ্মীর রাজ্যে রেশম কুটী স্থাপন করিয়া এই শিল্পের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গুণমুগ্ধ মহারাজ এইজন্য পুরস্কার ও উপাধি দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। পরে তিনি কাশ্মীর রাজের রাজস্ব সচিবের পদ প্রাপ্ত হন। এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি রাজ্যের সমুদয় বিভাগের উন্নতি সাধন করেন। ১৭ বৎসর কাল অতিশয় সুনামের সহিত কাশ্মীর রাজ্যে কার্য্য করিয়া ১৮৮৬ খ্রীঃ

অব্দে তিনি অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটির ভাইসচেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ইংরেজ সরকার তাঁহার কার্য্য দক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া ১৯১০ খ্রীঃ অব্দে সি আই ই উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার যত্নে আরও কয়েকজন বাঙ্গালী কাশ্মীর রাজ্যের উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

নীলাম্বর শর্ম্মা—তিনি ১৭৪৫ শকে (১৮২৩ খ্রীঃ) পাটনায় জন্ম গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুসারে তিনি "গোল প্রকাশ" নামক সংস্কৃত গণিত লিখিয়াছেন। তিনিই এই গণিতে জ্যোৎপত্তি, ত্রিকোণমিতি, চাপীয় রেখা গণিত, চাপীয় ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। লীলাবতীর অঙ্ক সমূহের বাসনাসহ এক টীকা ও তিনি করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভাস্করের বীজগণিতের টীকা এবং ভাবপ্রকাশাদি ফলিত গ্রন্থও তিনি লিখিয়াছিলেন। নীলাম্বর অলবন দেশের রাজা শিবদাস সিংহের প্রধান গণিতিক ছিলেন।

নীলোজী কটকর—তিনি ছত্রপতি শিবাজীর একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি বিজাপুরের সেনাপতি ইউসফ খাঁকে পরাজিত করিয়া সমস্ত কৃষ্ণা নদীর দোয়াব প্রদেশ অধিকার করেন।

নুনকর্ণ—তিনি বিকাণীর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নরপতি বিকার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৪৯৫ খ্রীঃ অব্দে রাজা বিকা পরলোক গমন করিলে, নুনকর্ণ পিতৃ পদে অভিষিক্ত হন। তিনিও পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি রাজা হইয়াই রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তস্থিত ভট্টিদিগের অনেকগুলি পল্লী আচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন। তাঁহার চারি পুত্র জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পিতার জীবিতকালেই, তাঁহার নিকট মহাজিন নগর ও একশত চল্লিশটী পল্লী গ্রহণ করিয়া, স্বীয় অগ্রজ স্বত্ব কনিষ্ঠ জৈতের করে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। নুনকর্ণ ১৪১৩ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে জৈত পিতৃ সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন।

নুনো ডা কুন্‌হা (Nuno da Cunha)—গোয়ার একজন পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা। ১৫৩৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি দুইশত সেনা মার্টিন্ আফন্সো দে মেলো জুসার্ত্তের (Martin Affonso de Mello Jusarte) অধীনে চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন। দে মেলো জুসার্ত্তে কয়েকজন অনুচরকে বহুমূল্য উপঢৌকনসহ গৌড়ের সুলতান গিয়াস-উদ্দিন মোহাম্মদ শাহের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। মোহাম্মদ শাহ পর্ত্তুগীজ দূতগণকে কারারুদ্ধ করিয়া চট্টগ্রামে পর্ত্তুগীজ সেনাপতি দে মেলো জুসার্ত্তকেও বন্দী করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। কিছুকাল

পরে দে মেলো জুসার্ত্ত ত্রিশজন সৈন্য-সহ বন্দী হইয়া গৌড়ে প্রেরিত হন। আফগানগণের সহিত যুদ্ধের সময় এই পর্ত্তুগীজ বন্দীগণ মোহাম্মদ শাহকে সাহায্য করিয়াছিল। এই সাহায্যের বিনিময়ে মোহাম্মদ শাহ পর্ত্তুগীজ বন্দী-গণকে মুক্তি প্রদান করেন এবং চট্টগ্রামে পর্ত্তুগীজগণ দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতি প্রাপ্ত হয়। চট্টগ্রামে দুর্গ নির্ম্মাণের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া, মুনো ডা কুন্‌হা কর্ত্তৃক দে মেলো জুসার্ত্ত পুনরায় গৌড় রাজ্যে প্রেরিত হইয়া বন্দী হন। তখন মুনো ডা কুন্‌হা তাঁহার সাহায্যার্থ নয়খানি জাহাজে, আন্টানি ও ডা সিল্‌ভা মেনেজেসের অধীনে তিনশতের অধিক সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। মেনেজেস্ চট্টগ্রামে আসিয়া ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। মোহাম্মদ শাহ এই সংবাদ জানিতে পারিয়া পর্ত্তুগীজ বন্দীগণকে মুক্তি প্রদান করেন নাই। এই ঘটনার পরে শের খাঁ গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিলে পর্ত্তুগীজ বন্দীগণ এই যুদ্ধে মোহাম্মদ শাহকে সাহায্য করায় তাঁহারা মুক্তি লাভ করেন। মোহাম্মদ শাহ, মুনো ডা কুন্‌হার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ডু বারোস (Du Barros) রচিত ডা এসিয়া (Da Asia) অনুসারে মুনো ডা কুন্‌হা, মোহাম্মদ শাহের সাহায্যার্থ পেরেজ দে সম্পয়োর (Perez de Sampayo) অধীনে নয়খানি জাহাজ বাঙ্গালা দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

নুরুদ্দিন শেখ—একজন মুসলমান গ্রন্থকার। তিনি 'তোয়ারিখ কাশ্মীর' নামক কাশ্মীরের একাখানা ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

নুরুউদ্দিন সয়েফউদ্দিন মোল্লা—একজন মুসলমান কবি। তাঁহার অন্য নাম অরথান। তিনি হিরাটের অন্ত-র্গত জামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার রচিত একখানা দেওয়ান আছে। তিনি সম্রাট হুমায়ুনের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি যমুনা হইতে কর্ণাল নামক স্থান পর্য্যন্ত একটী খাল কর্ত্তন করেন এবং উহার নাম শেখু নহর (শেখু রাজকুমার সলিমের ডাক নাম) রাখেন।

নুরুদ্দিন, সৈয়দ—এক জন মুসলমান গ্রন্থকার। চট্টগ্রামের অন্তর্গত হাট হাজারীর অধীন মির্জ্জাপুর নামক গ্রামে তাঁহার বাসস্থান ছিল। তিনি ফারসী ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি হইতে বাঙ্গালায় 'রাহাতুল কুলূপ' নামক একখানা মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থ এবং 'দাকায়েৎ' নামক একখানা মুসলমান সংহিতার বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করেন। 'রাহাতুল-কুলুপ' ফারসী শব্দ, ইহার অর্থ 'আত্ম-মুক্তি সোপান'।

নুরউল হক, শাহ বা শেখ—এক-জন মুসলমান গ্রন্থকার। অলমশরাখি,

অলডেহ্লবী এবং অলবোখারী নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি দিল্লীর শেখ আব্‌দুল হক বিন সয়েফ উদ্দিনের পুত্র। 'জুবদাত-উং-তোয়ারিখ' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাঁহারই রচিত। তাঁহার রচিত একখানা 'সরাহ'ও আছে। ১৬৬২ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৭৩) তাঁহার মৃত্যু হয়।

নুরউল্লা খাঁ—(১) তিনি দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজীবের ধাত্রী ভাই। বাঙ্গালার নবাব ইব্রাহিম খাঁর সময়ে (১৬৮৯—১৬৯৬ খ্রীঃ) শোভাসিংহের বিদ্রোহ হয় (শোভাসিংহ দেখ)। নুরউল্লা খাঁ সেই সময়ে যশোহর, খুলনা, হুগলী, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর চাকলার ফৌজদার ছিলেন। তিনি তিন হাজার সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ধনী এবং ব্যবসায় বাণিজ্যেও লিপ্ত ছিলেন। এই সময়ে শোভাসিংহের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য, নবাব তাঁহাকে আদেশ করিলেন। নুরউল্লা খাঁ সসৈন্যে যশোহর হইতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি প্রতিপক্ষের পরাক্রম ও বলাবলের বিষয় অবগত হইয়া হুগলী দুর্গে আশ্রয় লইলেন। শত্রু পক্ষীয়েরা ইহা জানিতে পারিয়া হুগলী দুর্গ পরিবেষ্টন করিল। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া ধনরত্ন পরিত্যাগপূর্ব্বক রাত্রিযোগে পলায়ন করিলেন। বিদ্রোহী সৈন্য হুগলী দুর্গ অধিকার করিয়া ধনরত্ন লুণ্ঠন করিল। ইহাতে সর্ব্বত্র হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। সহর ও সহরতলীর সম্ভ্রান্ত অধিবাসীরা এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের বণিকেরা ধন ও মূল্যবান দ্রব্যাদিসহ ওলন্দাজ অধিকৃত চুঁচুড়াতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ওলন্দাজেরা দুইখানি যুদ্ধ জাহাজ পাঠাইয়া হুগলী দুর্গ নষ্ট করিল। শোভাসিংহ সাতগাঁও অভিমুখে পলায়ন করিলেন।

নুরউল্লা খাঁ তেমন বীর ছিলেন না। যশোহরের কপোতাক্ষ নদীর তীরবর্ত্তী মিরজা নগরে তাঁহার বাসভবন ছিল। ১৮১৫ খ্রীঃ অব্দেও ইহা অন্যতম প্রধান নগর ছিল। এখন ইহা ভগ্নস্তূপে পরিণত। তাঁহার বংশধরেরা নানাস্থানে বাস করিতেছেন।

নুরুল্লা খাঁ—(২) ১৬৭৮খ্রীঃ অব্দে তিনি বাংলার সুবেদার রাজকুমার আজমের সহকারীরূপে কিছুদিন উড়িষ্যার সুবেদার ছিলেন। রসিদ খাঁ দেখ।

নুরউল্লা খাঁ বাহাদুর, নবাব—তিনি ১৬৭৮ খ্রীঃ অব্দে শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

নুরউল্লা বেগ—নবাব আলীবর্দ্দীখাঁর একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি।

নুরউল্লা শুস্তারী, মির—একজন মুসলমান গ্রন্থকার। তাঁহার অন্য নাম নুরউল্লা বিন সরিফ উল হুসেনী-উস-শুস্তারী। তিনি সম্রাট আকবরের একজন সভাসদ ছিলেন। 'মজলিস-

উল-মামিনীন' নামক জীবনী কোষ তিনি প্রণয়ন করেন। উহা একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তিনি অতিশয় গোঁড়া শিয়া ছিলেন বলিয়া ১৬১০ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৯৯) নিহত হন।

নুরকুতব-উল-আলম শেখ—একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু। তিনি যোধপুর রাজ্যের নগোর নামক নগরের অধিবাসী ছিলেন। শেখ হামিদউদ্দিন কুঞ্জনশীনের নিকট নগোরেই তিনি শিক্ষালাভ করেন। বঙ্গের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। রাজা গণেশ যখন গৌড়ের সিংহাসনে ক্রীড়াপুত্তলিকাবৎ শাহাব উদ্দিন বায়াজিদ শাহ নামক একজন মুসলমানকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া নিজে রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন। তখন নুরকুতব গৌড়ের মুসলমানগণের প্রতিনিধিরূপে জৌনপুরের শাসনকর্তা ইব্রাহিম শাহকে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাজা গণেশকে বিনাশ করিবার জন্য আহ্বান করেন। তাঁহার আদেশে জৌনপুররাজ বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিলে, রাজা গণেশ নুরকুতবের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করেন। তখন তিনি রাজা গণেশকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলেন। রাজা গণেশ বাধ্য হইয়া মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী তাঁহাকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে দেন নাই। রাজা গণেশের অনুরোধে নুরকুতব-উল-আলম তাঁহার পুত্র যদুকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি ইব্রাহিম শাহকে আক্রমণে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করেন। ইব্রাহিম শাহ তাঁহার অনুরোধ রক্ষায় ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। ইব্রাহিম শাহ জৌনপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কিছুকাল পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। পাণ্ডুয়ার ছোটীর দরগাহে তাঁহার সমাধি আছে। মালদহ জেলার সোলপুর নাগরাই নামক গ্রামে তাঁহার উপাসনা গৃহের একটী শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

নুরজাহান—ভারত প্রসিদ্ধা মুঘল সাম্রাজ্ঞী। সম্রাট জাহাঙ্গীরের মহিষীরূপে তিনি তৎকালীন মুঘল সাম্রাজ্যের বিবিধ গুরুতর রাজনৈতিক বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

নুরজাহানের পিতা মিরজা গিয়াস বেগ পারস্যদেশের অধিবাসী ছিলেন। স্বদেশে দুরবস্থায় পড়িয়া তিনি ভাগ্যান্বেষণে গর্ভবতী পত্নী ও দুই পুত্র সমভিব্যাহারে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তাঁহার পত্নী এক কন্যা সন্তান প্রসব করেন। তাঁহার নাম হয় মেহের উন্নিসা। ভারতে উপস্থিত হইয়া

গিয়াস বেগকে তাঁহার পরম হিতকারী বন্ধু মালিক মামুদ সম্রাট আকবরের সমীপে উপনীত করেন এবং সম্রাট তাঁহাকে উচ্চ রাজ কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আলিকুলি নামক দিল্লী প্রবাসী এক পারস্যদেশবাসী বীর পুরুষের সহিত মেহার-উন্নিসার বিবাহ হয়। আলিকুলি পরে স্বহস্তে এক ব্যাঘ্র বধ করিয়া শের আফগান নাম প্রাপ্ত হন। আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর সম্রাট হইয়া শের আফগানকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বর্দ্ধমানে প্রেরণ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে সম্রাট, শের আফগান রাজশক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন ইহা সন্দেহ করিয়া, বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা কুতবুদ্দিন খাঁকে অনুসন্ধান করিতে বলেন। কুতবুদ্দিন শের আফগানকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া কয়েকজন অনুচরসহ নিহত হন। শের আফগানও রাজানুচরগণের অস্ত্রাঘাতে প্রাণবিসর্জ্জন করেন। তাঁহার পত্নী মেহর-উন্নিসা ও কন্যা লাডিলি বেগম রক্ষী বেষ্টিত হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হন। এই সময়ে মেহর-উন্নিসার পিতা ইতিমাদ-উদ্-দৌল্লা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া দিল্লীতে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিছুকাল পরে মেহর-উন্নিসা স্বর্গত সম্রাট আকবরের অন্যতমা মহিষী ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিমাতা সুলতান সলিমা বেগমের সহচারিণী নিযুক্ত হইলেন। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার কালে মেহর-উন্নিসা সম্রাটের দৃষ্টিপথে পতিত হন এবং সম্রাট তাঁহার অসাধারণ রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অন্যতমা মহিষীর পদ প্রদান করেন। তদবধি গিয়াস্-বেগ-দুহিতা মেহর-উন্নিসা, নুরজাহান (জগতের আলো) নামেই ইতিহাসে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

নুরজাহান যেরূপ রূপবতী ছিলেন। সেইরূপ বিবিধ রাজকুলোচিত গুণেও গুণান্বিতা ছিলেন। ফারসী ভাষায় তিনি সুললিত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। আদব কায়দা, আচার ব্যবহার, রাজান্তঃপুরের সমুদয় বিষয় তত্ত্বাবধান করা, সকল বিষয়েই তিনি অল্পদিনের মধ্যেই অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করেন। এই সকলের সহিত তাঁহার তীব্র ক্ষমতাপ্রিয়তাও ছিল। সকল বিষয়ে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকিতেন। রাজমহিষী হইবার কয়েক বৎসর পরে, সুলতান সলিমা বেগমের মৃত্যু হইলে, তিনি রাজান্তঃপুরে প্রধানা (পাদিশা-বেগম) মহিলার মর্য্যাদা লাভ করেন এবং তখন হইতেই মুঘলহারেমে বহু নূতন বিধিব্যবস্থার প্রচলন

করেন। তিনি আড়ম্বর প্রিয় ও বিলাসী ছিলেন বলিয়া রাজান্তঃপুরে ক্রিয়াকলাপ ও রীতিনীতি, পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যেও অনেক নূতন বিষয় প্রচলন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের উপর তাঁহার এইরূপ অসাধারণ প্রভাব জন্মিয়াছিল যে মুদ্রার সঙ্গে তাঁহার নাম সংযোজিত হইত।

শের আফগানের ঔরসে তাঁহার এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার সহিত রাজকুমার শাহারিয়ারের বিবাহ হয়। সুতরাং তিনি তাহাকেই জাহাঙ্গীরের পরে সিংহাসন প্রদান করিতে অভিলাষী হইলেন। অন্যদিকে তাঁহার ভ্রাতা আসফ খাঁর কন্যা মমতাজ মহলের সহিত রাজকুমার খুরমের (পরে শাহ-জাহান) বিবাহ হয়। রাজকুমার খুরম রাজপুত কুলের দৌহিত্র ছিলেন। সুতরাং মন্ত্রী আসফ খাঁ ও রাজপুতেরা তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করেন। কিছুকাল এই গোলযোগ ধুমিত ছিল। পরে মহবত খাঁ নামক একজন সেনাপতি জাহান্‌গীর ও নুরজাহানকে বন্দী করেন। সেই যাত্রা নুরজাহানেরই বুদ্ধি কৌশলে সম্রাট জাহান্‌গীর কারামুক্ত হন। ইহার কিছুদিন পরেই সম্রাট কালগ্রাসে পতিত হন এবং নুরজাহান বার্ষিক পঁচিশ লক্ষ টাকা বৃত্তি লইয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৬৪৫ খ্রীঃ অব্দে বাহাত্তর বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। লাহোর নগরে স্বামীর সমাধির পার্শ্বেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। কথিত আছে নুরজাহানই গোলাপী আতরের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। (জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান দেখ)।

নুরমহল—তিনি দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহের মহিষী নুরজাহানের কন্যা। নুরজাহানের পূর্ব্ব স্বামী শের আফগানের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। জাহাঙ্গীরের চতুর্থ পুত্র রাজকুমার শাহরিয়ারের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই রাজকুমার, মহিষী নুরজাহানের অতিশয় অনুগত ছিলেন। সেইজন্য সম্রাটের মৃত্যুর পরে যাহাতে শাহরিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আসফ খাঁর আদেশে শাহজাহান সমস্ত জীবিত সিংহাসনের দাবীদারদিগকে বিনাশ করিয়া সম্রাট হইয়াছিলেন।

নুর মোহাম্মদ—একজন মুসলমান পাঁচালীকার। 'মদনকুমার ও মধুমালার বিরহ পাঁচালী' তিনি রচনা করিয়াছেন। ইহাতে গ্রন্থোক্ত নায়ক নায়িকার অদ্ভুত প্রেম কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

নুলা পঞ্চানন—তাঁহার রচিত একখানা কুল গ্রন্থ আছে। তাহার নাম 'দোষ কারিকা'।

নৃগ—মহারাজ নৃগ মিথিলার অধিপতি ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বাচস্পতি মিশ্রের সমসাময়িক এবং ৮৪১ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

নৃত্যগোপাল কবিরত্ন—কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, বিশিষ্ট অধ্যাপক ও যশস্বী নাটককার। তাঁহার রচিত কয়েকখানি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা ও সংস্কৃত নাটক আছে। তন্মধ্যে বাঙ্গালা নাটকগুলি অতিশয় সুনামের সহিত বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইত এবং সংস্কৃত নাটকগুলি তিনি টোলের ছাত্রগণকে লইয়া বাণী-বিলাস নাট্য সম্প্রদায় নামক একটী দল গঠনপূর্ব্বক অভিনয় করিতেন। এই বাণী-বিলাস নাট্য সম্প্রদায় দ্বারা তিনি নিজ রচিত নাটক ব্যতীত বহু প্রাচীন নাটকাদিরও অভিনয় করাইতেন। তাঁহার রচিত 'রামাবদানম্' কাব্যখানি জর্ম্মণীতে স্কুল পাঠ্য হইয়াছিল। আর কোনও আধুনিক পণ্ডিত এই সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই।

নৃত্যগোপাল শেঠ—একজন বিখ্যাত লৌহ ব্যবসায়ী। ১২৬৩ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে চন্দননগরে পালপাড়াস্থ পল্লীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শম্ভুচন্দ্র শেঠও একজন খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহারা জাতিতে সোম ঋষি গোত্রসম্ভূত তিলি এবং তাঁহাদের পূর্ব্ব উপাধি ছিল নন্দী। এককালে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ব্যবসায়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া শেঠ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নৃত্যগোপাল শৈশবে মাতৃহারা হইয়া তাঁহার পিতৃস্বসা কর্ত্তৃক লালিত পালিত হন। প্রথমে এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া, তিনি স্থানীয় গড়বাটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর শিক্ষা লাভ করেন। তৎপর পিতার বার্দ্ধক্য ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি ব্যবসায় কার্য্য পরিচালনা ও শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আসিয়া পিতার সহিত ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সুচতুর ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। ক্রমে ক্রমে সংসারের তত্ত্বাবধান, ব্যবসায় পরিচালনা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্যই তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। তিনি সততা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করিয়া অল্পকাল মধ্যেই খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ব্যবসায়ী মহলেও তিনি একজন সাধু ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচিত হন। ঐ সময় তাঁহাদের কলিকাতার কারবারে লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসায় চলিত এবং অন্যান্য সকল মোকামের কেন্দ্রস্থল কলিকাতার হাটখোলায় ছিল। কণ্ট্রাক্ট সহি না করিয়া কাজ করা দেশীয় ও বৈদেশিক কোন কার্য্যেরই রীতি নহে। কিন্তু কলিকাতা ও ইউরোপের ব্যবসায়ীরা বিনা সহিতেই তাঁহার সহিত কাজ করিতেন। ইংলণ্ডের যে সকল বড় বড় ব্যবসায়ী

অগ্রিম টাকা না লইয়া এদেশীয় ব্যবসায়ীগণের সহিত কাজ করেন না, তাঁহারাও শম্ভুচন্দ্র এণ্ড সন্সের সহিত টাকা অগ্রিম না লইয়া এবং কেহ কেহ 'বিল অব্ লেডিং' ব্যাঙ্কের মারফতে প্রেরণ না করিয়া তাহাদেরই বরাবরে প্রেরণ করিয়া মাল সরবরাহ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। স্বদেশী শিল্পকলা ও স্বদেশজাত শিল্প দ্রব্যের প্রতি তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি নিজ হস্তে বহু শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণ, সুন্দর চিত্রাঙ্কণ ও মৃৎপুত্তলিকা প্রস্তুত করিতে পারিতেন। করগেট, ষ্টীল ও লৌহ ব্যতীত আরও নানাবিধ ব্যবসায়ে তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐগুলিতে আশানুরূপ সফলতা লাভ করিতে না পারায় পরিত্যাগ করেন। পিতার মৃত্যুর পর মোকামী কাজও উঠাইয়া কেবলমাত্র পুরাতন ব্যবসা ও ব্যাঙ্কিং কাজ রাখিয়াছিলেন। তিনি সত্যবাদী, পরোপকারী ও নির্ম্মল প্রকৃতির লোক ছিলেন। নিজে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াও তিনি সত্যকথা বলিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না; বিপুল ধনশালী হইয়াও তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। বহু দরিদ্র ছাত্র, বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি ও বুভুক্ষু তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিত। জন্মভূমির সমস্ত জনহিতকর অনুষ্ঠানে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। কখনও কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থী হইয়া বিমুখ হয় নাই। তিনি নীরব দাতা ছিলেন। শেষ অবস্থায় তিনি তাঁহার পুত্রগণের প্রতি পঞ্চাশ হাজার টাকা দেশহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য আদেশ করিয়া যান। তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার মৃত্যুর পরে পিতার আদেশ অনুযায়ী ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকা চন্দননগরে শিক্ষার উন্নতি কল্পে ব্যয় করিয়াছেন। উপকারীর উপকার তিনি আজীবন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখিতেন। এক সময়ে তাঁহার এক কর্ম্মচারী তাঁহার ব্যবসায় হইতে ত্রিশ সহস্র টাকা আত্মসাৎ করে। ঐ কর্ম্মচারী তাঁহার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ও তাঁহার পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে অসুস্থতার সময় তাঁহার যত্ন করিয়াছিল। তাঁহার অপর ভ্রাতা এই কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতে উদ্যত হইলে, তিনি তৎকৃত পিতার সেবা শুশ্রূষার কথা উল্লেখ করিয়া ভ্রাতাকে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে নিরস্ত করিয়াছিলেন। ১৩২০ বঙ্গাব্দের (১৯১৩ খ্রীঃ) ১০ই চৈত্র কয়েক মাস পীড়িত থাকিয়া তিনি সাতান্ন বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

নৃপভান—খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে যশল্মীরের প্রান্তভাগে লোড্রু জাতীয় রাজপুতগণ বাস করিত। তাঁহাদের

রাজধানীর নাম লোহুর্কা নগর ছিল। তাঁহার অধিপতি ছিলেন নৃপভান। এই রাজপুতেরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দেবরাজের পিতা বিজয়রাজকে বিনষ্ট করিয়াছিল এবং তাঁহাকেও হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তিনি অতি কষ্টে জীবন রক্ষা করিয়া, স্বীয় মাতামহের সাহায্যে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময়ে নৃপভানের পুরোহিত কোন কারণে জাতক্রোধ হইয়া দেবরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ তাঁহার সাহায্য লইতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা দেবরাজের সহিত নৃপভানের কন্যার বিবাহ প্রস্তাব করিলে নরপতি নৃপভান সম্মত হইলেন। যথাকালে দেবরাজ দ্বাদশ সহস্র বিশ্বস্ত সাহসী সৈন্যসহ লোহুর্কা নগরে উপস্থিত হইলেন। নগরের দ্বার উন্মুক্ত হইল। দেবরাজ সসৈন্যে নগরে প্রবেশ করিয়াই অসি উন্মুক্ত করিয়া সকলকে অসিমুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। নৃপভানও চরমগতি লাভ করিলেন। দুর্গ স্ববশে আনয়ন করিয়া দেবরাজ নৃপভানের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই অভিযানের ফলে দেবরাজ ছাপান্ন হাজার অশ্ব ও এক লক্ষ উট প্রাপ্ত হইলেন। নৃপভানের রাজ্য একেবারে বিনষ্ট হইল।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ, মহারাজা বাহাদুর, কর্ণেল, স্যার—কুচবিহারের অধিপতি। ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দের ৪ঠা অক্টোবর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতা মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ পরলোক গমন করিলে তিনি সিংহাসনের অধিকারী হন। কিন্তু তখন তাঁহার বয়স মাত্র দশ মাস ছিল, কাজেই তিনি সিংহাসনে অভিষিক্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহার অপ্রাপ্ত বয়স্ককাল পর্য্যন্ত ইংরেজ সরকার তাঁহার রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি যথারীতি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে ভুটান যুদ্ধে ইংরেজ সরকার কুচবিহার রাজ্য হইতে প্রচুর সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহারা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপকে দুইটী কামান উপহার দিয়াছিলেন।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ প্রথমে বারাণসীর ওয়ার্ডস ইন্‌ষ্টিটিউটে (Wards Institute) এবং পরে বাঁকিপুর কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বিলাত গমন করেন। বিলাতে তাঁহার অধ্যয়ন শেষ হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের অধীশ্বরী বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য যখন দিল্লীতে এক দরবারের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তখন তিনি 'মহারাজা' উপাধি, পদক ও তরবারি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭৮খ্রীঃ অব্দে তিনি কেশবচন্দ্র

সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীকে বিবাহ করেন। ১৮৮৭খ্রীঃঅব্দে মহারাণী সুনীতি দেবী সি-আই (Crown of India) উপাধি লাভ করেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে ভারত সরকার কুচবিহারের মহারাজগণকে 'মহারাজ ভূপ বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন। ঐ বৎসরই তিনি 'মেজর' হন। ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি উৎসবের সময় তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করেন এবং সেই সময়েই জি-সি-আই-ই উপাধি লাভ করেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি সি-বি উপাধিও প্রাপ্ত হন। তিনি সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের (তদানীন্তন প্রিন্স অব ওয়েল্‌স) অনারারী এডিকং (Aid-de-camp) এবং বৃটিশ সেনাদলের লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল হইয়াছিলেন। তিনি বিলিয়ার্ড, টেনিস, পোলো প্রভৃতিতে একজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় এবং একজন সুনিপুণ শিকারীও ছিলেন। ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজী ভাষায় শিকার সম্বন্ধে তিনি একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। রাজ্যে শিক্ষাবিস্তার, সুশাসন ও প্রজামণ্ডলীর মঙ্গল সাধন প্রভৃতি বিষয়েও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁহার শাসন ব্যবস্থায় কুচবিহার রাজ্য অনেক সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত কলেজ, চিকিৎসালয়, আদালত, কারাগার প্রভৃতির কার্য্য অতিশয় সুশৃঙ্খল ও সুখ্যাতির সহিত চলিতেছে। শিল্প শিক্ষায়ও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। কলিকাতার 'ইণ্ডিয়া ক্লাব' (India Club) নামক সমিতি তাঁহারই চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত এবং আংশিক অর্থানুকূল্যে পরিচালিত। তিনি রাজ দরবারে ও লোক সমাজে প্রভূত সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তেরটী তোপধ্বনির সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার চালচলন অনেকটা ইংরেজী ভাবাপন্ন ছিল, কিন্তু তাঁহার পার্শ্বচর ও উচ্চতন কর্ম্মচারী সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন। ১৯১১ খ্রীঃ অব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর (১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১লা আশ্বিন) সোমবার ইংলণ্ডে বেক্সহিল (Bexhill) নামক স্থানে তিনি পরলোক গমন করেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের আদেশে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সামরিক বিভাগের পদ্ধতি অনুসারে বিশেষ সম্মানের সহিত সম্পন্ন করা হয়। সৈনিক কর্ম্মচারীগণ ও সেনাদল নানাবিধ বাদ্যসহ শবদেহের অনুগমন করিয়াছিল। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও ভারতসচিবের প্রতিনিধিরূপে যথাক্রমে স্যার ষ্টুয়ার্টনিল ও স্যার রিক্‌মণ্ড সাহেবও এই শব যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন।

নৃসিংহ—(১) এই নামে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বহু পণ্ডিতের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। গোলগ্রাম নিবাসী নৃসিংহাচার্য্য, ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত শিরোমণির

উপর ১৫৪৩ শকে (১৬২১ খ্রীঃ), বাসনা বার্ত্তিক' নামে একটী উৎকৃষ্ট টীকা লিখিয়াছেন।

নৃসিংহ—(২) গোদাবরী ও বিদর্ভা (বেদর্া) নদীর সংযোগ স্থলের দুই মাইল উত্তরে পার্থপুর নামে একটী গ্রাম ছিল। এই গ্রামে নৃসিংহ দৈবজ্ঞ নামে একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র ঢুণ্ডিরাজ দৈবজ্ঞ 'জাতকাভরণ' নামে একখানা উৎকৃষ্ট জাতক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

নৃসিংহ—(৩) পশ্চিম প্রদেশে প্রাচীন দেবগিরি ও বর্ত্তমান দৌলতাবাদ হইতে ৬৫ মাইল পশ্চিমে, নন্দীগ্রাম নামক স্থানে কৌশিকবংশে গণেশ নামে একজন বহু গ্রন্থ প্রণেতা প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে 'গ্রহলাঘব' গ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র ও রামের পুত্র নৃসিংহ গ্রহলাঘবের টীকা 'গ্রহকৌমুদী' ও 'গ্রহসিদ্ধি' নামক সারণী লিখিয়াছিলেন। নৃসিংহ অধ্যাপকও ছিলেন। গোলগ্রামের দিবাকর তনয় বিষ্ণু তাঁহার শিষ্য ছিলেন। এই কৌশিকবংশ পুরুষ পরম্পরায় শাস্ত্র-চর্চ্চার জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

নৃসিংহ—(৪) গোদাবরী নদীর উত্তর-কূলে গোলগ্রামে (নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত গোলগ্রাম) ভরদ্বাজ গোত্রীয় দিবাকর নামে এক মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি স্বয়ং, তাঁহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ এবং পৌত্র নৃসিংহও জ্যোতিষ শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। এই নৃসিংহ ১৫৮৬ খ্রীঃ অব্দে (১৫০৮ শকে) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় পিতৃব্য বিষ্ণু ও মল্লারির নিকট জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। পঁচিশ বৎসর বয়সে 'সৌরভাষ্য' নামে তিনি সূর্য্য সিদ্ধান্তের টীকা লিখেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে, ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত শিরোমণির উপর স্বয়ং লিখিত বাসনা ভাষ্যের "বার্ত্তিক" নামে এক টীকা রচনা করেন। তিনি বাসনা বার্ত্তিকের যন্ত্রাধিকারে ময়ূর যন্ত্র, ব্রহ্মচারী যন্ত্র, শর-বেদ যন্ত্র, বধূবর যোগ যন্ত্র, মেষাজ যুদ্ধ যন্ত্র, শংখ বাদন যন্ত্র, ২০শ যন্ত্র, প্রভৃতি বহুবিধ যন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। 'বাসনা বার্ত্তিক' সিদ্ধান্ত শিরোমণির একটী প্রসিদ্ধ টীকা। নৃসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিব দৈবজ্ঞও একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি নৃসিংহের পুত্রদের অধ্যাপক ছিলেন। 'অনন্ত সুধারস বিবৃতি' ও 'মুহূর্ত্ত চূড়ামণি' শিব দৈবজ্ঞের রচিত। নৃসিংহের দিবাকর, কমলাকর, গোপীনাথ ও রঙ্গনাথ নামে চারি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত পুত্র ছিলেন।

নৃসিংহ—(৫) এক নৃসিংহ হিল্লাজ তাজকের 'দীপিকা' নামক টীকা রচনা করেন।

নৃসিংহ—(৬) বরদাচার্য্যের পুত্র নৃসিংহাচার্য্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'কাল নির্ণয়' নামে একখানা বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। রামচন্দ্রাচার্য্য এই গ্রন্থের এক টীকা লিখিয়াছেন।

নৃসিংহ—(৭) জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত নৃসিংহ 'জাতক মঞ্জুরী' নামে একখানা জাতক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

নৃসিংহ—(৮) 'যোগার্ণব' নামক জাতক গ্রন্থ নৃসিংহ দৈবজ্ঞ বিরচিত।

নৃসিংহ—(৯) শিঙ্গন পুত্র নৃসিংহ স্থরী বেঙ্কটাদ্রি নামীয় 'গ্রন্থ তন্ত্র' নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

নৃসিংহ—(১০) নাবপ্রদীপ নামক গ্রন্থের গণেশ দৈবজ্ঞ কৃত টীকায় অনেক গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। এই জ্যোতির্ব্বিদ নৃসিংহের নামও তাহাতে দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাঁহার রচিত গ্রন্থ ও তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না।

নৃসিংহ—(১১) তিনি সদানন্দ যোগীন্দ্র প্রণীত 'বেদান্ত সারের' এক টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি 'বেদান্ত পরিভাষা' প্রণেতা ধর্ম্মরাজ ধ্বরীন্দ্রের গুরু ছিলেন।

নৃসিংহ ওঝা—তিনি ভাষা রামায়ণের গ্রন্থকার কৃত্তিবাস ওঝার পূর্ব্বপুরুষ। তিনি রাজা দনুজ মর্দ্দনের সভাসদ ছিলেন। তিনি বাঙ্গালার নবাব রুকর উদ্দিনের পূর্ব্ব বাঙ্গালা অধিকারের সময়ে (১৩৪৮ খ্রীঃ) পূর্ব্ব বাঙ্গালা পরিত্যাগপূর্ব্বক, গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পিতামহ উধো ওঝা, দনুজ মর্দ্দন ও দনুজ মাধব কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছিলেন।

নৃসিংহদেব— কর্ণাটক রাজবংশ মিথিলা দেশে ১১৫০—১৩২৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। মিথিলার রাজা নান্যদেব ৩৬ বৎসর রাজ্য পালন করিয়া ১১২৫ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র গঙ্গদেব রাজা হইয়াছিলেন। গঙ্গদেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র নৃসিংহদেব রাজা হইয়াছিলেন। নৃসিংহদেবের পরে রাম সিংহ, শক্তি সিংহ, ভূপতি সিংহ ও হরসিংহদেব রাজা হইয়াছিলেন। তৎপরে কর্ণাটক বংশীয়দিগকে পরাস্ত করিয়া কামেশ্বর বংশ রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

নৃসিংহদেব, রাজা—একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। 'পদসমুদ্রে' তাঁহার রচিত অনেক পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; তিনি মানভূমের অধিবাসী এবং জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। বাঁকুড়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। রাজা হাম্বির তাঁহাকে আদিবন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বিশেষ অন্তরঙ্গ এবং এক

গুরুর শিষ্যকেই আদিবক্তা বলা হয়। তোটক ছন্দেই তাঁহার অধিকাংশ পদ রচিত।

নৃসিংহদেব রায়—একজন সাহিত্যানুরাগী, সঙ্গীত রচয়িতা ও চিত্রকলা বিশারদ ব্যক্তি। ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দে বাঁশবেড়িয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার শূদ্রমণি বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহারাজ বল্লাল সেনের সমসাময়িক এবং বর্দ্ধমান পাটুলীর খ্যাতনামা দেবাদিত্য দত্তের অধস্তন ২১শ পুরুষ। তাঁহার অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের পিতা উদয় দত্ত সম্রাট আকবর কর্তৃক 'সভাপতি রায়' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উদয় দত্ত সভাপতি রায়ের প্রপৌত্র রামেশ্বর রায় সম্রাট আওরঙ্গজীবের নিকট হইতে জায়গীর এবং পুরুষানুক্রমে 'রায় মহাশয়' উপাধি লাভ করেন। তিনি পরে বাঁশবেড়িয়ার পূর্ব্বতন জমিদারী কাছারী সুদৃঢ় গড় বেষ্টিত করিয়া বাস করায় 'বাঁশবেড়িয়ার রায় মহাশয়' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহারই পুত্র রাজা রঘুদেব রায় বৈশযুদ্ধে মহারাষ্ট্রদিগকে পরাস্ত করিয়া নবাব মুরশিদ কুলি খাঁ কর্তৃক 'শূদ্রমণি' উপাধি প্রাপ্ত হন। রঘুদেব রায়ের পুত্র গোবিন্দ রায়। এই গোবিন্দ রায়েরই পুত্র নৃসিংহদেব রায়। গোবিন্দদেব রায় এদেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ বিঘা জমি দান করিয়াছিলেন।

নৃসিংহদেবের শৈশবকালেই অবস্থা বিপর্য্যয়ে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়া যায়। পরবর্ত্তী সময় তিনি তাঁহার কতক অংশ মাত্র পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হন এবং অবশিষ্ট সম্পত্তির পুনরুদ্ধারের জন্য অর্থ সংগ্রহের মানসে ১৭৯৭ খ্রীঃ অব্দে বারাণসীতে গমনপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে থাকেন। এইখানে কাশীখণ্ডের অনুবাদক জয়নারায়ণ ঘোষালের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। নৃসিংহদেবই জয়নারায়ণের কাশীখণ্ডের অনুবাদের বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তিনি এই গ্রন্থখানি ছন্দোবন্ধে রচনা করিয়া প্রচার করেন। নৃসিংহদেব প্রায় সাত বৎসরকাল কাশী বাস করিয়া সাত লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। কিন্তু কাশী থাকিয়া সর্ব্বদা জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনায় তাঁহার হৃদয় সরল হইয়া গিয়াছিল। তিনি আর মোকর্দ্দমাদির দ্বারা পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করিলেন না। সঞ্চিত অর্থ তিনি নানারূপ সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে লাগিলেন। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। সাহিত্যে ও চিত্রকলায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। দেবদেবী বিষয়ে তিনি বহু গান ও উড্ডীশতন্ত্রের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। ১৮০২ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

নৃসিংহ দৈবজ্ঞ—একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। ১৬২১ খ্রীঃ অব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

নৃসিংহ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য—তিনি জানকীনাথ শর্ম্মা বিরচিত 'ন্যায় সিদ্ধান্ত মঞ্জরী' গ্রন্থের 'ন্যায় সিদ্ধান্ত মঞ্জরীভূষা' নামে এক টীকা রচনা করেন। তিনি ১৬৭৫ খ্রীঃ অব্দে জীবিত ছিলেন।

নৃসিংহ রায়— অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের চন্দননগরের একজন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ও কবি সঙ্গীত রচয়িতা। ১৭৩৮ খ্রীঃ অব্দে চন্দননগরের ফরাসডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী গোন্দলপাড়া গ্রামে এক ভদ্র কায়স্থ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আনন্দীনাথ রায় ফরাসী সরকারের সামরিক বিভাগে কার্য্য করিতেন। নৃসিংহ প্রথমে স্থানীয় বিদ্যালয়ে এবং পরে মাতুলালয়ে থাকিয়া চুঁচুড়ায় মিশনারীদের বাঙ্গালা স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। পড়াশুনায় তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। সেইজন্য তাঁহার মাতুল তাঁহাকে পুনরায় চন্দননগরে প্রেরণ করেন। সেই সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অভিভাবকহীন হইয়া তিনি আরও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়েন। তৎপর তিনি 'দাঁড়াকবি' দলের সৃষ্টিকর্ত্তা সুবিখ্যাত কবিওয়ালা রঘুনাথের কবির দলে প্রবেশ করেন। কিছুকাল উক্ত দলে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাসু উভয়ে মিলিয়া একটী কবির দল সৃষ্টি করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই তাঁহারা বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। ১১৫৭ বঙ্গাব্দে তাঁহারা প্রথম কবির দল লইয়া কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক কোন এক ধনবান্ ব্যক্তির ভবনে গান করেন। দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তাঁহাদের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁহার সহায়তায় তাঁহারা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহাদের গান প্রধানতঃ বিরহ ও সখী সংবাদ এবং অনেক গানই সাত্ত্বিক ও ভক্তিভাবপূর্ণ ছিল। তাঁহাদের শ্রুতি মধুর গানে শ্লেষ এবং ব্যঙ্গোক্তিও ছিল; কিন্তু কোন অশ্লীলতা ছিল না। সুবিখ্যাত কবি লালু নন্দলাল তাঁহার সমকালীন ছিলেন। অনুমান ১৮০৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাসু এইরূপ সদ্ভাবে একত্রে গান রচনা করিতেন যে, গান ও সুর যোজনায় উভয়ের মধ্যে কে অধিক গুণসম্পন্ন ছিলেন তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই। গানের ভণিতায় উভয়ের যুগ্ম নাম দৃষ্ট হয়। রাসু, নৃসিংহ ও নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী এই তিনজন এক সময়ে চন্দনগরের প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন।

নৃসিংহ সরস্বতী—তিনি ১৫৯৬ খ্রীঃ অব্দে শঙ্কর মিত্র প্রণীত 'অভেদধিকার' নাম গ্রন্থের প্রত্যুত্তর স্বরূপ 'ভেদধিকার' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন।

নৃসিংহ সান্যাল—তিনি দামনাশের প্রসিদ্ধ বারেন্দ্র কুলীন কেশব সান্যাল শিরোমণির ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি একজন কৃতবিদ্য তেজস্বী যুবক ছিলেন। তিনি একটাকিয়ার জমিদার উপেন্দ্রনারায়ণ রায়ের কন্যা সর্ব্বমঙ্গলা দেবীকে বিবাহ করেন। উপেন্দ্রনারায়ণের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। সেজন্য তিনি জামাতাকে নিকটে রাখিয়া রাজকার্য্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল জামাতাকেই ভাবী উত্তরাধিকারী করিবেন। কিন্তু শেষে মত পরিবর্ত্তন হয়। তিনি রূপেন্দ্রনারায়ণ নামক এক বালককে পুষ্য গ্রহণ করেন। পরে নৃসিংহ এই রূপেন্দ্রনারায়ণের প্রধান অমাত্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী সর্ব্বমঙ্গলা নিঃসন্তান ছিলেন। নৃসিংহের মৃত্যু সময়ে তাঁহার অপরা পত্নী লক্ষ্মী দেবী সহমৃতা হইয়াছিলেন; লক্ষ্মীর গর্ভজাত সন্তানদেরে বিমাতা সর্ব্বমঙ্গলা প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

নৃহরি—একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার। "জাতক সার" নামে একখানা বিস্তৃত গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। সারাবলী, হোরা-প্রদীপ, জন্মপ্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্যে উহা লিখিত হইয়াছিল।

নেঙ্গাবাবা—এলাহাবাদ নিবাসী এক সাধু। তিনি পরমহংস নামেও খ্যাত ছিলেন। এলাহাবাদ দুর্গের নিম্নে একটী বটবৃক্ষ মূলেই প্রায় তিনি থাকিতেন। তিনি বলিতেন "শাস্ত্র সার পন্থা, ইহার যে কোনটা ধরিয়া চলিলেই হয়"। তিনি অতিশয় উদার প্রকৃতির সাধু ছিলেন।

নেট্টভঞ্জ—তিনি উড়িষ্যার ভঞ্জবংশীয় নরপতি। তিনি তাঁহার রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে, কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি বৃহস্পতিবারে, তাঁহার স্বর্গগতা মহিষী বাসটার কল্যাণ কামনায় যজুর্ব্বেদী রাজগণের চরণ শাখাধ্যায়ী কাণ্বপরাশর গোত্রীয় মাধব স্বামীকে একখণ্ড ভূমি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার বা তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদিগের সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। ভূমি-দান ৭০৪ খ্রীঃঅব্দে সম্পন্ন হইয়াছিল।

নেতজী—কবীর পন্থী একজন ভক্ত সাধু। তাঁহার রচিত অনেক বাণী দাদূ পন্থী ভক্তবাণী-সংগ্রহ গ্রন্থে পাওয়া যায়।

নেতজী পলকর—তিনি ছত্রপতি শিবাজীর একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। বিজাপুরের সেনাপতি আফজল খাঁর পরাভব ও নিধনের সময়ে তিনি শিবাজীর সঙ্গে ছিলেন। নেতজী যেমন বিশ্বস্ত তেমনই সাহসী ও বুদ্ধি-মান সেনাপতি ছিলেন। শায়েস্তা খাঁর পরাভবের সময়েও তিনি শিবাজীর অনুসঙ্গী ছিলেন। এই সকল বিশ্বস্ত অনুচরের সাহায্যে শিবাজী কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন।

নেত্রীভঞ্জ (প্রথম)—তিনি উড়িষ্যার ভঞ্জবংশীয় নরপতি প্রথম রণভঞ্জের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার প্রদত্ত তিনখানা ভূমিদান পত্র পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে শেষটী তাঁহার রাজত্বের চতুর্ব্বিংশ বৎসরে উৎকীর্ণ। তিনি রাজধানী ধৃতিপুর হইতে বিজয় ভঞ্জল্চকে স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার অনুজ দিগ্‌ভঞ্জ রাজা হন। (শত্রুভঞ্জ দেখ)।

নেত্রীভঞ্জ—(দ্বিতীয়) তিনি উড়িষ্যার ভঞ্জবংশীয় নরপতি বিদ্যাধর ভঞ্জের পুত্র ও দ্বিতীয় শীলভঞ্জের পৌত্র। তিনিই ভঞ্জবংশীয় এই শাখার শেষ নরপতি। তাঁহার মহিষীর নাম জয়া মহাদেবী। কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় ভট্ট পুরুষোত্তমকে প্রদত্ত একখানা গ্রামের দান পত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহাই নেত্রীভঞ্জের প্রদত্ত। ভট্ট বাপুক তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। (শত্রুভঞ্জ দেখ)।

নেডুমারণ পাণ্ড্য—দাক্ষিণাত্যের এই নরপতি জৈন ধর্ম্মের প্রভাবের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াও যৌবনে তীরুজ্ঞান সম্বন্ধর নামক এক শৈব সন্ন্যাসীর প্রভাবে শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং জৈনদের উপর ভীষণ অত্যাচার করেন। কথিত আছে তাঁহার অত্যাচারে আট হাজারেরও অধিক জৈন নিহত হয়।

নেপালচন্দ্র বসু রায়চৌধুরী—একজন জমিদার। ১২৭২ বঙ্গাব্দের (১৮৬৫ খ্রীঃ মার্চ্চ) ফাল্গুন মাসে তিনি খুলনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় দানশীল, অমায়িক ও স্বদেশ প্রিয় লোক ছিলেন। তিনি প্রজাবর্গকে নিজ সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিতেন। তিনি খুলনা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন এবং মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যের জন্য বহু জমি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নামে তিনি একটি পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি তদানীন্তনকালের প্রথম বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতার স্মৃতিরক্ষাকল্পে বি, কে, স্কুল নামে একটী মধ্যইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। ১৯১১ সালে উহাকে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত করেন। ঐ সময় খুলনায় আরও একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা অনুমোদিত হইতে বাধা হয়। অতঃপর ১৯১২ সালে এই দুইটি স্কুল একত্র মিলিত হইলে বি-কে ইউনিয়ন ইনষ্টিটিউশন নাম হয়। তিনি স্বদেশীর সেবক ছিলেন এবং কংগ্রেসকে সর্ব্ববিষয় সাহায্য করিতেন। দেশে লোকের সুবিধার জন্য তিনি ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘোরনাথ রায় চৌধুরী ১৮৯৫ সালে খুলনায় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র "খুলনা প্রেস" স্থাপন করেন।

স্থানীয় কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের বালিয়াখামার তিনি আরম্ভ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সভাপতি ছিলেন। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ৩রা পৌষ (১৯৩৮ খ্রীঃ অব্দে ১৯শে ডিসেম্বর) তিনি পরলোক গমন করেন।

নেপিয়ার, সার চার্লস জেমস (Sir Charles James Napier)—১৭৮২ খ্রীঃ অব্দের ১০ই আগষ্ট ইংলণ্ডে তাঁহার জন্ম হয়। ১৭৯৪ সালে সৈন্য দলে প্রবেশ করেন। তিনি ১৭৯৯ সালে সার জেমস ডাফের শরীর রক্ষী সৈন্য ছিলেন। ১৮০৮ সালের স্পেনের যুদ্ধে তিনি বন্দী হইয়াছিলেন। ১৮৪১ সালে তিনি ভারতে আগমন করেন। তখন লর্ড অকলাণ্ড বড়লাট ছিলেন। তাঁহার সময়েই আফগানিস্থানে ইংরেজদের বিশেষ পরাজয় হয়। ১৮৪২ সালে অকলাণ্ড চলিয়া গেলেন এবং লর্ড এলেনবরা তাঁহার স্থানে বড়লাট হইলেন। তিনি এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময়ে সিন্ধুদেশের আমীরেরা গোপনে আফগানদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন বলিয়া সেনাপতি আউটরাম বড়লাটের নিকট অভিযোগ করিলেন। বড়লাট সেনাপতি নেপিয়ারকে তদন্তের জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু এখানে বলা আবশ্যক যে ১৮০৯ সালে লর্ড মিণ্টো আমীরদের সহিত চিরস্থায়ী মিত্রতামূলক সন্ধি করেন। ১৮২০ সালে সেই সন্ধি আবার নূতন করিয়া করা হইয়াছিল। আফগানদের সহিত যুদ্ধকালে ইংরেজরাই সন্ধির কোন কোন নিয়ম ভঙ্গ করেন এবং সিন্ধুদেশের কোন কোন স্থান অধিকার করেন। কেবল তাহাই নহে তাঁহাদের নিকট হইতে বহু টাকাও আদায় করা হইল। ১৮৩৯ সালে আমীরদেরে অধীনতামূলক মিত্রতার সন্ধিতে আবদ্ধ হইতে বাধ্য করা হইল। এখানেই ইহার শেষ হইল না। আফগান যুদ্ধের অবসানে আউটরাম আমীরদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন। এই তদন্তের ফলে আমীরেরা দোষী সাব্যস্ত হইয়া রাজ্যহারা হন এবং সিন্ধুদেশ ইংরেজ রাজ্য ভুক্ত হয়। সেনাপতি নেপিয়ার তাহার প্রথম শাসনকর্ত্তা হইলেন। তিনি ইং ১৮৪৪ হইতে ১৮৪৭ সাল পর্য্যন্ত সিন্ধুদেশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। শিখদের সহিত চিলিনওয়ালা যুদ্ধের পর সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটন তাঁহাকে প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করিতে বলেন। কিন্তু বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ প্রথম আপত্তি করিয়াছিলেন, পরে সম্মত হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৪৯ হইতে ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতের বড়লাট ছিলেন। এই সময়ে দেশীয় সৈন্যদের ক্ষতিপূরণ আইন সম্বন্ধে বড়লাট লর্ড ডালহৌসীর সহিত

মতের অনৈক্য হওয়ায় তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশে চলিয়া যান। ১৮৫৩ সালের ২৯শে আগষ্ট তিনি পরলোক গমন করেন। সেন্টপল গীর্জায় তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আছে।

নেপিয়ার, রবার্ট কর্ণেলিস (Robert Carneles Napier of Magdala and Carington)—তাঁহার পিতার নাম চার্লস ফ্রেডারিক নেপিয়ার। ১৮১০ সালের ৬ই ডিসেম্বর সিংহল দ্বীপে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গদেশে ইন্‌জিনিয়ার হইয়া আগমন করেন। ১৮৩১ সালে পূর্ব্ব যমুনা খাল খনন কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮৩৬—১৮৩৯ সাল পর্য্যন্ত ইউরোপে অবস্থান করিয়া তিনি ইন্‌জিনিয়ারিং ও রেলের কার্য্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তৎপরে এদেশে আসিয়া প্রথমেই দারজিলিং সহরের পত্তন করেন। তৎপরে ১৮৪২ সালে তিনি আম্বালা সেনানিবাসের পত্তন করেন। ১৮৪৫—৪৬ সালে তিনি শিখ যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। মুদকি ও ফিরোজপুরের যুদ্ধে তিনি আহত হন। ১৮৪৬ সালে তিনি কাঙরা উপত্যকা যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। পূর্ত্তকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি অনেক খাল খনন এবং রাস্তা ও বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সীমান্ত প্রদেশের যুদ্ধেও তিনি অনেকবার যোগ দিয়াছিলেন। ১৮৫৮ সালে লক্ষ্ণৌ নগর পুনরধিকার করিবার সময়েও তিনি ছিলেন এবং তাঁতিয়া টোপিকে তিনি পরাস্ত করেন। মধ্যপ্রদেশের বিদ্রোহ দমনে তিনি বিশেষ কৃতকার্য্যতার পরিচয় দেন। ১৮৬১ সালে প্রধান যুদ্ধ সভার সদস্য হইয়াছিলেন। ১৮৬৩ সালে তিনি কিছুদিন অস্থায়ী বড়লাটও হইয়াছিলেন। ১৮৬৫—১৮৬৯ সালে তিনি বোম্বাই লাটের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ১৮৭০—১৮৭৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ১৮৭৬ সালে ভারত পরিত্যাগ করিয়া আরও নানা কাজে লিপ্ত ছিলেন। ১৮৯০ সালের ১৪ই জানুয়ারী তিনি পরলোক গমন করেন।

নেমি চন্দ্র কবি—তাঁহার জন্মস্থান গুজরাট প্রদেশ। তিনি একজন বড় দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ভৈরব স্বামীর ছাত্র ছিলেন। আবার তাঁহার শিষ্য সাগরেন্দু মুনি ছিলেন। তিনি খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

নেমিচন্দ্র, রাজা—তিনি অপারন্তক দেশের রাজা ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীঃ তৃতীয় শতকে বর্ত্তমান ছিলেন। লামা তারানাথের মতে নাগার্জ্জুন রাজা নেমিচন্দ্রের সমসাময়িক।

নেমিদত্ত— একজন জৈন দার্শনিক পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। ১৫২৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি জৈনদর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

নেমিনাথ—তিনি দ্বাবিংশ জৈন-তীর্থঙ্কর। সৌরীপুরের রাজা সমুদ্র-বিজয়ের মহিষীর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি গুজরাটের অন্তর্গত গিরনার পর্ব্বতে মোক্ষলাভ করেন।

নেহাং খাঁ—তিনি একজন আবি-সিনিয়াবাসী সেনানী। ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে আসিয়া আহম্মদনগর রাজ-সরকারের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ষোড়শ খ্রীঃ শকের শেষভাগে আহম্মদ নগরের গৃহবিবাদের সুযোগে, তিনি আহম্মদনগরের সিংহাসনলাভের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

নেহাল সিংহ—কর্পূরতলার শিখ রাজা। ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে তিনি পর-লোক গমন করেন। একদান পত্র দ্বারা তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র রণধীর সিংহকে সিংহাসন ও অপর কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় বিক্রম সিংহ ও সুবেত সিংহকে এক এক লক্ষ টাকার জায়গীর প্রদান করিয়া, ভারত সরকারকে তাঁহাদের অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া যান। সেই অনুসারে জ্যেষ্ঠ রণধীর সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং যুবেত সিংহ এক লক্ষ টাকার জায়গীর পৃথক করিয়া লইলেন। বিক্রম সিংহ ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ইংরেজ সরকারের সহায়তা করিয়া অযোধ্যা প্রদেশে এক জায়গীর ও উপাধি প্রাপ্ত হন।

নোনক—কাশ্মীরেশ্বর উৎকর্ষ রাজের একজন মন্ত্রী। তিনি উৎকর্ষরাজের কারারুদ্ধ জ্যেষ্ঠ সহোদর হর্ষদেবকে বিনাশ করিবার জন্য উৎকর্ষ রাজকেই পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু উৎকর্ষ-রাজ তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন নাই। পরে হর্ষদেব রাজা হইয়া প্রথমে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন এবং পরে শূলে নিহত করেন।

নোয়াজিস মোহাম্মদ—তাঁহার পূর্ব্ব নাম মোহাম্মদ রেজা খাঁ ছিল। বঙ্গের নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজী আহাম্মদের নোয়াজিস মোহাম্মদ, সৈয়দ আহাম্মদ ও জৈন উদ্দিন নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা আপন পিতৃব্য আলীবর্দ্দী খাঁর তিন কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নোয়াজিস মোহাম্মদ বাঙ্গালার নবাব সুজাউদ্দিনের সময়ে প্রধান বেতনদাতার পদ পাইয়া-ছিলেন। স্বীয় শ্বশুর আলীবর্দ্দী খাঁর সময়ে তিনি মেয়মত জঙ্গ উপাধি পাইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঢাকার শাসনকর্ত্তার পদও প্রাপ্ত হন। তিনি আলীবর্দ্দী খাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘেসেটী বেগমকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার কোন পুত্র কন্যা ছিল না। তিনি অতিশয় দানশীল ব্যক্তি ছিলেন।

প

পওহারী বাবা—জৌনপুরের একজন বিখ্যাত সাধু। ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে জৌনপুর জেলার প্রেমারপুর (গুজি) নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম অযোধ্যা তেওয়ারী। তাঁহার পিতামাতা উভয়ই অতিশয় ধর্ম্মানুরাগী, নিষ্ঠাবান ও পবিত্র চরিত্রের লোক ছিলেন। লছমীনারায়ণ নামে অযোধ্যা তেওয়ারীর এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন; কিন্তু তিনি সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচারী হইয়া গাজীপুর জেলার কুর্থা নামক স্থানে ভাগীরথীর তীরে একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া সাধন ভজন ও যোগাভ্যাসে নিমগ্ন থাকিতেন।

পওহারী বাবার এক অগ্রজ ও এক অনুজ ভ্রাতা ছিলেন। জন্মের পর তাঁহার পিতা তাঁহার নাম রামভজন দাস রাখিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি শান্তস্বভাব ও মধুর প্রকৃতির ছিলেন, অন্যান্য বালকদিগের সহিত কখনও বিবাদ কিম্বা মনোমালিন্য করিতেন না। পুত্রের এরূপ সুন্দরভাব দেখিয়া পিতামাতা তাঁহাকে শুক্রাচার্য্য বলিয়া ডাকিতেন। শৈশবাবস্থায়ই তিনি একবার কঠিন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং এই আক্রমণের ফলে তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুটি নষ্ট হইয়া যায়।

পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত লছমীনারায়ণ কুর্থা আশ্রমে অসুস্থ হইয়া পড়িলে দশম বৎসর বয়সে জ্যেষ্ঠতাতের সেবাশুশ্রূষা করিবার জন্য কুর্থা আশ্রমে গমন করেন। সেইখানে নির্জ্জন আশ্রমেই ও ভাগীরথী তীরে বাস এবং জ্যেষ্ঠতাতের সাহচর্য্য লাভে তাঁহার অন্তরে বৈরাগ্যের ভাব অঙ্কুরিত হয়।

তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত তাঁহাকে অতিশয় যত্ন ও স্নেহ করিতেন। এই সময় তিনি তাঁহার শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করিয়া দেন। গাজীপুরের তিনজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও একজন পরমহংসের নিকট শুক্রাচার্য্য উত্তমরূপে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ছয় বৎসরকাল শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত লছমীনারায়ণ পরলোক গমন করেন। তৎপর তিনি জ্যেষ্ঠতাতের একজন মন্ত্র শিষ্যের সহিত আশ্রমে বাস এবং জ্যেষ্ঠতাত প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর পূজা অর্চ্চনা ও শাস্ত্রাদি পাঠে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে তিনি শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। অর্দ্ধাহারে, অনাহারে, নির্জ্জনে, নদীতীরে দিবারাত্র কাটাইতে লাগিলেন। ষোল বৎসর বয়সের সময় তিনি আশ্রমের

সমস্ত ভার জ্যেষ্ঠতাতের মন্ত্র শিষ্যের উপর অর্পণ করিয়া তীর্থ ভ্রমণের জন্য নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন। প্রায় দুই বৎসরকাল তিনি ভারতের নানা তীর্থ ভ্রমণপূর্ব্বক বহু জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া পুনরায় কুর্থা আশ্রমে আগমন করেন। তীর্থ ভ্রমণকালে তিনি গিরণার পাহাড়ে গমন করেন এবং সেখানে এক মহাপুরুষের দর্শন পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে যোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি আশ্রমে আগমনের পর দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে উপদেশাদি গ্রহণ করিতে লাগিল। এইবার তিনি অনাহার ত্যাগ করিয়া অশ্বথ, আমলকী, বিল্বপত্র প্রভৃতি বাটিয়া তাহার রস ও অল্প দুগ্ধ পান করিতেন। তখন হইতে জনসাধারণ তাঁহাকে পওহারী (পবন আহারী) নামে অভিহিত করিতে লাগিল। কয়েক মাস পর তিনি এই বৃক্ষপত্র রস পান ত্যাগ করিয়া প্রতিদিন বড় বড় পঞ্চাশটি লঙ্কা বাটিয়া এক ঘটী জল সহ পান করিতেন। তাহার দীর্ঘ কেশ ও শ্মশ্রু ছিল, কিন্তু তিনি সাধারণ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণের ন্যায় অঙ্গে ভস্ম বা ধূলী লেপন এবং মস্তকে জটা রাখিতেন না। তিনি শুদ্ধ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভাল বাসিতেন। তিনি আশ্রমের মধ্যে গুহা নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে যোগে নিমগ্ন থাকিতেন। সেই সময় তিনি পান আহার, পূজা অর্চ্চনা ত্যাগ করিতেন এবং কুটীরের দ্বারও বন্ধ থাকিত। প্রতি একাদশী ও রামনবমী তিথিতে কুটীরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সর্ব্বসাধারণকে দর্শন দিতেন। তৎপরে প্রায় পনর বৎসর কুটীরের দ্বার আর উন্মুক্তই করিতেন না। ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে একবার তিনি দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহির হন এবং এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই উৎসবে ভারতের প্রায় সকল তীর্থ হইতে সাধু মহাত্মাগণ আগমন করিয়াছিলেন। ইহার পরে চিরতরে দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন, আর কখনও উন্মুক্ত করেন নাই। কিন্তু কখনও কখনও রুদ্ধদ্বার কুটীরে বসিয়া সদালাপ করিতেন। ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দের ২০শে মে শুক্রবার এই সিদ্ধ মহাপুরুষ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুও একটী অদ্ভুত ঘটনা। উক্ত তারিখ প্রত্যুষে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং আরও কয়েকজন গ্রাম্য লোক আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন, হঠাৎ তাঁহারা আশ্রমের দ্বিতল কুটীরের ছাদ হইতে অল্প অল্প ধূম নির্গত হইতেছে দেখিলেন, কিন্তু হোমের ধূম মনে করিয়া তাঁহারা নিস্তব্ধ রহিলেন। অল্পক্ষণ পরে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, সমস্ত ছাদ হইতে মেঘের ন্যায় গাঢ় ধূমরাশি বাহির হইতেছে, তখন তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইয়া বাহির হইতে পওহারী বাবাকে চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন

সাড়া পাইলেন না। ক্রমে সমস্ত ছাদ জ্বলিয়া উঠিল, তখন একজন লোক আশ্রমের একদিকের ছাদে উঠিয়া দেখিল যে, চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বলিতেছে। পওহারী বাবা তাঁহার পূজার ঘরের সম্মুখে কমণ্ডলু হস্তে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দাড়াইয়া আছেন। লোকটি এই দৃশ্য দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। তখন পওহারী বাবা শান্তভাবে জ্বলন্ত অগ্নি মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক গৃহের প্রান্ত-ভাগে হোমকুণ্ডের নিকট পদ্মাসনে বসিয়া যোগে নিমগ্ন হইলেন এবং অল্প-ক্ষণের মধ্যেই জ্বলন্ত অগ্নি তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় দেহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। যেখানে তিনি বসিয়া দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন। সেইস্থানে তাঁহার সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

পঙ্কজকুমারী দেবী—একজন মহিলা কবি। তাঁহার রচিত অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে। ১৩০৫ বাঙ্গাব্দে ষোল বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

পক্ষধর মিশ্র—খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর মিথিলার একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। তাঁহার প্রকৃত নাম জয়ধর মিশ্র তর্কালঙ্কার। তিনি কোনও কথা একবার মাত্র শ্রবণ করিয়া পুন-র্ব্বার আলোচনা ব্যতীত একপক্ষ কাল স্মরণ রাখিতে পারিতেন এবং যে কোনও শাস্ত্রীয় বিচার একপক্ষ কাল যাবৎ করিতেন ও পূর্ব্ব বা উত্তর যে পক্ষেই থাকিতেন, তাহা কখন স্খলিত হইতনা বলিয়া পক্ষধর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি হরিহর মিশ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ও যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের ছাত্র ছিলেন। বহুদূর দেশ হইতে পক্ষধর মিশ্রের নিকট বহু ছাত্র পাঠার্থ আগ-মন করিত। সেই সময় অধিকাংশ ছাত্রই ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য মিথিলায় গমন করিত, কারণ ন্যায়শাস্ত্র ও তৎসংক্রান্ত গ্রন্থাদি তখন মিথিলা ব্যতীত অন্যত্র পাওয়া যাইত না। মিথিলার পণ্ডিতগণ তাঁহাদের মূল্যবান্ গ্রন্থগুলি অতি সংগোপনে ও যত্নে রক্ষা করিতেন। ভিন্ন দেশের ছাত্রগণ যখন তাহাদের পাঠ সমাপনান্তে নিজ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, তখন যাহাতে তাহারা গোপনে কোন গ্রন্থ সঙ্গে না নিতে পারে পণ্ডিতগণ তৎ-প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। এইভাবে মৈথিলি অধ্যাপকগণ বহুকাল তাঁহাদের প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার জন্য ভিন্ন দেশের ছাত্রদের মিথিলায় গমন ব্যতীত উপায় ছিল না। বিশেষতঃ মৈথিলি অধ্যাপক ব্যতীত অপর কাহারও উপাধি দানের ক্ষমতা ছিল না। নবদ্বীপের সুবিখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম

মিথিলায় গমন করিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে সমুদয় ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপর তিনি নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ন্যায়-শাস্ত্র শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন (খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দী) এই বাসুদেব সার্ব্ব-ভৌম মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের চতুষ্পা-ঠীতেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তাহারই নিকট 'শলাকা পরীক্ষায়' উত্তীর্ণ হইয়া সার্ব্বভৌম এই সম্মানিত উপাধি ভূষিত হইয়াছিলেন।

পক্ষিল স্বামী বা বাৎস্যায়ন--তিনি ন্যায়সূত্রের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ভাষ্য-কার। সম্ভবত তিনি খ্রীঃ তৃতীয় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। অভিধান চিন্তামণি গ্রন্থে হেমচন্দ্র স্থূরী, বাৎ-স্যায়ন, মল্লনাথ, কৌটিল্য, চাণক্য, দ্রামিড়, পক্ষিল স্বামী ও বিষ্ণু গুপ্ত' এই কয়টী নাম একই ব্যক্তির বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পঞ্চশিখ--কপিলের শিষ্য আসুরিও তৎপত্নী কাপিলা একটী বালককে শিষ্য-রূপে পাইয়া তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। সেই বালকই পরে পঞ্চশিখ নামে খ্যাত হয়। দ্বাবিংশতি সূত্রাত্মক তত্ত্বমাস গ্রন্থ হইতে তিনি 'ষষ্টিতন্ত্র' প্রণয়ন করেন।

পঞ্চানন (ব্রজমোহন দাস)— সেরপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ঘোষালচন্দ্র দাস। তিনি বহু পদাবলী ও সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিত বলিয়াও বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়া-ছিলেন।

পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ, অধ্যাপক—হুগলী জিলার অন্তর্গত ইলিপুর গ্রামে ১৩০২ সালে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা কেদারনাথ গঙ্গো-পাধ্যায় মহাশয় স্মৃতি শাস্ত্রের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। পুরুষানুক্রমে তাঁহাদের বাড়ীতে চতুষ্পাঠী ছিল। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অদম্য বিদ্যা-নুরাগের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। শিয়াখলা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণী হইতে সর্ব্বদা প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ১৯১২ খ্রীঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পনর টাকার বৃত্তি লাভ করেন। প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে কাশীর ধর্ম্ম রক্ষিণী সভার পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার ও মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। মাতা পুত্র কন্যাদের লইয়া অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়েন। বিংশতি বর্ষ বয়স্ক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তুলসীচরণ অতি কষ্টে সংসার ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার পঞ্চাননের পড়ার খরচ চালাইতে লাগিলেন। এই কষ্টে পড়িয়াও পঞ্চাননের বিদ্যানুরাগ কিছু-

মাত্র শিথিলপ্রাপ্ত হয় নাই। তিনি ১৯১৬ সালে বি, এ, পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১৯ সালে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এম, এ, পাশ করিবার পূর্ব্বেই ১৮১৮ সালে বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। গুণগ্রাহী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার এম,-এ, পরীক্ষার ফল দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ প্রদান করেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, তেমনি বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের প্রভূত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বাল-সুলভ সরলতা ও নিরহঙ্কার তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। স্বীয় জন্মস্থানের ম্যালেরিয়া দূরীকরণে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে ১৯৩৯ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়—একজন নাট্যকার ও সংবাদপত্রের সেবক। 'প্রেম নাটক', 'রমণী নাটক', নামক নাটক এবং 'রসিক তরঙ্গিনী' ও 'রস তরঙ্গিনী' নামক গল্প পুস্তক তাঁহার রচিত 'অরুণোদয়' নামক একখানি সংবাদপত্রও তাঁহার সম্পাদকতায় বাহির হইত।

পটল—এই ব্যক্তি, আহমপাত চন্দ্রকান্ত সিংহের সময়ে (১৮১০ খ্রীঃ—১৮১৮ খ্রীঃ) বর্ম্ম সেনাপতি কর্ত্তৃক বড় বড়ুয়ার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যে বর্ম্ম সেনাপতির বিরাগ ভাজন হইয়া নিহত হন।

পটচারা—একজন প্রাচীন কালের বৌদ্ধ ভিক্ষুণী। তিনি অতিশয় বিদূষী ছিলেন। তিনি সমস্ত বিনয় পিটক আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

পট্টাভিরাম— অন্নম ভট্ট বিরচিত তর্ক সংগ্রহের উপর এক ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত বৈদ্য—একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত। তিনি শ্রীপতি ভট্টকৃত জ্যোতিষ রত্নমালার টীকা রচনা করিয়াছেন।

পতঞ্জলি—(১) তিনি যোগ শাস্ত্র প্রণেতা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'পাতঞ্জল দর্শন'। সম্ভবত তিনি খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দিতে বর্ত্তমান ছিলেন।

পতঞ্জলি—(২) তিনি পাণিনির মহাভাষ্যকার। তাঁহার জন্মস্থান গোণ্ডা নগর। তিনি খ্রীঃ পূঃ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন। মৌর্য্যবংশীয় শেষ নরপতি বৃহদ্রথের তিনি সেনাপতি ছিলেন। পরে পুষ্য মিত্র ১৮৫ খ্রীঃ পূর্ব্ব অব্দে বৃহদ্রথকে বিনাশ করিয়া পাটলীপুত্র নগরের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ব্যাকরণ শাস্ত্রে মহাভাষ্যের ন্যায় এইরূপ বিচারমূলক গ্রন্থ দুর্লভ। ইহাকে ব্যাকরণের ব্যাকরণ বলা যায়।

পতঞ্জলি—(৩) তিনি একজন বৈদ্যক গ্রন্থকার। তাঁহার বিষয় আর কিছু জানা যায় না।

পতিক—তিনি পঞ্জাবের কুষানবংশীয় নরপতিদের অধানস্থ একজন ক্ষপ নরপতি। তিনি খ্রীঃ দ্বিতীয় শকে বর্ত্তমান ছিলেন।

পতিতপাবন সিংহ—তিনি কলিকাতার জান বাজারের সুপ্রসিদ্ধা রাণী রাসমণি ও রাজচন্দ্র মাড়ের দেওয়ান ছিলেন। তিনি চরিত্রবান্, সত্যনিষ্ঠ, ও ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। রাজচন্দ্র মাড়ের মৃত্যুর পরে তাঁহার হস্তে নগদ লক্ষাধিক টাকার নোট ছিল। এই টাকার বিষয় কেহই জানিত না। ইচ্ছা করিলে তিনি ইহা আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। কিন্তু ধর্ম্মভীরু পতিত পাবন কল্পনাতেও মনে ইহা স্থান দেন নাই। তিনি সমস্ত টাকা রাণী রাসমণির হস্তে প্রদান করেন। রাণী তাঁহার সত্যনিষ্ঠায় প্রীত হইয়া, তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে বহু লোক তাঁহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেন।

পত্ত—যোধপুরের অধিপতি রণমল্লের অন্যতম পুত্র। রণমল্ল চতুর্ব্বিংশতি পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই একটী রাজ্য ভূমি বৃত্তি পাইয়া সামন্ত নরপতি হইয়াছিলেন। পত্তের বংশধরেরা পত্তাবৎ নামে খ্যাত। কর্ণিচারি, বারো ও দেশনথ তাঁহার ভূমি বৃত্তি ছিল। পত্তের বংশধরেরা খুব সাহসী ও রণনিপুণ ছিল।

পতিনাত্তু পিল্লে—তিনি মধ্যযুগের দাক্ষিণাত্য বাসী একজন সাধক। হাতে গড়া পাষাণে বা তেঁতুলে মাজা তাম্র মূর্ত্তিতে ঈশ্বর নাই। ইহাই ছিল তাঁহার মত।

পত্তিরা গিরিয়ার—তিনি দাক্ষিনাত্যের একজন উচ্চদরের সাধক। তিনি বলিতেন লিখিত শাস্ত্রে কি ঈশ্বরানুভব হয়। অর্থাৎ বিনা সাধনায় কেবল শাস্ত্র পাঠে কিছুই হয় না। তিনি খ্রীঃ দশম শতকে বর্ত্তমান ছিলেন।

পত্রদাস, রায়—পত্রদাস ক্ষেত্রী বংশ সম্ভূত ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ আকবর শাহের হস্তী শালার সুমার নবিসের কার্য্য করিতেন। এই কার্য্যে দক্ষতা প্রদর্শন করিলে, আকবর শাহ তাঁহাকে 'রায় রায়ান' উপাধি দেন। চিতোর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি তরবারি ধারণ করেন এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশিত হয়। চিতোর হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি বঙ্গদেশের রাজস্ব মন্ত্রীর পদ (দেওয়ানী) প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি বিহার, কাবুল, প্রভৃতি নানা সুবার দেওয়ানী করেন। আকবর শাহ বীর সিংহকে ধৃত করিয়া আনয়ন করিবার জন্য পত্রদাসকে প্রেরণ করেন। পত্রদাস

তাঁহাকে নানা খণ্ড যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং বহুস্থানে অনুসরণ করেন, কিন্তু ধৃত করিতে অসমর্থ হন। পত্রদাস প্রথমতঃ সাত শতী সেনাপতি ছিলেন। তারপর ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া পাঁচ হাজারী সৈন্যাপত্য এবং রাজা বিক্রমজিৎ উপাধি প্রাপ্ত হন।

পদ্মপ্রভা—তিনি নেপালরাজ অনন্ত-কীর্ত্তির পুত্র। অতীশদীপঙ্কর তিব্বত যাত্রাকালে তাহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। পরে তিনি ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পদারৎ—রাঠোরবংশীয় নয়নপালের পুত্র পদারৎ। পদারতের পুত্র পুঞ্জ। এই পদারতের পুত্রপুঞ্জ হইতে রাঠোর বংশ ত্রয়োদশ শাখায় বিভক্ত হয়।

পদুমা—দীপবংশ পাঠে জানা যে, সুমনা, পদুমা প্রভৃতি বিদুষী ভিক্ষুণীগণ বিনয় পিটক হইতে শিক্ষা দান করিতেন।

পদ্ম—(১) পুঞ্জের পুত্র এবং পদারতের পৌত্র। যদুবংশীয় রাজা তেজোমানের হস্ত হইতে ইনি বোগিলান জয় করেন। উড়িষ্যাও ইহার বিক্রম প্রভাবে জিত হইয়াছিল।

পদ্ম—(২) কাশ্মীরপতি ললিতাপীড়ের পুত্র শ্রীচিপ্পট জয়াপীড় অতি বাল্যকালেই রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। এই সুযোগে উৎপালক, পদ্ম প্রভৃতি মাতুলেরা রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করেন। এমন কি অবশেষে শ্রীচিপ্পটকে হত্যাও করিয়াছিলেন। কিন্তু ভ্রাতাদের মধ্যে পরস্পর প্রণয় না থাকায় তাঁহারাও পরে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পদ্ম স্বীয় নামে পদ্মপুর নামে একটী গ্রাম এবং পদ্মস্বামী নামে এক শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী গুণাদেবীও কয়েকটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

পদ্ম গুপ্ত—'নবশশাঙ্ক চরিত' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত। তিনি খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

পদ্মনন্দী—জৈন ধর্ম্মাচার্য্য ও গ্রন্থকার। তিনি খ্রীঃ প্রথম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি দিগম্বর সম্প্রদায়ের দ্রবিড় শাখার অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কুন্দকুন্দ, বক্রগ্রীব, এলাচার্য্য, গৃধ্রপিচ্ছ প্রভৃতি নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর একটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তিনি নিজেও একটি শাখা সম্প্রদায় সংগঠন করেন তিনি প্রাকৃত ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন।

পদ্মনাভ—(১) তিনি একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার। তাঁহার রচিত বীজগণিত হইতে ভাস্করাচার্য্য সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বীজগণিত এখনও আবিষ্কৃত হন নাই।

পদ্মনাভ—(২) এক পদ্মনাভ [illegible] 'যোগাবলী' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

পদ্মনাভ—(৩) যমুনাপুর নিবাসী কৃষ্ণদাসের পুত্র পদ্মনাভ "ব্যবহার প্রদীপ" নামক একখানা জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি ১১৫০ খ্রীঃ অব্দের (১০৭২ শকে) পরে প্রাদুর্ভূত হন।

পদ্মনাভ—(৪) ১৫২১ শকের পূর্ব্বে এই পদ্মনাভ 'জ্ঞান প্রদীপ বা দীপিকা' নামে ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে এক গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

পদ্মনাভ—(৫) দামোদর নামে একজন জ্যোতির্ব্বিদ ১৪১৭ খ্রীঃ অব্দে (১৩৩৯ শকে) 'ভটতূল্য' নামে একখানা করণ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই দামোদরের পিতা পদ্মনাভ ১৩২০ শকে 'মন্ত্র রত্নাবলী', নামে এক টীকা গ্রন্থ লিখিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এই পদ্মনাভের পিতার নাম নার্ম্মদ। তিনিও জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন।

পদ্মনাভ—(৬) 'প্রশ্নার্থ' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

পদ্মনাভ—(৭) তাঁহার রচিত একখানা বীজগণিত আছে।

পদ্মনাভ—(৮) 'মেঘানয়ন' বা বর্ষাগণনা নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

পদ্মনাভ—(৯) একজন গুজরাটী কবি। খ্রীঃ পঞ্চদশ শতকে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। 'কানহডদে প্রবন্ধ' কাব্য তাঁহারই রচিত।

পদ্মনাভ—(১০) 'দম্পাক' নামক কেরলজাত গ্রন্থ এক পদ্মনাভের রচিত।

পদ্মনাভ দত্ত—বঙ্গের অধিপতি লক্ষ্মণ সেনের ধর্ম্মাধিকারী ও ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বাদি গ্রন্থ প্রণেতা প্রসিদ্ধ হলায়ুধের তিনি বংশধর। তাঁহার পিতার নাম দামোদর দত্ত। পদ্মনাভ মিথিলাবাসী ছিলেন। সুপদ্ম ব্যাকরণ তাঁহারই রচিত। তিনি চতুর্দ্দশ খ্রীঃ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

পদ্মনাভ মিশ্র—(১) তিনি একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত। 'অর্ঘ প্রদীপ' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

পদ্মনাভ মিশ্র (কর্ণ খাঁ)—শ্রীহট্টের অন্তর্গত বানিয়াচঙ্গ রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কেশব মিশ্রের বংশধর কল্যাণ মিশ্রের পুত্র বাঞ্ছধর ও পদ্মনাভ (কর্ণ খাঁ)। এই পদ্মনাভ একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। তাঁহার দ্বারা বানিয়াচঙ্গের বিশেষ উন্নতি হয়। তথাকার সুবৃহৎ সাগর দীঘা তাঁহার দ্বারা খনিত। তিনি বিদ্যোৎসাহী, দাতা ও প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলেন। নানাস্থান হইতে বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে আনয়নপূর্ব্বক তিনি বানিয়াচঙ্গে স্থাপন করেন। তন্মধ্যে ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালি পাড়ার শ্রীকৃষ্ণ তর্কলঙ্কার অন্যতম। এই পদ্মনাভের একাদশ পুত্রের মধ্যে গোবিন্দ খাঁ বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। গোবিন্দ খাঁ মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তখন তাঁহার নাম হয় হবিব খাঁ। তিনি বানিয়াচঙ্গের প্রথম মুসলমান রাজা।

পদ্মপাদ আচার্য্য—তিনি শঙ্করাচার্য্যের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব নাম সনন্দন ছিল। তিনি ঋগ্বেদীয় কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মাধব ছিল। প্রসিদ্ধ পঞ্চ 'পাদিকা' গ্রন্থ তাঁহার রচিত। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহাকে পুরীর গোবর্দ্ধন মঠের অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পদ্মপাদ গোবর্দ্ধন মঠে অবস্থানকালেই পঞ্চপাদিকা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

পদ্মপ্রভ তীর্থঙ্কর—তাঁহার পিতা ধর কৌশাম্বীর রাজা ছিলেন। তিনি সমেত শিখরে অর্থাৎ পার্শ্বনাথ পর্ব্বতে নির্ব্বাণ লাভ করেন।

পদ্মপ্রভ পুরী—তিনি ১৫০৯ শকের (১৫৮৭ খ্রীঃ) পূর্ব্বে 'ভুবন দীপক বা গ্রহভাব প্রকাশ' নামক একখানা জাতক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

পদ্মবজ্র—(১)একজন বৌদ্ধ তন্ত্রাচার্য্য। তিনি ইন্দ্রভূতির সমসাময়িক ছিলেন। সন্ধ্যা-ভাষায় 'গুহ্য সিদ্ধি' নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উহাতে বজ্রযানের বিবিধ গুপ্ত সাধন প্রণালীর বিশদ বিবরণ আছে।

পদ্মবজ্র—(২) তিনি একজন বৌদ্ধ-তন্ত্র গ্রন্থ প্রণেতা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'হে বজ্র-তন্ত্র'। তারানাথের মতে বসুবন্ধুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসঙ্গ কর্ত্তৃক বৌদ্ধদিগের মধ্যে বৌদ্ধ-তন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়।

পদ্মমিহির—একজন প্রাচীনকালের ঐতিহাসিক পণ্ডিত। মহাতাপস ব্রাহ্মণ হেলারাজ, বার হাজার শ্লোকে 'রাজাবলী' নামে এক ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের অনুকরণে পদ্মমিহির অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকজন রাজার ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। এক্ষণে ইহাঁদের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

পদ্মরাজ—(১) কাশ্মীরপতি অনন্তরাজ (১০২৯—১০৮১ খ্রীঃ) অতিশয় তাম্বুল প্রিয় ছিলেন। পদ্মরাজ নামে এক তাম্বুলী রাজার অনুগ্রহে প্রভূত ধনশালী হয়। এমন কি সে রাজাকেও রাজমুকুট ও সিংহাসন বন্ধক রাখিয়া ঋণ প্রদান করিত। ইহাতে এই অসুবিধা ছিল যে, রাজা যখন সিংহাসনে উপবেশন করিতে ইচ্ছা করিতেন, তখনই সিংহাসন পদ্ম রাজের বাড়ী হইতে আনয়ন করিতে হইত। এই অবস্থা দৃষ্টে রাণী সূর্য্যমতী স্বীয় ধন হইতে তাম্বুলীর সমস্ত প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া রাজাকে ঋণ মুক্ত করেন।

পদ্মরাজ—(২) কাশ্মীরপতি সংগ্রাম রাজের (১০১৪—১০২৯ খ্রীঃ) অন্যতম মন্ত্রী তুঙ্গের তিনি অনুচর ছিলেন। কুকর্ম্মের জন্য তুঙ্গ নিহত হইলে, তিনি ভয়ে তীর্থাশ্রয় করিয়া দুঃখ সন্তাপ দূর করিতে প্রয়াসী হন।

পদ্ম সিংহ—(১) তিনি যোধপুরের একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর সামন্ত নরপতি ছিলেন। তিনি পঁচিশ হাজার টাকা আয়ের গজসিংহপুর নামক স্থানের অধিপতি ছিলেন। তিনি কুম্পাবৎ গোত্রীয় ছিলেন।

পদ্ম সিংহ—(২) বিকানীরের রাজা কর্ণের (১৬৩২—১৬৭৪ খ্রীঃ) পদ্ম সিংহ, কেশরী সিংহ, মোহন সিংহ ও অনুপ সিংহ নামে চারি পুত্র ছিল। পিতা কর্ণের মৃত্যুর পূর্ব্বেই প্রথম পুত্র পদ্ম সিংহ ও দ্বিতীয় পুত্র কেশরী সিংহ বিজাপুর বিপ্লবে প্রাণত্যাগ করেন। কর্ণের তৃতীয় পুত্র মোহন সিংহ শাহা-জাদার শ্যালকের সহিত বিবাদে নিহত হন। একটী মৃগশিশু লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। অবশেষে উভয়ে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু শাহাজাদার শ্যালকের অসির আঘাতে মোহন সিংহ নিহত হন। এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র জ্যেষ্ঠ পদ্ম সিংহ সদল বলে তথায় উপস্থিত হন এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করেন। শাহাজাদার শ্যালক পদ্ম সিংহকে দেখিয়াই আম খাসের একটী স্তম্ভের আরালে গমন করেন। কিন্তু পদ্ম সিংহের প্রচণ্ড অসির আঘাতে তাঁহার দেহ দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। এই ঘটনার পরে রাজপুতেরা সম্মিলিতভাবে সকলে মুঘল সংশ্রব ত্যাগ করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু রাজকুমার মোয়জ্জম তাঁহাদিগকে নিরস্ত করেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয়ের মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠ অনুপ সিংহ ১৬৭৪ খ্রীঃ অব্দে বিকা-নীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

পদ্ম সুন্দর গাণি—একজন জৈন পণ্ডিত। তিনি 'পার্শ্বনাথ চরিত' নামে একখানা গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় ১০৮৩ খ্রীঃ অব্দে রচনা করেন।

পদ্মাকর ঘোষ আচার্য্য—তিনি কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। বিক্রম শিলা বিহারে অবস্থান করিয়া শিক্ষাদান করিতেন। এই বিক্রমশিলা বিহার ভাগলপুর জিলার পাথরঘাটা নামক স্থানের নিকটে গঙ্গা তীরে অবস্থিত ছিল।

পদ্মাবতী— প্রসিদ্ধ কবি, গীত-গোবিন্দের রচয়িতা জয়দেব গোস্বামীর তিনি পত্নী ছিলেন। জয়দেব অল্প বয়সে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। তথায় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একমাত্র কন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করেন।

পদ্মিনী—ইতিহাস প্রসিদ্ধা রাজপুত রমণী ও চিতোরের রাণা ভীম সিংহের মহিষী। চিতোরের অধি-পতি লক্ষ্মণ সিংহের বয়স অল্প ছিল বলিয়া তাঁহার পিতৃব্য ভীম সিংহ রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। ভীম সিংহের স্ত্রী পদ্মিনী চৌহান-

বংশীয় হামির শঙ্করের কন্যা ছিলেন। দিল্লীর খিলিজিবংশীয় নরপতি আলা-উদ্দিন পদ্মিনীর অসামান্য রূপ লাবণ্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য চিতোর আক্রমণ করিলেন। দীর্ঘকাল স্থায়ী অবরোধের পরও চিতোর অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়া আলা-উদ্দিন ঘোষণা করিলেন যে, একবার দর্পণে পদ্মিনীর প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিতে পারিলেই তিনি চিতোর হইতে প্রস্থান করিবেন। চিতোর রক্ষার্থ অবশেষে তাঁহারা সম্মত হইলেন। আলাউদ্দিন অতিথি স্বরূপে চিতোর দুর্গে প্রবেশের অনুমতি পাইলেন। দর্পণে পদ্মিনীর অসামান্য রূপ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। প্রত্যাগমনের সময় অতিথির প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনের জন্য, ভীম সিংহ আলাউদ্দিনের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের বাহিরে আসিলেন। তৎক্ষণাৎ ভীম সিংহকে আলাউদ্দিনের ইঙ্গিতে বন্দী করা হইল এবং তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন যে পদ্মিনীকে পাইলেই তিনি ভীমসিংহকে ছাড়িয়া দিবেন। এই আকস্মিক বিপদে সকলেই ক্ষণকালের জন্য কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন। পদ্মিনীর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। পদ্মিনী, পিতৃব্য গোরা ও আপন ভ্রাতা বাদল এই দুই সাহসী বীরের সহিত পরামর্শ স্থির করিলেন। আলাউদ্দিনকে জানান হইল যে পদ্মিনী আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত। তবে তাহার পূর্ব্বে আলা-উদ্দিনকে সেনা নিবাস দূরে সরাইতে হইবে। পদ্মিনীর সঙ্গে যে সাতশত পরিচারিকা ও সহচরীর শিবিকা আসিবে তাহার প্রতি যেন কোন প্রকার অশিষ্ট ব্যবহার না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং যাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, ও তাঁহার সঙ্গে দিল্লী পর্য্যন্ত যাইবেন তাঁহাদের প্রতিও যথোচিত সৌজন্য প্রদর্শন করিতে হইবে। আর শেষ বিদায়ের জন্য ভীম সিংহের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে। এই সমস্ত প্রস্তাবে আলা-উদ্দিন সম্মত হইলেন। সেনা নিবাস দূরে অপসারিত হইল। সাতশত শিবিকা আলাউদ্দিনের শিবির সম্মুখে উপস্থিত হইল। প্রত্যেক শিবিকা বস্ত্রাবৃত ও ছয়জন বলিষ্ঠ লোক কর্ত্তৃক বাহিত। শিবিকার অভ্যন্তরে একটী রাজপুত ও অস্ত্র শস্ত্র। ভীম সিংহ পদ্মিনীর সহিত শেষ সাক্ষাতের জন্য অনুমতি পাইলেন। তিনি একটী শিবিকার নিকটে আসিয়াই সকল অবস্থা অবগত হইলেন এবং কৌশলপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। আলা-উদ্দিন ভীম সিংহের প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব দেখিয়া সন্দিহান হইলেন। কিন্তু তখন আর কোন প্রতীকারের উপায় ছিল না। রোষে তিনি ক্ষিপ্ত প্রায় হইলেন। অচিরেই যুদ্ধ বাধিল। শিবিকাবাহী ও অভ্যন্তরস্থ রাজপুত বীরেরা মুসলমান

সৈন্যদিগকে ভীষণরূপে পরাজিত করিল। আলাউদ্দিনের চতুরতার উপরও যে উচ্চতর চতুরতা সম্ভব ইহা ভাবিতে ভাবিতে ভগ্ন মনোরথ হইয়া তিনি দিল্লীতে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন ইহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। এই যুদ্ধে দ্বাদশবর্ষীয় বীর বালক বাদলের অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়া শত্রু পক্ষীয়েরাও বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। বীরবর গোরাও অসীম তেজ প্রদর্শনপূর্ব্বক সমর শয্যায় শয়ন করিলেন। বীরবর বালক বাদলের মুখে স্বীয় স্বামীর অদ্ভুত বীরত্ব কাহিনী শুনিয়া গোরার পত্নী ও স্বীয় স্বামীর অনুগমন করিবার জন্য ত্বরায় চিতা সজ্জিত করিয়া তাঁহাতে আরোহণ করিলেন।

কিছুকাল মধ্যেই আলাউদ্দিন বিপুল সৈন্য বাহিনী লইয়া আবার চিতোর আক্রমণ করিলেন। ১২৯০ খ্রীঃ অব্দে আলাউদ্দিন খিলিজী চিতোরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ গিরিকূট অধিকার করিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। অবশেষে চিতোর অবরোধ হইল। রাজপুত বীরেরা রোষ ও জিঘাংসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। অসি হস্তে সমস্ত চিতোর বীরেরা শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। দিবাভাগে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া একদা রাত্রিতে রাণা লক্ষ্মণ সিংহ বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময়ে তিনি শুনিতে পাইলেন অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিতেছেন "আমি ক্ষুধিত হইয়াছি। দ্বাদশ জন রাজার রক্ত পান না করিলে আমার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে না। প্রতিদিন একটী রাজ কুমারকে অভিষেক করিবে। রাজার মত তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইবে। তিন দিন পরে তিনি সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া শত্রু পক্ষকে বিনাশ পূর্ব্বক অদৃষ্টের অনুসরণ করিবেন। দ্বাদশ জন রাজকুমারের এইরূপে আত্ম জীবন উৎসর্গে আমি চিতোরে অবস্থান করিতে পারি।" দেবীর আদেশ কঠোর হইলেও রাণা লক্ষ্মণ সিংহ ও রাজপুত বীরবৃন্দ তাহা পালন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহারা জীবিত থাকিতে বিধর্ম্মী শত্রুকে চিতোরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে ও রমণীগণের উপর অত্যাচার করিতে কিছুতেই দিবেন না। এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। প্রথমেই সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ পুত্র অরি সিংহ রাজমুকুট পরিধান করিয়া তিনদিন রাজত্ব করিলেন, চতুর্থ দিনে সমরাঙ্গনে প্রবেশ পূর্ব্বক অসংখ্য শত্রু নিপাত করিয়া চির নিদ্রায় রণস্থলে শয়ন করিলেন। একে একে রাণার একাদশ পুত্র স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন পূর্ব্বক বীরগতি লাভ করিলেন। কেবল দ্বিতীয় পুত্র অজয় সিংহকে বাপ্পার বংশ

লোপের আশঙ্কায় প্রেরণ করিলেন না। তৎপরিবর্ত্তে স্বয়ং যুদ্ধে গমন করিলেন। ইহার পূর্ব্বে পদ্মিনীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া রাজপুত রমণীকুল জহর ব্রত উদ্‌যাপন পূর্ব্বক জলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। রাণা লক্ষ্মণ সিংহ ও ভীম সিংহ যুদ্ধে নিহত হইলেন।

পদ্মেশ্বরী—কোচবিহারের অধিপতি লক্ষ্মীনারায়ণের ভগিনী। সম্রাট আকবরের মন্ত্রী ও বাঙ্গালার সুবাদার মানসিংহের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।

পন্তলেব—ভারতের একজন গ্রীক নরপতি। তক্ষশিলায় তিনি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার নিকেল ও তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। গ্রীক ও ব্রাহ্মী অক্ষরে রাজার নাম ও উপাধি কোন কোন মুদ্রায় আছে।

পপাবাঈ—অতি প্রাচীনকালে পপাবাঈ নামে এক রাজপুত রাণা ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে দেশে অতিশয় বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। তদবধি অরাজক জনপদ মাত্রকেই রাজপুতেরা "পপাবাঈকা-রাজ" এই উপনামে অভিহিত করিয়া থাকে।

পবত—কৌশাম্বির ধ্বংসাবশেষ মধ্যে অনেকগুলি ছাঁচে ঢালা তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলির মধ্যে অক্ষর নাই, আর কতকগুলির মধ্যে ব্রাহ্মী অক্ষরে পবত, বহসত মিত্র; অশ্বঘোষ ও জ্যেষ্ঠামিত্র প্রভৃতি রাজগণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা কোন্ স্থানের রাজা অদ্যাপি তাহা স্থির হয় নাই।

পরম কারণ—তিনি শ্রীপতিকৃত জ্যোতিষ রত্ন-মালার উপর 'বাল-বোধিনী' নামে টীকা রচনা করেন।

পরম মিশ্র—যদুমণির পুত্র পরম মিশ্র জ্যোতিষী ১৪৫৬ শকে (১৫৩৪ খ্রীঃ) 'মুকুন্দবিজয়' নামে ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন।

পরম শুক্ল—(১) তিনি একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। প্রজাপতি দাস কৃত 'পঞ্চস্বরা' গ্রন্থের তিনি এক টীকা লিখিয়াছেন।

পরম শুক্ল—(২) তিনি পরাশরকৃত পরাশর লঘু বা উড়ুদায় প্রদীপ গ্রন্থের এক টীকা রচনা করিয়াছেন। 'বীজ-গণিত বিবৃত্তি কল্পলতা' নামক গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন।

পরম শুক্ল—(৩) তিনি মুহূর্ত্ত গণপতি নামক গ্রন্থের এক টীকা করেন। তিনি 'যন্ত্র চন্তামণি মালক' নামক গ্রন্থের প্রণেতা।

পরম শুক্ল—(৪) তিনি পুঞ্জরাজকৃত শম্ভুহোরা প্রকাশ গ্রন্থের এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

পরম সুখ—(১) গর্গাচার্য্য বিরচিত গর্গ মনোরমা নামক গ্রন্থের পরম সুখ

জ্যোতিষী এক টীকা রচনা করেন। গর্গকৃত প্রশ্ন মনোরমা গ্রন্থেরও তিনি এক টীকা প্রণয়ন করেন।

পরম সুখ—(২) সীতরামের পুত্র পরম ১৭৩২ শকে (১৮১০ খ্রীঃ) 'রমল নবরত্ন' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

পরম সুখ——(৩) ১৭৩৭ শকের (১৮২৫ খ্রীঃ) পূর্ব্বে তিনি 'লীলাবতী কৌতুক' নামে ভাস্করকৃত লীলাবতীর এক টীকা রচনা করেন।

পরমাদীশ্বর—তিনি একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি আর্য্য ভট্টের গ্রন্থের এক টীকা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি আর্য্য ভট্টের পৃথিবী ভ্রমণ মতের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন।

পরমানন্দ—তিনি ক্ষেত্রীবংশোদ্ভব ছিলেন। আকবর শাহ তাঁহাকে পাঁচ শত সৈন্যের অধিনায়ক করিয়াছিলেন।

পরমানন্দ গুপ্ত—একজন গ্রন্থকার। 'গৌরাঙ্গ বিজয়' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

পরমানন্দ গোস্বামী—একজন গ্রন্থকার। 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামক গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

পরমানন্দ ন্যায়রত্ন—একজন অনুবাদক। 'যোগবাশিষ্ট রামায়ণ' তিনি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

পরমানন্দ পাঠক—কাশীস্থ পরমানন্দ একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ১৬৭০ শকে (১৭৪৮ খ্রীঃ) 'প্রশ্নমাণিক্য মালা' নামে একখানা জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

পরমানন্দ পুরী—একজন গ্রন্থকার। 'গোবিন্দ বিজয়' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

পরমানন্দ সেন—একজন বৈষ্ণব কবি ও গ্রন্থকার। ১৫২৭ খ্রীঃ অব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কাঞ্চনপল্লী নামক গ্রামে মাতামহালয়ে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শিবানন্দ সেন। তাঁহারা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কুলীন গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। চৈতন্য দাস ও রাম দাস নামে তাঁহার আরও দুই সহোদর ছিল। আট বৎসর বয়সের সময় শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিয়া কর্ণ ও জিহ্বা দ্বারা তাঁহার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি স্পর্শ করেন। কথিত আছে ইহাতেই তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্ব শক্তি জন্মে। মহাপ্রভু তাঁহাকে 'কবি কর্ণপুর' বলিয়া ডাকিতেন। নিম্ন লিখিত গ্রন্থগুলি তাঁহারই রচিত। (১) চৈতন্য চরিত কাব্য, (২) চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, (৩) আনন্দ বৃন্দাবন চম্পু, (৪) কৃষ্ণ গণোদ্দেশ দীপিকা, (৫) গৌর গণোদ্দেশদীপিকা, (৬) অলঙ্কার কৌস্তুভ, (৭) চৈতন্য শতক, (৮) স্তবাবলী। তাঁহার রচিত সমস্ত সংস্কৃত নাটক ও কাব্য গ্রন্থাবলী ভক্তিরস ও সদালঙ্কারে পূর্ণ। তিনি কাঞ্চনপল্লীতে কৃষ্ণরায় জীউর মূর্ত্তি

প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বিগ্রহ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। 'বৈষ্ণবাচার্য্য দর্পণ' গ্রন্থ মতে তিনি কাঁচড়াপাড়ার অধিবাসী ছিলেন। অনুমান ১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

পরমার্থ—প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি উজ্জয়িনীর অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার বয়স যখন চল্লিশ বৎসর, তখন লিয়াংবংশীয় চীন সম্রাট উ-টির (Wu-Ti) আদেশে চীনদেশ হইতে বহু বৌদ্ধ শ্রমণ তীর্থ পর্য্যটনে ভারতে আগমন করেন। তাঁহারা মগধে উপস্থিত হইলে সম্রাট জীবিত গুপ্ত তাঁহাকে ঐ চীন শ্রমণদের সহিত, দোভাষীর কাজ করিবার জন্য চীনদেশে প্রেরণ করেন। পরমার্থ বহু সংস্কৃত পুঁথি লইয়া চৈনিক শ্রমণদিগের সহিত চীনদেশে গমন করেন। ৫৪৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি চীনদেশের ক্যান্টন নগরে উপস্থিত হন এবং দুই বৎসর পরে চীন সম্রাটের দর্শন লাভ করেন। ধর্ম্মপ্রচার ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারে সাহায্য করিবার জন্য তিনি চীনদেশের নানা-স্থানে পর্য্যটন করেন। ৫৬৯ খ্রীঃ অব্দে চীনদেশেই তাঁহার মৃত্যু হয়। চীন দেশে থাকিতেই তিনি বসুবন্ধুর তর্ক-শাস্ত্র এবং বসুবন্ধুর জীবন চরিত চীন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। অন্যান্য যে সকল গ্রন্থও তিনি চীন ভাষায় অনুবাদ করেন তাহাদের নাম—মহাযান-সম্পরিগ্রহ, বসুবন্ধু রচিত অভিধর্ম্ম কোষ, অশ্বঘোষ রচিত মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদ।

পরমার্দ্দী—তিনি হৈহয়বংশীয় ছিলেন এবং উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নরপতি প্রথম নরসিংহের ভগিনী চন্দ্রিকা দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি নরসিংহের প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন (সম্ভবতঃ ১২৬৪ খ্রীঃ অব্দে)। নরসিংহ প্রথম দেখ।

পরমেশ্বর—তিনি একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। তিনি আর্য্য ভট্টের কৃত "আর্য্যভট্ট তন্ত্র" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের এক টীকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার টীকার নাম "ভট্ট-দীপিকা"। সূর্য্যদেব যজ্বা নামে আর্য্যভট্ট তন্ত্রের আর ও একজন টীকাকার ছিলেন। তাঁহার টীকার নাম 'ভটি প্রকাশিকা'। পরমেশ্বর স্বীয় টীকার স্থানে স্থানে সূর্য্যদেবের টীকা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভটি প্রকাশিকা অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী সময়ে ভাস্করাচার্য্য আর্য্যভট্টের কোন কোন ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছেন। পরমেশ্বর স্বীয় টীকায় ভাস্করের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং পরমেশ্বর, সূর্য্যদেব যজ্বা ও ভাস্করের পরবর্ত্তী ছিলেন। এতদ্বারা ইহা ও বুঝান যাইতেছে যে

ভাস্করের আবির্ভাবের পরেও আর্য্যভট্টের এইরূপ প্রতিপত্তি ছিল যে, তখনও তাঁহার গ্রন্থের নূতন টীকা প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়াছিল। উভয় টীকা সম্বলিত করিয়া আর্য্যভট্টীয় সিদ্ধান্ত নাম দিয়া ডাঃ কার্ণ (Dr. Kern) সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন। পরমেশ্বর ১৩৫২ শকে (১৪৩০ খ্রীঃ) বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কেরল প্রদেশের উত্তরাংশে ছিল।

পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী—একজন বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে কাউ গ্রামে বৈদ্যবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর (মতান্তরে নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবীর) মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং খড়দহে বাস করিতেন। জাহ্নবী দেবীর সহিত তিনি খেতুরীর মহোৎসবে গমন করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে জাহ্নবী দেবী যখন বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন তিনি রক্ষক ও অভিভাবকরূপে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে তিনি একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। 'চৈতন্য ভাগবত' ও 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে পরমেশ্বর সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। জাহ্নবী দেবীর আদেশে তিনি তড়া আটপুর গ্রামে শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারই সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক প্রবাদ প্রচলিত আছে।

পরমেশ্বর কবীন্দ্র— মহাভারত প্রণেতা বাঙ্গালী কবি। কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামেও তিনি খ্যাত ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। 'পরাগলী মহাভারত' (আদি হইতে অভিষেক পর্ব্ব পর্য্যন্ত) তিনি প্রণয়ন করেন। বঙ্গের শাসনকর্ত্তা হোসেন শাহের (১৪৯৪-১৫২৫ খ্রীঃ) সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে তিনি এই মহাভারত রচনা করেন। পরাগল খাঁর আদেশে রচিত হইয়াছে বলিয়া, ইহার নাম পরাগলী মহাভারত হইয়াছে। এই মহাভারতে অনুমান ১৭০০ শত শ্লোক আছে। খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

পরম্ম দেব—তিনি চালুক্য পতিদের সামন্ত নরপতি সিউন চন্দ্রের পুত্র। সিউন চন্দ্রদেব যাদব, চালুক্য বংশের অতি বিশ্বস্ত সামন্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার তনয় পরম্ম দেবও তদনুরূপই ছিলেন। কিন্তু চালুক্য বংশের ক্ষমতা লোপের সঙ্গে সঙ্গে সামন্ত নরপতিদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দক্ষিণে হয়শাল বংশ ও উত্তরে যাদব বংশ প্রবল হইয়াছিলেন। পরম্ম দেবের পুত্র পর্য্যন্তই তাঁহারা চালুক্যবংশের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তৎপর তাঁহারা স্বাধীন হইয়াছিলেন।

পরশুরাম—(১)শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য পরশুরাম ১৪৪৪ শকের (১৫২২ খ্রীঃ)পূর্ব্বে 'ভূপালবল্লভ' নামে যুদ্ধ মুহূর্ত্ত সম্বন্ধে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

পরশুরাম (২)—তিনি গণপতি রাওল কৃত মুহূর্ত্ত গণপতি গ্রন্থের টীকাকার।

পরশুরাম—(৩) একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। 'রসরাজ শিরোমণি' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

পরশুরাম—(৪) একজন বৈষ্ণব কবি। ধ্রুব চরিত, সুদাম চরিত, প্রহ্লাদ চরিত প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত। ১৭২৬ শকে (১৮০৪ খ্রীঃ) তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

পরশুরাম—(৫)হরচন্দ্র (হবচন্দ্র) নামে উত্তরবঙ্গের এক রাজার নাম পাওয়া যায়। তাঁহার বংশে 'পরশুরাম নামে একজন রাজার আবির্ভাব হয়। তিনি উত্তরপ্রান্ত হইতে তাঁহার রাজধানী দক্ষিণপ্রান্তে অপসারিত করেন। এ সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী আছে। রাজা পরশুরাম তাঁহার রাজ্য মাপিয়া ঠিক মধ্যস্থলে রাজধানী স্থাপন করেন এবং এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর নাম দিলেন 'মাঝ স্থান', অর্থাৎ কেন্দ্রস্থল। এই 'মাঝ স্থান' ক্রমান্বয়ে 'মা স্থান' এবং 'মহাস্থান' নামে পরিবর্ত্তিত হয়।

পাল বংশ বিধ্বস্ত হওয়ার পর, রাজা হরচন্দ্র যখন উত্তর বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন—ঠিক সেই সময়ে সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন প্রবল পরাক্রমে দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন। নবদ্বীপ তাঁহার রাজধানী ছিল। ইহারই পুত্র ইতিহাস প্রসিদ্ধ বল্লাল সেন এবং তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন।

রাজা পরশুরাম ও লক্ষ্মণ সেন সমসাময়িক। সুতরাং কিম্বদন্তী অনুসারে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে ইহাই অনুমিত হয় যে, 'মহাস্থান গড়' পাল বংশের কীর্ত্তি চিহ্ন নহে। ইহা তৎপরবর্ত্তী ক্ষত্রিয় রাজাদের কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ। এই ক্ষত্রিয় রাজাদের বংশধরেরা রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, কুচবিহার প্রভৃতি জেলায় 'রাজবংশী' বলিয়া অভিহিত। মহাস্থান গড় নির্ম্মিত হয় খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। কিন্তু পালবংশ খ্রীঃ দশম শতাব্দীর প্রারম্ভেই বিধ্বস্ত হইয়াছিল। 'মহাস্থান গড়' সম্বন্ধে উপরোক্ত জেলা সমূহে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে—

রাজা পরশুরাম বাঙ্গালার 'মাঝ স্থানে' আপনার রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পর, একদিন সন্ধ্যার সময় রাজবাড়ীতে জনৈক মুসলমান অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতিথির নাম 'সুলতান পীর'। 'পীর' মানে সাধু বা সন্ন্যাসী ব্যক্তি। ইহা আরবী শব্দ।

যাহা হউক, রাজা অতিথিকে আশ্রয়

দিলেন। অতিথি কিন্তু খাদ্যদ্রব্য কিছুই গ্রহণ করিলেন না। শুধু তিনি প্রার্থনা করিলেন যে, রাজপ্রাসাদের ফটকের পার্শ্বে তাঁহাকে 'নমাজ' পড়িবার জন্য একটু জায়গা দেওয়া হউক। রাজা সম্মত হইলেন, পীর সাহেবও ফটকের পার্শ্বে চর্ম্মাসন পাতিয়া 'নমাজ' পড়িতে বসিলেন।

ইতিমধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। ফকিরের চর্ম্মাসনটী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সমস্ত ফটক পরিবেষ্টন করিয়া অবশেষে চর্ম্মাসনটী রাজ-অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাজা পরম ধার্ম্মিক, সুতরাং তিনি ফকিরের ঈশ্বর আরাধনায় বাধা দিতে ভরসা করিলেন না। কিন্তু, অবশেষে মহাবিপদ উপস্থিত হইল।

শীলা নামে পরশুরামের পরমাসুন্দরী একটী কন্যা ছিল। চর্ম্মাসনটী অবশেষে তাঁহারই গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাজা পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, ফকিরের ধর্ম্মকার্য্যে বাধা দিবেন না; সুতরাং তিনি প্রমাদ গণিলেন। এদিকে শীলা ধর্ম্মরক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া, প্রাসাদহইতে বাহির হইলেন। চর্ম্মাসনও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল। শীলা পাগলিনীর মত হইয়া ধর্ম্মরক্ষার্থে করতোয়ার পবিত্র জলে ঝাঁপ দিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।

মহাস্থান গড় করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত। যে ঘাটে শীলা প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি লোকে তাহাকে "শীলাদেবীর ঘাট" বলিয়া থাকে। সুলতান পীর অকৃতকার্য্য হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। যে স্থানে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল, লোকে আজও তাহাকে 'সুলতান পীরের দরগা' বলিয়া অভিহিত করে।

পরশুরাম চক্রবর্ত্তী—একজন গ্রন্থকার। 'কালীয় দমন', 'সুদামা চরিত্র', 'গুরু দক্ষিণা', 'শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল', 'কৃষ্ণগুণ কথন', 'জন্মাষ্টমীর ব্রতকথা' নামক গ্রন্থগুলি তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

পরশুরাম থাপ্পা—তিনি নেপালরাজের একজন সেনাপতি। নেপাল যুদ্ধের সময়ে, তিনি বাগমতী নদী তীরস্থ সীমান্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কয়েকবার পরাজিত হইয়া, এবার ইংরেজ গবর্ণমেন্ট খুব সাবধানে প্রবল চারিদল সৈন্য লইয়া নেপাল যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। (১৮১৫ খ্রীঃ)। তন্মধ্যে প্রধান দল জেনেরেল মরলির (Morley) অধীনে রাজধানী কাটমুণ্ডের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং মেজর ব্রেডশ অগ্রবর্ত্তী হইয়া সীমান্তের শাসনকর্ত্তা পরশুরাম থাপ্পাকে আক্রমণ করেন। তাঁহার অধীনে অধিক সৈন্য ছিল না। তথাপি তিনি অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া সমরে শয়ন

করিলেন। এই যুদ্ধের ফলে তরাই প্রদেশ ইংরেজের কুক্ষিগত হইল।

পরশুরাম বড়ুয়া—তিনি আসামের আহমবংশীয় রাজাদের সীমান্ত রক্ষক কর্ম্মচারী ছিলেন। হাদিয়া চকি নামক স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক আসামে প্রেরিত সমুদয় মালপত্রের শুল্ক আদায় করিতেন এবং বিদেশীয় শত্রুর সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার পুত্র হলিরাম ঢেকিয়াল ১৮০২ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪ বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যুর পরে উক্ত পদ লাভ করেন।

পরশুরাম বিপ্র—পশ্চিম বঙ্গের একজন প্রাচীন কবি। তিনি চম্পক নগরীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। 'কৃষ্ণমঙ্গল' ও 'মাধব সঙ্গীত' নামে তাঁহার রচিত দুইখানি গ্রন্থ আছে। কৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থখানা শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ; উহা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত এবং গানের পুস্তক বলিয়া পরিচিত। এক সময়ে পশ্চিম বঙ্গে কৃষ্ণমঙ্গলের গানের অত্যন্ত সমাদর ছিল। মাধব সঙ্গীত ১১৯৩ বঙ্গাব্দে রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে রাজা পরীক্ষিতের নিকট শুকদেবের কৃষ্ণকীর্ত্তন মাহাত্ম্যাদি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উহার রচনায় তিনি চৈতন্য চরিতামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, রুদ্রপুরাণ, ব্রহ্ম সংহিতা, সঙ্গীত দামোদর, কার্পণ্য পঞ্জিকা প্রভৃতি গ্রন্থগুলির আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাহার রচনা প্রাঞ্জল ও মনোরম। অনুমান ১০০০ বঙ্গাব্দের শেষাংশে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

পরশুরাম মিত্র মুস্তৌফী—১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি নদীয়া জিলার অন্তর্গত উলা বা বীরনগরে প্রসিদ্ধ মিত্র মুস্তৌফী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অখিল নাথ মিত্র মুস্তৌফী একজন প্রকৃত জ্ঞানী ও অতিশয় দাতা ছিলেন। অখিলনাথ সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ের পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র পরশুরাম সংস্কৃত, আরবী, পারসী, উর্দ্দু ও মাতৃভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তিনি নাস্তিক ছিলেন। কৃষ্ণনগরে তিনি ওকালতি করিতেন। সেই সময়ে তিনি "প্রকৃতি তত্ত্ব বা নাস্তিক বাদ" নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় ইহার প্রথম খণ্ড পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় খণ্ড মাত্র পাওয়া গিয়াছে। তিনি খুব তার্কিক ছিলেন। তর্কে তাঁহাকে কেহ পরাজয় করিতে পারেন নাই। ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

পরশুরাম মিশ্র—(১) তিনি একজন জ্যোতিষের পণ্ডিত। ঢুণ্ডিরাজকৃত জাতকাভরণের তিনি একখানি উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

পরশুরাম মিশ্র—(২) গণেশ সুরী কৃত জাতকালঙ্কারের তিনি একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

পরশুরাম মিশ্র—(৩) তিনি চিন্তামণি আচার্য্য বিরচিত ভাব চিন্তামণি গ্রন্থের এক টীকা রচনা করেন।

পরশুরাম শুক্ল—তিনি একজন জ্যোতিষী। তিনি প্রাণধর মিশ্র প্রণীত জাতক চন্দ্রিকার একটী উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

পরহিতভদ্র—তিনি একজন কাশ্মীর দেশীয় পণ্ডিত। তিনি ধর্ম্মকীর্ত্তির বিরচিত 'প্রমাণ বিনিশ্চয়' গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। মূল সংস্কৃত গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না।

পরাক্রম পাণ্ড্য—খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্য-রাজ্যের ক্ষমতা ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়াছিল। মাদুরা নগরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। এই সময়ে মাদুরার সিংহাসন লইয়া পাণ্ড্য ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কুলশেখরের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। অবশেষে কুলশেখর জয় লাভ করিয়া, পরাক্রম পাণ্ড্য ও তাঁহার স্ত্রী পুত্রের বধ সাধনপূর্ব্বক মাদুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরাক্রম পাণ্ড্য কুলশেখর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সিংহল দ্বীপের অধিপতি পরাক্রম বাহুর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে পরাক্রম বাহু সমস্ত সিংহল জয় করিয়া অতিশয় বলশালী হইয়াছিলেন। তিনি পাণ্ড্য রাজ্যের গৃহবিবাদের সুযোগ গ্রহণপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্য বিজয়ের অভিলাষী হইলেন। তিনি পরাক্রম পাণ্ড্যের দূতকে সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক, স্বীয় সেনাপতি লঙ্কাপুর দণ্ডনাথ ও জগদ্বিজয়কে তাঁহার সাহায্যার্থ ১১৭০ খ্রীঃ অব্দে দাক্ষিণাত্য জয়ে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা মাদুরার রাজা কুলশেখরকে পরাস্ত করিয়া, পরাক্রম পাণ্ড্যের একমাত্র পুত্র বীর পাণ্ড্যকে সিংহাসন প্রদান করিলেন। পরাক্রম পাণ্ড্যের নিধন সময়ে তাঁহার এই পুত্র বীর পাণ্ড্য পলায়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে সিংহলদ্বীপপতি পরাক্রম বাহুর সাহায্যে পিতৃ সিংহাসন লাভ করিলেন।

পরাক্রম বাহু—তিনি সিংহল দ্বীপের অতিশয় পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার শৌর্য্যবান্ সেনাপতি লঙ্কাপুর দণ্ডনাথ ও জগদ্বিজয় দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্য রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। চোল ও পাণ্ড্য রাজ্য বিজয়ের পর, পরাক্রম বাহু চোল রাজ্যের মুদ্রার অনুকরণে এক জাতীয় মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন। ১১৫৪ হইতে ১১৯৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত সময়ের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। পরাক্রম পাণ্ড্য দেখ।

পরাগল খাঁ—রাস্তি খাঁর পুত্র পরাগল খাঁ বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নসরৎ শাহের (১৫১৯—১৫৩২ খ্রীঃ) সেনাপতি

ছিলেন। নসরৎ শাহ চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া পরাগল খাঁকে তাহার শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরাগল খাঁ অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার আদেশে চট্টগ্রামের ব্রাহ্মণ জাতীয় কবি পরমেশ্বর জৈমিনির ভারত সংহিতা অবলম্বনপূর্ব্বক পয়ারাদি ছন্দে মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। ইহা পরাগল খাঁর নামানুসারে পরাগলি মহাভারত নামে খ্যাত। কবি পরমেশ্বর কবীন্দ্র উপাধি লাভ করিয়া, সম্মানিত হইয়াছিলেন। পরাগল খাঁর উপযুক্ত পুত্র ছুটি খাঁ পিতার ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। (পরমেশ্বর কবীন্দ্র ও ছুটি খাঁ দেখ)। চট্টগ্রামের ফেনী নদীর তীরে জোরোয়ার থানার অধীন পরাগলপুরে পরাগল খাঁর বংশধরেরা এখনও বাস করিতেছেন।

পরাণ শাহ—তিনি একজন অসাধারণ দৈবশক্তি সম্পন্ন পীর ছিলেন। তিনি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দরবেশ হজরত শাহ জালাল এমনির অনুসঙ্গী অন্যতম দরবেশ ছিলেন। তিনি শ্রীহট্টের দক্ষিণস্থ কাছাড় পরগণার শাহপরাণ গ্রামে বাস করিতেন। তথায় তাঁহার সমাধি আছে এবং তাঁহার বংশধরগণও তথায় বাস করেন।

পরাশর—(১) রামানুচার্য্যের প্রধান শিষ্য কুরেশের পত্নী অণ্ডাল দেবী পরাশর ও ব্যাস নামে দুই যমজ পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারাও পিতার ন্যায় অতি ভক্ত ছিলেন। কুরেশ দেখ। তিনি বাল্যকালেই সর্ব্বজ্ঞ ভট্ট নামে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে হাতে এক মুষ্টি বালী লইয়া বলিয়াছিলেন "বলুন দেখি আমার হাতে কত বালী? আপনি ত সর্ব্বজ্ঞ"। পণ্ডিত নিরুত্তর হইয়া পরাজয় স্বীকার করিলেন।

পরাশর—(২) পরাশর একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থকার। তিনি খ্রীষ্ট জন্মের তেরশত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'পরাশর তন্ত্র'। এই গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য বা লুপ্ত। ব্রহ্মা স্বীয় পুত্র বশিষ্ঠকে, বশিষ্ঠ পৌত্র পরাশরকে, পরাশর স্বীয় শিষ্য মৈত্রেয়কে এই অতি দুর্লভ গুহ্য জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। আর্য্যভট পরাশর সিদ্ধান্ত হইতে গ্রহভগণাদি স্বীয় সিদ্ধান্ত গ্রন্থে দিয়াছেন। আর্য্যভটের মতে কলিযুগ আরম্ভ হইবার অল্প পরে আর্য্য ও পরাশর সিদ্ধান্ত লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ বোম্বাই নগরে মুদ্রিত হইয়াছে কিন্তু কেহ কেহ ইহা মূল গ্রন্থ নহে বলিয়া সন্দেহ করেন। পণ্ডিত ভৈরব, লক্ষ্মীপতি, বাণীবিলাস, সদানন্দ, গঙ্গাধর, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ইহার টীকা রচনা করিয়াছেন। 'পরাশর লঘু বা উড়ুদায়' প্রদীপ নামে পরাশরকৃত একখানা গ্রন্থ আছে। ভৈরব, পরমগুরু, হীরারাম

শর্ম্মা প্রভৃতি ইহার টীকা রচনা করিয়াছেন।

পরাশর—(৩) একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—পরাশর সংহিতা। ভেড়, অগ্নিবেশ, জাতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীত, তাঁহারা সকলেই আত্রেয় পুনর্ব্বসুর শিষ্য ছিলেন এবং সকলেই নিজ নিজ নামে এক একখানি আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন।

পরাশর—(৪) একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। সত্যযুগের অবসান কালে ময়াসুর সূর্য্যকে তুষ্ট করিয়া স্ফুট গ্রহগণিত লাভ করেন। কলিতে তাহাতে অন্তর দৃষ্ট হয়। তখন পরাশর চারুসিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন। কালবশতঃ তাহাতেও ভুল দেখিয়া আর্য্য ভট্ট তাহাকে পরিশোধিত করেন। তাহাও ভ্রস্ত হওয়াতে দুর্গ সিংহ, বরাহমিহিরাদি তাহাতে স্ফুট নিবন্ধ করেন। তাহাও যখন আবার শিথিল হইল, তখন ব্রহ্মগুপ্ত তাহার সংস্কার করেন।

পরাশর—(৫) রামানুজের অন্যতম শিষ্য কুরেশের পুত্র। তিনি রামানুজের আদেশে বিষ্ণুর সহস্র নামের ভাষ্য রচনা করেন।

পারতোষ—নারায়ণ প্রণীত 'ছান্দোগ্য পরিশিষ্ট প্রকাশ' গ্রন্থ পাঠে জানা যায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ পণ্ডিত পরিতোষ 'সোমপীথী' ও বেদের 'দেহবন্ধ' স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মও পিতার ন্যায় বেদজ্ঞ এবং বৈদিক ক্রিয়ায় পরম জ্ঞানী ছিলেন। তাঁহারা খ্রীঃ অষ্টমশতকে বর্ত্তমান ছিলেন।

পরিবানু—সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান শুজা (১৬৩৯—১৬৬১ খ্রীঃ) বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি দয়ালু ও প্রজাপ্রিয় শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারই মহিষী পরিবানু অতিশয় বুদ্ধিমতী, দয়াবতী ও অপরূপ রূপ লাবণ্যবতী ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক গ্রাম্য গীতি রচিত হইয়াছিল। শাহ শুজা আরাকান-রাজহস্তে নিষ্ঠুরভাবে সপরিবারে নিহত হইয়াছিলেন। (শুজা দেখ)।

পরীক্ষিৎনারায়ণ—তিনি কুচবিহারের সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি শুক্লধ্বজের পুত্র। শুক্লধ্বজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরনারায়ণের অনুমতি অনুসারে একটী নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র রঘুদেব ১৫৯৩ খ্রীঃ অব্দে রাজা হইয়া গদাধর নদীর তীরে একটী নগর স্থাপন করিয়া তথায় বাস করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পরীক্ষিৎনারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন। সেই সময়ে কোচবিহারপতি নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ কোচবিহারের রাজা হইলেন। এই লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত পরীক্ষিতের বিবাদ সংঘটিত হয়। পরীক্ষিৎ এই বিপদে ঢাকার নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া

অকৃতকার্য্য হন। তৎপরে তিনি দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের শরণাপন্ন হইয়া (১৬০৬ খ্রীঃ) সাহায্য প্রাপ্ত হন; কিন্তু সসৈন্যে দেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পাটনা নগরে গতায়ু হন। এদিকে ঢাকার নবাবের সৈন্য তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া, অধিকার করিল। তখন এই রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হয়। পশ্চিমে সোণকোষ হইতে পূর্ব্বে মনাস নদী পর্য্যন্ত পরীক্ষিতের পুত্র বিজিত-নারায়ণ এবং মনাস নদী হইতে পূর্ব্বে দিক্রাই নদী পর্য্যন্ত ভূভাগ পরীক্ষিতের ভ্রাতা বলিতনারায়ণ প্রাপ্ত হইলেন।

পরীক্ষিৎ শ্রীচন্দনপাল মাড়ি সুল-তান, রাজা—তিনি মেদিনীপুরের অন্ত-র্গত নারায়ণগড়ের দ্বাবিংশতিতম নর-পতি। তিনি ১৭৬১—১৭৮২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে এক-দিকে মারাঠাদের উপদ্রব অন্যদিকে চুয়াড় জাতীয় ডাকাত গোবর্দ্ধন দিক-পতির উৎপাতে রাজ্যের অতিশয় ক্ষতি হইয়াছিল। গন্ধর্ব্ব শ্রীচন্দন পাল রাজা দেখ।

পরেশচন্দ্র নন্দী, ডাক্তার—কলি-কাতা মেডিকেল কলেজের বিশিষ্ট রেসিডেণ্ট হাউস সার্জ্জন ও সুচিকিৎসক। ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত নাছিরাবাদ গ্রামে ১৩১৩ বঙ্গাব্দে (১৯০৬ খ্রীঃ) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আশৈ-শব অধ্যবসায়ী ও উন্নতিশীল ছিলেন। ত্রিপুরার বাঙ্গরা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি দশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ক্রমে রসায়নশাস্ত্রে সম্মানের (Honours) সহিত B. Sc. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশের বলে কলি-কাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ লাভ করেন। ঢাকা অবস্থান কালে তিনি এক বৎসর কলেজের ছাত্রদিগের দ্বারা প্রকাশিত 'শতদল' নামক মাসিক পত্রি-কার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার সম্পা-দনায় পত্রিকাটির বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। মেডিকেল কলেজেরও তিনি একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। প্রতি পরীক্ষাতেই ভাল ফল প্রদর্শন করিতেন। ১৯৩২ খ্রীঃ তিনি এম বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার কাজে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। তজ্জন্য তিনি অতি সহজেই কলিকাতা মেডিকেল কলেজের হাউস সার্জ্জনের পদ লাভ করিয়াছিলেন। ঐ পদে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে তিনি নানা সদ্‌-গুণের জন্য অল্পকাল মধ্যেই বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা জিলার কসবা থানার এলাকাধীন গুরুহিত গ্রামনিবাসী রায়সাহেব শ্রীযুত কামিনীকুমার দত্তের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় এই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন উদীয়মান

যুবক প্রতিভা বিকাশের প্রারম্ভেই মাত্র সাতাশ বৎসর বয়সে (বৈশাখ ১৩৪০ বঙ্গাব্দ; (মে, ১৯৩৩) দুরন্ত কলেরা রোগে অকালে পরলোক গমন করেন।

পর্ণদত্ত—তিনি ১৩৬ গোপ্তাব্দে (৪৫৬ খ্রীঃ) সৌরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তা ছিলেন সৌরাষ্ট্রের মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে গিরিনগরের অনতি দূরে অবস্থিত পর্ব্বতোপত্যকার প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া সৌরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তা বৈশ্যজাতীয় পুষ্যগুপ্ত সুদর্শন হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পর্ণদত্তের সময়ে সুদর্শন হ্রদের পাষাণ নির্ম্মিত প্রাচীর জল বৃদ্ধি ও ঝটিকায় ধ্বংস হইয়াছিল। পর্ণদত্তের পুত্র চক্রপালিত শতহস্ত দীর্ঘ ও প্রায় সপ্ততি হস্ত উচ্চ প্রাচীরদ্বারা এই হ্রদের জল রক্ষা করিয়াছিলেন।

পর্ব্বগুপ্ত—তিনি অভিনব নামক একজন সামান্য লিপিকরের পৌত্র ও সংগ্রামগুপ্তের পুত্র। তিনি প্রথম জীবনে কাশ্মীরের শৌণ্ডিকবংশীয় অবন্তীবর্ম্মার মন্ত্রী ছিলেন। পরে কাশ্মীরের অধিপতি সংগ্রামদেবকে বিনাশ করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। সার্দ্ধেক বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র ক্ষেমগুপ্ত রাজা হইয়াছিলেন।

পর্ব্বত রায়, মহারাজ—সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাজ পর্ব্বত রায় আসামের অন্তর্গত জয়ন্তিয়া রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পরে মাঝ গোসাঞি রাজা হন। তৎপরে ক্রমে বুড়া পর্ব্বত রায়, বড় গোসাঞি (১ম), বিজয়মাণিক্য, প্রতাপ রায়, ধনমাণিক্য প্রভৃতি রাজা হন।

পর্ম্মাড়ী—তিনি কর্ণাট দেশের অধিপতি ও কাশ্মীরপতি হর্ষদেবের (১০৮৯-১১০২ খ্রীঃ) সমসাময়িক রাজা ছিলেন। কাশ্মীরী পণ্ডিত বিহ্লন কিছুদিন পর্ম্মাড়ীর সভাপণ্ডিত ছিলেন। রাজা তাঁহাকে 'বিদ্যাপতি' উপাধি ও অন্যান্য উপহার প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

পল্টু সাহেব—কবিরপন্থী সাধক। ফৈজাবাদ জিলার নগপুর জলালপুর গ্রামে বাণিয়া বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি গৃহী সাধক ছিলেন। তাঁহার গুরু ছিলেন সাধক গোবিন্দ। তিনি সম্রাট শাহ আলমের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার রচিত কুণ্ডলিয়া ছন্দের কাব্য অতিশয় জনপ্রিয়। "যে সত্যকে জানে তাঁহার আর দেশবিদেশ নাই। প্রত্যক্ষ সত্য বড় সত্য নহে, অন্তরের দেখা সত্যই বড় সত্য। ভগবান্ কোন সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি নহেন। জাতি পংক্তি ক্ষুদ্র পরিচয় ছাড়; নম্রতায় দোষ নাই', ইহাই তাঁহার উপদেশের সারমর্ম্ম।

পলসিন (Polyxenos)—একজন ভারতীয় গ্রীক নরপতি। পঞ্জাবের নিকবর্ত্তী স্থানে তিনি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

পল্লগম্ভীর—তিনি উড়িষ্যার ভঞ্জবংশীয় নরপতি। তাঁহার পিতার নাম যথা-সুখ। পুত্রের নাম শীলভঞ্জ ও পৌত্র শত্রুভঞ্জ। এই শত্রুভঞ্জের ৮০০ সম্বতে (৭৪৪ খ্রীঃ) প্রদত্ত একখানা দানপত্র পাওয়া গিয়াছে।

পশুপতি—(১) তিনি ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব প্রণেতা হলায়ুধের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি শ্রাদ্ধকৃত্য পদ্ধতি ও পাকযজ্ঞ পদ্ধতি নামে দুইখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গের সেন-বংশীয় নরপতি লক্ষ্মণ সেনের (খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দী) প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার অন্য ভ্রাতা ঈশান 'দ্বিজাহ্নিক পদ্ধতি' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। হলায়ুধ দেখ।

পশুপতি—(২) প্রাচীনকালে নেপালে পশুপতি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার নামাঙ্কিত তিন প্রকার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। প্রথম প্রকার মুদ্রায় একদিকে বৃষের ও অপর দিকে সূর্য্যের মূর্ত্তি বা কোন চিহ্ন। দ্বিতীয় প্রকার মুদ্রায় একদিকে ত্রিশূল ও অপর দিকে সূর্য্যের মূর্ত্তি এবং তৃতীয় প্রকার মুদ্রায় একদিকে উপবিষ্ট রাজমূর্ত্তি ও অপর দিকে সপুষ্প ঘট রহিয়াছে।

পশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায়—একজন সাংবাদিক। তিনি 'প্রভাবতী' নামক একটী দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদক ছিলেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে উহা প্রকাশিত হয় এবং এক বৎসরকাল তিনি উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিন বৎসরকাল এই পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল।

পসাদ পালা (প্রসাদ পালা)—একজন বিদুষী বৌদ্ধ ভিক্ষুণী। তিনি বিনয় পিটক ও সুত্ত পিটকের পাঁচখানি গ্রন্থ হইতে এবং অভিধর্ম্মের সাতখানি হইতে উপদেশ প্রদান করিতেন।

পহাড়ী—কর্ণাট দেশের অধিপতি। তিনি কাশ্মীরপতি হর্ষদেবের (১০৮৯—১১০২ খ্রীঃ) সমসাময়িক ছিলেন। কাশ্মীরী পণ্ডিত বিহ্লন কিছুদিন তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন।

পাগলা কানাই—নদীয়া জিলার উত্তর দিকে তাঁহার বাসস্থান ছিল। কানাই গুরুর উপদেশে কঠোর সাধন করিতে যাইয়া পাগল হইয়া যান। পরে প্রকৃতিস্থ হন। সাধন ফলে তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার বিকাশ হয়। তিনি আসরে দাঁড়াইয়া এক সঙ্গে গান রচনা ও গান করিতে পারিতেন। তাঁহার প্রায় সকল সংগীতই আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ। শ্রোতাদের মন তাঁহার সংগীতে মুগ্ধ হইত। তিনি খ্রীঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

পাণ্ডর বৈরোচন—তিব্বতের রাজা শ্রী-সম্রং-দি-বলসান (৭৪০—৭৪৬খ্রীঃ) ভারতবর্ষ হইতে অনেক পণ্ডিতকে তিব্বতে লইয়া যান। তাঁহাদের মধ্যে পদ্মসম্ভব ও তাঁহার শিষ্য পাণ্ডর বৈরোচন ছিলেন। তাঁহারা অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহাদের নাম তিব্বতীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

পাঁচকরি বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে ভাগলপুরে, তাঁহার জন্ম হয়। সেই স্থানে তাঁহার পিতা উকিল ছিলেন। ভাগলপুর তেজনারায়ণ কলেজ হইতে বি, এ পাশ করিয়া তিনি কিছুদিন কাশীতে অবস্থানপূর্ব্বক সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তৎপরে কিছুদিন সরকারী চাকুরী করিয়াছিলেন। অধ্যাপকের কাজও কিছুদিন করিয়াছিলেন। তিনি বিশিষ্ট সংবাদ পত্রসেবী বলিয়াই সুপরিচিত। বঙ্গবাসী, হিতবাদী, বসুমতী প্রভৃতি কাগজের তিনি সম্পাদকের দায়ীত্বপূর্ণ কাজ অতি দক্ষতার সহিত করিয়া সুনাম অর্জ্জন করেন। দৈনিক নায়কেরও তিনি কিছুদিন সম্পাদক ছিলেন। তিনি ইংরেজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় সমান ভাবে প্রবন্ধাদি লিখিতে পারিতেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়েরও তিনি কিছুদিন সম্পাদক ছিলেন। আইন আকবরীর বঙ্গানুবাদ ও চৈতন্য চরিতামৃতের একটী উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করেন। সুরেশ সমাজপতির মৃত্যুর পরে কিছুদিন তিনি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। উমা, রূপলহরী, প্রভৃতি উপন্যাস, ভিক্‌টোরিয়া চরিত তাঁহারই লেখনী প্রসূত। ১৯২৩ খ্রীঃ অব্দের ১৫ই নবেম্বর তিনি দেহত্যাগ করেন।

পাঁচু ফিরিঙ্গী—আণ্টুনী ফিরিঙ্গীর পুত্র পাঁচু বাঙ্গালার নবাব সরফরাজ খাঁর (১৭৩৯—১৭৪০ খ্রীঃ) গোলন্দাজ সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি জাতিতে পর্ত্তুগীজ ছিলেন। আলীবর্দ্দী খাঁর সহিত যুদ্ধে এই বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী প্রাণত্যাগ করেন। (১৭৪০ খ্রীঃ)।

পাচেয়াপ্পা মুদালিয়ার—এই দানবীরের অর্থে মান্দ্রাজ সহরের পাচেয়াপ্পা কলেজ পরিচালিত হইতেছে। ১৭৫৪ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান কাঞ্জেভরম সহরে (কাঞ্চীপুর) তাঁহার জন্ম হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দ্বিভাষীর বৃত্তি অবলম্বন করেন। সেইকালে ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী সকলেই কোন না কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই এই দ্বিভাষীর সাহায্যে জিনিষ পত্রাদি ক্রয় বিক্রয় করিতেন। ভাল দ্বিভাষী না হইলে কাজ চালান খুব অসুবিধা হইত। পাচেয়াপ্পা একজন সুনিপুণ দ্বিভাষী ছিলেন। এই কার্য্যে

তিনি বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত শিক্ষা এবং অন্যান্য ধর্ম্ম কার্য্যের জন্যও যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার একটী মাত্র কন্যা ছিল। তাঁহাকে কিছু অর্থ দিয়া বাকী সমস্ত সম্পত্তি শিক্ষার জন্য এক চরম পত্র দ্বারা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে সেই টাকা সুদে ও আসলে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা হয়। সেই অর্থদ্বারা পাচেয়াপ্পা কলেজ স্থাপিত ও কয়েকটীবৃত্তি দিবার বন্দোবস্ত হয়। এই কলেজ কেবল হিন্দু ছাত্রদের জন্য স্থাপিত হইয়াছে।

পাটল—কাশ্মীরের অধিপতি পর্ব্বগুপ্ত, রাজা হইবার পূর্ব্বে ছোজ ও ভূভট নামক দুই মন্ত্রীকে রাজ্য প্রাপ্তির আশায় দুই কন্যা সম্প্রদান করেন। জামাতা ছোজ মন্ত্রীর পুত্র মহিমা ও জামাতা ভূভট মন্ত্রীর পুত্র পাটল রাজগৃহে থাকিয়া, রাজপুত্রবৎ বর্দ্ধিত হইতেছিলেন। পরে ক্ষেমগুপ্তের মহিষী দিদ্দার সময়ে তাঁহারা বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। রাণী দিদ্দা প্রতিপক্ষদিগকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া পাটল ও মহিমার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। পর্ব্বগুপ্ত দেখ।

পাটকুমার—কোচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ১৫৮৪—১৬২২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময়ে পিতৃব্য পুত্র পাটকুমার বিদ্রোহী হইয়া রাজ্য অধিকার করিতে প্রয়াসী হন। রাজা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক বঙ্গের শাসনকর্ত্তা মানসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি জেহাজ খাঁ নামক এক সেনাপতির অধীনে, রাজাকে সাহায্য করিবার জন্য, একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সৈন্য দলের সাহায্যে লক্ষ্মীনারায়ণ, পাটকুমারকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। কিন্তু তদবধি কোচবিহাররাজ মুঘলের সামন্ত শ্রেণীভুক্ত হইলেন (১৬০১ খ্রীঃ)।

পাণিনি—সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত বৈয়াকরণিক। গান্ধারের অন্তর্গত শলাতুর (বর্ত্তমান পঞ্জাবের অন্তর্গত আটকনগর) গ্রামে দেবল পুত্রের ঔরসে ও দাক্ষী দেবীর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শলাতুরে জন্ম বলিয়া তিনি শলাতুরীয় নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি উপবর্ষের শিষ্য ছিলেন ও পাটলিপুত্র নগরে তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। কাত্যায়ন তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। পরে তিনি হিমালয় পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনা করতঃ মহাদেবের বরে ব্যাকরণ শাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞান লাভ করেন এবং অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। তাঁহার নামানুসারে এই ব্যাকরণ 'পাণিনি' নামে খ্যাত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত ধাতুপাঠ ও গণপাঠ নামক গ্রন্থও প্রসিদ্ধ। পণ্ডিত প্রবর বয়েটলিঙ্কের (Otto Von Boht-

lingk) মতে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে তিনি জীবিত ছিলেন।

পাণ্ডু—রাজপুতানার মরুভূমির মধ্যে জিত নামক জাতি বাস করে। তাহারা নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত। পাণ্ডু এইরূপ গোদারা দলের নায়ক ছিলেন। যোধপুরের রাণা যোধের ষষ্ঠ পুত্র বিকা স্বীয় ভ্রাতা বিদাসহ বিকানীর রাজ্য স্থাপন করেন। বিকা প্রথমে মরুভূমির কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আক্রমণ করিয়া পরে জিতদিগকে আক্রমণ করেন। জিতদিগের সকল দল সংমিলিত হইয়া শেখসর নগরবাসী পাণ্ডু ও রোণিয়ার মণ্ডলকে জিতদিগের প্রতিনিধিরূপে বিকার নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা বিকার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, বিকা তাঁহাদিগকে তাঁহাদের শত্রুদের কবল হইতে রক্ষা করিবেন, জিতদের স্বত্ব অব্যাহত রাখিবেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা বিকাকে প্রতি একশত বিঘা জমির রাজস্ব বার্ষিক দুই টাকা ও প্রতি পরিবার বার্ষিক এক টাকা করিয়া পুরুষানুক্রমে দিবে। বিকা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; তখন পাণ্ডু ও তাঁহার সঙ্গী প্রস্তাব করিলেন, তাঁহাদের স্বত্ব রক্ষার্থ রাজা কি ব্যবস্থা করিবেন? বিকা তখন প্রতিশ্রুত হইলেন যে, তোমাদের বংশধরেরা অভিষেককালে রাজার ললাটে রাজটীকা না দিলে, তাঁহারা রাজা বলিয়া গণ্য হইবে না। বিকার উদারতায় মুগ্ধ হইয়া জিতেরা চিরকালের জন্য তাঁহার বশীভূত হইল। বিকা দেখ।

পাণ্ডুদাস—বোধ হয় তিনি পাণ্ডুশাক্যের বংশধর। বলদেব অব্বোকারের পুত্র শ্রীধর, পাণ্ডুদাসের আশ্রয়ে থাকিয়া ৯৯১ খ্রীঃ অব্দে 'পদার্থ ধর্ম্ম সংগ্রহ' গ্রন্থের 'ন্যায় কন্দলী' নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

পাণ্ডুরঙ্গ স্বামী—একজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত আর্য্যভটের তিনি একজন শিষ্য ছিলেন। ভাস্কর আর্য্যভটের গ্রন্থের অন্যতম টীকাকার ভাস্কর পাণ্ডুরঙ্গ স্বামীর উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না।

পাণ্ডুশাক্য—ভগবান বুদ্ধের খুল্লতাত অমৃতোদন শাক্য। তাঁহার পুত্র পাণ্ডুশাক্য। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই পাণ্ডুশাক্য বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পাণ্ডুয়াতে রাজত্ব করিতেন।

পাতশা বেগম—তিনি অযোধ্যার নবাব নাসিরউদ্দিন হায়দরের মহিষী। ১৮৩৭ খ্রীঃ সালে সামান্য অসুখে হঠাৎ তিনি নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। তখন তাঁহার মহিষী পাতশা বেগম স্বীয় মনোনীত মুনাজান নামক এক ব্যক্তিকে রাজ সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট রাজ্যের প্রকৃত

উত্তরাধিকারী নাসিরউদ্দৌলার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। সামান্য চেষ্টাতেই পাতশা বেগম ও মুনাজান বন্দী হইয়া কানপুরে প্রেরিত হইলেন নাসির উদ্দৌলা পুনঃ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন (১৮৩৭ খ্রীঃ)।

পান্না ধাত্রী—খীচি রাজকুলে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সংগ্রাম সিংহের পুত্রদের ধাত্রী কার্য্যে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। উচ্চবংশীয়া রমণীরাই এই সম্মানিত পদে নিযুক্তা হইতেন। তাঁহাদের সন্তানেরা রাণাদের বিশ্বস্ত কার্য্যে সাধারণতঃ নিযুক্ত হইতেন। ধাত্রী পান্না রাণা সংগ্রাম সিংহের পঞ্চম বর্ষীয় শিশুপুত্র উদয় সিংহের ধাত্রী কার্যে নিযুক্তা ছিলেন। অযোগ্য বিক্রমজিৎকে পদচ্যুত করিয়া সর্দ্দারেরা যখন বনবীরকে সিংহাসন প্রদান করেন, তখন তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, বনবীর সিংহাসন লাভ করিয়াই রাজকুলের এমন প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবেন। বনবীর বিক্রমজিৎকে হত্যা করিয়া অন্তঃপুরের দিকে আসিতেছেন। এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র ধাত্রী সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। এখনই উদয় সিংহের মস্তকে বনবীরের অসি নিপতিত হইবে। ধাত্রী চিন্তা করিবারও অবসর প্রাপ্ত হইলেন না। তাড়াতাড়ি বিশ্বস্ত সংবাদ দাতা নাপিতের হস্তে, উচ্ছিষ্ট করণ্ডে পত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া নিদ্রিত উদয় সিংহকে স্থাপনপূর্ব্বক, প্রদান করিলেন। বলিয়া দিলেন নদী তীরে তাঁহার আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে। পরিত্যক্ত উদয়ের শয়ন খট্টায় আপন পুত্রকে স্থাপনপূর্ব্বক ভীষণ পরিণামের অপেক্ষায় রহিলেন। বনবীর ক্ষণকাল পরেই তথায় উপস্থিত হইয়া উদয় সিংহের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পান্না অঙ্গুলী সঙ্কেতে তাহা দেখাইয়া দিলেন। পাষণ্ড নিদ্রিত নিরপরাধ শিশুর মস্তক ছেদন করিয়া ভাবিল, তাঁহার সিংহাসন নিষ্কণ্টক হইল। একবারও ভাবিল না, এই পাপের ফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হইবে। এদিকে অবরোধবাসিনী রমণীগণ ধাত্রীর এই মহৎ ও উদার অনুষ্ঠানের বিষয় কিছুই জানিতে পারিল না। তাঁহারা উদয়ের মৃত্যুতে করুণ রোলে রোদন করিতে লাগিলেন। আর পান্না, আপনার প্রাণের কুমারকে নীরবে জলন্ত চিতায় স্থাপন করিয়া হৃদয়ের সমস্ত দুঃখ ক্লেশকে সংবরণ করিয়া অশ্রুজলে চিতাগ্নি নির্ব্বাণপূর্ব্বক নদী তীরে উপস্থিত হইলেন। ধন্য পান্না, ধন্য ভারত, আজ তোমার মত রমণীরত্ন বক্ষে ধারণ করিয়া ভারতভূমি ধন্য ও পবিত্র। জগতে যতদিন মহত্ত্বের গৌরব থাকিবে, তোমার নাম ততদিন গৃহে গৃহে পূজিত হইবে। উদয় সিংহ দেখ।

পান্নালাল মেহতা রায়, মহামাননীয় সি, আই, ই—উদয়পুরের মহারাজের মন্ত্রী। ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে এক সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁহার জন্ম হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণকালে, ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে রায় উপাধি এবং উদয়পুর রাজের মন্ত্রী বলিয়া মহামাননীয় (His Excellency) এই সম্মানজনক উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ করমচাঁদ মেহতা, বহু পূর্ব্বে বিকানীরের রাজার মন্ত্রী ছিলেন এবং দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে সম্মানজনক মেহতা উপাধি ও জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে করমচাঁদ মেহতার এক পৌত্র উদয়পুর রাজ্যে গমন করেন এবং এই স্থানেই বাসস্থান স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধর আগরজী মেহতা ও হংসরাজজী মেহতা, মহারাজ অরিসিংহের রাজত্বকালে ১৭৬২ খ্রীঃ অব্দে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা দুর্গ ও মঙ্গলগড় জিলার অধ্যক্ষ ছিলেন। আগরজী মেহতার বংশধর, দেবীচাঁদ মেহতা, শেরসিংহ মেহতা ও গোকুলচাঁদ মেহতা, পান্নালাল মেহতার পূর্ব্বে উদয়পুরের মহারাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতা মুরলীধর মেহতা পরলোক গমন করিলে, পান্নালাল প্রধান মন্ত্রী পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র কুমার ফতেলাল মেহতা ১৮৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

পান্নালাল শীল—কলিকাতার মধ্যবর্ত্তী কলুটোলার প্রসিদ্ধ দানবীর মতিলাল শীলের তিনি তৃতীয় পুত্র ছিলেন। তিনি পিতার বহু সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। পিতার ন্যায় বাণিজ্য ব্যবসায়ে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া জমিদারী ক্রয় করেন। তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় দয়া দাক্ষিণ্য, দানশীলতা ও মহানুভবতায় অতিশয় জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি স্বীয় কার্য্যে পিতার সুনাম অধিকতর উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। রাজসরকারেও তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল। এই মহাত্মা ১৯০২ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত মাণিকলাল শীল মহাশয়, বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন রোগ নিবাসের একটী অংশ বহু অর্থ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় পিতার নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। বেলগাছিয়ার উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় তাঁহার পুণ্য স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে। এই বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব এই যে এই স্থানের ছাত্রেরা বিনা ব্যয়ে অধ্যয়ন করিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে কোন না কোন শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিতে পারে।

পাম হেইবা—তিনি মণিপুরের রাজা। তাঁহার অন্য নাম করিমনওয়াজী। ১৭১৪

খ্রীঃ অব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ত্রিপুরাপতি দ্বিতীয় ধর্ম্ম-মাণিক্যের তিনি সমসাময়িক। যে সময়ে ধর্ম্ম মাণিক্য মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময়ে সীমান্ত-বর্ত্তী একদল ত্রিপুর সৈন্য পরাস্ত করিয়া পাম হেইবা 'ত্রিপুরা বিজয়ী' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই সময়ে শ্রীহট্টের গোঁসাইগণ মণিপুরে প্রবেশ করিয়া মণিপুরীদিগকে মহাভারতোক্ত বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া প্রচার করেন। তাহাদের দেশকে মণিপুর রাজ্য বলিয়া প্রচার করেন এবং মণি-পুরিরা বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করে। পর-বর্ত্তীকালে শান্তিপুরের গোস্বামীরা মণিপুরের রাজাকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

পারভেজ—তিনি দিল্লার সম্রাট জাহা-ঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার মাতা সাহিব জামাল, খাজা হাসনের কন্যা ছিলেন। ১৫৯০ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৯৮) কাবুল নগরে তাঁহার জন্ম হয়। সেই সময়ে জাহাঙ্গীর কাবুলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পারভেজের প্রতি জাহাঙ্গীর শাহ প্রীতিমান ও সন্তুষ্ট ছিলেন না। পারভেজ উচ্চাকাঙ্ক্ষাবিহীন নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। রাজকুমার খুরম বিদ্রোহী হইলে, তাঁহাকে দমন করিবার জন্য পারভেজ ও মহবত খাঁ দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হন। খুরম পরাজিত হইয়া উড়িষ্যার পথে বাঙ্গালা দেশে গমন করেন। তৎপরে এলাহাবাদের নিকট জুনি নামক স্থানে আর একবার রাজকুমার পারভেজ, খুরমকে পরাস্ত করিয়া ছিলেন। পারভেজ পিতার জীবিত-কালেই মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে ১৬২৬ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৩৫) বুরহান-পুরে পরলোক গমন করেন।

পারস্কর—একজন বৈয়াকরণ। তিনি পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন।

পারুলবালা মুখোপাধ্যায়—এক-জন বিশিষ্টা বাঙ্গালী মহিলা দেশকর্ম্মী। ১৯৩০ খ্রীঃ অব্দের সত্যাগ্রহের আন্দো-লনের সময় তিনি কংগ্রেসের কার্য্যে যোগ দান করেন। সেই সময়ে হাবড়ায় একটী নারী সত্যাগ্রহী সমিতি স্থাপিত হয় এবং তিনি তাহার যুগ্ম সম্পাদিকা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন তিনি অক্লান্তভাবে বাড়ী বাড়ী যাইয়া স্বদেশ প্রচার করিতেন। ১৯৩১ খ্রীঃ অব্দের আন্দোলনের সময়, তিনি সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত ধুলাগোড়ে নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহীদল পরিচালনাকালে গ্রেপ্তার হন এবং বিচারে তিন মাসের কারা-দণ্ড লাভ করেন। যথাসময়ে মুক্তি লাভ করিয়া তিনি পুনরায় হাবড়া জেলার পাঁচলা, বাগনান, সাঁকরাইল প্রভৃতি স্থানে স্বদেশী প্রচার কার্য্য চালাইতে থাকেন এবং তজ্জন্য মুগ-

কল্যাণে গ্রেপ্তার হন। এইবার বিচারে তিনি চারি মাসের কারাদণ্ড লাভ করেন। চারি মাস পর জেল হইতে মুক্তি লাভ করেন, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় এবং নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। ১৯৩৫ খ্রীঃ অব্দের ১৪ই অক্টোবর সোমবার (১৩৪২ বঙ্গাব্দ আশ্বিন) তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি হাবড়ার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী ছিলেন।

পার্জিটার, ফ্রেডারিক ইডেন— (Frederick Eden Parjiter) খ্যাতনামা ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিদ্। ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রবার্ট পার্জিটার একজন ধর্ম্মযাজক ছিলেন। বিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষা সমাপন হয়। কৃতী ও মেধাবী ছাত্ররূপে তিনি খ্যাত ছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে সিবিল সার্বিস (I. C. S.) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সরকারী চাকুরী লইয়া বাঙ্গালাদেশে আসেন। চল্লিশ বৎসরেরও অধিককাল বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতীত্বের সহিত কাজ করিয়া ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তৎপূর্ব্বে দুই বৎসরকাল কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি হইয়াছিলেন।

কর্ম্মজীবনে তিনি আইন ও রাজস্ব সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয় পুরাতত্ত্বে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। ঐ সকল বিষয়েই তিনি প্রভূত গবেষণা করেন। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির (Royal Asiatic Society of Bengal) মুখপত্রে তাঁহার বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি প্রথমে কিছুকাল ঐ বিদ্বজ্জন পরিষদের কার্য্যাধ্যক্ষ (Secretary) ও পরে উহার পরিচালক (President) হন। ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি মার্কণ্ডেয় পুরাণ ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দে উহা শেষ হয়। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত Dynasties of the Kali Age (১৯১৩ খ্রীঃ) এবং Ancient Indian Historical Tradition (১৯২২ খ্রীঃ) গ্রন্থ দুইখানি পৌরাণিক ইতিহাস আলোচনায় অপরিহার্য্য।

ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও তিনি এই সকল বিষয় চর্চ্চা হইতে নিবৃত্ত হন নাই। Indian Antiquary, Epigraphica Indica, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain, প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার বহু গভীর গবেষণা প্রসূত প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়। মধ্য এসিয়ায় আবিষ্কৃত বৌদ্ধ পুঁথি সমূহের সংকলনে তিনি হর্ণেল সাহেবের (Dr. A. F. R. Hoernle) একজন বিশিষ্ট সহযোগী

ছিলেন। ১৯২৩ খ্রীঃ অব্দে পূর্ব্বোক্ত রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির শত বার্ষিক উপলক্ষে যে বিশেষ পরিচয় গ্রন্থ (Centenary Volume) প্রকাশিত হয়, তাহা প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফল। তিনি কিছুকাল ঐ সোসাইটির সহ-সভাপতি ছিলেন এবং ১৯২০ খ্রীঃ অব্দে প্যারী নগরীতে অনুষ্ঠিত প্রাচ্য বিদ্যা সম্মেলনে উহার প্রতিনিধি হইয়া গমন করেন।

মহাভারত, রামায়ণ পুরাণাদিতে উল্লেখিত ভৌগলিক নামের বর্ত্তমান স্থিতি নির্দ্দেশ তাঁহার এক প্রধান কীর্ত্তি। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যও ক্ষত্রিয় সাহিত্য স্বতন্ত্র ভাবে বিচার করিয়া তিনি প্রাচীন সমাজের অবস্থা নির্ণয়ের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কলি অব্দের বিচার করিয়া ভারতের সভ্যতার প্রাচীনত্ব তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন। পুরাণাদি সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা অতি মূল্যবান।

তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি হেনরী রেভারলীর কন্যাকে বিবাহ করেন। মৃত্যুকালে (ফেব্রুয়ারী ১৯২৭ খ্রীঃ) তাঁহার এক কন্যা ও এক পুত্র বর্ত্তমান ছিল।

পার্থ—তিনি কাশ্মীরের শৌণ্ডিক বংশীয় নরপতি অবন্তী বর্ম্মার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শূরবর্ম্মার প্রপৌত্র, সুখ বর্ম্মার পৌত্র ও নির্জ্জিত বর্ম্মার পুত্র। কাশ্মীরে আত্মকলহ থাকায়, একদল লোক গোপাল বর্ম্মার মৃত্যুর পরে (৯০২—৯০৪ খ্রীঃ) নির্জ্জিত বর্ম্মাকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার পুত্র পার্থকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি নিরাপদে রাজ্য শাসন করিতে পারেন নাই। ৯০৬—৯২১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজ্য শাসন করেন। তৎপরে তন্ত্রীদল প্রবল হইয়া তাঁহার পিতা নির্জ্জিত বর্ম্মাকেই সিংহাসন প্রদান করেন। তাঁহার শেষ জীবন অতিশয় শোচনীয় হইয়াছিল। তাঁহার পাষণ্ড পুত্র অবন্তী বর্ম্মা লোক দ্বারা তাঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন। (নির্জ্জিত বর্ম্মা দেখ)।

পার্থসারথি মিশ্র—তিনি একজন বিখ্যাত মীমাংসা শাস্ত্রকার। তিনি জৈমিনি সূত্রের উপর 'শাস্ত্র দীপিকা' নামে এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি মীমাংসা বার্ত্তিকের উপর 'ন্যায়রত্নাকর' নামে এক টীকাও রচনা করিয়াছিলেন; সম্ভবত তিনি খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

পার্ব্বতীকান্ত বাচস্পতি—ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি পঞ্চকোটের রাজসভায় সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি তৎকালে নব্য ন্যায়ের একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত নব্য ন্যায়ের 'পত্রিকা' নামক গ্রন্থ তৎকালে দেশ বিখ্যাত ছিল।

পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায়—তিনি একজন দেশ বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার জন্ম স্থান ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কোটালী পাড়া গ্রাম। ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা বিদ্যাদানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে কলিকাতায় আসিয়া বাগবাজার অঞ্চলে টোল স্থাপন করেন। এবং তদর্থে বহু ব্যয়ও স্বয়ং বহন করেন। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার বিদ্যাখ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে স্বীয় সভাপণ্ডিতের পদে বরণ করেন। মহারাজ প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরও তাঁহাকে, তাহার স্বর্গীয় পিতারই ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদানপূর্ব্বক সম্মানিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পাঁচ মাস পূর্ব্বে তাঁহার সহধর্ম্মিণী পরলোক গমন করেন। তিনি ১৯৩২ খ্রীঃ অব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী পরলোক গমন করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত পতঞ্জলী ভট্টাচার্য্য এম, এ, ও সাত কন্যা বর্ত্তমান।

পার্ব্বতীচরণ দাস—একজন সংবাদপত্রসেবী। তিনি 'সংবাদমৃত্যুঞ্জয়' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

পার্ব্বতীচরণ রায়—তিনি উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থবংশীয়, রাজা নরপতি রায়ের অধঃস্তন ৯ম পুরুষ ও মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত পাঁচথুপীর রায় বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি তৎকালীন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান দর্পনারায়ণ রায়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়া প্রচুর ধন সম্পত্তি ও নবাব হইতে 'রায়' উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ে বহু দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা ও জলাশয়াদি খনন করাইয়া সুনাম অর্জ্জন করেন। তিনি মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে অকালে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পোষ্যপুত্র রামশঙ্কর রায় তৎপরে সম্পত্তির অধিকারী হন। তাঁহার বংশধরেরা এখনও পাঁচথুপীর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন।

পার্ব্বতীদেবী—বারেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত একটাকিয়ার রাজাদের জ্ঞাতি প্রচণ্ড খাঁর পত্নী। প্রচণ্ড খাঁ কোন কারণে রাজাদের উপর বিরক্ত হইয়া শাহজাহানের আশ্রয় লইয়াছিলেন। শাহজাহান তাঁহাকে রোহিল খণ্ডের সুবাদার নিযুক্ত করেন। সেই স্থানে তিনি গঙ্গাপ্রসাদ তেওয়ারীর কন্যা পার্ব্বতীদেবীকে বিবাহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সামাজিক দলাদলি আরম্ভ হয়। তাঁহার পক্ষভুক্ত লোকেরা রোহিলাপটির কুলীন নামে খ্যাত হইলেন। প্রচণ্ড খাঁ দেখ।

পার্ব্বতীনাথ—একজন বাঙ্গালী গ্রন্থকার। 'নলোদয়' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

পার্ব্বজী বাজীরাও মোরে—বিজাপুরের প্রতিষ্ঠাতা ইউসফ আদিল শাহ, তাঁহার অন্যতম মারাঠা সেনাপতি পার্ব্বজী বাজীরাও মোরকে মহাবালেশ্বর ও তাহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশ জায়গীর স্বরূপ দিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র যশোবন্তরাও একজন বীর পুরুষ ছিলেন।

পার্শ্বনাথ—জৈন তীর্থঙ্করদিগের মধ্যে পার্শ্বনাথ ও মহাবীরই প্রধানতঃ ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকৃত। ভগবান পার্শ্বনাথ জৈনদিগের ত্রয়োবিংশতি তীর্থঙ্কর। তাঁহার পিতা অশ্বসেন বারাণসীর ইক্ষাকুবংশীয় রাজা ছিলেন। পার্শ্বনাথের মাতার নাম বামা দেবী। পুত্রের জন্মের পূর্ব্বে বামা দেবী চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্থী তিথিতে বিশাখা নক্ষত্রের যোগ হইলে, নিদ্রাবস্থায় চতুর্দ্দশটি অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করেন। উহার কিছুকাল পরে তিনি গর্ভ ধারণ করেন এবং পরবর্ত্তী পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় দশমী তিথিতে পুনরায় বিশাখা নক্ষত্রের যোগ হইলে পার্শ্বনাথ ভূমিষ্ঠ হন। তিনি যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন বামাদেবী একটি সর্পকে রাত্রকালে তাঁহার পার্শ্বে বিসর্পিত হইতে দেখিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার নাম পার্শ্বনাথ রাখা হয়।

শৈশবাবস্থা হইতেই তাঁহার প্রকৃতিতে মহাপুরুষোচিত নানা সদ্‌গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কোশলরাজ প্রসেনজিতের কন্যা প্রভাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু যৌবনের প্রথমাবস্থা হইতেই সংসারের অনিত্যতা তাঁহার মনকে অভিভূত করে। কিছুকাল পরে সংসারে বীতরাগ হইয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর। প্রথমে কোপটক নামক স্থানে ধন্য নামক একজন সন্ন্যাসীর আশ্রমে গমন করেন। পরে কিছুকাল কাশীতে ঘোর তপস্যা করেন। তিরাশী দিন ব্যাপী তপশ্চর্য্যাকালে তিনি দৈবিক, ভৌতিক, মানুষিক প্রভৃতি অনেক প্রকার উপসর্গের মধ্যেও আত্মধ্যান হইতে বিচলিত হন নাই। তপস্যান্তে তিনি লোকালোক প্রকাশক পূর্ণ কৈবল্যজ্ঞান প্রাপ্ত হন। তদবধি নিজমত প্রচার ও সদুপদেশ দান করিবার জন্য তিনি উত্তর ভারতের বহু স্থানে পর্য্যটন করেন। কিলিকুণ্ডতীর্থ, শিবাপুরী, কৌশাম্বী, রাজপুর, বারাণসী, পুণ্ড্রদেশ, তাম্রলিপ্তি, নাগপুরী প্রভৃতি বহু স্থানে তিনি পরিক্রমণ করিয়া বহু নরনারীকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান ও মোক্ষ লাভের উপায় প্রদর্শন করেন। এই জীবন্মুক্ত কৈবল্য অবস্থায় সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত তিনি তীর্থঙ্কররূপে পরিক্রমণ

করিয়া, যখন নিজের নির্ব্বাণ লাভের সময় আসন্ন বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, তখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু তীর্থঙ্করের কৈবল্য প্রাপ্তির স্থান সমেত শিখরে উপনীত হইলেন। তথায় শ্রাবণ মাসের শুক্লা-ষ্টমীর দিন শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হইলে একশত বৎসর বয়সে যোগাবলম্বন পূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন।

ভগবান পার্শ্বনাথের সময়ে চতুর্যাম ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এই চতুর্যাম ধর্ম্ম জৈনধর্ম্মের মূলভিত্তি। পরবর্ত্তী তীর্থঙ্কর মহাবীর পঞ্চযাম ধর্ম্ম প্রচার করেন। জৈন শাস্ত্র কল্পসূত্রের প্রথমাংশে পার্শ্ব-নাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে। প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অনেকগুলি বিস্তৃত জীবনী আছে। সমুদয় জৈন তীর্থঙ্করদিগের মধ্যে পার্শ্বনাথেরই অধিক প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কল্প সূত্রে তাঁহাকে 'পুরুষাদানী' (পুরুষ প্রধান) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পশ্চিম ভারতের নানা স্থানে বিশেষতঃ গুজরাট ও রাজপুতানায় পার্শ্বনাথের বিগ্রহ সম্বলিত বহু মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বীদিগের শিবলিঙ্গ বা শিব মূর্ত্তি যেরূপ বিভিন্ন নামে বিভিন্ন স্থানে পুজিত হইয়া থাকে ভগবান পার্শ্বনাথও সেইরূপ বিভিন্ন নামে বিভিন্ন তীর্থে জৈনগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। এই সকলের মধ্যে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়েরই পঞ্চাশটি বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে ভগবান পার্শ্ব-নাথ বিভিন্ন নামে পূজিত হন। এই কারণেই তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্তব, স্তুতি, ভজনাদি রচিত হইয়াছে। দিগম্বর সম্প্রদায়ের কয়েক ব্যক্তি পার্শ্বনাথের জীবনী রচনা করিয়াছেন।

(এস্থলে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে কলিকাতায় 'পরেশনাথের মন্দির' নামে পরিচিত জৈনমন্দিরটি আদৌ পার্শ্বনাথের মন্দির নহে)।

পার্শ্বনাথ গণি—একজন জৈন নৈয়ায়িক ও গ্রন্থকার। তিনি খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। 'ন্যায়প্রবেশ' নামক গ্রন্থের তিনি 'ন্যায়-প্রবেশ পঞ্জিকা' নামক একখানা টীকা প্রণয়ন করেন। তদ্ভিন্ন নেমীচন্দ্র রচিত আখ্যান মণিকোষ নামক গ্রন্থের টীকা প্রণয়নে তিনি দেবসূরীর সহকারী ছিলেন বলিয়াও উল্লিখিত হয়।

পার্শ্ব (পুর্ণক)—রাজা কণিষ্কের পৃষ্ঠ-পোষকতায় আনুমানিক ৭৮ খ্রীঃ অব্দে জালন্ধর নগরে একটী বৌদ্ধ সম্মিলন সংঘটিত হয়। সেই সম্মিলনীর কার্য্যা-ধ্যক্ষ পার্শ্ব ও বসুমিত্র ছিলেন। সেই সম্মিলনীতে নানা স্থান হইতে পাঁচশত ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা পালি ভাষায় লিখিতি ত্রিপিটক সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেন। বোধ হয় ইহাই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রথম বৌদ্ধশাস্ত্র।

পালক—অবন্তী দেশের রাজা প্রদ্যোতের পুত্র। পালক অত্যাচারী রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র বিশাখ বা বিশাখ যূপ। পালকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোপালের অর্য্যক নামে এক পুত্র ছিল। এই অর্য্যক, বিশাখকে অপসারিত করিয়া অবন্তীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল। শিশু নাগ এই অর্য্যককে বিনাশ করিয়া অবন্তীর প্রদ্যোত বংশের বিলোপ করেন।

পালক স্তম্ভ—আসাম প্রদেশের শালস্তম্ভ বংশীয় একজন নরপতি। শালস্তম্ভ দেখ।

পাল কাপ্য—তিনি একজন গজায়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বেত্তা পণ্ডিত। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ। তিনি সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

পাহার সিংহ—ফরিদ কোটের রাজা। ১৮০৮ ও ১৮০৯ খ্রীঃ অব্দে লাহোরের মহারাজা রণজিৎ সিংহ তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া, তাঁহার সেনাপতি মোকমচাঁদকে দিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব সন্ধির বলে শতদ্রুর বাম তীরবর্ত্তী ভূমি দাবী করিলেন।

মহারাজা রণজিৎ সিংহ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফরিদকোট রাজ্য পূর্ব্ব অধিকারী পাহার সিংহকে প্রত্যর্পণ করেন। পাহার সিংহ ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দের প্রথম শিখ যুদ্ধে নানাপ্রকারে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়া রাজা উপাধি ও নাভা রাজ্যের অনেক অংশ পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দের দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধেও তাঁহার পুত্র উজির সিংহ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে নানাপ্রকারে সাহায্য করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়েও তিনি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করেন। প্রসিদ্ধ বিদ্রোহী শ্যামদাসের গ্রাম তিনি বিনষ্ট করিয়া দেন। তাঁহার সৈন্য ইংরেজ সেনাপতির অধীনে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিল। এই সকল কারণে তিনি নানাপ্রকারে পুরস্কৃত হন, এবং তাঁহার সম্মানার্থ একাদশ তোপের ব্যবস্থা হয়। ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে উজির সিংহ পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র বিক্রম সিংহ রাজা হইয়াছিলেন। ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে বিক্রম সিংহ পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার পুত্র, দ্বাদশ বর্ষীয় বালক, ব্রজেন্দ্র সিংহ রাজা হন। তিনি মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র (জন্ম ১৯২৫ খ্রীঃ) হরসুন্দর সিংহ রাজা হইয়াছেন।

পিকক, সার বারণস্ (Sir Barnes Peacock)—তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ১৮১০ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৩৬ সালে ব্যারিষ্টারী পাশ করেন। ১৮৫২ সালে তিনি সুপ্রিম

কাউন্‌সিলের সভ্য হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৮৫৯—১৮৬২ সাল পর্য্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তৎপরে হাইকোর্ট স্থাপিত হইলে ১৮৬২—৭০ সাল পর্য্যন্ত তাহার প্রধান বিচারপতি ছিলেন। কোনও কোন সময়ে তিনি ব্যাবস্থাপক সভার (Legislative Council) সভ্য ছিলেন। ১৮৭০ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাত গমন করেন। তৎপরে ১৮৭২ সাল পর্য্যন্ত তিনি প্রিভিকাউন্‌সিলের সভ্য ছিলেন। ১৮৯০ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন।

পিগট, জর্জ লর্ড (Lord George Pigot)—তিনি মান্দ্রাজের গবর্ণর ছিলেন। ১৭১৯ খ্রীঃ অব্দের ৪ঠা মার্চ্চ ইংলণ্ডে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রিচার্ড পিগট। ১৭৩৭ খ্রীঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম লইয়া মান্দ্রাজ প্রদেশে আগমন করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই স্বীয় কার্য্যদক্ষতা গুণে তিনি প্রধান সওদাগরের পদ লাভ করেন। ১৭৫৫ খ্রীঃ অব্দে মান্দ্রাজের কাউন্‌সিলের সভ্য, এবং গবর্ণরের পদ লাভ করিয়া ১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত উক্ত পদে আসীন ছিলেন। ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দে ফরাসীরা মান্দ্রাজ আক্রমণ করিলে, তিনি উক্ত সহর শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হন। এই সময়ে তিনি আভিজাত্য শ্রেণীতে উন্নিত হন। ১৭৬৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি পার্লিয়া-মেণ্টের সভ্য হন। ১৭৬৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল, এল, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি পুনর্ব্বার মান্দ্রাজের গবর্ণর ও প্রধান সেনাপতি হইয়া এদেশে আগমন করেন।

এবারের প্রধান ঘটনা তাঞ্জোরের রাজাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠা করা। আর্ক-টের নবাবের প্ররোচনায় ১৭৭৩ খ্রীঃ অব্দে হঠাৎ তাঞ্জোর নগর আক্রমণ করিয়া ইংরেজ গবর্ণর রাজাকে বন্দী করিলেন এবং তাঁহার রাজ্য আর্কটের নবাবকে প্রদান করিলেন। এই কার্য্যটি ইংলণ্ডের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ ভাল মনে করিলেন না। কেন না ১৭৬২ খ্রীঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত রাজার যে সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে উল্লেখ ছিল যে, কোম্পানী সর্ব্বপ্রযত্নে শত্রুহস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। কিন্তু পিগটের এই কার্য্যদ্বারা কোম্পানী তাহার অপলাপ করিয়াছেন। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ সেই জন্য লর্ড পিগটকে পুনর্ব্বার গবর্ণারের পদ প্রদান করিয়া আদেশ দেন যে, তাঞ্জোরের রাজাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। তদনুসারে আর্কটের নবাবের অনিচ্ছা স্বত্বেও, রাজাকে তাহার রাজ্য পুনঃপ্রদান করা

হইল (১৭৭৬ খ্রীঃ)। কিন্তু এই সময়ে লর্ড পিগট ও কাউন্সিলের সভ্যদের মধ্যে, পলবেন ফিল্ডের তাঞ্জোর রাজার নিকট প্রাপ্য টাকার বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। লর্ড পিগট কাউন্সিলের দুইজন সভ্যকে পদচ্যুত করেন এবং সেনাপতি সার রবার্ট ব্রোচারকে অবরুদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান করেন। কাউন্সিলের সভ্যেরা ইহাতে বিরক্ত হইয়া লর্ড পিগটকেই বন্দী করেন। এই বন্দী অবস্থায়ই তিনি ১৭৭৭ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। বিলাতের ডিরেক্টারেরা ইহার বিচার হাতে নিয়া দেখিলেন যে, লর্ড পিগট নির্দ্দোষ এবং কাউন্সিলের সভ্যেরাই অপরাধী। এজন্য চারিজন সভ্যের প্রত্যেককে পনর হাজার টাকা করিয়া জরিমানা করেন।

পিঙ্গল বৎসজীব—একজন দৈবজ্ঞ। রাজর্ষি অশোকের জন্মের পর তিনিই বলিয়াছিলেন যে, অশোক রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন।

পিঙ্গলাচার্য্য—তিনি একজন ছন্দশাস্ত্রকর্ত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম ছন্দঃসূত্র। উহা অতি বিস্তৃত। তাহার গণ, মাত্রা, বৃত্ত, জগম ইত্যাদি আছে। তিনি কালিদাসের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। কালিদাস তাঁহারই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সংক্ষেপে ছন্দমঞ্জরী প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পিঙ্গলাচার্য্যের জন্মস্থান বৎসদেশ। (বর্ত্তমান এলাহাবাদের পশ্চিমাংশ, কৌশাম্বী তাঁহার রাজধানী ছিল) তিনি মগধের রাজা বিন্দুসারের (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী) সভাপণ্ডিত ছিলেন।

পিটার মুণ্ডি—একজন ইংরেজ পর্য্যটক। তিনি দিল্লীর সম্রাট শাহ-জাহান পাতশাহের সময়ে (১৬২৭—১৬৫৮খ্রীঃ) ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়।

পিণ্ডোল—একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন তাঁহারই উপদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পিপ্পলাদ—প্রাচীন যুগের একজন দার্শনিক আচার্য্য। তিনি গৌতম বুদ্ধের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। প্রশ্নোপনিষদে তাঁহার সহিত বিচারে নিরত আরও ছয়জন আচার্য্যের নাম পাওয়া যায়। তাহা হইতে প্রতীতি জন্মে যে তিনি ঐ সকল আচার্য্যের সমসাময়িক। তাঁহাদের নাম—(১) সুকেশ ভরদ্বাজ, (২) শৈব্য সত্যকাম, (৩) সৌর্য্যায়ণী গার্গ্য, (৪) কৌশল্য আশ্বলায়ন, (৫) ভার্গব বৈদর্ভী ও (৬) কবন্ধী কাত্যায়ন। অন্যান্য সমসাময়িক গ্রন্থাদিতে যে সকল আচার্য্যদের উল্লেখ আছে, সে সমুদয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে পিপ্পলাদকে যাজ্ঞবল্ক্যের পরবর্ত্তী বলিয়া মনে করিতে হয়। অনেকে

মনে করেন যে, পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত ককুধ কাত্যায়ন (পকুধ কচ্চায়ন) ও কবন্ধি কাত্যায়ন একই ব্যক্তি। উমাস্বাতী প্রণীত তত্ত্বার্থ সূত্রের টীকাতে পিপ্পলাদকে "অজ্ঞান কুদৃষ্টি" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্নোপনিষদের বিবরণানুযায়ী তাঁহাকে একজন বিশিষ্ট আচার্য্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাঁহাকে অনেক স্থলে আথর্ব্বণিক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা হইতে অনুমিত হয় যে তিনি 'অথর্ব্ব' নামক চতুর্থ বেদের প্রণেতা অথবা প্রণেতাদের অন্যতম। পুরাণের বিবরণ অনুসারে পিপ্পলাদ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের ভাগিনেয় ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের কংসারি নামক অবিবাহিতা ভগিনীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। জন্মের পর লোকলজ্জাভয়ে কংসারি তাঁহাকে এক পিপ্পলবৃক্ষের পাদমূলে পরিত্যাগ করেন। তজ্জন্য তাঁহার নাম পিপ্পলাদ হয়।

পিয়ার্স, রেভারেণ্ড ডবলিউ,—একজন পাদরী। তিনি 'ভূগোল বৃত্তান্ত' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে স্কুল বুক সোসাইটী কর্ত্তৃক উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে পৃথিবীর আকার ও গতির বিবরণ এবং এশিয়া, ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত ছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সার সংগ্রহও এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছিল।

পিয়ার্স, রেভারেণ্ড জি,—একজন পাদরী। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'কালক্রমিক ইতিহাস' প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থ প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে লিখিত এবং পিনক্ সাহেবের রচিত বাইবেল ইতিহাসের অনুবাদ।

পিয়ার্স, রেভারেণ্ড জে,—একজন পাদরী। ১৮২০ খ্রীঃ অব্দে তিনি একখানি ইংরেজী বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করেন এবং ১৮২৪ খ্রীঃ অব্দে ভূগোল ও জ্যোতিষ বিষয়ক গ্রন্থে ইংরেজীও বাঙ্গালা ভাষায় গদ্যচ্ছলে ভূগোলও জ্যোতিষ সংক্রান্ত বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'বাক্যাবলী' 'নীতিকথা' প্রভৃতি আরও কয়েক খানি গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

পিল, সার লরেন্স (Sir Lawrence Peel)—তিনি কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে ১০ই আগষ্ট ইংলণ্ডে তাঁহারজন্ম হয়। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত রাগবি ও সেণ্টজনকলেজে অধ্যয়ন করিয়া পরে ব্যারিষ্টার হন। স্বদেশে কিছুদিন কাজ করিয়া ইং১৮৪০ সালে কলিকাতায় এডভোকেট জেনারেল (Advocate General) হইয়া আগমন করেন। তৎপরে ১৮৪২ সালে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির

পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়েই তিনি স্যার (Sir) উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৫৪—৫৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি বড়লাটের আইন সভার সদস্য ছিলেন। ১৮৫৫ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে গমন করেন। ১৮৫৬ সালে তিনি বিলাতের প্রিভিকাউন্‌সিলের সদস্য মনোনীত হন। ১৮৫৭ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্যতম পরিচালক সভার (Board of Directors) অন্যতম সদস্যের পদে মনোনীত হন। ১৮৫৮ সালে অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে D. C. L. (Doctor of Civil Law) এই উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইং১৮৮৪ সালের ২২শে জুলাই তিনি পরলোক গমন করেন।

পিলাজী গাইকবাড়—তিনি বরোদা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার প্রপিতামহ নন্দজী ভোর রাজ্যের অন্তর্গত পবন নদী তীরস্থ ভের দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন। সেই সময়ে এক কসাই কতকগুলি গরু ক্রয় করিয়া তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল। গরুগুলি দুর্গের একটী ছোট দরজা দিয়া দুর্গে প্রবেশ করে। নন্দজী হিন্দুর কর্ত্তব্যবোধে গরুগুলিকে রক্ষা করিলেন। এই কার্য্যের জন্য তিনি গাইকবাড় উপনাম লাভ করেন। (গাই অর্থ গরু, কবাড় অর্থ কপাট বা ক্ষুদ্র দ্বার অর্থাৎ গরুর দ্বার বা রক্ষক)। তদবধি তাঁহার বংশধরেরাও গাইকবাড় বা গো-রক্ষক উপাধি গ্রহণ করেন। এই নন্দজীর পুত্র খেরোজী, খেরোজীর চারি পুত্র—দামাজী, লিঙ্গোজী, গুজজী ও হরজী রাও। দামাজী খণ্ডেরাও দাবারের অধীনে কাজ করিতে আরম্ভ করেন। অল্পকাল মধ্যেই স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়া তিনি বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। বালাপুরের যুদ্ধে বিশেষরূপে শত্রু পক্ষকে পরাজয় করিয়া তিনি সহকারী সেনাপতির পদ লাভ করেন। ইহার কিছুকাল পরেই তিনি পরলোক গমন করেন। দামাজী নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র পিলাজীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পিলাজী প্রথমে খণ্ডেরাও দাবারের গৃহ পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইহার কর্ম্ম নৈপুণ্যে ও সাধুতায় সন্তুষ্ট হইয়া খণ্ডেরাও তাহাকে চল্লিশটী রুগ্ন ঘোড়ার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে ঘোড়াগুলি শীঘ্রই হৃষ্ট পুষ্ট হয়। ইহা দেখিয়া খণ্ডেরাও তাঁহার হস্তে আরও চারিশত অশ্ব, তাহাদের আহারাদি ও চিকিৎসার জন্য কিছু অর্থ প্রদান করেন। কিছুদিন পরে, অশ্বগুলি সবল হইলে, পিলাজী উদ্বৃত্ত অর্থসহ তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন। খণ্ডেরাও ইহাতে অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে সৈনিক বিভাগে একটী কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। প্রথমে পিলাজী সুরাটের নিকটবর্ত্তী একটী

দুর্গের অধ্যক্ষ হন। তিনি উহার নাম সোনাগড় (স্বর্ণগড়) রাখেন। পরে দামাজীর মৃত্যুর পরে সহকারী সেনাপতি হইয়াছিলেন। এই সময়ে দুইজন মুঘল কর্ম্মচারীর (রোস্তমআলী ও হামিদ খাঁ) বিবাদে তিনি এক এক পক্ষকে ক্রমান্বয়ে সাহায্য করিয়া ক্ষমতাশালী হন। দিল্লীর সম্রাট এই বিবাদের নিবারণ করিবার জন্য, যোধপুরের রাজা অভয় সিংহকে প্রেরণ করেন। অভয় সিংহ গোপনে বিষ প্রয়োগে পিলাজীকে হত্যা করেন। তৎপরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র দাদাজী পিতৃপদ লাভ করেন (১৭৩২ খ্রীঃ)।

পিলান—তিনি রামানুজের শিষ্য। রামানুজের আদেশে 'তিরুভয়মলি' গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেন।

পিশুন—একজন রাজনীতি শাস্ত্রবিদ্। কৌটিল্য তাঁহার পূর্ব্বগামী যেসকল রাজনীতি শাস্ত্রবিদ্গণের মত উদ্ধৃত করিয়া অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, পিশুন তাঁহাদের অন্যতম। সুতরাং পিশুন কৌটিল্যের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। পিশুন একজন শাস্ত্রকাররূপে মহাভারতেও উল্লিখিত হইয়াছেন।

পীতাম্বর—(১) একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। তিনি ১৪৪৬ শকে (১৫২৪ খ্রীঃ) 'বিবাহ পটল' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি 'নির্ণয়ামৃত' নামে উক্ত গ্রন্থের এক টীকাও রচনা করেন।

পীতাম্বর—(২) তিনি কুচবিহারের রাজা সমর সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

পীতাম্বর—(৩) একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম অনুপান-মঞ্জরী।

পীতাম্বর তর্কভূষণ—বিগত উনবিংশ খ্রীঃ শতাব্দীর প্রথমভাগে ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত নাটাই গ্রামে এই বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিতের জন্ম হয়। তিনি একজন বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধকও ছিলেন। তিনি পরিণত বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন।

পীতাম্বর দাস, চৌধুরী—একজন বৈষ্ণব পদকর্ত্তা ও গ্রন্থকার। তিনি 'রসকল্পবল্লী' প্রণেতা রামগোপাল চৌধুরীর পুত্র এবং শ্যামরায়ের পৌত্র। 'রসমঞ্জরী' নামক গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। তিনি পিতৃপ্রণীত 'রসকল্পবল্লীর' (১৬৪৩ খ্রীঃ) রচিত অষ্টম কলি অবলম্বন করিয়া রসমঞ্জরী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি স্বীয় রচিত পদ ব্যতীত বিদ্যাপতি, পুরন্দর খাঁ, গোবিন্দ দাস, কবিশেখর, কৃষ্ণমঙ্গল, কবিরঞ্জন, গোপাল দাস ও রাধিকা দাস এই নয়জন পদকর্ত্তার পদ সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে প্রমাণাদিসহ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি শচীনন্দন ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পীতাম্বর দে—একজন সঙ্গীতকার। ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে বীরভূম জিলার অন্তর্গত জয়বাজার নামক গ্রামে গন্ধবণিক কুলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বীরভূম, পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানের জিলা স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে প্রধান শিক্ষকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি উনচল্লিশ বৎসরকাল শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত বহু সঙ্গীত আছে। শেষজীবনে তিনি নিজ রচিত অনেকগুলি গান একত্র সংগৃহীত করিয়া 'গীতাবলী' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তাঁহার রচিত কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, গৌরাঙ্গলীলা, শিব-শক্তি তত্ত্ব, অদ্বৈতবাদ ও বিবিধ বিষয়ক অনুমান দুইশত সঙ্গীত আছে। ইংরেজী ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। অব্যবস্থিত চিত্ততার জন্য উপযুক্ততা থাকা সত্ত্বেও তিনি কোন বিশেষ কাজ করিতে পারেন নাই।

পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ—তিনি নবদ্বীপের মৌদ্‌গল্য গোত্রীয় বিখ্যাত কমলাকর জ্যোতিষীর বংশের একটী উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। এই বংশে বহু বিখ্যাত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তিনি উমাকান্ত বিদ্যানিধির তৃতীয় পুত্র। তিনি প্রথমে কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন, পরে জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত হন। তিনি জন্ম পত্রিকায় যাহা লিখিতেন, তাহা কদাচ ভুল হইত না। একজন জমিদার তাঁহার পুত্রের জন্ম পত্রিকায় উনিশ বৎসর সাত মাসে বিবাহ লেখা আছে দেখিয়া তাহা ব্যর্থ করিবার জন্য একুশ বর্ষ বয়সে বিবাহ দিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তিনি উনিশ বর্ষ সাত মাসের দুই দিন থাকিতেই পুত্রের বিবাহ দিতে বাধ্য হন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বড় নিষ্ঠাবান সদাচার সম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন। লোকে তাঁহাকে বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া শ্রদ্ধা করিত। যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার তদনুরূপ সদ্ব্যয়ও ছিল। ষাট বৎসর বয়সে উচ্চ শিক্ষিত উপযুক্ত চারি পুত্র রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার প্রথম পুত্র বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র অধ্যাপক শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী নানা গ্রন্থের রচয়িতা। তৃতীয় পুত্র সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি এইচ ডি মহামহোপাধ্যায়। তিনি নানা গ্রন্থ লিখিয়া সুযশ অর্জ্জন করিয়াছেন। এই বংশ বিদ্যানুরাগ, সদাচার, বিদ্যাদান প্রভৃতি সৎকার্য্যের জন্য বিখ্যাত।

পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য—একজন গ্রন্থকার। 'রতিবিলাস' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত। উহা কালিদাস প্রণীত 'কুমার সম্ভব' কাব্যের আংশিক অনুবাদ।

পীতাম্বর মিত্ররাজা—দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের একজন বিশ্বস্ত বাঙ্গালী হিন্দু সেনাপতি। ১৭৪৭ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গের নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর রাজত্বকালে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বড়িষা নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা এবং পিতামহ উভয়েই মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার পিতা অযোধ্যারাম মিত্র নবাবের অতিশয় প্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন। নবাব তাঁহাকে 'রায়-বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন। নবাবের অনুরোধেই সম্রাট শাহআলম পীতাম্বরকে সেনাপতি পদ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া পরে সম্রাট তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি ও দশ হাজার মুসলমান অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করেন। মহারাষ্ট্র যুদ্ধে রাজা পীতাম্বর মিত্র সম্রাটের নিকট হইতে পুরস্কার স্বরূপ বর্ত্তমান এলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত 'কড়ার' সুদৃঢ় দুর্গ ও নগর জায়গীর প্রাপ্ত হন। এই কড়া নগরের বার্ষিক আয় দুই লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা ছিল। অযোধ্যার সুপ্রসিদ্ধ নবাব আসফ-উদ্দৌলার সহিত রাজা পীতাম্বর মিত্রের অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। কথিত আছে, রাজা তাঁহার নিকট নয় লক্ষ টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। তিনি কার্য্য হইতে অবসর লইয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে নবাব তাঁহাকে ঐ টাকা প্রত্যর্পণ করেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে গোলাম কাদির বিদ্রোহী হইয়া শাহ আলমকে অন্ধ করিয়া দেন। তখন দিল্লীর সাম্রাজ্য অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। ইহার পরেই তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে মেছুয়াবাজারের বিখ্যাত মিত্র পারিবারিক বাড়ীতে উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করায় এই বাটী পরিত্যাগ করিয়া সুঁড়ার বাগানে যাইয়া প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় পরিবারসহ বাস করিতে থাকেন এবং 'সুঁড়ার রাজা' বলিয়া অভিহিত হন। তাঁহার পুত্র রাজা বৃন্দাবন মিত্র অশেষ গুণসম্পন্ন ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন; কিন্তু অমিতব্যয়িতার জন্য পিতার অর্জ্জিত জায়গীরটি নষ্ট করিয়া ফেলেন। পীতাম্বর মিত্র ভারত বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রপিতামহ ছিলেন।

পীতাম্বর মিশ্র— ১৭০০ শকে ১৭৭৮খ্রীঃ) তিনি গণেশকৃত অলঙ্কারের উপর এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়—একজন বাঙ্গালী আভিধানিক। 'শব্দসিন্ধু' নামক

অভিধান তাঁহার সঙ্কলিত। অমর-কোষে সংগৃহীত সমুদয় শব্দের বাঙ্গালা অর্থ এই অভিধানে প্রদান করা হইয়াছে।

পীতাম্বর মোহান্ত—আসাম প্রদেশের আহম বংশীয় নরপতি কমলেশ্বর সিংহের রাজত্বকালে (১৭৯৫ খ্রীঃ—১৮১০ খ্রীঃ) মোয়ামারিয়ারা বিদ্রোহী হয়। বুড়া গোঁহাই তাঁহা-দিগকে খেরকেটিয়া সুটী নদীর তীরে পরাস্ত করিয়া তাহাদের দলপতি পীতাম্বর মোহান্তকে নিহত করেন এবং অন্যতম দলপতি ভারতী রাজা সেই সময় পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন।

পীতাম্বর সেন—একজন গ্রন্থকার। 'উষাহরণ' নামক বিবিধ ছন্দে রচিত তাঁহার একখানি গ্রন্থ আছে।

পীতো—তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্মের ইতি-হাস রচয়িতা তারানাথের মতে বসু বন্ধুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসঙ্গ কর্তৃক বৌদ্ধ-দিগের মধ্যে প্রথম তন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয় খ্রীঃ ৪র্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে। খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীতে পীতো নামক এক ব্যক্তি 'কালচক্র তন্ত্র' প্রবর্ত্তন করেন।

পীপা—রামানন্দের প্রধান দ্বাদশজন শিষ্যের অন্যতম। (জন্ম—১৪২৫খ্রীঃ অব্দ) রাজপুতানার অন্তর্গত গাগরোহ গড়ের তিনি রাজপুত জাতীয় রাজা ছিলেন। তিনি শাক্ত ছিলেন, কিন্তু রামানন্দের উপদেশ শুনিয়া ভক্তি পথ অবলম্বন করেন। তিনি যখন সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তখন রাণীদের মধ্যে ছোট রাণী সীতাদেবী রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর সঙ্গে পথের ভিখারী হইয়াছিলেন। পীপা গান করিতেন ও সীতাদেবী নৃত্য করিতেন। এই উপায়ে লব্ধ অর্থ গরীবদিগকে দান করিতেন। দ্বারকাতীর্থে যাইবার পথে পীপার প্রতিষ্ঠিত মঠ আছে। উহা অতিথি সেবার জন্য বিখ্যাত। এই স্থানে ভক্তদের অঙ্গে ভগবানের মুদ্রার ছাপ দেওয়া হয়।

পীযুষকান্তি ঘোষ—বাঙ্গালী সাংবা-দিক। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' নামক দেশ বিখ্যাত সংবাদ পত্রের প্রতিষ্ঠাতা শিশিরকুমার ঘোষের তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় পিতৃভবনে তাঁহার জন্ম হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি কিছুকাল কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন।

পিতা শিশিরকুমার ও পিতৃব্য মতিলাল ঘোষের সাহচর্য্যে বাল্যকাল হইতেই সংবাদপত্র পরিচালনার সকল বিষয় শিক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করেন এবং পরবর্ত্তী জীবনে অমৃত-বাজার পত্রিকারই অন্যতম পরিচালক হন। সংবাদপত্র পরিচালনা বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান বহু বিস্তৃত ছিল। প্রায়

ছয়ত্রিশ বৎসরকাল অসাধারণ দক্ষতার সহিত তিনি পত্রিকার উন্নতিকল্পে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। স্বাস্থ্যহানী হওয়ায় তিনি কর্ম্মজীবন হইতে কতকটা অবসর গ্রহণ করেন।

পীযুষকান্তি পরলোক-তত্ত্বে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। শিশিরকুমার প্রতিষ্ঠিত পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পত্রিকার (The Hindu Spiritual Magazine) তিনি অনেকদিন সম্পাদক ছিলেন।

বহু জনহিতকর কার্য্যের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কলিকাতার প্রথম মহামারী (Plague) রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, তখন তিনি অকুতোভয়ে রোগাক্রান্ত পল্লীসমূহে গমন করিয়া জনসাধারণকে আশ্বাস দান করিতেন।

ব্যায়াম চর্চ্চার অভাবে বাঙ্গালী হিন্দুদের শারীরিক শক্তি হ্রাস পাইতেছে ইহা বিশেষভাবে অনুভব করিয়া তিনি ব্যায়াম চর্চ্চার উৎসাহ দানের জন্য একটি সমিতি স্থাপন করেন এবং উহার উন্নতির জন্য প্রভূত পরিশ্রম করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতি, ধর্ম্মভীরু বৈষ্ণব ছিলেন। অমায়িক স্বভাব ও জনহিতৈষণার জন্য বিশেষ লোক প্রিয় ছিলেন। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে (১৯২৮ খ্রীঃ, নবেম্বর) কলিকাতা নগরেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

পীরন শাহ—তিনি খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন সাধক। উজ্জয়িনীর রাজবংশের এক শাখা বক্সারের নিকটবর্ত্তী জগদীশপুরে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। এই বংশেই পীরনশাহের জন্ম হয়। তিনি মুসলমানদের অত্যাচার হইতে ভাইদেরে বাঁচাইতে যাইয়া স্বয়ং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তিনি তখন এক দর্জ্জির কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহারই গর্ভে তাঁহার পুত্র সাধক দরিয়া শাহ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের উপর সুফী সম্প্রদায়ের প্রভাব খুব বেশী ছিল। তাঁহারা লিখিত কোন শাস্ত্র, ব্রত, তীর্থভ্রমণ, বাহ্য আচার অনুষ্ঠান, ভেক, মন্ত্র প্রভৃতি কিছুই মানেন না। তাঁহাদের প্রধান গ্রন্থ জ্ঞানদীপক। তাঁহারা মূর্ত্তি বা অবতারের পূজা করেন না। জীবহিংসা, মদ্যপান, মৎস্য-মাংস আহার প্রভৃতি তাঁহাদের মতে নিষিদ্ধ। ছাপরা জিলার মির্জাপুরে, তেলপা, দংসী, মুজরেপুর, যমুয়া চৌকী প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের আখড়া আছে। তাঁহারা হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মিলনপ্রার্থী।

পীরমোহাম্মদ জাহাঙ্গীর— তিনি প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী তৈমুরলঙ্গের পুত্র। তিনি ১৩৯৬ খ্রীঃ অব্দে, সিন্ধু নদ উত্তীর্ণ

হইয়া উব নগরে উপস্থিত হইলেন। মুলতানের শাসন কর্ত্তা সারঙ্গ খাঁ তাঁহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বাধা দিবার জন্য দ্রুত গতিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পীরমোহাম্মদ পূর্ব্বেই সারঙ্গ খাঁর অভিসন্ধি অবগত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সুতরাং সারঙ্গ খাঁ পরাজিত হইয়া মুলতান দুর্গে আশ্রয় লইলেন। পীরমোহাম্মদ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া মুলতান অবরোধ করিলেন। ছয় মাসের পর খাদ্যাভাব উপস্থিত হইলে, সারঙ্গ খাঁ আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার দুই বৎসর পরে, তৈমুর ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। দিল্লীর আক্রমণ সময়েও পীরমোহাম্মদ একদল সৈন্যের নায়ক ছিলেন। কিন্তু তৈমুরের মৃত্যু সময়ে তিনি সমরকন্দে উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া রাজ্যাধিকারী হইতে পারেন নাই।

পীর মোহাম্মদ মোল্লা—তিনি শিরবানের অধিবাসী ছিলেন। সম্রাট আকবরের অধীনে পাঁচ হাজারী সেনাপতি ছিলেন। মালবের রাজাকে দমন করিবার জন্য তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অনুসরণ করিতে যাইয়া ১৫৬১ খ্রীঃ অব্দে নর্ম্মদা নদী পার হইবার সময় জলমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন।

—তাঁহার প্রকৃত নাম আখি সিরাজউদ্দিন ওসমান। কিন্তু এতদ্দেশে তিনি পীরাণে পীর নামেই খ্যাত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ পীর নিজামউদ্দিন আউলিয়ার (১২৩৬—১৩২৫ খ্রীঃ) নিকট আগমন করেন। নিজাম তাঁহাকে শিক্ষা লাভের জন্য ফকরউদ্দিন জিরাদির নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাঁহার নিকট বিশেষরূপে শিক্ষিত হন। নিজামউদ্দিন পীরাণে পীরকে হিন্দুস্থানের দর্পণ বলিতেন। নিজামউদ্দিনের আদেশে তিনি বাঙ্গালায় আগমন করেন। গৌরের সুলতান খাজা ইলিয়াস শাহ তাঁহার শিষ্য ছিলেন। ১৩৫৭ খ্রীঃ অব্দে (৭৫৮ হিঃ) তিনি পরলোক গমন করেন। দিনাজপুরে সাগর দীঘীর উত্তর পশ্চিম কোণে এই মহাত্মার সমাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পালোনীলকণ্ঠ—শিবাজী ছত্রপতির সময়ে, তাঁহার পিতা নীলকণ্ঠ নায়ক পুরন্দর দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে পালোনীলকণ্ঠ অন্যান্য ভ্রাতাদিগকে বঞ্চিত করিয়া বিজাপুরের নবাবের অনুমতি ব্যতীত পিতৃপদ ও পিতৃসম্পত্তি অধিকার করেন। দ্বিতীয় ভ্রাতা শঙ্কর রাওজী নীলকণ্ঠ, শিবাজীর নিকট বিচার প্রার্থী হইলেন। শিবাজী এই বিবাদের সুযোগ গ্রহণ করিয়া দুর্গ অধিকার পূর্ব্বক স্বীয় অন্যতম সেনাপতি মোর পিঙ্গলকে তাহার অধ্যক্ষ পদ প্রদান করিলেন। বলা

বাহুল্য পীলো প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ ক্ষতি পূরণ স্বরূপ প্রচুর ভূমি সম্পত্তি অন্যত্র পাইয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন।

পুঞ্জ—তিনি পদারতের পুত্র ও রাঠোর বংশের প্রতিষ্ঠাতা নয়ন পালের পৌত্র। তাঁহার ত্রয়োদশটি পুত্র হইতে রাঠোর বংশ, ত্রয়োদশটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। (১) ধর্ম্মডুম্ব—তাঁহা হইতে দানেশ্বর কালধ্বজ শাখা, (২) ভাবুদ তাঁহা হইতে অভয়পুরী কামধ্বজ শাখা, (৩) বীরচন্দ্র হইতে কুপশীয় কামধ্বজ, (৪) অমর বিজয় হইতে কামধ্বজ শাখা, (৫) সুবর্ণ বিনোদ হইতে জিরখেরাধ্বজ শাখা, (৬) পদ্ম হইতে পদ্ম কামধ্বজ, (৭) ঐহর হইতে ঐহর কামধ্বজ, (৮) বরদেব হইতে পারুক কামধ্বজ, (৯) উগ্রপ্রভু হইতে চাদেল কামধ্বজ, (১০) মুকুন্দ দান হইতে বার কামধ্বজ শাখা, (১১) ভূরে হইতে ভূরো কামধ্বজ, শাখা (১২) অনক্ষ্ণ হইতে ক্ষীরোদায় কামধ্বজ শাখা, এবং (১৩) চাঁদ হইতে চাদ কামধ্বজ শাখা।

পুঞ্জরাজ—তিনি একজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। নন্দাবার নগরাধিপতি শিলাদেবের মনোরঞ্জনার্থ তিনি 'শম্ভু হোরা প্রকাশ' নামক জাতক ফল গ্রন্থের প্রণয়ন করেন। রাজা শম্ভুদাসের ১৬৭২ খ্রীঃ অব্দে জন্ম হয়। পরম শুক্ল উহার এক টীকা রচনা করেন। আর একজন সারস্বত ব্যাকরণের টীকা রচনা করেন।

পুড়ুমারি—অন্ধ্রদেশীয় একজন রাজা। পোটিন নামক মিশ্র ধাতু নির্ম্মিত তাঁহার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজার অবস্থান স্থান নির্ণয় হয় নাই। এই জাতীয় মুদ্রার একদিকে হস্তী মূর্ত্তি ও অপরদিকে উজ্জয়িনী নগরের চিহ্ন আছে।

পুণ কুণ্ড নাড়াল বার—তিনি খ্রীঃ দশম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের শিরিয়-বয়ল নামক স্থানের রাজা ছিলেন। সিংহলের রাজা পরাক্রম বাহুর সেনাপতি লঙ্কাপুর দণ্ডনাথ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

পুণ্ডরীক—যমুনাচার্য্যের অন্যতম প্রধান শিষ্য মহাপূর্ণের পুত্র। মহাপূর্ণ স্বীয় শিষ্য রামানুজের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন সেজন্য স্বীয় পুত্র পুণ্ডরীককে তাঁহার শিষ্য করিয়া দেন।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। চট্টগ্রামের অন্তর্গত চক্রশালা গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। তিনি গাঙ্গুলী বংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে পিতৃ সম্বোধন করিতেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও তিনি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন।

পুণ্ডরীক বিঠ্‌ঠল—তাঁহার জন্মস্থান কর্ণাট দেশ। তিনি আহম্মদ নগরের

অধিপতি প্রথম বুরহান নিজাম শাহের আশ্রয়ে থাকিয়া (১৫০৮—১৫৫৩ খ্রীঃ) 'ষড়রাগ চন্দ্রোদয়' নামক একখানা সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধীয় বই রচনা করেন। তাঁহার রচিত রাগমালা ও রাগ মঞ্জরী নামক গ্রন্থদ্বয় রাজা মানসিংহ ও মাধব সিংহের সাহায্যে রচিত হইয়াছিল। তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ 'নর্ত্তন নির্ণয়' দিল্লীর সম্রাট আকবর শাহের উৎসাহে রচিত হইয়াছিল। ভারতীয় প্রাচীন নৃত্য কলার প্রচলিত আদর্শ, পদ্ধতি ও লক্ষণাদি তাঁহার সঙ্কলিত গ্রন্থে অতি উত্তমরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

পুণ্যরাজ—তিনি হরিকারিকা নামক গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

পুতলা বাঈ—ছত্রপতি শিবাজীর দ্বিতীয়া পত্নী। প্রথমা স্ত্রী সই বাঈ পরলোক গমন করিলে শিবাজী পুতলী বাঈকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে কোন সন্তান জন্মে নাই। স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি চিতায় আরোহণ করেন।

পুত্ত—দিল্লীশ্বর সম্রাট আকবর চিতোর আক্রমণ করিলে, মিবারের বহু সামন্ত নরপতি চিতোর রক্ষার্থ শোণিত দান করিয়াছিলেন। কিন্তু তন্মধ্যে যে দুইজন মহাবীর দুর্দ্দান্ত মুঘল সম্রাটের দর্পহারী প্রচণ্ড ধূমকেতুরূপে উদিত হইয়া, মিবারের সেই বিষাদ তমসাচ্ছন্ন ভাগ্য গগন কিয়ৎক্ষণের জন্য বিকট উজ্জ্বল আলোকে বিভাষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, যাঁহাদিগের লোক বিস্ময়কর অমানুষিক বীরত্ব ও রণ নৈপুণ্যের বিবরণ জ্বলন্ত বর্ণে চিত্রিত হইয়া মিবারের ইতিহাসের এই অন্ধতম অধ্যায়কে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। স্বয়ং আকবর শাহও যাঁহাদের বীরত্ব ও রণ নৈপুণ্য অক্ষয় রাখিবার অভিপ্রায়ে স্বহস্তে তদ্বিবরণ প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পবিত্র নাম জয়মল্ল ও পুত্ত। কৈলবার অধিপতি পুত্ত চন্দাবৎ কুলের অন্যতম শাখা জগাবৎ গোত্রের শীর্ষস্থানীয় বীর। যখন শালুম্ব্রাপতি চন্দাবৎ বীর সাহিদাস সূর্য্য তোরণদ্বারে আত্মোৎসর্গ করিলেন, তখন হতাবশিষ্ট চন্দাবৎ বীরদিগের অধিনেতৃত্ব ভার কৈলবারপতি পুত্তের করে সমর্পিত হইল। তৎকালে পুত্তের বয়স ষোড়শ বৎসর মাত্র। তাঁহার পিতা তাঁহার শিশুকালেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন-ছিলেন। তিনি পিতার একমাত্র সন্তান সুতরাং কৈলবারপতির একমাত্র বংশধর। তাঁহার অপমৃত্যুতে সমস্ত জগাবৎ গোত্রের নামই লুপ্ত হইবে, ইহা জানিয়াও পুত্তের বীর্য্যবতী জননী চিতোরের গৌরব রক্ষার্থ স্বীয় তনয়কে পীত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক জীবন উৎসর্গ করিতে বলিলেন। তিনি বীর বালক, বীর জননী স্বয়ং বীরা। পুত্রের মৃত্যুর সমকালে যে বিপুল জগাবৎ কুল, অনন্ত কালের জন্য লুপ্ত হইয়া যাইবে সে চিন্তা

তাঁহার হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পাইল না। পুত্র যে মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করিবেন, তাঁহার জীবন যে পবিত্রতম ব্রত পালনেই ব্যয়িত হইবে, ইহাই বীর মাতার একমাত্র সান্ত্বনা। তিনি কি শুধু পুত্রকেই সমরাঙ্গনে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন? না—না, স্বয়ং আপনার সুকোমল অঙ্গে কঠিন লৌহবর্ম্ম ও অস্ত্রশস্ত্রাদি ধারণপূর্ব্বক সমরাঙ্গণে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পুত্তের বীরা জননী সুকুমারী বালিকা পুত্রবধূকেও বীর সাজে সজ্জিতা করিলেন। তাঁহার শিরিষ-কুসুম সুকুমার দেহে কঠিন লৌহ কবচ পরাইয়া হস্তে একটী সুতীক্ষ্ণ শূল প্রদান করিলেন। পুত্রবধূসহ বীরা মাতা সমরাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। এই বীরা মাতার দৃষ্টান্ত সহস্র রমণী হৃদয়ে উন্মাদনার অনল জ্বালিয়া দিল। অন্তঃপুরের অবরোধ বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্ত উৎসাহে তাঁহারা তাঁহার অনুগমন করিলেন। দেখিতে দেখিতে রমণীগণ শ্রবণভৈরব রণ বাদ্যের সহিত উন্মাদনা রণ গীতি গাহিতে গাহিতে ভয়ঙ্করী রণচণ্ডীবেশে মুঘল সেনা সাগরে ঝম্প প্রদান করিলেন। রাজপুত বীরগণ এই অশ্বারূঢ়া বীরাঙ্গনাগণের যুদ্ধ নৈপুণ্য দেখিয়া বিস্মিত ও মোহিত হইলেন। তাঁহারা দেখিতে দেখিতে অসংখ্য অরাতি সৈন্য নিপাত করিয়া সমরাঙ্গণে চিরকালের জন্য শয়ন করিলেন। এদিকে রাজপুত বীরবৃন্দ পীত বসন পরিধান করিয়া শত্রু বিনাশে তৎপর হইলেন। 'জীবন যায় যাবে, তবু শত্রু হস্তে আত্মসমর্পণ রূপ হেয় কর্ম্ম করিব না।' এই প্রতিজ্ঞা করিয়া জীবন আহুতি দিতে লাগিলেন। মুঘলের আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে অসংখ্য রাজপুত বীর জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। আকবর স্বয়ং জয়মল্লকে দূর হইতে গুলির আঘাতে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পাতিত করিলেন। চিতোরের পতন হইল। কিন্তু স্বয়ং আকবরও এই বীরদ্বয়ের অদ্ভুত বীরত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেই জয়মল্ল ও পুত্তের লোক বিস্ময়কর বীরত্ব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য সম্রাট আকবর দিল্লীতে আপন প্রাসাদের সিংহদ্বারে অত্যুচ্চ বেদিকোপরি তাঁহাদের উভয়ের হস্ত্যারূঢ় দুইটী পাষাণ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

পুত্রদাস রায়—হোশেন কুলি খাঁর পরে, দিল্লীর সম্রাট আকবর শাহ মজফর খাঁকে (১৫৭৯—৮০ খ্রীঃ) বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। সেই সময় পুত্রদাস রায় ও মীর আদম খাঁ রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তা হইয়া আগমন করেন। মুঘল সেনাপতিগণ পাঠান সামন্তদিগের জায়গীর অধিকার করিয়াছিলেন। জলেশ্বরের জায়গীর-

দার খালেদি খাঁ ও ঘোড়াঘাটের (রংপুর) জায়গীরদার বাবা খাঁ বিদ্রোহী হইলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত জায়গীরদার তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সম্রাট এই বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া আদেশ করিলেন যে, বিদ্রোহীরা স্ব স্ব জায়গীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। এই বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য বিদ্রোহীরা রাজকর্ম্মচারী পুত্রদাস রায় ও বক্‌সি রিজভি খাঁকে তাঁহাদের নিকট পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। এই কর্ম্মচারীদ্বয়কে হাতে পাইয়া বিদ্রোহীরা তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন এবং শাসনকর্ত্তার নিকট অসম্ভব দাবী করিলেন। অবশেষে বিদ্রোহীদের হস্তে মজফর খাঁ প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন।

পুরগুপ্ত—তিনি মগধের গুপ্তবংশীয় নরপতি প্রথম কুমার গুপ্তের অন্যতমা মহিষী অনন্তদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম কুমার গুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা স্কন্দগুপ্ত রাজা হইয়াছিলেন। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পরে, পুরগুপ্ত রাজা হন। তাঁহার মহিষীর নাম শ্রীবৎসাদেবী। পুত্রের নাম নরসিংহ গুপ্ত। তিনি খ্রীঃ পঞ্চম শতকে বর্ত্তমান ছিলেন।

পুরঞ্জয় পাল—১০১৪ খ্রীঃ অব্দে অনঙ্গ পালের মৃত্যুর পরে, গজনীর সুলতান মামুদ তাঁহার নবম অভিযানে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। এইবার তিনি নিন্দুনা দুর্গ আক্রমণ করিলেন। নিন্দুনা বর্ত্তমান নন্দকুল নগর। ইহা নন্দীসর নামক সরোবরের তীরে শ্রীনগর হইতে ২৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত। নিন্দুনা-পতি সুলতান মামুদের আগমনে ভয় পাইয়া নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক কাশ্মীরের দিকে পলায়ন করেন। সুলতান মামুদ নগর লুণ্ঠন করিয়া কাশ্মীরের দিকে পুরঞ্জয় পালের পশ্চাদ্ধাবিত হন। কিন্তু তাঁহার দর্শন না পাইয়া তিনি কাশ্মীর লুণ্ঠন ও বহু দাসদাসী সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন।

পুরণকশ্যপ—ভগবান বুদ্ধের সমকালবর্ত্তী একজন দার্শনিক আচার্য্য পরিব্রাজক। তিনিও গৌতমবুদ্ধ, মহাবীর প্রভৃতির ন্যায় একটি পরিব্রাজক সন্ন্যাসী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ অক্রিয়াবাদী ছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্র সমূহের বহুস্থানে পুরণ কশ্যপের সহিত ভগবান বুদ্ধ, মহাবীর অথবা তাঁহাদের শিষ্যদের আলোচনা ও বিতর্কের বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি খুব সম্ভব জলে ডুবিয়া সন্ন্যাস জীবনের শেষভাগে দেহত্যাগ করেন।

পুরণ ভকত—মধ্যযুগের একজন সাধক। সম্ভবত খ্রীঃ ১৬শ শতকে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। পঞ্জাবের শিয়াল

কোটে তাঁহার আস্তানা আছে। বহু লোক সেই স্থানে সাধনার্থ গমন করিয়া থাকেন। তিনি হিন্দু মুসলমানের মিলনার্থী ছিলেন।

পুরণমল খেদুরিয়া—সম্রাট আকবর শাহের রাজত্বকালে, একবার বাঙ্গালা সুবার জায়গীরদারেরা বিদ্রোহী হইলে তাঁহাদের দমনার্থ সম্রাট আকবরকর্ত্তৃক মানসিংহ বঙ্গদেশে প্রেরিত হন। হাজীপুরের জমিদার পুরণমল খেদুরিয়া সেই বিদ্রোহীদের অন্যতম ছিলেন। মানসিংহ ১৫৮৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার দুর্গ আক্রমণ করিলে, পুরণমল বিস্তর নগদ টাকা ও আপনার সমুদয় হস্তী প্রদান করিয়া সম্রাটের শরণাপন্ন হন। মানসিংহ পুরণমলকে ক্ষমা করিয়া তৎপ্রদত্ত অর্থ ও হস্তী দিল্লীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

পুরণ মল্ল—গিধোরের রাজা, তিনি ১৫৭৪ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত গিধোরের রাজবংশ অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশ। বীর বিক্রম সিংহ নামক চন্দ্রবংশীয় এক রাজপুত ক্ষত্রিয় ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ১০৬৬ খ্রীঃ অব্দে এই রাজ্যের স্থাপন হয়। এই বংশের দশম নরপতি পুরণ মল্ল বৈদ্যনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। সম্রাট আকবর শাহের রাজস্ব মন্ত্রী টোডর মল্ল তাঁহারই সাহায্যে মুঙ্গের দুর্গ অধিকার করিয়া দাউদ খাঁকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই বংশের চতুর্দ্দশ নরপতি দেলোয়ার সিংহ দিল্লীর সম্রাট শাহ-জাহান পাতশার নিকট হইতে ১৬৫১ খ্রীঃ অব্দে সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী রাজা গোপাল সিংহকে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট রাজা বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারই পৌত্র মহারাজা সার জয়মঙ্গল সিংহ, ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহে এবং ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়া কে, সি, এস, আই উপাধি পাইয়াছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণকালে ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে পুরুষানুক্রমে মহারাজা উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার পরলোক গমনের পরে, তাঁহার পুত্র শিবপ্রসাদ সিংহ বাহাদুর সিংহাসনারোহণ করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র মহারাজা সার রাবণেশ্বরপ্রসাদ সিংহ বাহাদুর রাজপদ লাভ করেন। ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দ হইতে তিনি কয়েকবার বাঙ্গালার মন্ত্রী সভার সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। তিনি ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের সদস্য ও অবৈতনিক বিচারপতি (Honourary Magistrate) হইয়াছিলেন। তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র রাজা চন্দ্রমৌলীপ্রসাদ সিংহ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

পুরদিল খাঁ—দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজীবের অন্যতম সেনাপতি। যোধপুরের রাণা যশোবন্ত সিংহ কাবুল নগরে প্রাণত্যাগ করিলে, সম্রাট তাহার পুত্রদিগকে হস্তগত করিবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু মহারাজ যশোবন্তের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দুর্গাদাসের কৌশলে রাণী পুত্রগণসহ যোধপুরে পলায়ন করিতে সমর্থ হন। (দুর্গাদাস দেখ)। ইহা প্রকাশিত হইলে সম্রাট অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া মাড়বার (যোধপুর) রাজ্য আক্রমণ করেন। তাঁহার অন্যতম সেনাপতি পুরদিল খাঁ শিবানো অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু অচিরেই রাঠোর সেনাপতি রত্নসিংহ ১৬৮৫ খ্রীঃ অব্দে পুরদিল খাঁকে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন।

পুরন্দর—তিনি একজন বাস্তুশাস্ত্রোপদেশক। তাঁহার রচিত বাস্তুশাস্ত্র এখন পাওয়া যায় না। মৎস্য পুরাণে—ভৃগু, বশিষ্ঠ, বিশ্বকর্ম্মা, ময়, নারদ, নগ্নজিৎ, বিশালাক্ষ, পুরন্দর, ব্রহ্মা, কুমার, নন্দীশ, শৌনক, গর্গ, বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, শুক্র ও বৃহস্পতি এই আঠারজন বাস্তুশাস্ত্রোপদেশকের নাম পাওয়া যায়।

পুরন্দর খাঁ—(১) একজন গ্রন্থকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'কৃষ্ণমঙ্গল'। গোপীনাথ বসু দেখ।

পুরন্দর খাঁ—তাঁহার প্রকৃত নাম গোপীনাথ বসু ও তাঁহার পিতার নাম ঈশান বসু। তিনি দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ এবং বাঙ্গালার নবাব হোসেন শাহের (১৪৯৪—১৫২৫ খ্রীঃ) উজির ছিলেন। হোসেন শাহ তাঁহাকে পুরন্দর খাঁ উপাধি প্রদান করেন। তিনি একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন। দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সমাজে সমান পর্য্যায়ে বিবাহ দিবার নিয়ম তিনিই প্রবর্ত্তন করেন। বর্ত্তমান হুগলী জেলার মেয়াখালা গ্রামে তাঁহার বাসস্থান ছিল।

পুরন্দর পাল—তিনি আসামের বিখ্যাত নরপতি রত্নপালের পুত্র। তিনি যেমন বীর ছিলেন, তেমনি বিদ্যানুরাগীও ছিলেন। তিনি স্বয়ং কবি ছিলেন। তিনি দ্যূত ক্রীড়ায় অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। দুর্লভা নাম্নী এক ক্ষত্রিয় কুমারীকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে ইন্দ্রপাল জন্মগ্রহণ করেন। পিতার জীবিতকালেই পুরন্দর পরলোক গমন করাতে ইন্দ্রপাল পিতামহ রত্নপালের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

পুরাণ সিংহ—বর্ত্তমানকালের পঞ্জাবের শিখ জাতির একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার কবিতা আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ। তিনি শিখ জাতির অতি প্রিয় কবি।

পুরীহর—চিতোরের মহারাণা খোমানের আহ্বানে যে সকল স্বদেশ ভক্ত মহাবীর স্বদেশ শত্রু মুসলমানদিগকে তাড়াইবার জন্য খোমানের পতাকা

তলে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, কাশ্মীরের পুরীহর তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। খোমান দেখ।

পুরু—৩২৬ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দের প্রথমভাগে আলেকজাণ্ডার সিন্ধু নদী উত্তীর্ণ হইলেন। ঐ স্থান তক্ষশীলার নরপতির অধীন ছিল। তিনি যুদ্ধ না করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই সময়ে ঝিলাম ও চিনাব নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে পুরু নামে এক নরপতি বাস করিতেন। তিনি দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারকে বাধা দিতে প্রস্তুত হইলেন। রাজা পুরু ও তাঁহার দুই পুত্র পঞ্চাশ হাজার পদাতিক, তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, এক হাজার রথ ও একশত ত্রিশটী হস্তীসহ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হইল। পুরুর এক পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রেই শয়ন করিলেন। পুরু বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া ক্ষত বিক্ষত দেহে বন্দী হইয়া আলেকজাণ্ডার সমীপে নীত হইলেন। তিনি রাজা পুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কিরূপ ব্যবহার আমার নিকট প্রত্যাশা কর?' পুরু উত্তর করিলেন—'রাজার মত।' আলেকজাণ্ডার তাঁহার শৌর্য্য ও বীর্য্যে পূর্ব্বেই তাঁহার উপর শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার বাক্যে ততোধিক প্রীত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। তৎপরে তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যার্পণ করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট দেখ।

পুরুষ দত্ত—মথুরার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে গ্রীক শকরাজগণের মুদ্রার সহিত অনেক প্রাচীন তাম্র মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই সকল মুদ্রায় পুরুষ দত্ত, বলভূতি প্রভৃতি রাজার নাম ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত আছে। কিন্তু তাঁহারা কোন্ স্থানের রাজা ছিলেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

পুরুষোত্তম—(১) তিনি উড়িষ্যার সূর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত নৃপতি কপিলেন্দ্রের পুত্র। ১৪৭০—১৪৯৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তিনি কপিলেন্দ্রের মত পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন না। রাজ্য লাভ করিবার ৫।৬ বৎসর মধ্যেই তিনি পিতৃ রাজ্যের অর্দ্ধাংশেরও অধিক হইতে বিচ্যুত হন। বাহমনী বংশের রাজা তৃতীয় মোহাম্মদের একজন কর্ম্মচারী (ভীমরাজ) পুরুষোত্তমের পক্ষে যোগ দিয়া ১৪৭৪ খ্রীঃ অব্দে কোণ্ডপল্লে নামক বাহমনী রাজ্যের একটী দুর্গ অবরোধ করেন। পুরুষোত্তম তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করেন এবং নিজাম-উল-মুল্ক হুসেন বাহুরীকে রাজমহেন্দ্রী হইতে বিতাড়িত করেন। তখন তৃতীয়

মোহাম্মদ বাহমনী সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। তুমুল যুদ্ধের পর সন্ধি হইল। মোহাম্মদ পুরুষোত্তমের নিকট ত্রিশটী হস্তী পাইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে আমরা দেখিতে পাই, পুরুষোত্তম কৃষ্ণা ও গোদাবরী দোয়াব হইতে বাহমনী রাজ সুলতান মোহাম্মদকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে সালুব নরসিংহকে পরাস্ত করিয়া পন্তুর পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকারে আনিয়াছিলেন। বিজয় নগরপতিকে পরাস্ত করিয়া তথাকার রত্ন খচিত সিংহাসন ও সাক্ষী গোপাল বিগ্রহ আনয়ন করিয়াছিলেন। কর্ণাট রাজ দুহিতা রূপম্বিকা পুরুষোত্তমের মহিষী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র প্রতাপ রুদ্র রাজা হন।

পুরুষোত্তম—(২) তাঁহার জন্মস্থান কাশী। তিনি স্বয়ং বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধ পুরোহিতদের সাধনার অনেক গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছেন।

পুরুষোত্তম গোস্বামী—তিনি বল্লভ স্বামী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বল্লভাচার্য্যের বংশধর। বংশাবলী এইরূপ—বল্লভাচার্য্য—বিঠ্‌ঠলদাস—বালকৃষ্ণ—ব্রজরাজ—যদুপতি—পীতাম্বর—পুরুষোত্তম গোস্বামী। তিনি বল্লভীয় অণুভাষ্যের টীকাকার। তাঁহার টীকার নাম—ভাষ্য প্রকাশ। তিনি তাঁহার টীকায় আচার্য্য শঙ্কর, ভাস্কর, রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক, বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতির মতবাদ উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বিঠ্‌ঠলনাথ বিরচিত বিদ্বন্মণ্ডণের উপর 'সুবর্ণ সূত্র' নামে এক টীকা রচনা করেন। 'প্রস্থান রত্নাকর' নামে তাঁহার আরও একখানা গ্রন্থ আছে। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীঃঅষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

পুরুষোত্তম তর্কালঙ্কার— তিনি পাণিনি ব্যাকরণের বৃত্তি প্রণয়ন করেন। ঐ বৃত্তি 'ভাষা বৃত্তি' নামে প্রসিদ্ধ। তিনি রাজসাহীর বুড়ীরভাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পুরুষোত্তম দত্ত—তিনি খেতুরির প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য নরোত্তম ঠাকুরের জ্যেষ্ঠতাত। তিনি গৌড়ের রাজ সরকারে কর্ম্ম করিতেন। এই পুরুষোত্তমের পুত্র সন্তোষ দত্ত ছয়টী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই উপলক্ষে খেতুরির প্রসিদ্ধ উৎসব হয়। তৎকালের যাবতীয় বৈষ্ণব প্রধানগণ এই উৎসবে উপস্থিত হন। নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেবীও এই উৎসবে উপস্থিত হইয়া ইহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

পুরুষোত্তম দাস—(১) একজন পদকর্ত্তা। কুমারহট্ট হালিসহরে বৈদ্যবংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা সদাশিব দাস একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। পুরুষোত্তম প্রভু নিত্যানন্দের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি পুরুষোত্তম

পণ্ডিত নামেও খ্যাত ছিলেন। তাঁহার ভক্তিভাবে আকৃষ্ট হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন।

পুরুষোত্তম দাস—(২) 'মোহমুদ্গর' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্যু নিহত হইলে, অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ, রিপুঞ্জয়ী ভক্ত রাজা মোহমুদ্গরের যে উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। ইহা পদ্যে রচিত।

পুরুষোত্তম দেব—(১) বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধদের মধ্যে অমর সিংহ, পুরুষোত্তম দেব প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ শাব্দিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম দেবের প্রধান গ্রন্থ 'ত্রিকাণ্ড-শেষ'। এই গ্রন্থখানা অমর সিংহ বিরচিত অমর কোষ গ্রন্থের পরিশিষ্ট। অমর সিংহ খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতকে তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পাঁচশত বৎসর পরে, অর্থাৎ খ্রীঃ একাদশ শতকে পুরুষোত্তমের ত্রিকাণ্ড শেষ রচিত হয়। এই দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যে বহু নূতন শব্দ সংযোজিত হইয়াছিল। ত্রিকাণ্ড-শেষ গ্রন্থে পুরুষোত্তম তাহা সংগ্রহ করিয়া অমর কোষ গ্রন্থকে তৎকালের উপযোগী করিয়াছিলেন। অমর সিংহ বিষ্ণুর ৩৯টী নাম দিয়াছিলেন, আর পুরুষোত্তম দিয়াছেন ৬৬টী। সেইরূপ শিবের ৪৮টী ও দুর্গার ১৭টী স্থলে তিনি শিবের ৬৩টী ও দুর্গার ৩৭টী নাম দিয়াছেন। পুরুষোত্তমের আর এক গ্রন্থ ভাষাবৃত্তি। পাণিনির স্বরের ও বেদের সূত্রগুলি বাদ দিয়া শুধু ভাষার যে সূত্রগুলি, সেইগুলির উপর লঘুবৃত্তি দিয়া ভাষাবৃত্তি রচিত হইয়াছে। বাঙ্গালার উত্তর অংশে বৌদ্ধ পালবংশীয় রাজাদের খুব প্রভাব ছিল। সেইজন্য ঐ অঞ্চলে ভাষাবৃত্তি অনেককাল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। উহার অনেক টীকা টিপ্পনী রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃতের বানান ঠিক করিয়া দিয়া তিনি আর এক কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত বর্ণদেশনা, দ্বিরূপ কোষ, একাক্ষর কোষ, সংবলিত 'হারাবলী' অভিধান অতি মূল্যবান্ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের এক এক অংশ একখানি পৃথক গ্রন্থ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। এই হারাবলী অভিধান সংকলনে সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর তাঁহাকে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে ও কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত 'জ্ঞাপক সমুচ্চয়' ও 'উণাদি বৃত্তি' নামে তাঁহার আরও দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে।

পুরুষোত্তম দেব—(২) চট্টগ্রাম প্রদেশে চন্দ্রবংশীয় একটী হিন্দু রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১২৪৩ খ্রীঃ অব্দের একটী তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে পুরুষোত্তম দেব, তৎপুত্র মধুসূদন দেব ও তৎপুত্র দামোদর দেব সেই সময় তথায় রাজা ছিলেন। এই

তাম্রশাসনে দামোদর দেব 'সকল ভূপতি চক্রবর্ত্তী' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

পুরুষোত্তম দেব গজপতি—(১) দিল্লীর সম্রাট শাহজাহানের সময়ে বকির খাঁ নজম শানি উড়িষ্যার মুঘল সুবেদার ছিলেন (১৬২৭—১৬৩২ খ্রীঃ)। সেই সময়ে খুর্দ্দার রাজা পুরুষোত্তমদেব গজপতি পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার পুত্র নরসিংহ রাজা হন। পুরুষোত্তম ১৬০৭ খ্রীঃ—১৬২০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত খুর্দ্দার রাজা ছিলেন। নরসিংহ দেব গজপতি ১৬৩০—১৬৫৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; কিন্তু তিনি মুঘল সুবেদার মুতাকদ খাঁর হস্তে যুদ্ধে নিহত হন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গঙ্গাধর (১৬৫৩—১৬৫৪ খ্রীঃ অব্দ) মাত্র এক বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপর নরসিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলভদ্র গঙ্গাধরকে বধ করিয়া রাজা হন।

পুরুষোত্তমদেব গজপতি—(২) একজন অসমিয়া গ্রন্থকার। 'দিপীকাচন্দ' নামে একখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। রাজনীতি উহার প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনি জামল সংহিতা, হংসকালী প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে উহার রচনা করেন। উহাতে সৃষ্টিতত্ত্ব, যমপুরীর বিবরণ, চন্দ্রবিপ্র ও সূর্য্যবিপ্রের ভেদ বর্ণন, দৈবজ্ঞের বিবরণ ও শ্রেষ্ঠত্ব, বৈষ্ণবনীতি ও ধর্ম্ম, প্রাচীন পৌরাণিক রাজগণের বিবরণ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে। গ্রন্থকার নিজেকে সূর্য্যবংশীয় রামচন্দ্রের বংশধর একজন নৃপতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন। গ্রন্থ রচনা কাল খুব সম্ভব খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী।

পুরুষোত্তম নৃসিংহ—তিনি উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় দশম নরপতি। এই বংশে নৃসিংহ উপাধিধারী ছয়জন রাজা হইয়াছেন। তাঁহার পিতামহ নৃসিংহ দেব কর্ত্তৃক কোণার্কের সূর্য্য মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ—(১) প্রসিদ্ধ প্রয়োগোত্তম রত্নমালা ব্যাকরণের প্রণেতা। কুচবিহার অঞ্চলে অদ্যাপি উক্ত ব্যাকরণ অধীত হইয়া থাকে। তিনি কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ—(২) তিনি বঙ্গের সেনবংশীয় নরপতি লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধের বংশধর জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। তিনি 'প্রয়োগ-রত্নমালা', 'মুক্তিচিন্তামণি' 'বিষ্ণুভক্তি-কল্পলতা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'প্রবোধ প্রকাশ' নামক গ্রন্থ প্রণেতা বলরাম তাঁহারই পুত্র। তাঁহার অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ পঞ্চানন ঠাকুর কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। সাহেবেরা তাঁহাদিগকে ঠাকুর বলিত বলিয়া তাঁহারা ঠাকুর নামেই খ্যাত হন। জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ

ঠাকুর পদবীধারী ভূম্যধিকারীরা তাঁহারই বংশধর।

পুরুষোত্তম মিশ্র সিদ্ধান্তবাগীশ—বাঙ্গালী বৈষ্ণব সাধক ও কবি। তাঁহার জন্মস্থান নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কুলিয়া গ্রাম। তাঁহার পিতার নাম গঙ্গাদাস মিশ্র। পিতামহের নাম মুকুন্দানন্দ মিশ্র। ষোড়শ বর্ষ বয়ক্রম কালে তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন। তথায় তিনি তাঁহার গুরুদত্ত প্রেমদাস নামে পরিচিত হন। তিনি গোবিন্দজীর মন্দিরের অধিকারী শ্রীকৃষ্ণচরণ গোস্বামীর গৃহে অবস্থান করিতেন এবং গোবিন্দজী মন্দিরের পূজারী ছিলেন। কয়েক বৎসর বৃন্দাবনে অবস্থানের পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৭০৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি কবিকর্ণপুর বিরচিত 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটকের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বংশীশিক্ষা' ১৭১২খ্রীঃ অব্দে রচিত হয়। এতদ্ব্যতীত 'আনন্দ' ভৈরব, 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদী' প্রভৃতি গ্রন্থও তাঁহার রচিত। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্ত্তা ছিলেন।

পুরুষোত্তমাচার্য্য—আচার্য্য নিম্বার্ক ও শ্রীনিবাস দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। বলিতে গেলে আচার্য্য নিম্বার্কের মতকেই শ্রীনিবাস বলবান্ করিয়া তুলেন। খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আচার্য্য পুরুষোত্তম দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বেদান্তরত্ন মঞ্জুষা' প্রণয়ন করেন। তাঁহার পরেই দেবাচার্য্যের আবির্ভাব হয়।

পুরুহুত—প্রাচীন কালের একজন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। প্রসিদ্ধ সোমহন তাঁহার ১৫৪৫ খ্রীঃ অব্দে রচিত 'সোমহনবিলাস' গ্রন্থে পুরুহুতের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পুলকেশী (প্রথম)—তিনি চালুক্যবংশীয় নরপতি জয় সিংহের পৌত্র। জয় সিংহই প্রথমে চালুক্য বংশ স্থাপন করেন। তৎপরে পুলকেশী বাতাপীপুরে (বর্ত্তমান বাদামী) রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পৃথ্বীবল্লভ ও সত্যাশয় নামে দুই উপাধি ছিল। তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিবর্ম্মা ও মঙ্গলীশ পিতারই ন্যায় পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। ৫৬৬ খ্রীঃ অব্দে পুলকেশীর মৃত্যুর পরে কীর্ত্তিবর্ম্মা রাজা হন।

পুলকেশী (দ্বিতীয়)—তিনি চালুক্যবংশীয় নরপতি কীর্ত্তিবর্ম্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও প্রথম পুলকেশীর পৌত্র। তিনি স্বীয় পিতা ও পিতামহেরই ন্যায় অতিশয় পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। ৫৯০ খ্রীঃ অব্দে পিতার মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পিতৃব্য মঙ্গলীশ সিংহাসন লাভ করিবার জন্য বিদ্রোহী হন। কিন্তু ৬১১ খ্রীঃ অব্দে মঙ্গলীশ সপুত্র রণস্থলে নিহত হন। এই গৃহ বিবাদের সময়ে

রাষ্ট্রকূটপতি গোবিন্দ বিদ্রোহ পতাকা উত্তোলন করিয়া পূর্ব্ব গৌরব পুনর্লাভ করিবার প্রয়াসী হন। কিন্তু পরাস্ত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। অচিরকাল মধ্যেই পুলকেশীর সদয় ব্যবহারে উভয় পক্ষের বৈরীভাব মিত্রতায় পরিণত হয়। এই সময়ে উত্তর ভারতের সম্রাট হর্ষ শিলাদিত্য দাক্ষিণাত্য জয়ে অভিলাষী হইয়া পুলকেশীর রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। পুলকেশী (২য়) দেশবিদেশেও খ্যাত ছিলেন। ৬২৫ খ্রীঃ অব্দে পারস্য রাজ খুসরু (দ্বিতীয়) তাঁহার সভায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুলকেশীর বিষয় চৈনিক ভ্রমণকারী হিউয়েন্‌সাং-এর ভ্রমণ কাহিনী হইতেও অনেক জানা যায়। তাঁহার রাজত্বের শেষ অংশ বড়ই বিষাদপূর্ণ। ৬৪০ খ্রীঃ অব্দে পল্লববংশীয় নরসিংহ বর্ম্মা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন এবং সেই যুদ্ধে পুলকেশী নিহত হন। তাঁহার রাজ্য নষ্ট হয়। ১৩ বৎসর পরে ৬৫৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পুত্র চন্দ্রাদিত্য বেঙ্গিতে যাইয়া রাজপাট স্থাপন করেন।

পুলমায়ী (১ম)—তিনি অন্ধ্রবংশীয় গৌতমী পুত্রের তনয়। তিনি শকবংশীয় নরপতি রুদ্র দমনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। গৌতমী পুত্র শকদিগকে মহারাষ্ট্র দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র পুলমায়ী শকদিগের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে সমর্থ হন নাই। রুদ্র দমন বিজিত রাজ্যগুলি পুন অধিকার করেন। পুলমায়ী ১৫০ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা শিবশ্রী রাজা হন।

পুলমায়ী (৪র্থ)—তিনি অন্ধ্রবংশীয় শেষ নরপতি। তিনি ২১৮ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে, এই বংশের প্রাধান্য লোপ পায়।

পুলস্ত্য—জ্যোতিষশাস্ত্র প্রবর্ত্তকদের মধ্যে পুলস্ত্য একজন ছিলেন। তিনি স্বীয় শিষ্যকে ইহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম পৌলস্ত্য সিদ্ধান্ত।

পুলিন্দ সেন—উড়িষ্যার শৈলোদ্ভব-বংশীয় প্রথম নৃপতি। কথিত আছে তিনি ব্রহ্মাকে আরাধনা করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে তিনি রাজ্য গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। সেজন্য ব্রহ্মা শৈল খণ্ডকে (প্রস্তর খণ্ড) পুত্ররূপে উৎপাদন করিয়া বলিলেন—'এই তোমার শৈলোদ্ভব পুত্র রাজ্য লাভ করিবে।' তদবধি এই বংশীয় রাজারা শৈলোদ্ভব নামে খ্যাত হইলেন। সম্ভবতঃ খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে শৈলোদ্ভব রাজত্ব করিয়াছিলেন। শৈলোদ্ভব দেখ।

পুলিশ—তিনি অষ্টাদশ জ্যোতিষশাস্ত্র

প্রবর্ত্তকদের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু বরাহের বৃহৎ সংহিতার বিবৃতিতে উৎপল ভট্ট তাঁহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। অত্রি দেখ।

পুষ্কর—তিনি একজন শিল্প বা বাস্তু-শাস্ত্র প্রণেতা ঋষি। তাঁহার রচিত গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায় না'ই।

পুষ্পদত্ত—বাণভট্ট বিরচিত হর্ষ চরিতে লিখিত আছে যে, ভগদত্তের পরে পুষ্প দত্ত ও বজ্রদত্ত কামরূপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু ভগদত্তের বংশাবলীতে তাঁহাদের কোন উল্লেখ নাই

পুষ্পদন্ত—(১) নবম জৈন তীর্থঙ্কর সুবুদ্ধিনাথের দন্তপংক্তি পুষ্পের ন্যায় সুন্দর ছিল বলিয়া তিনি পুষ্পদন্ত নামে কথিত হইতেন। সুবুদ্ধিনাথ দেখ।

পুষ্পদন্ত—(২) একজন শৈব সন্ন্যাসী। তিনি খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে মহিম্ন স্তোত্র রচনা করেন।

পুষ্পবতী রাণী—তিনি চন্দ্রাবতী নগরীর প্রমারবংশীয় নরপতির কন্যা ও প্রথম শিলাদিত্যের মহিষী। তিনিই নরপতি গোহের জননী। প্রথম শিলাদিত্য ও গোহ দেখ।

পুষ্পভূতি—সম্ভবতঃ খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীতে পঞ্জাবের পূর্ব্ব দিকে একটী রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার রাজধানী থানেশ্বর (স্থাণ্বীশ্বর) নগরে ছিল। তাঁহারা পুষ্পভূতি নামক রাজার বংশধর ছিলেন। এই বংশেই প্রভাকর বর্দ্ধন এবং তাঁহার পুত্র রাজ্য বর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পুষ্যগুপ্ত—সৌরাষ্ট্রে মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট চন্দ্র গুপ্তের রাজত্বকালে, গিরি নগরের অনতিদূরে অবস্থিত পর্ব্বতোপত্যকায় প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া, সৌরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তা বৈশ্যজাতীয় পুষ্যগুপ্ত সুদর্শন হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

পুষ্য বর্ম্মা—আসামের নরকবংশীয় নরপতি বজ্র দত্তের পরে পুষ্য বর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার পরে তাঁহার বংশীয় দশজন নরপতির পরে ভাস্কর বর্ম্মা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে রাজা হইয়াছিলেন। নিম্নে এই বংশীয় রাজাদের নাম ও একই সঙ্গে রাণীদের নাম এবং আনুমানিক রাজত্বকাল প্রদত্ত হইল।

১। পুষ্য বর্ম্মা, ৩৮০—৪০০ খ্রীঃ অব্দ।

২। সমুদ্র বর্ম্মা—রাণীদত্তা দেবী। ৪০০—৪২০ খ্রীঃ।

৩। বল বর্ম্মা ১ম—রাণী রত্নবতী। ৪২০—৪৪০ খ্রীঃ।

৪। কল্যাণ বর্ম্মা—রাণী গন্ধর্ব্ববতী। ৪৪০—৪৬০ খ্রীঃ।

৫। গণপতি বর্ম্মা—রাণী যজ্ঞবতী। ৪৬০—৪৮০।

৬। মহেন্দ্র বর্ম্মা—রাণী সুব্রতা। ৪৮০—৫০০।

৭। নারায়ণ বর্ম্মা—রাণী দেববতী। ৫০০—৫২০।

৮। মহাভূত বর্ম্মা—রাণী বিজ্ঞানবতী। ৫২০—৫৪০।

৯। চন্দ্রমুখ বর্ম্মা—রাণী ভোগবতী। ৫৪০—৫৬০।

১০। স্থিত বর্ম্মা—রাণী নয়ন দেবী। ৫৬০—৫৮০।

১১। সুস্থিত বর্ম্মা—(অন্য নামমৃগাঙ্গ; রাণীশ্যামা দেবী। ৫৮০—৬০০ খ্রীঃ।

এই সুস্থিত বর্ম্মারই পুত্র কুমার ভাস্কর বর্ম্মা। তিনি পুষ্য বর্ম্মা হইতে একাদশ পুরুষ। ভাস্কর বর্ম্মা ৬৫০ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং পুষ্যবর্ম্মা খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ভাস্কর বর্ম্মা ৬০০—৬৫০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। ভাস্কর বর্ম্মা দেখ।

পুষ্যমিত্র বা পুষ্পমিত্র—মৌর্য্যবংশীয় শেষ নরপতি বৃহদ্রথকে তাঁহার ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র খ্রীঃ পূঃ ১৮৫ অব্দে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক হত্যা করিয়া মগধ সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বৈদিক অধ্যাপক বংশে জন্মগ্রহণ করেন; পুষ্যমিত্রের সময়ে মগধের পূর্ব্ব গৌরব অব্যাহত ছিল। তাঁহার রাজ্য পশ্চিমে জলন্ধর হইতে পূর্ব্বে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত এবং উত্তরে হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার সময়ে বাহ্লিক বা বাকৃত্রিয়া রাজ্যের গ্রীকেরা পঞ্জাবের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিল। গ্রীকরাজ মিলিন্দের রাজধানী শাকল নগরে (বর্ত্তমান শিয়াল কোট) ছিল। কাহারও মতে গ্রীকরাজ মিলিন্দ অযোধ্যা জয় করিয়া পাটলীপুত্র নগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু পুষ্যমিত্রের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন কাহারও মতে কলিঙ্গ দেশের রাজা খারবেলের সহিত যুদ্ধেও পুষ্যমিত্র জয় লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি অশ্বমেধ যজ্ঞ। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মৌর্য্য বংশীয় রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ আর তিনি বৌদ্ধ বিদ্বেষী হিন্দু। সম্ভবতঃ গ্রীক বিজয়ের পরে তাঁহার গৌরব বর্দ্ধনের জন্য তিনি প্রথম অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। এই যজ্ঞের অশ্বের রক্ষক তাঁহার পৌত্র বসুমিত্র ছিলেন পঞ্জাবে সেই অশ্ব উপস্থিত হইলে গ্রীকেরা অশ্ব অবরোধ করেন। কিন্তু বসুমিত্র তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া যজ্ঞীয় অশ্বের মোচন করেন। দ্বিতীয় অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্ভবতঃ বিদর্ভের রাজা যজ্ঞসেনকে পরাস্ত করার পরে সম্পন্ন হইয়াছিল। যজ্ঞসেন শেষ মৌর্য্য নৃপতি বৃহদ্রথের মন্ত্রী ছিলেন। সেই সময়ে দুইটী দল ছিল,—এক দল সেনাপতি পুষ্যমিত্রের পক্ষে অন্য দল মন্ত্রী যজ্ঞসেনের পক্ষে। সেনাপতির দল প্রাধান্য লাভ

করিয়া রাজ্য লাভ করেন এবং মন্ত্রী যজ্ঞসেনের দল পরাজিত হইয়া বিদর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুষ্পমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র বিদিসার (পূর্ব্বমালব) প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

পুষ্যমিত্র ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫১ খ্রীঃ পূঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র অগ্নিমিত্র রাজা হইয়াছিলেন। তিনিও পিতার ন্যায় অতিশয় বীর্য্যশালী ছিলেন। তৎপরে অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্র রাজা হইয়াছিলেন। তিনিও পিতা, পিতামহের ন্যায় পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে তিনি পিতামহের অশ্বমেধ যজ্ঞে যবনদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। বসুমিত্রের পরে, ভাগবত পুরাণ মতে ভদ্রক (বিষ্ণুপুরাণ আদ্রক) রাজা হন। তৎপরে ক্রমান্বয়ে পুলিন্দ, উদঘোষ, বজ্রমিত্র, ভাগবত ও দেবভূতি রাজত্ব করেন। শুঙ্গবংশীয়েরা খ্রীঃ পূঃ ৭৩ অব্দ পর্য্যন্ত ১১২ বৎসর রাজত্ব করেন। সর্ব্বশেষ ভূপতি দেবভূতি মাত্র দশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মন্ত্রী বাসুদেব তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। শুঙ্গ বংশীয়েরা তৎপরে মধ্যভারতে রাজ্য স্থাপন করিয়া তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শুঙ্গ বংশীয় রাজারা প্রভাবশালী ছিলেন বলিয়া, উত্তর পশ্চিম সীমান্তবাসী গ্রীক রাজারা ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের রাজত্বকালে শিল্পের ও স্থপতি বিদ্যার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহারা যেমন পরাক্রমশালী ছিলেন, তেমনি বিদ্যানুরাগীও ছিলেন।

পুজন সিংহ—তিনি অম্বরের (বর্ত্তমান জয়পুর) রাজা ছিলেন। তিনি দিল্লীর চৌহানবংশীয় পৃথ্বিরাজের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ কুশাবহবংশীয় পুজন সিংহকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। এই বীরের সাহায্যে পৃথ্বিরাজ চাঁদেলদিগের মাহোবা রাজ্য জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে চৌষট্টিজন রাজপুত বীর আপনাদের সৈন্য সামন্তের সহিত কনোজরাজ জয়চাঁদের কন্যা সংযুক্তার হরণে, পৃথ্বিরাজকে সাহায্য দান করিয়াছিলেন। পুজন সিংহ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মোহাম্মদ ঘোরীর সহিত পৃথ্বিরাজের যুদ্ধকালে তিনি সমর শয্যায় শয়ন করেন।

পুজ্যপাদ স্বামী—তিনি উমাস্বাতি-কর্ত্তৃক বিরচিত 'তত্ত্বার্থাধিগম সূত্র' নামক গ্রন্থের এক টীকা রচনা করেন। এই টীকার নাম 'সর্ব্বার্থসিদ্ধি'।

পুদত্ত আলোয়ার—মান্দ্রাজের দ্বাদশ ক্রোশ দক্ষিণে মল্লাপুরীতে (বর্ত্তমান বড়ল্মলই) খ্রীঃ পূঃ ৪২০২ অব্দে তিনি বিষ্ণুর গদার অবতাররূপে কার্ত্তিক

মাসের ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পুরণচাঁদ নাহার, এম্-এ, বি-এল্ এম-আর-এ-এস—একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জের বিখ্যাত নাহার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িয়া তিনি যথা সময়ে বি-এ ও বি-এল্ উপাধি লাভ করেন। ১৮০৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাঙ্গালার জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনিই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার কর্ম্মধারা বহুমুখীন ছিল। তিনি জন সেবায় অক্লান্তকর্ম্মী ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতি কল্পে তিনি বহুবিধ কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালক সভায় (Court) ভারতীয় জৈন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং নিখিল ভারত অশোয়াল জৈন সম্মেলনের প্রথম সভাপতি হন। তিনি বোম্বাই জৈন শ্বেতাম্বর শিক্ষা পরিষৎ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী অব গ্রেট ব্রিটেন, এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, নাগরী প্রচারিণী সভা, পাটনার বিহার উড়িষ্যা গবেষক সঙ্ঘ, ভাণ্ডারকর প্রাচ্য বিদ্যা সংসদ ও বহু বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আজীবন সভ্য ছিলেন। তিনি বহু পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিন খণ্ডে লিখিত 'জৈন অনুশাসন লিপি' ভারতীয় ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ। এই গ্রন্থ লিখিবার জন্য তিনি বহু সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়া ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বহু ভারতীয় চারুশিল্প ও ভাস্কর্য্য এবং মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু জৈন পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি আছে। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও অমায়িক ব্যবহারে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। সাহিত্যে, শিক্ষায় ও জনসেবায় তিনি অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৯৩৬ খ্রীঃ অব্দের ৩১ শে মে তিনি পরলোক গমন করেন।

অকালে পরলোক প্রাপ্ত তাঁহার অনুজ কুমার সিংহ নাহারের নামে তাঁহাদের বাসভবনের পার্শ্বে 'কুমার সিংহ হল' নামে এক মনোরম সৌধ নির্ম্মাণ করান এবং নিজ সংগৃহীত সমুদয় মূল্যবান গ্রন্থ, চিত্র, মুদ্রা প্রভৃতি দ্বারা তথায় এক পুরা তত্ত্বশালা (Museum) প্রতিষ্ঠা করেন।

পূর্ণচন্দ্র—খড়্গ বংশের অধঃপতনের পর বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী চন্দ্রবংশীয় রাজগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই বংশের আদি পুরুষ পূর্ণচন্দ্র রোহিতাগিরি বা রোহিতাশ্ব পর্ব্বতের (রোহতাসগড়) অধিপতি ছিলেন। পূর্ণচন্দ্রের পুত্র

সুবর্ণচন্দ্র, তৎপুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে (হরিকেল ও চন্দ্রদ্বীপ) রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্রদেবের তিনখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীচন্দ্রদেবের মাতার নাম কাঞ্চনা। বিক্রমপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। শ্রীচন্দ্রদেবের পরে এই বংশীয়েরা পালরাজগণের অধীন হইয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র নামক এই বংশের একজন রাজা প্রথম রাজেন্দ্র চোলকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন।

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্ব কনিষ্ঠ সহোদর। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি কর্ম্ম জীবনে ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে প্রথম স্পেসাল সাব রেজিষ্টারের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। পরে ডিপুটী মেজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হন। বঙ্কিমের সাহিত্য সাধনায় তিনিও একজন সহকর্ম্মী ছিলেন। 'বঙ্গদর্শনের' প্রথম প্রচার হইতেই, তিনি উহার একজন নিয়মিত সেবক ছিলেন। তাঁহার 'শৈশব সহচরী' উপন্যাস প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তাঁহার আর একখানা উপন্যাস 'মধুমতী'। ১৮৯৭খ্রীঃ অব্দে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২২ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—লক্ষ্ণৌ প্রবাসী একজন খ্যাতনামা বাঙ্গালী প্রত্নতাত্ত্বিক ও সরকারী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। শৈশবে তিনি অতিশয় দুরন্ত ছিলেন এবং লেখা পড়া অপেক্ষা খেলাধূলাতে অধিক মত্ত থাকিতেন। সুতরাং তিনি ছাত্রাবস্থায় বিদ্যালয়ে ভাল ফল প্রদর্শন করিতে পারিতেন না। কিন্তু ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি কোনও কোনও বিষয়ে অন্যান্য ছাত্রদের অপেক্ষা তিনি ভাল ছিলেন। প্রথমে আগড়পাড়ার বিবির (খ্রীষ্টীয়) বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। পরে ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি সোদপুর বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপর বৎসরে তিনি মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু এই সময় পিতার আর্থিক বিপর্য্যয় হেতু তিনি ডাক্তারী পড়ার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেন এবং কিছুকাল বাড়ীতে বসিয়া নিজ চেষ্টায়ই বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি পদ্য রচনাও শিক্ষা করেন এবং ক্রমে পদ্যে গদ্যে নাটকাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর বৎসর তিনি লক্ষ্ণৌতে গমন করেন এবং পুনরায় ক্যানিং কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। ইতি পূর্ব্বে মহাকাব্যের (Epic Poem) প্রতি তিনি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া-

ছিলেন এবং ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দেখিয়া এক ওজস্বী মহাকাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। উহার প্রথম সর্গ মুদ্রিত হইয়া দ্বিতীয় সর্গের কতকাংশ লিখা হইয়াছিল; কিন্তু এই সময় তাহার মন অন্য দিকে প্রধাবিত হওয়ায় দ্বিতীয় সর্গ ঐখানেই বন্ধ রহিল। ঐ সময় দেশের শিল্প কার্য্য একেবারে বিলুপ্ত হইতেছিল এবং লক্ষ্ণৌর প্রাচীন অট্টালিকার অধিকাংশই ধ্বংস হইতেছিল। এই জন্য তিনি Pictorial Lucknow History, People and Architecture নামক পুস্তক সংকলন করেন। সেইজন্যই তিনি চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করেন। ইতিমধ্যে তিনি এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৭৩ সালে বি-এ পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন নাই। তৎপর একজন সাহেব তাঁহাকে সামান্য বেতনে এক চাকুরী প্রদান করেন। ১৮৮২ অথবা ৮৩ খ্রীঃ অব্দে তদানীন্তন ছোট লাট স্যার আলফ্রেড লায়েলকর্ত্তৃক তিনি সরকারী পুরাতত্ত্বানুসন্ধাতা (Government Archaeologist) নিযুক্ত হন। তখন হইতে তিনি ভারতবর্ষীয় পুরাতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। স্যার আলফ্রেড সাহেব তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। এই সময় কানিংহাম সাহেব রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করাতে ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে পুরাতত্ত্ব বিভাগ পুনর্গঠিত হয়। তখন তাঁহাকে উচ্চ পদে নিযুক্ত করিবার জন্য ছোট লাট স্যার আলফ্রেড সুপারিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ডাঃ ফুহরার (যিনি তাঁহার প্রাপ্য পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন) ও তিনি যাহার সহকারী ছিলেন, ঐ ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধতা করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিতে চেষ্টা করেন। এইজন্য তিনি ঐ চাকরী পরিত্যাগ করিয়া পূর্ত্ত-বিভাগে (P. W. Department) কর্ম্ম গ্রহণ করেন। সেই সময় তিনি ঝান্সী গমন করেন এবং ললিতপুর আদিস্থানে পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার করেন। এই বিষয়ে Sir A. P. Macdonell এর আদেশে সরকার ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দে এক বৃহৎ Report and Portfolio of Drawings মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। পুনরায় ডাঃ ফুহরার সাহেবের পরামর্শে তাঁহার কর্ম্মচ্যুতি ঘটে। তখন বঙ্গের ছোট লাট স্যার চার্লস ইলিয়ট তাঁহাকে কলিকাতায় আহ্বান করিয়া বঙ্গীয় পুরাতত্ত্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় তিনি মগধ, মিথিলা এবং উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করেন এবং প্রথমেই তিনি বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। তিনি Archaeolgical Gallery of the Imperial Museum বিগুণ করেন। কিন্তু তাঁহার Behar and Orissa Reports and Drawings ছাপা হয় নাই এবং শেষে

তাঁহার চাকরী যায়। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে P. W. D. Secretariatএ চাকরী প্রাপ্ত হন এবং বুন্দেল খণ্ডে পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করেন। সেই সময় ওয়ার্ড (Ward) সাহেব ঝান্সীর কমিশনার ছিলেন। তাঁহার অনুরোধে তিনি বুন্দেল খণ্ডীয় রাজাদের অট্টালিকার অনুকরণে স্থানীয় বিদ্যালয়ের নক্সা (Design) করেন এবং তথাকার কলেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট হার্ডি সাহেবের অনুরোধে ঝান্সী হাসপাতালের নক্সা প্রস্তুত করেন, উহা দেখিয়া অনেকেই সন্তুষ্ট হন। ১৮৮৭—১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি বুন্দেল খণ্ডে চান্দেলীয় পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ছবিসহ দুইটী বড় বিবরণ লিখেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দে স্যার আন্টনী ম্যাকডোনেলের আদেশে উহা ছাপা হয়। তৎপর তিনি আগ্রায় গমন করেন এবং তাঁহার চাকুরী যায়। তখন স্যার চার্লস ইলিয়ট তাঁহাকে পুনরায় কলিকাতায় আহ্বান করিয়া যাদুঘরে (Museum) পুরাতত্ত্বাধ্যক্ষ করেন। ১৮৯১—১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বিহার ও উড়িষ্যায় পুরাতত্ত্ব বিভাগে কাজ করেন। পরে ১৮৯৭—৯৮ খ্রীঃ অব্দে পাটনায় গমন করিয়া প্রাচীন পাটলিপুত্র অনুসন্ধানে অনেক খনন ও আবিষ্কার করেন। পাটলিপুত্র রিপোর্ট সরকার কর্ত্তৃক ছাপা হইয়াছিল। তাঁহার পাটলিপুত্র রিপোর্টে সম্রাট অশোক সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে। তাহাতে জানা যায় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উহা ঠিক নহে। অশোকের সময় ২৭০ বৎসর খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ নহে—উহা ৩২৫ বৎসর এবং মৌর্য্য-বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদের Sandracottus নহে; অশোকই Sandracottus ছিলেন। তৎপরে ডাক্তার ফুহরার কর্ম্মচ্যুত হইলে ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়া লক্ষ্ণৌ গমন করেন। তখন কপিলবস্তু আদি আবিষ্কার করিবার জন্য তিনি নেপালে প্রেরিত হন। গোরক্ষপুরের নিকট তলিবার উত্তরে তিলোরাকোটে তিনি কপিলবস্তুর স্থান নির্ণয় করেন। পরে রুমিনদেই নামক স্থানে তিনি বুদ্ধদেবের জন্ম স্থানের অনুসন্ধান পান। পর বৎসর সরকার তাঁহার নেপাল রিপোর্ট সচিত্র মুদ্রিত করেন। তাহাতে ইউরোপ পর্য্যন্ত তাঁহার যশোরাশি বিস্তৃত হয়। তাঁহার প্রণীত লক্ষ্ণৌ বিষয়ক একখানি উৎকৃষ্ট ও চিত্তাকর্ষক বৃহৎ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল কিন্তু প্রকাশিত হয় নাই। অনেক দুর্লভ পুস্তক ও সরকারী কাগজ পত্রাদি হইতে সাধারণের অবিদিত অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার রচিত মহাকাব্যের নাম 'ভারতীয়ম্'। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে উহা

মুদ্রিত হইয়াছিল সংস্কৃত কবিতার ন্যায় লঘুগুরু উচ্চারণ করিয়া উহা পাঠ করিতে হয়। তিনি বহু প্রাচীন মুদ্রা, অলঙ্কার, মৃণ্ময় ও প্রস্তর মূর্ত্তি প্রভৃতি নানাপ্রকার পুরাতত্ত্ব বিষয়ক দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছেন। পুরাতন জিনিষ চিনিয়া সংগ্রহ করিবার শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে এলাহাবাদে থাকাকালীন তিনি প্রাচীন কৌশাম্বীর ধ্বংসাবশেষে, যাইয়া অনেকগুলি অতি প্রাচীন তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রা, স্ফটিকের মালা ও অলঙ্কার, মৃণ্ময় ও প্রস্তর মূর্ত্তি, ক্ষুদ্র মৃন্ময় মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবার প্রস্তর নির্ম্মিত ছাঁচ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আনেন। তিনি যেমন নির্ভীক ও স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন, অপর দিকে তেমনি যোগ্য এবং কার্য্যদক্ষও ছিলেন। এই জন্যই তিনি বারংবার কর্ম্মচ্যুত হইয়াও পুনঃ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিতেন। তিনি সুরসিক ও সঙ্গীতামোদী ছিলেন এবং সঙ্গীত ও সুর বিষয়ে তিনি নানা প্রকার আলাপ আলোচনাও করিতেন। তিনি অনাড়ম্বর, সরল প্রকৃতি ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। ১৩২০ বঙ্গাব্দের ১৮ই শ্রাবণ তিনি পরলোক গমন করেন। তৎকালে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের মধ্যে তিনি একরূপ অদ্বিতীয় ছিলেন।

পূর্ণচন্দ্র সিংহ, রাজা—তিনি মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কান্দির রাজা প্রতাপ সিংহের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে পূর্ণচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি তাঁহার বংশের অনুরূপই বিবিধ সৎকার্য্যে দান করিতেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। সতীশচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্র নামে দুই পুত্র রাখিয়া ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে তিনি পৃথিবীর রঙ্গভূমি হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

পূর্ণচন্দ্র সেন, এম-এ— একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও কলিকাতার স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক। তিনি ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ধনী সুবর্ণ বণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি পড়াশুনায় প্রখর মেধার পরিচয় প্রদান করেন। প্রথমে আহিরীটোলার বঙ্গ বিদ্যালয় হইতে বৃত্তিসহ মধ্য ইংরেজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি হিন্দু স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে এফ্-এ পড়িবার জন্য ডাফ কলেজে প্রবেশ করেন। সেই হইতে ডাফ কলেজের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ মৃত্যু পর্য্যন্ত ছিন্ন হয় নাই। তৎপর ক্রমে কৃতিত্বের সহিত বি-এ ও এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই দর্শন শাস্ত্রের অদ্বিতীয় অধ্যাপক ডাক্তার হীকেন তাঁহাকে সহযোগী পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার প্রতি ডাক্তার হীকেনের এই বিশ্বাস

তিনি সাফল্যের সহিত রক্ষা করিয়া ছিলেন। তিনি ছাত্রদের অবিচলিত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লাভ করিয়াছিলেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাবিস্তারার্থ তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি মতিলাল শীলের ফ্রী কলেজ ও আহিরীটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ের সম্পাদক, কুমার মার্কেন্ডয়ার ইনষ্টিটিউশনের সভাপতি, সেনট্রাল টেক্স্ট বুক কমিটির সভ্য, সুবর্ণ বণিক সমাজের সভাপতি, তিনের পল্লী করদাতা সঙ্ঘের সভাপতি ও উত্তর কলিকাতার যাবতীয় ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৩৩ খ্রীঃ অব্দে ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

পূর্ণ দাস— তিনি একজন সিন্ধু দেশবাসী বৌদ্ধ ভিক্ষু। তিনি বঙ্গের প্রথম বিগ্রহপাল রাজার সময়ে উদ্দণ্ডপুর (বর্তমান বিহারনগর) বিহারে দুইটী বুদ্ধ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

পূর্ণ বর্দ্ধন—তিনি খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গের পালবংশীয় নরপতি ধর্ম্মপালের সময়ে, প্রসিদ্ধ বিক্রমশিলার বৌদ্ধ বিহারে অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন।

পূর্ণ বর্ম্মা—মৌর্য্যবংশীয় মগধের একজন রাজা। বোধ হয় তিনিই অশোকের শেষ বংশধর। শশাঙ্ক বার বার বোধিবৃক্ষ নষ্ট করিলে, তিনি ইহা পুনঃপুন স্থাপন করিয়াছিলেন। খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

পূর্ণ সেন—একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। বররুচিকৃত যোগ শতকের তিনি এক উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন।

পূর্ণানন্দ—তিনি আসাম প্রদেশের আহম্‌বংশীয় নরপতি কমলেশ্বর সিংহের সময়ে (১৭৯৫—১৮১০ খ্রীঃ) তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী বড় গোহাই এর পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই বিচক্ষণ সেনাপতির কর্ম্ম নিপুণতায় রাজ্যের প্রণষ্ট গৌরব কিয়ৎ পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি মোয়ামারীয়া ও মোরানদের বিদ্রোহ দমন করিয়া তাঁহাদেরে স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন। রাজা কমলেশ্বর নামে মাত্র রাজা ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই রাজা ছিলেন। কমলেশ্বর সিংহের মৃত্যুর পরে তাহার ভ্রাতা চন্দ্রকান্তকে তিনিই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু চন্দ্রকান্ত সিংহ বয়প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণানন্দের প্রভুত্ব সহ্য করিতে অসমর্থ হইলেন। ইতিপূর্ব্বে বর ফুকনের মৃত্যুর পরে বদনচন্দ্র নামে এক ব্যক্তি তৎপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই বদনচন্দ্র ও তাঁহার পুত্রদের ব্যবহারে রাজ্য শুদ্ধ লোক অতিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে বদনচন্দ্র জীবন নাশের আশঙ্কায় রাজ্য ছাড়িয়া বঙ্গদেশে পলায়ন করেন। তথা হইতে বর্ম্মাদেশে যাইয়া বর্ম্মার রাজাকে আসাম আক্রমণ করিতে প্ররোচিত করেন। বর্ম্মরাজ আট হাজার সৈন্যসহ

আসাম আক্রমণ করেন। বড় ভুকন পূর্ণানন্দ তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া অকৃতকার্য্য হন। কেহ কেহ বলেন এই অপমানে পূর্ণানন্দ আত্মহত্যা করেন।

পূর্ণানন্দ পরমহংস—একজন তান্ত্রিক সিদ্ধ পুরুষ। খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কাটিহালি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম জগদানন্দ। পূর্ণানন্দ তাঁহার গুরু প্রদত্ত নাম। তাঁহার গ্রন্থে, গিরি, যতি, পরিব্রাজক, পরমহংস এই সকল উপাধি তাহার নামের সহিত যুক্ত আছে। শৈশবেই তিনি পিতৃহীন হইয়া, মাতা কর্তৃক লালিত-পালিত হন। মাতা ভিন্ন সংসারে তাঁহার আর কেহ ছিল না। বাল্যকালে তিনি অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল ও লেখাপড়ায় বিশেষ অমনোযোগী ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ নামে একজন সন্ন্যাসী স্বীয় গুরু ত্রিপুরানন্দ কর্তৃক শাপ প্রাপ্ত হন; কিন্তু নানা প্রকারে গুরুর তুষ্টি বিধান করিয়া কথঞ্চিৎ ক্ষমা লাভ করেন। তখন গুরু ত্রিপুরানন্দ ব্রহ্মানন্দকে আদেশ করিলেন যে, "যদি তুমি উপযুক্ত উত্তরসাধক সংগ্রহ করিয়া কামাখ্যা পীঠের উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক তথায় সাধনা করিতে পার, তবে সিদ্ধি লাভ করিবে।" গুরু কর্তৃক এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপযুক্ত উত্তরসাধকের অনুসন্ধানে বাহির হন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে একদা কাটিহালি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। সেই স্থানে জগদানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই ব্যক্তিই ভবিষ্যতে তাঁহার উপযুক্ত সাহায্যকারী হইবে। তিনি জগদানন্দকে নিজ গৃহে আনয়নপূর্ব্বক লেখাপড়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে জগদানন্দ সংস্কৃতে প্রগাঢ় জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দের নিকট হইতে তন্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং গুরু তাঁহাকে 'পূর্ণানন্দ' নাম প্রদান করেন। তিনি গুরুর আদেশ ক্রমে গুরুর পূর্ব্বেই সিদ্ধি লাভ করেন। তৎপর কোন কারণ বশতঃ গুরু শিষ্যকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। সেই সময় পূর্ণানন্দ ভ্রমণে বাহির হন এবং নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া মণিপুরে যাইয়া উপস্থিত হন এবং সেইখানে পুনরায় তিনি গুরুর সাক্ষাৎ লাভ করেন। কিছুকাল পর তিনি গুরুর সহিত মণিপুর হইতে চলিয়া আসেন এবং তন্ত্রশাস্ত্র আলোচনা করিয়া কামাখ্যাপীঠের উদ্ধার সাধন করেন। তৎপর তাঁহার উত্তর সাধকতায় গুরু ব্রহ্মানন্দ সেইস্থানে 'তারা-বিদ্যা' বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করেন। তিনি 'শক্তিক্রম' 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি' 'শ্যামারহস্য' 'তত্ত্বানন্দ তরঙ্গিনী' প্রভৃতি অনেকগুলি তান্ত্রিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

তিনি কামাখ্যা পীঠের স্থান নির্দেশ করিয়া শক্তি উপাসকগণের পরম কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছিলেন।

পূর্ণানন্দ স্বামী, মহারাজ—একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ। বরিশাল জিলার অন্তর্গত গুঠিয়া গ্রামে প্রসিদ্ধ সেনবংশে তাঁহার জন্ম হয়। শৈশবকালেই তাঁহার মধ্যে আধ্যাত্মিকভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বিষ্ণুপুর, বাকুড়া প্রভৃতি স্থানে শিক্ষকতা করেন। পরে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভোলাতে (বরিশাল) ওকালতী আরম্ভ করেন; কিন্তু সেই সময় তাঁহার অসামান্য আধ্যাত্মিক ভাব সংসারের প্রতি তাঁহাকে বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিল। তিনি যৌবনেই বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন এবং ওকালতী ত্যাগ করিয়া, হিমালয়ের পাদদেশে স্বর্গাশ্রমে গমন করেন। তথায় কিছুকাল তপস্যার পর তিনি 'গিরি' সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী শ্রীমৎস্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি নির্জ্জনে থাকিয়া ধ্যান ধারণা করিতেই ভালবাসিতেন। সিদ্ধি লাভের বহু দিন পরে তিনি পুনরায় বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন। বহু নরনারী তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দের নিকট তাঁহার লিখিত পত্রগুলি 'বেদবাণী' নামে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং সত্যান্বেষীদের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করে। তাঁহার লিখিত 'যোগ ও পারফেক্সন' নামক ইংরেজী গ্রন্থ এবং 'পূর্ণজ্যোতি' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহু মনীষী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। হৃষীকেশস্থ 'শিবালয়' আশ্রম তাঁহারই কীর্ত্তি। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ২৭শে কার্ত্তিক শুক্রবার তিনি দেহত্যাগ করেন।

পূর্ণিয়া—উচ্চপদস্থ ব্রাহ্মণ রাজকর্মচারী। তিনি হায়দর আলির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। হায়দরআলির মৃত্যুর পর তৎপুত্র টিপু সুলতানের অধীনেও তিনি উচ্চ দায়ীত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। টিপু সুলতানের মৃত্যুর পর মহীশূর রাজ্য যখন পূর্ব্বতন হিন্দু রাজবংশের অধীন হয়, তখনও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় শাসন বিভাগে বিশেষ দায়ীত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত থাকেন। তাঁহার সুব্যবস্থায় মহীশূর রাজ্যের প্রভূত উন্নতি এবং রাজকোষে বহু অর্থ সঞ্চিত হয়। মহীশূরের প্রথম হিন্দু রাজা কৃষ্ণরাজ ওয়াদিয়ারের নাবালক অবস্থায় পুর্ণিয়াই প্রধানতঃ সকল বিষয় তত্ত্বাবধান করিতেন। কিন্তু ১৮১১ খ্রীঃ অব্দে মহারাজা পুর্ণিয়াকে পদচ্যুত করিয়া স্বহস্তে রাজ্য ভার গ্রহণ করেন। তদবধি রাজ্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

রাজকার্য্য হইতে অপসৃত হইয়া তিনি শ্রীরঙ্গপত্তনে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। মহীশূর রাজসরকার হইতে তাঁহাকে বৃত্তি দেওয়া হয়। ১৮০৭ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজ সরকার তাঁহাকে একটি জায়গীর প্রদান করেন। ১৮১২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পৃথমচন্দ্র (পৃথ্বীচন্দ্র)—খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি কাঙ্গাড়া উপত্যকায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার একদিকে রাজার নাম অপর দিকে অশ্বারোহী মূর্ত্তি আছে।

পৃথা—ভারতের শেষ স্বাধীন ভূপতি দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের ভগিনী। মিবার-পতি মহারাজ সমর সিংহ তাঁহাকে বিবাহ করেন। পৃথ্বীরাজের পক্ষে যুদ্ধ করিতে করিতে তিরৌরীক্ষেত্রে ১১৯৫ খ্রীঃ অব্দে সমর সিংহ সমর শয্যায় শয়ন করেন। পৃথা অনলে প্রবেশপূর্ব্বক স্বামীর সহিত অনুমৃতা হন।

পৃথিবীচন্দ্র—তিনি ত্রিগর্ত্তদেশের (বর্ত্ত-মান লাহোর জিলার কতক অংশ) অধিপতি ছিলেন। কাশ্মীরের শৌণ্ডিক-বংশীয় নরপতি শঙ্কর বর্ম্মা (৮৮৪—৯০২ খ্রীঃ) তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া-ছিলেন। তাঁহার পুত্র ভুবনচন্দ্র কাশ্মী-রের অগণিত সৈন্য দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন।

পৃথীবী বর্ম্মা—গঞ্জাম জিলায় প্রাপ্ত কতকগুলি তাম্রশাসনে গঙ্গাবংশীয় মহেন্দ্র বর্ম্মার পুত্র পৃথিবী বর্ম্মার নাম পাওয়া গিয়াছে। তিনিও কলিঙ্গপতি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সময় নির্ণিত হয় নাই।

পৃথিবীষেণ—মগধের গুপ্তবংশীয় নর-পতি কুমার গুপ্তের তিনি প্রথমে মন্ত্রী ও পরে মহাবলাধিকৃত অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন। ১১৭ গুপ্তাব্দে (৩১৯+১১৭=৪৩৬ খ্রীঃ) তিনি পৃথিবী-শ্বর নামে একটী শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

পৃথিবী সেন—(প্রথম) মধ্যভারতের বাকাটকবংশীয় নৃপতি। ঐ বংশীয় রুদ্র সেন (প্রথম) তাঁহার পিতা। পৃথিবী সেন গুপ্তবংশীয় সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। তাঁহার রাজত্বকালে বাকা-টকবংশীয়দের প্রভুত্ব উত্তরে বুন্দেলখণ্ড ও দক্ষিণে কানাড়া প্রদেশের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। অজন্তাতে প্রাপ্ত একটী খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে কুন্তল প্রদেশের অধি-পতিকে তিনি যুদ্ধে পরাস্ত করেন।

পৃথিবী সেন—(দ্বিতীয়) প্রথম পৃথিবী সেনের পৌত্র। তাঁহার রাজত্বকালে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাকাটক বংশীদের রাজ্যের আয়তন অনেক কমিয়া যায়।

পৃথিব্যাপীড়—তিনি কাশ্মীরের অধি-

পতি বজ্রাদিত্যের অন্যতম মহিষী মঞ্জরীকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রজাপীড়ক নরপতি ৭৪৪—৭৪৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত মাত্র চারি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সংগ্রামপীড়কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। কিন্তু সাত দিন মাত্র রাজ্য ভোগ করিয়া সংগ্রামপীড় পরলোক গমন করিলে, তাহার অন্যতম ভ্রাতা জয়াপীড় রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন।

পৃথু—কামরূপের রাজা। তিনি ১২০০ ১২২৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই বংশীয়—

তিঙ্গদেব—১১২৫—১১৩১ খ্রীঃ।

বৈদ্যদেব—১১৩১—১১৫০ খ্রীঃ।

*   *   *

পৃথুদেব—১২০০—১২২৮ খ্রীঃ।

*   *   *

সন্ধ্যা ১২৫০ খ্রীঃ অব্দে রাজ্য লাভ করেন। এই বংশীয় রাজাদের মধ্যে পৃথু খুব পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। বঙ্গের নবাব গিয়াসউদ্দীন খিলজী আসাম আক্রমণ করিয়া, পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত সদিয়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। গিয়াসউদ্দিন মনে করিয়াছিলেন, আসাম প্রদেশ তাঁহার করতলগত হইল। কিন্তু বর্ষা সমাগমে আসামীরা এমন প্রবলভাবে পালটা আক্রমণ করিল যে, গিয়াসউদ্দিন পরাজিত হইয়া পলাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাজা পৃথুর আক্রমণে তাঁহার বহু সৈন্য জল নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

পৃথুযশা—প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত বরাহ মিহিরের তিনি পুত্র। তিনি নিজেও একজন জ্যোতিষশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কৃত 'ষট্ পঞ্চাশিকা' নামক প্রশ্ন গণনা বিষয়ক ফল গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে ৫৬টী শ্লোক আছে বলিয়া ইহার নাম ষট্ পঞ্চাশিকা হইয়াছে। উৎপল ভট্ট ইহার একটী টীকা রচনা করিয়াছেন।

পৃথুদক—তিনি কান্যকুব্জের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মধুসূদন ছিল। তিনি ব্রহ্মগুপ্তের গ্রন্থের টীকাকার ছিলেন। ৯৬২ শকে (১০৪০ খ্রীঃ) বরুণখণ্ড খাদ্যের টীকায় পৃথুদকের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি স্বীয় টীকায় পৃথিবীর স্বীয় কক্ষে আবর্ত্তন সমর্থন করিয়াছেন।

পৃথুদক স্বামী—তিনি একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। ব্রহ্মগুপ্ত বিরচিত ব্রহ্ম সিদ্ধান্তের তিনি এক টীকা রচনা করেন। ৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

পৃথ্বীচন্দ্র ত্রিবেদী, রাজা—মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত পাকুরের অন্যতম ভূম্যধিকারী। তাঁহার পিতার নাম বৈদ্যনাথ। পৃথ্বীচন্দ্র 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা। ইহা পুরাণের অনুকরণে রচিত এবং পাঁচ খণ্ডে ও চারিশত

ঊনিশ অধ্যায়ে শেষ হইয়াছে। ইহাতে দেবী মাহাত্ম্য, তীর্থ মাহাত্ম্য, উপাসনা পদ্ধতি, জীমূত বাহনের উপাখ্যান প্রভৃতি আছে। উহা বঙ্গাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে (খ্রীঃ অষ্টাদশের ১ম) রচিত হয়।

পৃথ্বীচাঁদ—শিখদের গুরু রামদাসের অর্জ্জুন, পৃথ্বীচাঁদ ও মহাদেব নামে তিন পুত্র ছিল। গুরু রামদাসের পরলোক গমনের পর অর্জ্জুন গুরু পদে প্রতিষ্ঠিত হন। সেই সময়ে পৃথ্বীচাঁদ গুরু পদ পাইবার জন্য তেমন চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু অর্জ্জুনের মৃত্যুর পর, এই গুরুপদ পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন তিনি গুরু অর্জ্জুন জীবিত থাকিতেই তাঁহার বিরোধী হইয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার নিধনের কারণও কিয়দংশে তিনি। সুতরাং অর্জ্জুনের দেহাবসানের পর, তাঁহার একাদশবর্ষ বয়স্ক পুত্র হরগোবিন্দকেই শিখেরা গুরু বলিয়া মানিয়া লইলেন। পৃথ্বীচাঁদ তাঁহাদের সঙ্গে না মিলিয়া একটী পৃথক দলের সৃষ্টি করিলেন। তাঁহারও কতক শিখ অনুবর্ত্তী হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল অপর শিখেরা পৃথ্বীচাঁদের অনুবর্ত্তীদিগকে অবজ্ঞাসূচক 'মিনা' (ঘৃণা) নামে অভিহিত করিল।

পৃথ্বীদেব—মহাকোশলে চেদি বংশের এক শাখা রাজত্ব করিতেন। এই বংশের জাজল্লদেব, রত্নদেব ও পৃথ্বীদেব নামক তিনজন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে। এই বংশে তিনজন পৃথ্বীদেব ছিলেন। রাজা দ্বিতীয় পৃথ্বীদেবের সময়ের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তিনি ১১৪০—১১৬০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

পৃথ্বীধর—খ্রীঃ ২০৩ অব্দে শূদ্রক কর্ত্তৃক রচিত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের তিনি একটী টীকা রচনা করিয়াছেন।

পৃথ্বীনারায়ণ সিংহ—নেপালের রাজা। ১২ বৎসর বয়সে ১৭৪২ খ্রীঃ অব্দে তিনি নেপালের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহারই বীরত্বে, উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ও অদম্য উৎসাহে নেপালের একছত্রীকরণ ও এই বর্ত্তমান উন্নতির সূত্রপাত হয়। ১৯ বৎসর বয়সে ১৭৪৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি নয়াকোটগড় অধিকার করেন। তখন নেপাল কয়েকটী খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এক খণ্ডের রাজা জয়প্রকাশ মল্লকে পরাস্ত করিয়া তিনি সমস্ত নেপালের অধিপতি হইলেন। ক্রমে ক্রমে কাটমুণ্ড, ভাটগাঁও ও পাটন তাঁহার অধিকারে আসিল। ১৭৬৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি কাটমুণ্ড নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। ১৭৭১ খ্রীঃ অব্দে গণ্ডকী নদীর তীরে মোহন তীর্থে বর্ত্তমান নেপালের রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও রাজাধিরাজ মহাবীর পৃথ্বীনারায়ণ চির নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তৎপরে

তাঁহার পুত্র সিংহ প্রতাপ রাজা হইয়াছিলেন।

পৃথ্বীপাল—তিনি কাশ্মীরপতি ক্ষেমগুপ্ত ও তাঁহার রাণী দিদ্দার সময়ে (৯৫০—১০১৪ খ্রীঃ) বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি কাশ্মীররাজের সামন্ত নরপতি ছিলেন। মন্ত্রী ফল্গুনের মৃত্যুর পরে রাজপুরীর অধীশ্বর পৃথ্বীপাল অতিশয় প্রবল হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে প্রয়াসী হন। রাণী দিদ্দা তাঁহাকে দমন করিবার জন্য প্রবল একদল সৈন্য তুঙ্গ প্রভৃতি সেনাপতিদের তত্ত্বাবধানে প্রেরণ করেন। পৃথ্বীপালের সহিত যুদ্ধে মন্ত্রী বিপাটক ও হংসরাজ নিহত হন। তুঙ্গ ভিন্ন পথে পৃথ্বীপালের রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া অগ্নি প্রদান করেন। ইহাতে রাজপুরীর অধীশ্বর পরাজিত হন।

পৃথ্বীপাহার—আজমীর নগরের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর অজপাল নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি মকাবতী নগর হইতে স্ববংশীয় পৃথ্বীপাহার নামক এক ব্যক্তিকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। পৃথ্বীপাহারের চতুর্বিংশতি পুত্র হইতে তাঁহার বংশ রাজপুতনার সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। প্রখ্যাত নামা মাণিক রায় তাঁহারই বংশধর।

পৃথ্বীবর্ম্মা—জেজাকভুক্তির (বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ড) চন্দ্রাত্রেয় বা চন্দেল্লবংশীয় রাজা মদনণ বর্ম্মার তিনি দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ১১১৫—১১২৯ খ্রীঃ অব্দ মধ্যে কোন সময়ে রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার তাম্র মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার পুত্র মদন বর্ম্মা ১১২৯—১১৬২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

পৃথ্বীবল্লভ শ্রীচন্দনপাল মাড়ি সুলতান, রাজা—তিনি মেদিনীপুরের অন্তর্গত নারায়ণ গড়ের শেষ নরপতি। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতা জগৎ বল্লভের মৃত্যুর পরে তিনি রাজা হন। তাঁহার প্রকৃতি অতি মধুর ছিল। কিন্তু কতকগুলি ধূর্ত্ত ও মন্দ প্রকৃতির লোকের সংস্রবে আসিয়া তাঁহার চরিত্র অতিশয় কলুষিত হয়। ইহার ফলে তিনি ঋণ জালে আবদ্ধ হন এবং তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে সমস্ত সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় হয়। স্বর্গীয় দুর্গাচরণ লাহার বংশধরেরা এখন তাঁহার মালিক। গন্ধর্ব্ব শ্রীচন্দন পাল রাজা দেখ।

পৃথ্বী বীর বিক্রম শাহ, মহারাজাধিরাজ—তিনি নেপালের মহারাজা। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে তিনি সিংহাসনারূঢ় হন।

পৃথ্বীভঞ্জ—তিনি উড়িষ্যার ভঞ্জবংশীয় নরপতি দ্বিতীয় রণভঞ্জের (১০৬৮ খ্রীঃ) দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার ভ্রাতা রাজভঞ্জের রাজত্বের পরে তিনি রাজা হন। পৃথ্বীভঞ্জের পুত্র নরেন্দ্র ভঞ্জ। কোটভঞ্জ দেখ।

পৃথ্বীমল্ল—চিতোরের রাণা পৃথ্বীমল্ল গয়াতীর্থ মুসলমানদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য বার বার মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট বার বার পরাজিত হইয়া মুসলমানগণ হিন্দুতীর্থে অত্যাচার করিতে কিছু দিনের জন্য বিরত হইয়াছিলেন। পৃথ্বীমল্ল যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হন।

পৃথ্বীরাজ—(১) ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভারতের স্বাধীন শেষ হিন্দু নরপতি। যে সময়ে দিল্লীর সার্ব্বভৌম সম্রাট অনঙ্গপালের সহিত কণৌজের রাঠোররাজ বিজয় পালের যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময়ে আজমীরের চৌহানরাজ সোমেশ্বর অনঙ্গ পালের যথেষ্ট সহায়তা করেন। সামন্তরাজ সোমেশ্বরের এই কার্য্যে অনঙ্গ পাল অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিলেন। এই কন্যার গর্ভেই পৃথ্বীরাজের জন্ম হয়। ইতিপূর্ব্বে অনঙ্গ পাল জ্যেষ্ঠা কন্যাকে কনোজরাজ বিজয় পালের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে স্বদেশ দ্রোহী জয়চাঁদ জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লীশ্বর অনঙ্গ পাল অপুত্রক ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র জয়চাঁদকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠ দৌহিত্র পৃথ্বীরাজকেই দিল্লীর সিংহাসন প্রদান করেন। জয়চাঁদ মাতামহের এই ব্যবহারে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতীকারে সচেষ্ট হইলেন। পৃথ্বীরাজও ইহা বুঝিতে পারিয়া একবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। মুন্দরের পুরীহররাজ ও পত্তনের অধিপতি আজমীরের চৌহান বংশের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন না। চৌহান পতি পৃথ্বীরাজ মাতামহ অনঙ্গ পালের সিংহাসন লাভ করিলে পর মুন্দররাজ তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু প্রতারণাপূর্ব্বক তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিলেন না। পৃথ্বীরাজ এই প্রতারণার সমুচিত শাস্তি প্রদান করিয়া মুন্দর রাজাকে তাঁহার শক্তির পরিচয় প্রদান করিলেন। জয়চাঁদ কিন্তু পৃথ্বীরাজের এই জয়ে আরও ঈর্ষান্বিত হইলেন। ইতিমধ্যে নগর কোটের কোন স্থানের ৭ কোটি স্বর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। এই সমস্ত স্বর্ণ মুদ্রা পৃথ্বীরাজ অধিকার করিলেন। পৃথ্বীরাজের অর্থ লাভে কনোজের জয়চাঁদ ও পত্তন রাজের ভয় হইল। একেইত পৃথ্বীরাজের বিশাল সেনাবল, তাহাতে আবার বিপুল অর্থ লাভ ইহাতে তাঁহার শক্তি শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। মিবারের মহারাজ সমর সিংহ পৃথ্বীরাজের ভগিনী পৃথাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শ্যালক ও ভগিনীপতি এই উভয়ের মধ্যে প্রণয়ও যথেষ্ট ছিল। কনোজ ও পত্তনের নরপতিদ্বয় সমর সিংহের প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে ক্ষান্ত

ছিলেন না। সমর সিংহের পক্ষাবলম্বন করিয়া পৃথ্বীরাজ কয়েকবার যুদ্ধও করিয়াছেন। এক্ষণ ভূগর্ভ নিহত প্রাপ্ত অর্থের অর্দ্ধভাগ স্বীয় ভগিনীপতি সমর সিংহকে প্রদান করিলেন। উদার হৃদয় সমর সিংহ সেই অর্থ স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া সামন্ত নৃপতিবর্গকে বণ্টন করিয়া দিলেন। ইঁহাতেও প্রকারান্তরে পৃথ্বীরাজের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। জয়চাঁদ ভয় পাইয়া কতকগুলি তাতার সৈন্য পোষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতেও তাঁহার বিভীষিকা দূর হইল না। অবশেষে মোহাম্মদ ঘোরীকে ভারত আক্রমণ করিতে আহ্বান করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে জয়চাঁদ স্বীয় কন্যা সংযুক্তার বিবাহের জন্য এক স্বয়ম্বর সভার আহ্বান করেন। তদানীন্তন ভারতের সকল নৃপতিকেই তিনি নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈরী নিবন্ধন পৃথ্বীরাজ ও সমর সিংহ সেই বিবাহে গমন করেন নাই। সেই জন্য জয়চাঁদ তাঁহাদের স্বর্ণ মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া দ্বারে দ্বারপালের স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। সংযুক্তা স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের কাহারও গলে মালা অর্পণ না করিয়া, দ্বারস্থিত পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্ত্তির গলে মালা অর্পণ করিলেন। পৃথ্বীরাজ ছদ্মবেশে সেই রাজসভায়ই ছিলেন। তিনি সংযুক্তাকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। উপস্থিত রাজন্যবর্গ অথবা জয়চাঁদ কাহারও তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবার সমর্থ হইল না। এই ঘটনাও জয়চাঁদের পৃথ্বীরাজের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবার অন্যতম কারণ হইয়াছিল।

মোহাম্মদ ঘোরী লাহোরে সুদৃঢ় হইয়া সমুদয় ভারতবর্ষ জয় ও লুণ্ঠনের কল্পনা করিতেছিলেন। এমন সময়ে জয়চাঁদ তাঁহাকে দিল্লী আক্রমণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। এমন সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নহে মনে করিয়া মোহাম্মদ ঘোরী অবিলম্বে বিপুল সৈন্য বাহিনী সমভিব্যাহারে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পৃথ্বীরাজ পূর্ব্বেই এই সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি সমর সিংহকে আনয়ন করিবার জন্য চাঁদ পুন্দির নামক সামন্ত রাজকে প্রেরণ করিলেন। অন্য স্থানেও সংবাদ প্রেরিত হইল। সমর সিংহ ও তাঁহার পুত্র কল্যাণ সিংহ বহু সৈন্য পরিবৃত হইয়া সত্বর দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। বহু সামন্ত নরপতি অসংখ্য সৈন্যসহ পৃথ্বীরাজের বাহিনীর সহিত মিলিত হইলেন। অগোণে তিরৌরীক্ষেত্রে উভয় সৈন্য দলের সাক্ষাৎ হইল। মুসলমান সৈন্য দল হিন্দু সৈন্যদের মধ্যস্থল বার বার আক্রমণ করিয়াও বিফল হইলেন। অবশেষে হিন্দু ব্যূহের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সৈন্য দল মুসলমান সৈন্যকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল। মুসলমান সৈন্য

দলে দলে পলায়ন করিতে লাগিল। মোহাম্মদ ঘোরীর বর্ষার আঘাতে সেনাপতি গোবিন্দ রায়ের সম্মুখের দুইটী দন্ত ভগ্ন হইল। গোবিন্দ রায় প্রতিশোধ লইবার জন্য সজোরে মোহাম্মদ ঘোরীর বাহুতে আঘাত করিলেন। এই আঘাতের যন্ত্রণায় তিনি পতনোন্মুখ হইলে একজন খিলজী তাঁহার পশ্চাতে ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া তাঁহাকে লইয়া সবেগে রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। মোহাম্মদ ঘোরী সিতুন্দার দুর্গে আশ্রয় লইলেন। হিন্দু সৈন্য দুর্গ অবরুদ্ধ করিলেন। ত্রয়োদশ মাস পরে ঘোরী আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি হিন্দুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া ভ্রাতার নিকট গজনীতে গমন করিলেন (১১৯১ খ্রীঃ অব্দ)। ইহার দুই বৎসর পরে ১১৯৩ খ্রীঃ অব্দে মোহাম্মদ ঘোরী আবার দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আবার তিরৌরী ক্ষেত্রে উভয় দলে সম্মুখীন হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল; দুইদিন যুদ্ধ হইল, কিন্তু কোনও পক্ষে জয় পরাজয় নির্ণিত হইল না। তৃতীয় দিন প্রত্যূষে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সেনাপতি গোবিন্দ রায় অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া সমর ক্ষেত্রে শয়ন করিলেন। সমর সিংহ ও তাঁহার পুত্র কল্যাণ সিংহ বিরোচিত গতি লাভ করিলেন। আরও অসংখ্য যোদ্ধা সমর শয্যায় শয়ন করিলেন। অবশেষে পৃথ্বীরাজ বন্দী হইয়া নিষ্ঠুররূপে নিহত হইলেন। পৃথা, সংযুক্তা প্রভৃতি অন্যান্য পুরনারীদের সহিত অনলে প্রবেশ করিলেন পৃথ্বীসিংহের পুত্র বীর রণসিংহ দিল্লী নগর লুণ্ঠন হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন। ভারতে মুসলমান পতাকা উড্ডীন হইল।

পৃথ্বীরাজ—(২) তিনি অম্বরের অধিপতি। তাঁহারই কন্যাকে রাণা রত্ন অতি সংগোপনে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাণা রত্ন ও সূর্য্যমল্ল দেখ।

পৃথ্বীরাজ—(৩) সক্কোরপতি পৃথ্বীরাজ মিবারের সামন্ত নরপতি ছিলেন তিনি মিবারের রাণা উদয়সিংহের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বনবীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ছিলেন। উদয়সিংহ দেখ।

পৃথ্বীরাজ—(৪) মিবারপতি মালদেব ১৫৫৯ খ্রীঃ অব্দে দ্বাদশ পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। মালদেবের সপ্তম পুত্র পৃথ্বীরাজ হইতে বর্ত্তমান আলোয়ার রাজবংশ সমুদ্ভূত হইয়াছে।

পৃথ্বীরাজ—(৫) মিবারের প্রসিদ্ধ রাণা রায় মল্লের সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্ল নামে তিনটী পুত্র ছিল। তাঁহারা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন। যদিও জ্যেষ্ঠ সঙ্গ রাজা হইবার কথা, তথাপি পৃথ্বীরাজ বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করিবার অভিলাষী ছিলেন। এই বিষয়

মীমাংসা করিবার জন্য পিতৃব্য সূর্য্য মল্লের সহিত তিন ভ্রাতা উদয়পুরের পাঁচ মাইল পূর্ব্বস্থিত বারুণী দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হন। কথা হইয়াছিল যে বারুণী দেবীর পরিচারিকা যাহাকে নির্দ্দেশ করিবেন, তিনিই রাজা হইবেন। পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্ল একখানা মাদুরে, সঙ্গ একখানা ব্যাঘ্রচর্ম্মে উপবেশন করিলেন, সূর্য্যমল্ল সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মে জানু সংলগ্ন করিয়া উপবেশন করিলেন। যথাকালে সন্ন্যাসিনী উপস্থিত হইয়া সঙ্গকেই রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। ইহাতে পৃথ্বীরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া সঙ্গকে আক্রমণ করিলেন। সূর্য্যমল্ল মধ্যবর্ত্তী হইলে সঙ্গ পলায়ন করিলেন। বারুণী দেবীর পরিচারিকারাও অন্য দ্বার দিয়া পলায়ন করিলেন। সঙ্গ পলায়নকালে শিবান্তি নগরে উদাবৎবংশীয় বিদা নামক এক রাজপুতের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সদাশয় বিদা যেই মাত্র সঙ্গকে অশ্ব হইতে নামাইলেন অমনি জয়মল্ল তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। সদাশয় বিদা শরণাগত সঙ্গকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। এই অবসরে সঙ্গ পলায়নপূর্ব্বক জীবন রক্ষা করিলেন। পৃথ্বীরাজ সূর্য্যমল্লের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অনেক আঘাত পাইয়াছিলেন। সেই আঘাতের উপশম হইলেই তিনি আবার সঙ্গের অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন।

এই দিকে রাণা রায় মল্ল পুত্রদের এই সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া পৃথ্বীরাজকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন—"তুমি আমার রাজ্য হইতে দূর হইয়া যাও। তুমি যেরূপ উদ্ধত, সাহসী ও বিবাদ প্রিয় তাহাতে তুমি অনায়াসে আপন জীবিকা অর্জ্জন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।" তেজস্বী পৃথ্বীরাজ জনকের আদেশে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া পাঁচজন মাত্র অশ্বারোহী অনুচর সঙ্গে লইয়া গদবারের অন্তর্গত বালীয় নগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে নাদোল নগরে কিছুকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ওঝা নামক এক বণিকের সাহায্যে ও পরামর্শে নাদোল নগরের মীন রাজের আনুগত্য স্বীকার করিলেন এবং আপনার প্রকৃত পরিচয় গোপনপূর্ব্বক মীনরাজের সেবায় নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু কি উপায়ে গদবার রাজ্য উদ্ধার করিবেন, অনবরত কেবল সেই চিন্তায় রত রহিলেন। অবিলম্বে সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। আহেরীয়া নামে মীনদের এক উৎসব উপলক্ষে সকলে যখন আমোদ প্রমোদে লিপ্ত সেই সময়ে রাজপুতদিগকে সম্মিলিত করিয়া, পৃথ্বীরাজ সমস্ত মীনদিগকে নিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। মীনরাজ নিহত হইলেন। পশুযূথের ন্যায় মীনদিগকে বধ করিয়া, তিনি সমস্ত গদ-

বার রাজ্য অধিকার করিলেন। সন্দা নামক জনৈক শোলাঙ্কি রাজপুত এবং ওস্নাকে ইহার শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিলেন। রাণা রায় মল্ল পৃথ্বীরাজের বিজয়ে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে পুনরানয়ন করিলেন। ইহার পূর্ব্বেই জয়মল্ল রাও শূরতানের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। শোলাঙ্কিপতি রাও শূরতানের তারাবাঈ নাম্নী একটী পরম রূপবতী ও বীর্য্যবতী কন্যা ছিল। শূরতান রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আরাবল্লীর পাদপ্রস্থস্থিত বেদনোর নগরে অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছিলেন। তারার রূপ গুণের কথা শুনিয়া পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে দেখিবার জন্য বেদনোরে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। এদিকে তারা ও পৃথ্বীরাজের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগিনী হইয়াছিলেন। শূরতানের মুখে যখন পৃথ্বীরাজ শুনিতে পাইলেন যে "যিনি তোডাতঙ্ক উদ্ধার করিবেন, তিনিই তারাকে লাভ করিতে পারিবেন।" তখনই তিনি তোডাতঙ্ক উদ্ধারের জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন। সৌভাগ্য বশতঃ সেই সুযোগও উপস্থিত হইল। মুসলমানদের মহরম পর্ব্ব উপস্থিত। পৃথ্বীরাজ পাঁচশত নির্ব্বাচিত অশ্বারোহী সৈন্যসহ নগরে উপস্থিত হইয়া তাজিয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে তারাবাঈও ছিলেন। তাজিয়া যখন প্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন যবনপতি আফগান্ সর্দার উপর হইতে তাহা দেখিতেছিলেন, এমন সময় তারাবাঈ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একটী তীর নিক্ষেপ করিলে, সঙ্গে সঙ্গে পৃথ্বীরাজও একটী প্রকাণ্ড শূলের আঘাতে তাঁহাকে ভূমিতে পাতিত করিলেন। অমনি মুসলমানদের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। যে যেদিকে পারিল প্রাণ লইয়া সবেগে পলায়ন করিল। অধিকাংশ লোক পলায়ন করিতে না পারিয়া পৃথ্বীরাজের অসির তলে শয়ন করিল। এইরূপে তোডাতঙ্কের উদ্ধার করিয়া পৃথ্বীরাজ বীর নারী তারাবাঈকে লাভ করিলেন। ইতিমধ্যে সূর্য্যমল্ল পৃথ্বীরাজের অনুপস্থিতির সুযোগে মিবার অধিকার করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। পৃথ্বীরাজ ফিরিয়া আসাতে তাঁহার সেই সুযোগ আর ঘটিয়া উঠিল না। সেজন্য তিনি সারঙ্গ দেব নামক একজন রাজপুতের সহিত মিলিত হইয়া মালবপতি মজফরের নিকট গমন করিলেন। মজফর তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সূর্য্যমল্ল ও পৃথ্বীরাজের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সূর্য্যমল্ল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। সারঙ্গ দেব নিহত হইলেন। ইহার পরে স্বীয় ভগিনীর পত্র পাইয়া পৃথ্বীরাজ শিরোহী রাজ্যে গমন করিলেন। শিরোহীপতি জগমল্ল মদ